من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে ফকীহ্ বানাইয়া দেন।

বঙ্গানুবাদ

বেহেশ্‌তী জেওর

৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড

[দ্বিতীয় ভলিউম]

লেখক

কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক

হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা

نـحمده و نـصلـى عـلى رسولـه الـكريـم

আরয

হাম্‌দ ও ছালাতের পর বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট অধীনের বিনীত আরয এই যে, মুজাদ্দেদে যমান, কুত্‌বে দাওরান, পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রহ্‌মতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় সম্পূর্ণ জীবনটি ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন কিতাব ১০/১২ জিল্‌দেরও আছে। কিন্তু এইসব কিতাবের কপি রাইট তিনি রাখেন নাই বা কোন একখানি কিতাব হইতে বিনিময় স্বরূপ একটি পয়সাও তিনি উপার্জন করেন নাই। শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দ্বীন ইসলামের খেদমতে ও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত কিতাবের মধ্যে ১১ জিল্‌দে সমাপ্ত বেহেশ্‌তী জেওর একখানা বিশেষ যরূরী কিতাব। সমগ্র পাক-ভারতের কোন ঘর বোধ হয় বেহেশ্‌তী জেওর হইতে খালি নাই এবং এমন মুসলমান হয়ত খুব বিরল, যে বেহেশ্‌তী জেওরের নাম শুনে নাই। বেহেশ্‌তী জেওর আসলে লেখা হইয়াছিল শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য; কিন্তু কিতাবখানা এত সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও এত ব্যাপক হইয়াছে যে, পুরুষেরা এমন কি আলেমগণও এই কিতাবখানা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা পাইতেছেন।

বহুদিন যাবৎ এই আহ্‌কারের ইচ্ছা ছিল যে, কিতাবখানার মর্ম বাংলা ভাষায় লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলিম ভাই-ভগ্নীদিগের ইহ-পরকালের উপকারের পথ করিয়া দেই এবং নিজের জন্যও আখেরাতের নাজাতের কিছু উছীলা করি; কিন্তু কিতাব অনেক বড়, নিজের স্বাস্থ্য ও শরীর অতি খারাপ, শক্তিহীন; তাই এত বড় বিরাট কাজ অতি শীঘ্র ভাগ্যে জুটিয়া উঠে নাই। এখন আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে মুসলিম সমাজের খেদমতে ইহা পেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। মক্কা শরীফের হাতীমে বসিয়া এবং মদীনা শরীফের রওযায়ে-আক্‌দাসে বসিয়াও কিছু লিখিয়াছি। 'আল্লাহ্ পাক এই কিতাবখানা কবূল করুন এই আমার দো'আ এবং আশা করি, প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণও দো'আ করিতে ভুলিবেন না। এই পুস্তকে আমার বা আমার ওয়ারিশানের কোন স্বত্ব নাই ও থাকিবে না।

মূল কিতাবে প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গেই উহার দলীল এবং হাওয়ালা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উর্দু বেহেশ্‌তী জেওর কিতাব সব জায়গায়ই পাওয়া যায় এবং উর্দু ভাষাও প্রায় লোকেই বুঝে, এই কারণে আমি দলীল বা হাওয়ালার উল্লেখ করি নাই। যদি আবশ্যক বোধ হয়, পরবর্তী সংস্করণে দলীল ও হাওয়ালা দেওয়া হইবে। আমি একেবারে শব্দে শব্দে অনুবাদ করি নাই, খোলাছা মতলব লইয়া মূল কথাটি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছি। দুই একটি মাসআলা আমাদের দেশে গায়ের যরূরী মনে করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং কিছু মাসআলা যরূরত মনে করিয়া অন্য কিতাব হইতে সংযোজিত করিয়াছি। তা'ছাড়া বেহেশ্‌তী গওহরের সমস্ত মাসআলা বেহেশ্‌তী জেওরের মধ্যেই বিভিন্ন খণ্ডে ঢুকাইয়া দিয়াছি। কাহারও সন্দেহ হইতে পারে বিধায় বিষয়টি জানাইয়া দিলাম।

আরযগুযার

শামসুল হক

৩১/৭/৮৬ হিজরী

সূচী-পত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ খণ্ড

বিষয় — **পৃষ্ঠা**

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বেহেশ্‌তী জেওর

চতুর্থ খণ্ড

বিবাহ

১। **মাসআলা ঃ** বিবাহ আল্লাহ্ তা'আলার অতি বড় একটি নেয়ামত। ইহা দ্বারা দ্বীনেরও উপকার হয় এবং দুনিয়ারও উপকার হয়। ইহার উপকারিতা এবং সদুদ্দেশ্যাবলী অনেক বেশী। বিবাহ দ্বারা মানুষ গোনাহ্ হইতে রক্ষা পায়, চক্ষু বা দিল এদিক ওদিক যায় না এবং মনের চাঞ্চল্য দূর হয়। বড় বিষয় এই যে, বিবাহে যেমন পার্থিব উপকার হয়, তেমন আখেরাতেরও উপকার হয়। কেননা, (পার্থিব উপকারিতা, ঘর-গৃহস্থালির সুশৃঙ্খলা ত আছেই, তাছাড়া হাদীস শরীফে আছে,) 'স্বামী-স্ত্রী যে সময়মত গোপন ঘরে বসিয়া প্রেমালাপ বা হাসি-ঠাট্টা করে তাহার ছওয়াব নফল নামাযের চেয়ে কম নহে।

২। **মাসআলা ঃ** দুই জনের মুখের দুইটি কথা অর্থাৎ 'ঈজাব' এবং 'কবূলের' দ্বারা নেকাহ্‌র আক্‌দ (বিবাহ-বন্ধন) সম্পাদিত হইয়া যায়। যেমন—যদি দুল্‌হানের পিতা সাক্ষীদের সামনে দুল্‌হাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, 'আমি আমার কন্যাকে আপনার নিকট বিবাহ দিলাম' এবং দুল্‌হা বলে যে, 'আমি কবূল করিলাম'—তবেই নেকাহ্‌র আক্‌দ হইয়া যাইবে এবং দুল্‌হা-দুল্‌হান উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হইয়া যাইবে।

অবশ্য যদি তাহার একাধিক কন্যা থাকে, তবে মেয়ের নামও উল্লেখ করিতে হইবে (এবং নেকাহ্‌র আক্‌দের সময় মহরের উল্লেখ করিয়া দেওয়াও উত্তম এবং তৎপূর্বে খোৎবায়ে মাছুরা পড়া এবং পরে খোরমা, মিঠাই ইত্যাদির দ্বারা হাজিরানে মজলিসের মুখ মিঠা করা মোস্তাহাব। যদিও দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের সামনে 'ঈজাব-কবূল' হইলেই নেকাহ্‌র আক্‌দ হইয়া যায়; তবুও ভাই-বেরাদর, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের প্রকাশ্য সভায় বিবাহ হওয়াই উত্তম।

৩। **মাসআলা ঃ** কেহ যদি বলে, 'আপনার অমুক মেয়ের বিবাহ আমার সহিত দিয়া দেন' এবং তদুত্তরে মেয়ের পিতা বলে, 'আচ্ছা আমি তাহার বিবাহ আপনার সহিত দিয়া দিলাম', তবে (এইরূপ বলাতেও) বিবাহ হইয়া যাইবে, প্রার্থী পুনরায় 'আমি কবূল করিলাম' এই কথা না বলিলেও চলিবে।

৪। **মাসআলা ঃ** মেয়ে যদি সামনে উপস্থিত থাকে এবং তাহার দিকে ইশারা করিয়া বলে যে, 'আমার এই মেয়ের বিবাহ আপনার সহিত দিয়া দিলাম' এবং দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ দুল্‌হা বলে যে, 'আমি কবূল করিলাম', তবে তাহাতেই বিবাহ দুরুস্ত হইবে, মেয়ের নাম উল্লেখ করার দরকার

হইবে না। আর যদি মেয়ে সামনে উপস্থিত না থাকে, তবে মেয়ের নাম এবং তাহার পিতার নাম এই পরিমাণ উচ্চ শব্দে বলিতে হইবে যে, সকল সাক্ষীরা যেন পরিষ্কার শুনিতে পায় যদি শুধু বাপের নাম উল্লেখ করাতে যথেষ্ট পরিচয় না হয়, সকলে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে না পারে যে, কাহার বিবাহ কাহার সহিত হইল, তবে দাদার নামও উল্লেখ করিতে হইবে। ফলকথা এই যে, নাম-ধাম এমনভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যাহাতে সকলেই বুঝিতে পারে যে, অমুকের বিবাহ হইতেছে।

৫। মাসআলা ঃ বিবাহ দুরুস্ত হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, অন্ততঃ (পূর্ণ বয়স্ক সজ্ঞান মুমিন মুসলমান) পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে ঈজাব কবূলের কথা দুইটি হওয়া দরকার এবং তাহাদেরও নিজ কানে উভয়ের কথা শুনা দরকার; আর যদি মেয়ের পিতা একা একা অথবা একজন পুরুষের সামনে অথবা শুধু স্ত্রীলোকদের বা বালকদের সামনে ঈজাবের কথা বলে যে, 'আমি আমার অমুক মেয়েকে আপনার সহিত বিবাহ দিলাম' এবং অপর পক্ষ বলে যে, 'আমি কবূল করিলাম' তবে তাহাতে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না।

৬। মাসআলা ঃ যদি শুধু দশ বার জন মেয়েলোকের সাক্ষাতে ঈজাব-কবূল করে, তবে তাহাতেও বিবাহ হইবে না। ফলকথা এই যে, দুইজন মেয়েলোকের সঙ্গে একজন পুরুষ থাকাই চাই, বহু সংখ্যক মেয়েলোক হইলে তবুও তাহাদের সহিত একজন পুরুষ থাকাই চাই।

৭। মাসআলা ঃ যদি দুইজন অমুসলমান পুরুষের সামনে অথবা একজন মুসলমান পুরুষ এবং অন্যান্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের সামনে অথবা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান পুরুষ এবং একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান স্ত্রীলোক এবং অন্যান্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদের সামনে 'ঈজাব-কবূল' হয়, তবে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না।

৮। মাসআলা ঃ প্রকাশ্য সভায়, যেমন জামে' মসজিদে জুমু'আর নামাযের পর অথবা এইরূপ অন্য কোন মজলিসে বিবাহ হওয়াই অতি উত্তম, যাহাতে বিবাহের সংবাদ সকলেই অবাধে জানিতে পারে; গোপনে বিবাহ হওয়া উচিত নহে। অবশ্য একান্তই যদি কোন ঠেকা পড়ে, তবে কমের পক্ষে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের অবশ্যই উপস্থিত থাকিতে হইবে যাহারা নিজ কানে বিবাহের 'ঈজাব-কবূল' কথাগুলি শুনিতে পায়।

৯। মাসআলা ঃ পাত্র এবং পাত্রী উভয় যদি পূর্ণ বয়স্ক বালেগ হয়, তবে তাহারা তাহাদের 'ঈজাব-কবূল' নিজেরাই করিতে পারে। সাক্ষীদের সামনে যদি তাহাদের একজন বলে, 'আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম' এবং অন্যজন বলে, 'আমি কবূল করিলাম' তবে তাহাতেও বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

১০। মাসআলা ঃ সাবালেগ পাত্র বা পাত্রী যদি নিজে 'ঈজাব-কবূল' না করিয়া অন্য কাহাকে বিবাহে 'ঈজাব-কবূল'-এর জন্য উকীল বানাইয়া দেয় এবং উকীল সাক্ষীদের সামনে উকীল স্বরূপ 'ঈজাব-কবূল' করিয়া দেয় তাহাতেও বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে। উকীলের 'ঈজাব-কবূল'-এর পর আর মোয়াক্কেলের অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম

১। মাসআলা ঃ (১) নিজের সন্তানের সহিত বিবাহ হারাম। যেমন ছেলে, পোতা, পরপোতা, নাতি, নাতির ছেলে ইত্যাদি (যতই নীচে দিকে যাউক না কেন) সকলের সহিতই বিবাহ হারাম।

(২) এইরূপে বাপ, দাদা, পরদাদা, নানা, পরনানা ইত্যাদি (যতই ঊর্ধ্বে যাউক না কেন,) সকলের সহিতই বিবাহ হারাম।

২। **মাসআলা** ঃ (৩) আপন ভাই, (৪) মামু, (৫) চাচা, ভাতিজা, ভাগিনা ইহাদের সহিত বিবাহ হারাম।

শরীঅতে ভাইয়ের অর্থ এই যে, উভয়েরই মা এবং বাপ উভয়ই এক, অথবা বাপ দুই মা এক, অথবা মা দুই বাপ এক। নতুবা যদি বাপ ও মা উভয়েই ভিন্ন হয়, তবে তাহারা শরীঅত অনুসারে ভাই নহে। তাহাদের সহিত বিবাহ্ দুরুস্ত আছে। (যেমন, বাপের স্ত্রীর ছেলে। এইরূপে শরীঅতে মামু তাহাকে বলে, যে মার শরীঅতী ভাই হয় নতুবা মার চাচাত, মামাত ইত্যাদি ভাইকে শরীঅতে মামু বলে না, তাহাদের সহিত বিবাহ দুরুস্ত আছে। এইরূপে চাচা তাহাকে বলে, যে বাপের উপরোক্ত প্রকারের ভাই হয়, নতুবা বাপের চাচাত, খালাত ইত্যাদি ভাই শরীঅত অনুসারে চাচা নহে, তাহাদের সহিত বিবাহ দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআলা** ঃ (৬) জামাই অর্থাৎ মেয়ের স্বামীর সহিত বিবাহ হারাম। মেয়ের যদি কাহারও সহিত শুধু আক্‌দ হয়, রোখছতী না হয় বা মেয়ে স্বামীর সহিত গৃহবাস নাও করে, তবুও সেই জামাইর সহিত শাশুড়ীর বিবাহ হারাম।

৪। **মাসআলা** ঃ (৭) বাপ মরিয়া যাওয়ার পর মা যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে, তবে মায়ের সেই স্বামীর সহিত মেয়ের বিবাহ হারাম। কিন্তু সেই স্বামীর সহিত সহবাস করিবার পূর্বেই যদি মা মরিয়া যায় বা তালাক প্রাপ্তা হয়, তবে মায়ের সেই স্বামীর সহিত মেয়ের বিবাহ হারাম নহে।

৫। **মাসআলা** ঃ (৮) সতীনের পুত্রের সহিত বিবাহ হারাম। স্বামী-সহবাস ভাগ্যে ঘটুক বা সহবাসের পূর্বেই স্বামী তালাক দেউক বা মরিয়া যাউক; তথাপি স্বামীর জন্য স্ত্রীর সন্তানদের সহিত বিবাহ হারাম। (ভাসুর-পুত) বা দেওর-পুতের সহিত বিবাহ হারাম নহে।

৬। **মাসআলা** ঃ (৯) শ্বশুর এবং তাহার বাপ, দাদা, পরদাদা ইত্যাদির সহিত পুত্র-বধূর বিবাহ হারাম। (চাচা-শ্বশুর, মামা-শ্বশুরের সহিত বিবাহ হারাম নহে।)

৭। **মাসআলা** ঃ (১০) নিজের ভগ্নীর স্বামীর সহিত বিবাহ হারাম, যে পর্যন্ত ভগ্নী তাহার বিবাহে থাকে। আর যদি ভগ্নী মরিয়া যায় অথবা ভগ্নীকে তালাক দেয় এবং তালাকের ইদ্দতও শেষ হইয়া যায়, তখন ভগ্নীপতির সহিত বিবাহ হারাম নহে। (এই জন্যই ভগ্নীপতি মাহ্‌রাম নহে, গায়ের মাহ্‌রাম। কেননা, মাহ্‌রাম উহাকে বলে, যাহার সহিত জীবনে কখনও বিবাহ্ দুরুস্ত হইতে পারে না।) ভগ্নীকে তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হইবার পূর্বেই যদি অন্য ভগ্নীকে বিবাহ করে, তবে সে বিবাহ দুরুস্ত নহে। (নন্দাই অর্থাৎ, ননদের স্বামীর সহিত, বহনই অর্থাৎ ভগ্নীর স্বামীর সহিত ভগ্নীর মৃত্যু বা তালাকের ইদ্দতের পর এবং বিহাই অর্থাৎ ভাইয়ের শালা, ছেলের শ্বশুর, মেয়ের শ্বশুর প্রভৃতির সহিত বিবাহ হারাম নহে।)

৮। **মাসআলা** ঃ যদি দুই ভগ্নীর একই পুরুষের সহিত বিবাহ হয়, তবে যাহার বিবাহ প্রথমে হইয়াছে তাহার বিবাহ দুরুস্ত হইবে, যাহার বিবাহ পরে হইয়াছে তাহার বিবাহ হারাম ও বাতেল হইবে। (আর যদি আগে পরে আক্‌দ না হইয়া এক সঙ্গেই দুই বোনের আক্‌দ একই পুরুষের সহিত হয়, তবে উভয়েরই বিবাহ বাতিল হইবে।)

৯। **মাসআলা** ঃ (১১) নিজের ফুফা এবং খালুর সহিত বিবাহ হারাম, যতদিন পর্যন্ত ফুফু, ফুফার এবং খালা, খালুর বিবাহে থাকে; নতুবা যদি ফুফু বা খালা মরিয়া যায় অথবা তালাক

দিয়া দেয় এবং তালাকের ইদ্দতও শেষ হইয়া যায়, তবে বিবাহ হারাম হইবে না। (এই জন্যই ফুফা এবং খালু মাহ্‌রাম নহে, গায়ের মাহ্‌রাম।)

১০। মাসআলা ঃ ফলকথা এই যে, একত্রে এমন দুইজন মেয়েলোককে একজন পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না, যাহাদের যে কোন একজনকে যদি পুরুষ ধারণা করা হয়, তবে তাহাদের পরস্পর বিবাহ হইতে পারে না। যেমন, খালা, বোন্‌ঝী, ফুফু, ভাতিজী ইত্যাদি।

১১। মাসআলা ঃ (আর যদি একজনকে পুরুষ ধরিলে বিবাহ হারাম হয়, কিন্তু অন্য জনকে পুরুষ ধরিলে হারাম হয় না, তবে এইরূপ দুইজনকে একত্রে বিবাহ করা যায়; যেমন) সতাল মা এবং সতীন-ঝি; (কেননা সতীন-ঝিকে যদি পুরুষ ধরা যায়, তবে এ বিবাহ হারাম হয়; কারণ সতাল মাকে বিবাহ করা হারাম; কিন্তু যদি সতাল মাকে পুরুষ ধরা যায়, তবে সতীন-ঝির সহিত তাহার কোন সম্পর্কই থাকে না, কাজেই বিবাহ হারাম হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে) দুইজনকে একত্রে একজনে বিবাহ করিতে পারে।

১২। মাসআলা ঃ পালক-পুত্র বা ধর্ম-ছেলের সহিত বিবাহ হারাম নহে। কেননা শরীঅতে মুখবোলা কুটুম্বিতার কোনই অস্তিত্ব নাই (কাজেই ধর্ম-ছেলে বা ধর্ম-বাপ মাহ্‌রামও হইবে না।)

১৩। মাসআলা ঃ আপন মামু অর্থাৎ, মার হাকীকী বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাই ব্যতিরেকে অন্য রেশ্‌তার মামুর সতি বিবাহ হারাম নহে। যেমন, মায়ের চাচাত, ফুফাত, মামাত, খালাত ভাইগণ (এইজন্য এইসব মামু মাহ্‌রাম নহে) এইরূপে আপন চাচা ব্যতিরেকে অন্য রেশ্‌তার চাচাদের সহিতও বিবাহ হারাম নহে। এইরূপে আসল ভাঞ্জা, ভাতিজা ব্যতিরেকে অন্য কোন রেশ্‌তার ভাঞ্জা, ভাতিজাদের সহিতও বিবাহ দুরুস্ত আছে। এইরূপে আপন ভাই ব্যতিরেকে চাচাত, মামাত, ফুফাত, খালাত ইত্যাদি রেশ্‌তার ভাইদের সঙ্গেও বিবাহ দুরুস্ত আছে।

১৪। মাসআলা ঃ এইরূপে যেখানে বলা হইয়াছে যে, দুই বোনকে বা ভাতিজীকে বা খালা-ভাঞ্জীকে একত্রে একজনে বিবাহ করিতে পারে না, সেখানে এই-ই অর্থ যে, আপন বোন বা আপন খালা-ভাঞ্জী বা আপন ফুফু-ভাতিজী; নতুবা যদি চাচাত, মামাত, খালাত বোন বা ফুফু-ভাতিজী বা খালা-ভাঞ্জী হয়, তবে তাহাদেরকে একত্রে বিবাহ করা হারাম নহে।

১৫। মাসআলা ঃ নসবের দিক দিয়া অর্থাৎ, জন্ম ও জাতিগত দিক দিয়া যে সব রেশ্‌তাদারের সহিত বিবাহ হারাম (বাপ, দাদা, ছেলে, চাচা, মামু ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, আর নানা, নাতি, পুতি) দুধের দিক দিয়াও সেইসব রেশ্‌তাদারের সহিত বিবাহ হারাম।যেমন, দুধ-বাপ অর্থাৎ, যাহার দুধ খাইয়াছে তাহার স্বামীর সহিত বিবাহ হারাম; দুধ-ভাই অর্থাৎ, যাহার দুধ খাইয়াছে তাহার পেটের ছেলে বা মেয়ে এবং দুধ পানকারী ছেলে-মেয়ের সহিত বিবাহ হারাম। দুধ-ছেলে,দুধ-পোতা অর্থাৎ যাহাকে নিজের দুধ খাওয়াইয়াছে তাহার সহিত এবং তাহার ছেলের সহিত বিবাহ হারাম। দুধ-চাচা অর্থাৎ দুধ-বাপের ভাইয়ের সহিত বিবাহ হারাম, দুধ-মামু অর্থাৎ দুধ-মার ভাইদের সহিত বিবাহ হারাম। দুধ-ভাতিজা অর্থাৎ দুধ-ভাইয়ের ছেলের সহিত বিবাহ হারাম। দুধ-ভাঞ্জা অর্থাৎ দুধ-ভগ্নীর ছেলের সহিত বিবাহ হারাম।

১৬। মাসআলা ঃ (নসবের দিক দিয়া এক, এইরূপ দুই ভগ্নীকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। দুধের দিক দিয়া এক, এইরূপ দুই ভগ্নীকেও একত্রে বিবাহ করা (তদ্‌রূপ) হারাম। অর্থাৎ, যদি দুইটি বেগানা মেয়েকে শৈশবে কোন একটি মেয়েলোক দুধ খাওয়াইয়া থাকে, তবে ঐ দুইটি মেয়েকে কোন পুরুষ একত্রে বিবাহ করিতে পারিবে না। (এমন কি, একটির তালাকের ইদ্দতের

মধ্যেও অন্যটিকে বিবাহ করিতে পারিবে না।) মোটকথা, উপরে যে হুকুম বর্ণিত হইয়াছে দুধের রেশ্‌তারও সেই হুকুম! ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ নং **মাসআলা** পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২১। মাসআলা ঃ মুসলমান মেয়ের বিবাহ অন্য কোন ধর্মাবলম্বী পুরুষের সহিত (বা মোর্‌তাদ[১] বা বে-ঈমানের সহিত) জায়েয নহে।

২২। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোকের স্বামী তাহাকে তালাক দিয়া দিলে অথবা স্বামী মরিয়া গেলে যতদিন পর্যন্ত তালাক বা মৃত্যুর ইদ্দত শেষ না হইয়া যাইবে, ততদিন পর্যন্ত অন্য কোন পুরুষের সহিত তাহার বিবাহ জায়েয নহে।

২৩। মাসআলা ঃ যে মেয়ের বিবাহ কাহারও সহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার বিবাহ অন্য কোন পুরুষের সহিত জায়েয নহে যতদিন পর্যন্ত না ঐ স্বামী মরিয়া যায় অথবা তালাক দিয়া দেয় এবং তালাকের ও মৃত্যুর ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যায়।

২৪। মাসআলা ঃ দেখুন পরিশিষ্ট 'যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম।

২৫। মাসআলা ঃ যে পুরুষের বিবাহে চারিটি মেয়েলোক বর্তমান আছে, তাহার জন্য পঞ্চম বিবাহ জায়েয নহে। আর যদি সে চারি স্ত্রীর এক স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেয়, তবে যতদিন তাহার ইদ্দত শেষ না হইয়া যাইবে, ততদিন অন্য কোন স্ত্রীলোকের বিবাহ তাহার সহিত জায়েয নহে।

২৬। মাসআলা ঃ সুন্নী মুসলমান মেয়ের বিবাহ শিয়া পুরুষের সহিত বহু সংখ্যক আলেমের ফৎওয়া মতে জায়েয নহে।

(কাদিয়ানীর সহিত বিবাহ সমস্ত আলেমগণের ফৎওয়া অনুসারে আদৌ জায়েয নহে।)

আরও এই চারিজন হারাম—(১) পরের স্ত্রী; (২) পুত্র-বধূ; (৩) স্ত্রীর মেয়ে; (৪) দুই বোনের বিবাহ এক সঙ্গে হারাম। খালা বোনঝিও তেমনি এক সঙ্গে হারাম।

যাহাদের সহিত চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম তাহাদিগকে মাহ্‌রাম বলে; যথা ঃ—ফুফু, খালা, শাশুড়ী ইত্যাদি। অস্থায়ীভাবে যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম তাহারা মাহ্‌রাম নহে? যথা শালী, পরের-স্ত্রী, খালা-শাশুড়ী, ফুফু-শাশুড়ী ইত্যাদি।

মা, দাদী, নানী আর নাতিনী, পুতিনী
বেটী, ফুফু, খালা আর ভাতিজী, ভাগিনী
দুধ-মাতা, দুধ-বোন, শাশুড়ী, ভাগিনী
এই চৌদ্দ জন জান হারাম একিনী

সাধারণতঃ লোকে যে মামী, চাচী, ভাবী, শালী, শালা-বৌ, সতাল শাশুড়ী, ধর্ম-মা, ধর্ম-বোন বা মেয়েলোকের পক্ষ হইতে চাচা-শ্বশুর, মামা-শ্বশুর, দেওর, দেওর-পুত, ননদ-পুত, ধর্ম-বাপ, ধর্ম-ভাই ইত্যাদিকে মাহ্‌রামের মত মনে করিয়া তদ্রূপ দেখা-শুনা বা আলাপ ব্যবহার করে বা দাদা পুত্নীকে, নানা পুত্নীকে বিবাহ করিতে পারে বলিয়া হাসি চাতুরী করে, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং শরীঅত বিরুদ্ধ।

(যাহাদের সহিত জীবনে কখনও বিবাহ হইতে পারে তাহাদিগকে গায়েরে-মাহ্‌রাম বলে।
—অনুবাদক)

টিকা

১ যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করিয়া কাফের হইয়াছে।

ওলী

(ছেলে বা মেয়েকে বিবাহ দিবার ক্ষমতা যাহার আছে, তাহাকে ওলী বলে। ওলীর জন্য আকেল, বালেগ এবং ওয়ারিশ হওয়া শর্ত। আকেল বালেগের উপর কেহ ওলী হইতে পারে না।)

১। মাসআলাঃ মেয়ে এবং ছেলের সর্বপ্রথম ওলী তাহাদের পিতা। পিতা না থাকিলে, দাদা থাকিলে দাদা ওলী হইবে। পিতা এবং দাদা না থাকিলে পরদাদা থাকিলে পরদাদা ওলী হইবে। যদি পিতা, দাদা এবং পরদাদা কেহই না থাকে, তবে হাকীকী ভাই থাকিলে হাকীকী ভাই ওলী হইবে, যদি হাকীকী ভাই না থাকে, তবে বৈমাত্রেয় ভাই থাকিলে বৈমাত্রেয় ভাই ওলী হইবে। যদি বৈমাত্রেয় ভাইও না থাকে এবং হাকীকী ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা থাকে, তবে হাকীকী ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা ওলী হইবে। যদি হাকীকী ভাইয়ের ঘরে ভাতিজা না থাকে এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ঘরে ভাতিজা থাকে, তবে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা ওলী হইবে। যদি ভাতিজা কেহই না থাকে, তবে ভাতিজার ছেলে এবং ভাতিজার ছেলে না থাকিলে ভাতিজার পোতা (উপরোক্ত তরতীব অনুযায়ী) ওলী হইবে। যদি ইহারা কেহই না থাকে, তবে হাকীকী চাচা ওলী হইবে। হাকীকী চাচা না থাকিলে সতাল চাচা, যদি চাচা কেহই না থাকে, তবে চাচাত ভাই ওলী হইবে। যদি চাচাত ভাই কেহই না থাকে, তবে চাচাত ভাইয়ের ছেলে ওলী হইবে। যদি চাচাত ভাইয়ের ছেলে না থাকে, তবে চাচাত ভাইয়ের পোতা ওলী হইবে। (উপরোক্ত তরতীব অনুযায়ী) যদি চাচা বা চাচার কোন আওলাদ না থাকে, তবে বাপের চাচা ওলী হইবে, বাপের চাচা না থাকিলে তাহার আওলাদ থাকিলে তাহারা ওলী হইবে। যদি বাপের চাচা বা তাহার ছেলে, পোতা, পরপোতা কেহই না থাকে, তবে দাদার চাচা, তারপর তাহার ছেলে, তারপর তাহার পোতা পরপোতারা তরতীব অনুসারে ওলী হইবে।

যদি এইসব জ্ঞাতির পুরুষবর্গের মধ্যে কেহই না থাকে, তবে তখন মা ওলী হইবে, তারপর দাদী, তারপর নানী, তারপর নানা, তারপর হাকীকী ভগ্নী, তারপর বৈমাত্রেয় ভগ্নী, তারপর বৈপিত্রেয় ভাই, ভগ্নী, তারপর ফুফু, তারপর মামু, (তাপরপর চাচাত ভগ্নী,) ক্রমাগত এইসবও ওলী হইতে পারে। (এক শ্রেণীর কয়েকজন ওলী হইলে বড়জন অন্যান্যদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিবে। মুরুব্বীর অনুমতি লইয়া অন্যেও কাজ করিতে পারে।)

২। মাসআলাঃ নাবালেগ ছেলে বা উন্মাদ, পাগল কাহারও ওলী হইতে পারিবে না। এইরূপে কাফেরও কোন মুসলমানের ওলী হইতে পারে না। (এমনকি, বাপ যদি কাফের হয় এবং মেয়ে মুসলমান হয়, তবে ঐ মেয়ের ওলী ঐ বাপ হইতে পারিবে না।)

৩। মাসআলাঃ মেয়ে বালেগা (আকেলা) হইলে সে স্বাধীন। তাহার উপর কোন ওলী বা অন্য কাহারও এমন ক্ষমতা থাকে না যে, তাহার বিনা অনুমতিতে তাহার বিবাহ দিয়া দিতে পারে। বিনা ওলীতে নিজেদের মন মত বিবাহ বসিবার ক্ষমতাও তাহাদের আছে। এরূপ করিলে ওলী অস্বীকার করিলেও তাহাদের বিবাহ জায়েয হইয়া যাইবে; কিন্তু মেয়ে যদি সমান ঘরে বিবাহ না বসিয়া নীচ ঘরে বিবাহ বসে এবং ওলী তাহাতে মত না দেয়, তবে তাহার বিবাহ দুরুস্ত

হইবে না। আর যদি সমান ঘরে বিবাহ বসিয়া থাকে, কিন্তু মহর অনেক কম হইয়া থাকে, তবে জ্ঞাতি পুরুষগণ মুসলমান হাকিমের নিকট নালিশ করিয়া তাহার ঐ বিবাহ ভঙ্গ করাইয়া দিতে পারে। (এইসব কারণেই হাদীস শরীফে বিনা ওলীতে মেয়েদের বিবাহ বসিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে এবং ওলীদেরকে বলা হইয়াছে যে, তাহারাও যেন বালেগ ছেলে-মেয়েদের মত না লইয়া তাহাদের বিবাহ না দেয়।)

৪। **মাসআলাঃ** কোন ওলী যদি সাবালেগ মেয়ের বিবাহ তাহার "এয্ন" (অনুমতি) ছাড়া দিয়া দেয়, তবে সে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না; মওকুফ্ থাকিবে। পরে যদি মেয়ে রাজী হয়, তবে বিবাহ জায়েয হইবে। আর যদি রাজী না হয়, তবে সে বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে।

মেয়ের এয্নের নিয়ম

৫। **মাসআলাঃ** সাবালেগা অবিবাহিতা মেয়ের থেকে এয্ন নেওয়ার নিয়ম এই যে, ওলী যদি তাহাকে বলে, 'আমি তোমাকে অমুক জায়গায় অমুকের ছেলে অমুকের সহিত বিবাহ দিতেছি বা বিবাহ দিলাম বা বিবাহ দিয়াছি' এবং এই কথার পর মেয়ে (অসম্মতিসূচক কোন ভাব প্রকাশ না করিয়া সম্মতিসূচক ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ, গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া) চুপ করিয়া থাকে অথবা (মানসিক খুশীতে মিটি মিটি) হাসিতে থাকে অথবা (মা-বাপের বাড়ী ছাড়িয়া পরের বাড়ী যাইতে হইবে এই মনবেদনায়) চোখের পানি ছাড়িয়া দেয়, তবেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার সম্মতি আছে। এতটুকু সম্মতি পাইয়া ওলী যদি বিবাহ দিয়া দেয়, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে, অথবা যদি আগেই বিবাহ দিয়া থাকে এবং পরে এতটুকু সম্মতি পায়, তবে ইহাতেই পূর্বের আকদ্ ছহীহ্ হইয়া যাইবে। খামখা জোর-জবরদস্তী লজ্জাশীলার লজ্জা ভাঙ্গিয়া তাহার মুখের কথা "রাযী আছি" বাহির করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন এবং অন্যায়।

৬। **মাসআলাঃ** ওলী যদি এয্ন লইবার সময় স্বামীর নাম-ধাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করিয়া থাকে, যাহাতে মেয়ে সহজেই তাহাকে চিনিতে পারে এবং পূর্বেও মেয়ে তাহাকে না চিনে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে মেয়ে চুপ করিয়া থাকিলে তাহাতে তাহার এয্ন বা সম্মতি ধরা যাইবে না; বরং স্বামীর নাম-ধাম এমন স্পষ্টভাবে তাহার সামনে উল্লেখ করা দরকার যাহাতে সে সহজেই বুঝিতে পারে যে, সে অমুক ব্যক্তি। এইরূপে এয্ন লইবার সময় যদি মহরের কথা উল্লেখ না করে এবং অনেক কম মহরে বিবাহ দেয়, তবে মেয়ের বিনা অনুমতি ও সম্মতিতে সেই বিবাহ দুরুস্ত হইবে না। পুনরায় বা-কায়েদা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি এজাযত দেয়, তবে বিবাহ হইবে, নতুবা হইবে না।

৭। **মাসআলাঃ** যদি পাত্রী অবিবাহিতা না হয় অর্থাৎ, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে তাহার এয্ন বিনা কথায় হইবে না। ওলী জিজ্ঞাসা করিলে যদি চুপ করিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার সম্মতি বুঝা যাইবে না; বরং মুখ দিয়া পরিষ্কারভাবে "রাযী আছি" এতটুকু বলার আবশ্যক হইবে। যদি এতটুকু না বলা সত্ত্বেও ওলী বিবাহ করাইয়া দেয়, তবে সেই বিবাহ দুরুস্ত হইবে না, যে-পর্যন্ত পাত্রী মঞ্জুর না করে। অবশ্য পাত্রী পরে মঞ্জুর করিয়া লইলে বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৮। **মাসআলাঃ** বাপ বর্তমান থাকা সত্ত্বে যদি ভাই, চাচা ইত্যাদি অবিবাহিতা পাত্রীর নিকট এয্ন চায়, তবে চুপ থাকাতে এয্ন ধরা যাইবে না; বরং মুখ দিয়া পরিষ্কার বলিলে তখন এয্ন ধরা যাইবে। অবশ্য যদি বাপ তাহাদিগকে এয্ন আনিবার জন্য পাঠায়, তবে চুপ থাকিলেও এয্ন

ধরা যাইবে। সারকথা এই যে, শরীঅত অনুসারে যে ওলীর হক অগ্রগণ্য, তিনি নিজে বা তাঁহার প্রেরিত লোকে জিজ্ঞাসা করিলে চুপ থাকিলেও এজাযত ধরা যাইবে, নতুবা অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে চুপ থাকিলে এজাযত ধরা যাইবে না। যেমন, বাপ বর্তমান থাকা সত্ত্বে যদি দাদা অবিবাহিতা পাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, তবে চুপ থাকিলে এজাযত ধরা যাইবে না। এইরূপে যদি ওলী হওয়ার হক থাকে ভাইয়ের, আর জিজ্ঞাসা করে চাচা, তবে চুপ থাকিলে এজাযত ধরা যাইবে না; বরং মুখে স্পষ্ট এজাযতের শব্দ বলিলে, তবেই এজাযত ধরা যাইবে।

৯। মাসআলাঃ ওলী যদি অবিবাহিতা বালেগা পাত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া বিবাহ দিয়া দেয় এবং পরে নিজেই বলে অথবা অন্য কাহারও মারফৎ বলায় যে, তোমার বিবাহ অমুকের সঙ্গে করিয়া দিয়াছি এবং তাহা শুনিয়া পাত্রী চুপ থাকে, তবে তাহাতেও এজাযতই ধরা যাইবে। কিন্তু যদি (ওলী বা ওলীর প্রেরিত ব্যক্তি ছাড়া) অন্য কেহ এই খবর পৌঁছায় তবে দেখিতে হইবে, যদি দুইজন লোক অথবা একজন বিশ্বস্ত লোক খবর পৌঁছাইয়া থাকে এবং সে খবর শুনিয়া চুপ থাকিয়া থাকে, তবে তাহাতে এজাযতই ধরা যাইবে। আর যদি একজন অবিশ্বস্ত লোক খবর পৌঁছাইয়া থাকে, তবে তাহাতে চুপ থাকিলে এজাযত ধরা যাইবে না, বিবাহ মওকুফ থাকিবে। যদি পাত্রী মঞ্জুর করে, দুরুস্ত হইবে; নতুবা বাতিল হইয়া যাইবে।

১০ নং মাসআলা পরিশিষ্টে ওলীর বয়ান দ্রষ্টব্য।

১১। মাসআলাঃ তদ্রূপ ছেলেও বালেগ হইলে তাহার উপর তাহার ওলীর সম্পূর্ণ অধিকার থাকে না; বরং তাহার অনুমতি লইয়া তাহার বিবাহ ধার্য করিতে হইবে এবং বিনা অনুমতিতে বিবাহ করাইলে তাহার সম্মতি ছাড়া সে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না। যদি সম্মতি দেয়, তবে দুরুস্ত হইবে, আর যদি সম্মতি না দেয়, তবে বাতিল হইয়া যাইবে। অবশ্য বালেগ ছেলে এবং বালেগা মেয়ের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য আছে যে, বালেগা মেয়ে যদি অবিবাহিতা হয়, তবে বলার বা জিজ্ঞাসার পর তাহার চুপ থাকাই সম্মতি এবং অনুমতি ধরা যাইবে; কিন্তু ছেলে বালেগ হইলে তাহার মুখের কথা ব্যতিরেকে অনুমতি বা সম্মতি ধরা যাইবে না, মুখে পরিষ্কার বলা ছেলের জন্য জরুরী।

১২। মাসআলাঃ ছেলে বা মেয়ে না-বালেগ থাকিলে তাহাদের কোনই ক্ষমতা বা স্বাধীনতা থাকে না, ওলীর বিনা অনুমতিতে তাহাদের বিবাহ-শাদী করিবার ক্ষমতা নাই। এমনকি, যদি কোন না-বালেগ নিজের বিবাহ নিজে বা অন্য কেহ করাইয়া দেয়, তবে ওলীর অনুমতি সাপেক্ষ দুরুস্ত হইবে, আর যদি ওলী এজাযত না দেয়, তবে বাতিল হইয়া যাইবে। তাহাদের বিবাহ দেওয়া না দেওয়ার পুরা এখ্‌তিয়ার ওলীর। যাহার সাথে ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারে। না-বালেগ ছেলে-মেয়ে ঐ বিবাহ রদ করিতে পারে না। না-বালেগা মেয়ে কুমারী হউক অথবা পূর্বে অন্যত্র বিবাহ হইয়া থাকুক এবং স্বামী-গৃহে গমন করিয়া থাকুক বা না থাকুক উভয়ের একই হুকুম।

১৩। মাসআলাঃ না-বালেগা মেয়ে বা ছেলের বিবাহ যদি বাপ বা দাদা করায়, তবে তাহাদের বালেগ হওয়ার পরও সেই বিবাহ রদ করিবার কোনই ক্ষমতা নাই।

১৪। মাসআলাঃ যদি বাপ এবং দাদা ছাড়া অন্য কোন ওলী (চাচা, ভাই ইত্যাদি) না-বালেগ ছেলে বা মেয়ের বিবাহ করায়, তবে যদি সমান সমান ঘর হয় এবং মহরও ঠিক মত হয়, তবে ত উপস্থিত তাহাদের বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে যখন বালেগ হইবে, তখন যদি তাহারা ঐ বিবাহ ঠিক রাখিতে না চায়, তবে সে ক্ষমতা তাহাদের আছে, কিন্তু

তাহাদের মুসলমান হাকিমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মুসলমান হাকিম যদি ঐ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেন, তবে সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া বাতিল হইয়া যাইবে, (নতুবা যে পর্যন্ত মুসলমান হাকিম না ভাঙ্গিয়া দিবেন, শুধু নিজে নিজে বিবাহ ভাঙ্গিতে পারিবে না বা কোন বিধর্মী হাকিমের হুকুমেও বিবাহ ভঙ্গ হইবে না,) আর যদি এই শ্রেণীর ওলীরা অর্থাৎ, বাপ এবং দাদা ছাড়া অন্য ওলীরা মেয়ের বিবাহ নীচ ঘরে বা অনেক কম মহরে এবং ছেলের বিবাহ অনেক বেশী মহরে করায়, তবে সে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না।

১৫ নং এবং ১৬ নং মাসআলা : পরিশিষ্টে ওলীর বয়ান দেখুন।

১৭। মাসআলা : শরীঅতের নিয়ম অনুসারে যিনি না-বালেগা মেয়েকে বিবাহ দিবার হক্‌দার ওলী ছিলেন, তিনি হয়ত এত দূরদেশে আছেন যে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে গেলে হয়ত এমন সুযোগ্য পাত্র আর পাওয়া যাইবে না, পাত্র পক্ষ হইতে যাহারা পয়গাম পাঠাইয়াছে তাহারাও দেরী করিতে প্রস্তুত নহে, এরকম ক্ষেত্রে আসল ওলীর পরবর্তী যে ওলী থাকিবে তাহারও বিবাহ দিবার ক্ষমতা থাকিবে। যদি এরকম ক্ষেত্রে আসল ওলীর পরবর্তী ওলী আসল ওলীর নিকট হইতে অনুমতি বা পরামর্শ না লইয়াই বিবাহ দিয়া দেয়, তবুও সে বিবাহ দুরুস্ত হইবে। কিন্তু যদি এত দূরে না থাকে যে, তাহার অনুমতি আনিতে গেলে সুযোগ ছুটিয়া যাইবে, তবে আসল ওলীর বিনা অনুমতিতে অন্য কোন ওলীর বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। যদি দেয়, তবে সে বিবাহ মওকুফ থাকিবে। যদি আসল ওলী এজাযত দেয়, তবে দুরুস্ত হইবে, নতুবা বাতিল হইয়া যাইবে।

১৮। মাসআলা : এইরূপে আসল ওলীর উপস্থিতি সত্ত্বেও যদি পরবর্তী ওলী তাহার নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই না-বালেগা মেয়ের বিবাহ দিয়া দেয় ; যেমন, আসল ওলী ছিল বাপ, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া দাদা যদি বিবাহ দিয়া দেয় বা আসল ওলী ছিল ভাই, তাহার অনুমতি না লইয়া চাচা যদি বিবাহ দিয়া দেয়, তবে এই বিবাহ মওকুফ থাকিবে। (যদি আসল ওলী অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বাপ বা ভাই এজাযত দেয়, তবে ত বিবাহ দুরুস্ত হইবে, আর তাহারা এজাযত না দিলে বাতেল ধরা হইবে।)

১৯। মাসআলা : কোন মেয়েলোক যদি পাগল ও বুদ্ধিহারা হইয়া যায় এবং তাহার না-বালেগ ছেলেও থাকে এবং বাপও থাকে, এমতাবস্থায় তাহার বিবাহ দিতে হইলে তাহার ছেলে তাহার ওলী হইবে। কেননা, ওলী হওয়ার ব্যাপারে ছেলে বাপের অগ্রগণ্য।

কুফু

[কে সমান ঘরের, কে সমান ঘরের নয়]

১। মাসআলা : মেয়ে বিবাহ দিবার সময় যাহাতে সমান ঘরে বিবাহ হয়, কুফু ছাড়া নীচ ঘরে বিবাহ না হয়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখিবার জন্য শরীঅতে যথেষ্ট তাকীদ আসিয়াছে। (কারণ, বিবাহের উদ্দেশ্য হইল অশান্তি দূর করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা এবং স্বামী-স্ত্রী একত্রে মিল-মহব্বতের সহিত জীবন যাপন করিয়া ইহ পরকালের উন্নতি সাধন করিয়া যাওয়া। যদি স্বামী-স্ত্রীতে সামঞ্জস্য না থাকে, তবে কাজ-কর্মের দিক দিয়া, আচার ব্যবহারের দিক দিয়া সংসার-জীবনযাত্রার অনেক অসুবিধা ঘটিতে পারে। বিশষতঃ স্ত্রী পরাধীনা, কাজেই তাহার দিক হইতেও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার তাকীদ বেশী করা হইয়াছে।) স্বামী ত স্বাধীন, সক্ষম। সে ইচ্ছা

করিলে একটার পরিবর্তে চারিটি বিবাহ করিতে পারে বা মিল্‌মিশ্‌ না হইলে ছাড়িয়াও দিতে পারে; স্ত্রীর ত আর সে ক্ষমতা নাই। এই জন্যই ছেলেকে বিবাহ করাইবার সময় কুফু দেখার জন্য বেশী তাম্বীহ্‌ নাই। শুধু অপাত্রে বীজ বপন না হয়, এইজন্য সচ্চরিত্রা, লজ্জাশীলা, খোদাভক্তা, স্বামীসেবিকা, সন্তান পালনকারিণী দেখিয়া বিবাহ করানই যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বড় ঘর, সমান ঘর বা ছোট ঘরের কথা বলা হইতেছে, ইহার উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও এই নয় যে, বড় ঘরওয়ালারা নিজেরা বড়াই বা ফখর করিবে এবং ছোট ঘরওয়ালাদের ঘৃণা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিবে; যদি এরূপ হয়, তবে তাহারা মহাপাপী হইবে। অবশ্য ছোট ঘরওয়ালারাও বড় ঘরওয়ালাদের হিংসা করিবে না; বরং বড়দের প্রতি ভক্তি ও তা'যীম এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসাই হাদীসের বিধান। কুফু রক্ষা করিয়া চলা শুধু দুনিয়ার উপকারের জন্যই শরীঅত নির্ধারিত করিয়াছে। তাহার প্রমাণ এই যে, যদি কোন বালেগা মেয়ে নিজ ইচ্ছায় কোন নীচ ঘরের স্বামী পছন্দ করে এবং তাহার বাপ-ভাইয়েরও কোন আপত্তি না থাকে, তবে সে বিবাহ অবাধে জায়েয আছে। তাহাতে আখেরাতের কোন গোনাহ্‌ বা শাস্তি নাই, আর বাপ ভাইয়েরা যদি কলঙ্কের ভয়ে আপত্তি উঠায় এবং বাধা দেয়, তাহাতেও তাহাদের কোন গোনাহ্‌ বা শাস্তি নাই। কারণ, শরীঅতের উদ্দেশ্য যেমন আখেরাতের সুখ-শান্তির বিধান করা তেমনই দুনিয়ার মান-সম্মান রক্ষা ও সুখ-শান্তির বিধান করা। কাজেই পরে অশান্তি সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কাজেও শরীঅতে বাধা প্রদান করা হইয়াছে।

—অনুবাদক

২। মাসআলাঃ সমান সমান ঘর কি না, তাহা বিচার করিবার বেলায় পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, (১) বংশের দিক দিয়া, (২) মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া, (৩) দ্বীনদারী, পরহেযগারীর দিক দিয়া, (৪) মালদারীর দিক দিয়া এবং (৫) পেশার দিক দিয়া সমান কি না।

৩। মাসআলাঃ বংশের দিক দিয়া সমান হওয়ার অর্থ এই যে, শেখ, সাইয়্যেদ, আনছারী এবং আল্‌বী[১] সকলকে একই শ্রেণীর ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ, যদিও সাইয়্যেদের মর্তবা বড় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি কোন সাইয়্যেদের মেয়ের বিবাহ শেখের বা আনছারীর ছেলের সহিত হয়, তবে তাহাকে "কুফু ছাড়া বিবাহ" বলা হইবে না; বরং এই বলা হইবে যে, সমান সমান ঘরে বিবাহ হইয়াছে। (শেখ বলিতে বড় বড় কোরায়শী ছাহাবাদের বংশধরগণকে বুঝায়; যেমন ছিদ্দীকী, ফারূকী, ওসমানী ইত্যাদি। অধুনা বাংলাদেশে যে মুসলমান মাত্রকেই "শেখ" বলে—হউক না সে বঙ্গীয় বা ভারতীয় কোন নওমুসলিম বংশোদ্ভব, সে অর্থ এখানে নয়।)

৪। মাসআলাঃ মোগল, পাঠান ইত্যাদি সব 'আজমীদিগকে বংশের দিক দিয়া একই শ্রেণীভুক্ত ধরা হইয়াছে। কারণ, তাহারা সকলেই 'আজমী' এবং সব 'আজমী' একই শ্রেণীভুক্ত। আর 'আজমী' আরবী কুফু অর্থাৎ সমান হইতে পারে না। কাজেই যদি কোন সাইয়্যেদ বা শেখের মেয়ের বিবাহ কোন পাঠান বা মোগলের ছেলের সহিত হয়, তবে বলা হইবে যে, কুফু ঠিক হয় নাই, নীচ ঘরে বিবাহ হইয়াছে। [জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ছিদ্দীকী বা সাইয়্যেদ বলিয়া মিছামিছি দাবী করা হারাম। যাহাদের কাছে সনদ বা শেজ্‌রা আছে বা অন্য কোন বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা সাইয়্যেদ বা শেখ, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই সাইয়্যেদ

টিকা

১ হযরত আলীর বংশধরের মধ্যে যাহারা ফাতেমার গর্ভজাত বংশধর, তাঁহারা সাইয়্যেদ আর তাঁহার অন্যান্য বিবিদের গর্ভজাত তাঁহারা 'আল্‌বী'।

এবং শেখ। নতুবা অনর্থক দাবী করা বা ফখর করা জায়েয নহে। এক শ্রেণীর লোকেরা আনছারী-ছাহাবাদের বংশোদ্ভব না হওয়া সত্ত্বেও আনছারী বলিয়া দাবী করিতেছে, ইহাও সম্পূর্ণ না-জায়েয এবং হারাম।]

৫। মাসআলা ঃ বংশ ধরা হয় বাপের দিক দিয়া। মার দিক দিয়া বংশ ধরা হয় না। সুতরাং যদি বাপ সাইয়্যেদ হয়, তবে ছেলেমেয়েও সাইয়্যেদ হইবে এবং যদি বাপ শেখ হয়, তবে ছেলেমেয়েও শেখ হইবে, মা যে কোন বংশেরই হউক না কেন। যদি কোন সাইয়্যেদযাদা কোন পাঠানের বা অন্য কোন নওমুসলিমের মেয়ে বিবাহ করে, তবে সেই ঘরে যে সব ছেলেমেয়ে হইবে তাহাদের বংশ সাইয়্যেদেরই সমান হইবে। অবশ্য যাহার মা-বাপ উভয়ই সাইয়্যেদ তাহার সম্মান নিশ্চয়ই বেশী হইবে। কিন্তু শরীঅতে সবাইকে একই শ্রেণীভুক্ত ধরা হইবে। [এইরূপে বঙ্গদেশে হিন্দুদের দেখাদেখি যে কু-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, বিধবা নারীকে বিবাহ করিলে বা দ্বিতীয় বিবাহ করিলে সেই ঘরের ছেলেমেয়েকে নীচ বলিয়া ধরা হয়, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং শরীঅত অনুসারে বাতিল ও গোনাহ্‌র কথা।]

৬। মাসআলা ঃ মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া কুফু বা সমান হওয়ার অর্থ এই যে, যে ছেলে নিজেই নূতন মুসলমান হইয়াছে, কিন্তু তাহার বাপ-দাদা সব অমুসলমান। সে সেই মেয়ের কুফু নহে, যে নিজেও মুসলমান এবং তাহার বাপও মুসলমান। যে ছেলে নিজেও মুসলমান, তাহার বাপও মুসলমান, কিন্তু দাদা অমুসলমান, সে ঐ মেয়ের কুফু নহে যাহার বাপ এবং দাদা উভয়ই মুসলমান।

৭। মাসআলা ঃ যে ছেলের বাপ দাদা মুসলমান, কিন্তু পর-দাদা অমুসলমান তাহাকে সেই মেয়ের কুফু (অর্থাৎ, সমস্তরের) ধরা হইয়াছে, যাহার পর-দাদা বা তারও উপরে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত মুসলমান। ফলকথা, বাপ-দাদা এই দুই পুরুষ পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া কুফুর হিসাব ধরা হইয়াছে, তাহার উপরে ধরা হয় নাই। আর শেখ, সাইয়্যেদ ও আনছারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া কুফুর হিসাব ধরা হয় নাই, শুধু মোগল পাঠান প্রভৃতি আজমীদের মধ্যে দুই পুরুষ পর্যন্ত ধরা হইয়াছে, উপরে ধরা হয় নাই।

৮। মাসআলা ঃ দ্বীনদারী-পরহেযগারীর দিক দিয়া কুফু বা সমান হওয়ার অর্থ এই যে, লুচ্চা, বদমাআশ, শরাবী, বে-নামাযী, (সুদখোর, চোর, ডাকাত, দাড়ি মুণ্ডনকারী, পর্দা অমান্যকারী ইত্যাদি ফাছেক ছেলে পর্দানশীন, লজ্জাবতী,) নেকবখ্‌ত, সতী, দ্বীনদার, পরহেযগার মেয়ের কুফু হইবে না।

৯। মাসআলা ঃ মালদারীর দিক দিয়া কুফু হওয়ার অর্থ এই যে, ছেলে যদি এইরূপ গরীব কাঙ্গাল হয়, যাহার ভাত, কাপড় ও ঘরবাড়ী নাই, তবে সে মালদার মেয়ের কুফু হইবে না। কিন্তু যদি একেবারে তেমন গরীব না হয় ; বরং মেয়ের নগদ মহর, (যেওররূপে বা নগদভাবে দিবার মত) এবং ভাত কাপড় ও ঘর দিবার মত (সঙ্গতি) সম্পন্ন হয়, তবে সে ছেলেকে বড় মালদার মেয়েরও কুফু ধরা হইবে। মোটকথা, ছেলে এবং মেয়ে সম স্তরের মালদার হওয়ার আবশ্যক নাই, উপরোক্ত পরিমাণ মালদার হইলেই মালদারীর দিক দিয়া সেই ছেলেকে অনেক বড় মালদার মেয়েরও কুফু ধরা হইবে।

১০। মাসআলা ঃ পেশা এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়া কুফু হওয়ার অর্থ এই যে, যাহারা তাঁতী তাহারা দর্জিদের সমান নহে, যাহারা নাপিত, ধোপা তাহারা দর্জিদের সমান নহে। যাহারা কাপড়

সেলাই করে (দর্জি) তাহারা, যাহারা কাপড়ের তেজারত করে, তাহাদের সমান নহে। যাহারা নাপিত (ক্ষৌর কার্য করে) ধোপা (কাপড় ধৌত করে) বা তেলী (তৈল বাহির করে) তাহারা যাহারা কাপড় সেলাই করে (দর্জি) তাহাদের সমান নহে [কুলি-মজুর গৃহস্থের সমান নহে। গৃহস্থ ব্যবসায়ীর সমান নহে।]

১১। মাসআলা ঃ পাগল, জ্ঞানহীন, উন্মত্ত ছেলে, জ্ঞানসম্পন্না মেয়ের কুফু নহে।

মহর

১। মাসআলা ঃ বিবাহ পড়াইবার সময় মহরের কথা উল্লেখ হউক বা না হউক, বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে এবং মহর দিতে হইবে। কারণ, মহর ছাড়া বিবাহ হইতে পারে না। এমনকি, যদি কেহ মহর না দিবার কথা উল্লেখ করিয়া বিবাহ করে, তবুও মহর দিতে হইবে। (কারণ মহর ছাড়া বিবাহ হয় না।)

২। মাসআলা ঃ কমের পক্ষে মহরের পরিমাণ (দশ দেরহাম) প্রায় পৌনে তিন তোলা রূপা। (ইহার চেয়ে কম মহর হইতে পারে না।) বেশীর কোনই সীমা নির্ধারিত নাই। উভয় পক্ষ (ছেলে এবং মেয়ে) রাজী হইয়া যত স্বীকার করিবে ততই ওয়াজেব হইবে, কিন্তু অনেক বেশী মহর ধার্য করা ভাল নহে। [বিশেষতঃ যদি শুধু নামের জন্য অনেক বেশী মহর ধার্য করা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা দিবার কোন ইচ্ছা না থাকে, তবে তাহা অতি বড় গোনাহ্‌।] যদি কেহ এক টাকা বা আট আনা মহর ধার্য করিয়া বিবাহ করে, তবে বিবাহ হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু ঐ পৌণে তিন তোলা রূপার কম মহর হইতে পারিবে না। যদি এক টাকা বা আট আনা মহর ধার্য করিয়া বিবাহ করে এবং বাসর-ঘর[১] হইবার পূর্বে তালাক দেয়, তবে (এক টাকা বা আট আনার অর্ধেক দিবে না; বরং) পৌনে তিন তোলা রূপার অর্ধেক দিবে।

৩, ৪, ৫ এবং ৬ নং মাসআলা পরে লিখিত 'মহরের বয়ান' দ্রষ্টব্য।

৭। মাসআলা ঃ যদি বিবাহের সময় মহর কত হইবে তাহা আদৌ উল্লেখ না হয় অথবা এই শর্তের উপর বিবাহ করে যে, মহর মাত্রই দিবে না, তারপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কোন একজন মরিয়া যায় অথবা বাসর-ঘর হইয়া যায়, তবে পূর্ণ মহর দিতে হইবে এবং এই রকম ছুরতে (অর্থাৎ আদৌ মহরের উল্লেখ না হইয়া বা বিনা মহরে বিবাহ হইলে) 'মহরে মেছেল' ওয়াজিব হইবে। (মহরে মেছেল কাহাকে বলে তাহা সামনে বলা হইবে।) আর যদি এই রকম ছুরতে (অর্থাৎ, যদি মহরের উল্লেখ ছাড়া বা বিনা মহরে বিবাহ হইয়া থাকে।) বাসর-ঘর হইবার পূর্বেই পুরুষ মেয়েলোকটিকে তালাক দিয়া দেয়, তবে মেয়েলোকটি মহর পাইবে না, শুধু এক জোড়া কাপড় পাইবে এবং এই কাপড় জোড়া দেওয়া পুরুষের জিম্মায় ওয়াজেব হইবে; যদি না দেয়, তবে গোনাহ্‌গার হইবে। (এতদ্ব্যতীত অন্যান্য তালাক দিলে কাপড় দেওয়া ওয়াজেব নহে; মোস্তাহাব।)

৮। মাসআলা ঃ এক জোড়া কাপড় ওয়াজেব হওয়ার অর্থ এই যে, (লম্বা আস্তিনের হাঁটু পর্যন্ত) একটি কোর্তা, মাথায় দিবার একটি উড়নী বা ছোট চাদর, পায়জামা অথবা একখানা শাড়ী

টিকা

১ বাসর ঘরের অর্থ স্বামী-স্ত্রী এক ঘরে একাকী থাকা, স্বামী সহবাস করুক বা না করুক একাকী সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও বিনা কারণে স্ত্রীসহবাস না করিলেও তাহাকে খালওয়াতে ছহীহ্‌ বলে। মহর ওয়াজেব হওয়ার বেলায় খাল্‌ওয়াতে ছহীহ্‌কে সহবাসেরই হুকুমে ধরা হয়।)

এবং একটি বড় চাদর (অথবা কোর্তা) যাহার দ্বারা আপাদমস্তক ঢাকিতে পারে, এই চারিখানা কাপড় ওয়াজেব হয়, ইহার চেয়ে বেশী ওয়াজেব নহে।

৯। মাসআলাঃ পুরুষের যেমন অবস্থা সে রকম মূল্যের কাপড় দিবে। যদি গরীব হয়, তবে সূতার কাপড় দিবে, যদি গরীব না হয়, কিন্তু বড় ধনীও না হয়, তবে তসরের কাপড় দিবে, আর যদি বড় ধনী হয়, তবে রেশমের কাপড় দিবে। কিন্তু প্রত্যেক অবস্থাতেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মহরে মেছেলের অর্ধেকের চেয়ে অধিক মূল্যের কাপড় ওয়াজেব হইবে না এবং এক টাকা ছয় আনার চেয়ে কম মূল্যের কাপড় দেওয়া জায়েয হইবে না; তাছাড়া আপন ইচ্ছায় যত ইচ্ছা বেশী দিতে পারে।

১০। মাসআলাঃ বিবাহের সময় ত মহর ধার্য হইয়াছিল না, কিন্তু পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একমত হইয়া মহর ধার্য করিয়া লইয়াছিল, এরূপ হইলে ধার্যকৃত মহরই ওয়াজেব হইবে, মহরে মেছেল ওয়াজেব হইবে না। কিন্তু যদি "বাসর-ঘর" হওয়ার পূর্বেই তালাক হইয়া যায়, তবে স্ত্রী পরের ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক পাইবে না; বরং (উপরের বর্ণিতরূপে) এক জোড়া কাপড় পাইবে। (আর যদি একজন মরিয়া যায় অথবা "বাসর-ঘর" হওয়ার পর তালাক হয়, তবে পরের ধার্যকৃত মহর ওয়াজেব হইবে।)

১১। মাসআলাঃ বিবাহের সময় হয়ত একশত টাকার মহর ধার্য করা হইয়াছিল পরে স্বামী নিজ ইচ্ছায় স্ত্রীকে বলিল যে, একশত টাকার জায়গায় দেড়শত টাকা মহর আমি তোমাকে দিব। এইরূপ নিজ মুখে স্বীকার করিলে পরে স্বামী নিজ ইচ্ছায় যে পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা দেওয়া ওয়াজেব হইবে। যদি না দেয়, তবে গোনাহ্গার হইবে। কিন্তু যদি বাসর-ঘর হওয়ার পূর্বে তালাক হইয়া যায়, তবে স্ত্রী পূর্বের ধার্যকৃত মহরের অর্ধেকই পাইবে, পরের বৃদ্ধিকৃত পরিমাণের অর্ধেক পাইবে না। এইরূপে যদি বিবাহের সময় যে মহর ধার্য হইয়া থাকে পরে স্ত্রী নিজ খুশীতে স্বামীকে তাহার কতেক অংশ বা সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দেয়, তবে তাহা মাফ হইয়া যাইবে, স্ত্রী পুনরায় তাহা পাইবার অধিকারিণী থাকিবে না। (অবশ্য স্বামী নিজ ইচ্ছায় যদি দেয় সে ভিন্ন কথা।)

১২। মাসআলাঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে ধমক দিয়া বা ভয় দেখাইয়া বা অন্য কোন প্রকার কৌশলে ও অসদুপায়ে স্ত্রীর আন্তরিক অনিচ্ছা সত্ত্বে তাহার দ্বারা মহর মাফ করাইয়া লয়, তবে তাহাতে মহর মাফ হইবে না, স্বামীর জিম্মায় মহর দেওয়া ওয়াজিব থাকিবে; না দিলে গোনাহ্গার হইবে।

১৩। মাসআলাঃ মহরের জন্য যদি টাকা-পয়সা বা সোনা-রূপার অলঙ্কার ধার্য না করিয়া একটা নির্দিষ্ট গরু, ঘোড়া, জমিন বা বাগান ধার্য করে, তবে জায়েয আছে, যাহা ধার্য করিয়াছে তাহাই দিতে হইবে।

১৪। মাসআলাঃ মহর ধার্য করিবার সময় যদি কেহ বলে যে, একটি ঘোড়া বা একটি হাতী বা এক বিঘা জমি বা একটি বাগিচা দিব, তবে তাহাতে বিবাহ ত হইয়া যাইবে এবং মহরও ধার্যকৃত সাব্যস্ত হইবে, তবে যথাক্রমে মধ্যম প্রকারের এক বিঘা জমি বা মধ্যম প্রকারের একটি বাগিচা দিতে হইবে, (কিন্তু যদি নির্দিষ্ট করিয়া বলে যে, অমুক ঘোড়াটি বা অমুক হাতীটি বা অমুক জমিখানা বা অমুক বাগিচাটি দিব, তবে তাহা অধিক উত্তম।) আর যদি শুধু এইরূপ বলে যে, মহর কিছু দিব বা কোন একটি বস্তু দিব বা কোন একটি মাল দিব, তবে এইরূপ বলাতে মহর ধার্য হইবে না। এইরূপ ছুরত হইলে "মহরে মেছেল" দিতে হইবে। (মহরে মেছেলের বয়ান সামনে আসিতেছে।)

১৫ নং এবং ১৬ নং মাসআলা পরে বর্ণিত মহরের বয়ান দ্রষ্টব্য।

১৭। মাসআলা ঃ যে দেশে প্রথম মোলাকাতের সময়ই সমস্ত মহর আদায় করিবার প্রথা আছে, সে দেশে প্রথম রাত্রিতেই সমস্ত মহর উসুল করিয়া লইবার হক (অধিকার) স্ত্রীর আছে। যদি প্রথম রাত্রিতে না চায়, তবে যখন চাহিবে তখনই দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হইবে, বিলম্ব করা বা টালবাহানা করা জায়েয হইবে না।

১৮। মাসআলা ঃ আমাদের দেশে প্রথা আছে যে, মহরের লেনদেন তালাক কিংবা মৃত্যুর পর হয়। অর্থাৎ স্ত্রীকে যখন তালাক দেয়, তখন মহরের দাবী করে, কিংবা স্বামী সম্পত্তি রাখিয়া মরিয়া গেলে ঐ সম্পত্তি হইতে মহর উসুল করে, স্ত্রী মরিয়া গেলে তাহার ওয়ারিসগণ মহর দাবী করে। কিন্তু যাবৎ স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে কেহ মহর চায়ও না দেয়ও না, এমত স্থানে প্রথার কারণে তালাকের পূর্বে স্ত্রী মহরের দাবী করিতে পারে না। অবশ্য প্রথম সাক্ষাতের রাত্রে যে পরিমাণ মহর অগ্রিম দেওয়ার দস্তুর আছে ঐ পরিমাণ প্রথমে দেওয়া ওয়াজেব, অবশ্য যদি কোন সম্প্রদায়ে এরূপ দস্তুর না থাকে, তবে এই হুকুম হইবে না।

১৯। মাসআলা ঃ দেশপ্রথা অনুসারে (বা পরিষ্কার দুই পক্ষের নির্ধারণ অনুসারে) নগদ মহর আদায় ব্যতিরেকে স্ত্রীর কাছে স্বামীর যাইবার অধিকার নাই বা তাহাকে নিজ বাটিতে আবদ্ধ রাখিবার বা বিদেশে লইয়া যাইবারও অধিকার নাই এবং নগদ মহর না পাওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর এ অধিকার আছে যে, স্বামীকে কাছে থাকিতে না দেয় বা স্বামীর সঙ্গে তাহার দেশে না যায় বা স্বামীর বাড়ীতে না থাকিয়া বাপের বাড়ীতে চলিয়া যায়। কিন্তু মহর আদায় করার পর স্ত্রীর কোনই অধিকার নাই, স্বামীকে কাছে আসিতেও বাধা দিতে পরিবে না এবং স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর বাড়ী ছাড়িয়া বাপের বাড়ীও যাইতে পারিবে না এবং স্বামী বিদেশে কোথাও নিয়া যাইতে চাহিলে তাহাও আস্বীকার করিতে পারিবে না। (৪র্থ খণ্ড ৫২ পৃঃ হইতে গৃহীত)

২০। মাসআলা ঃ স্বামী যদি মহরের নিয়তে (খোরাক, পোশাক এবং বাসস্থান ব্যতিরেকে) কিছু টাকা বা অন্য কোন মাল জিনিস দেয়, তবে তাহা মহর হইতেই কাটা যাইবে। স্ত্রীকে এ বলার অবশ্যক হইবে না যে, আমি ইহা তোমার মহর বাবত দিতেছি। [অবশ্য পরিষ্কার বলিয়া দেওয়াই ভাল, যাহাতে পরে কোন গোলমাল বা মতভেদের সৃষ্টি না হইতে পারে। কিন্তু খোরাক, পোশাক বা বাসের ঘর দিয়া স্বামী বলিতে পারিবে না যে, ইহা আমি মহর বাবত দিলাম। কারণ খোরাক, পোশাক, এবং ঘর ত বিবাহের ঈজাব-কবূলের সঙ্গে সঙ্গে মহর ছাড়াই স্বামীর উপর ওয়াজেব হইয়াছে এবং স্ত্রী পাওনা হইয়াছে।]

২১। মাসআলা ঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন জিনিস দিয়া থাকে এবং পরে (মতভেদ হয় ;) স্বামী বলে যে, আমি মহর বাবত দিয়াছি, স্ত্রী বলে যে, না—আপনি মহর বাবত দেন নাই, এমনি আমাকে দিয়াছেন, তবে বিচারকগণ দেখিবেন যে, সেই জিনিস কোন ধরনের ছিল, যদি খাওয়া-পিয়ার বা পচা-গলার কোন অস্থায়ী জিনিস (বা ব্যবহারের কাপড় বা ঘর) হয়, তবে স্বামীর কথা হিসাবে ধরা যাইবে না এবং মহর হইতে কাটা যাইবে না। আর যদি অন্য কোন জিনিস (টাকা, পয়সা, গহনা, অতিরিক্ত ঘর বা কাপড় বা কোন গরু, ছাগল, থালা, বাসন ইত্যাদি) হয়, তবে স্বামীর কথাই ধর্তব্য হইবে এবং মহর হইতে কাটা (বাদ দেওয়া এবং উসুল দেওয়া) হইবে।

মহরে মেছেল

১। মাসআলা ঃ (মহরে মেছেলের নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীঅতের পক্ষ হইতে নির্ধারিত নাই। তবে শরীঅতের হুকুম এই যে, যে খান্দানে যে দেশে যত পরিমাণ মহর লওয়ার প্রচলন আছে তাহাই তাহাদের মহরে মেছেল অর্থাৎ খান্দানী মহর।) খান্দানী মহরের মধ্যে বাপ-দাদার বংশের মেয়ের মহর দেখিতে হইবে, (যেমন, বোন, ফুফু, ভাতিজী, চাচাত বোন ইত্যাদি। মা, খালার বংশ দেখিতে হইবে না) এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে, যাহার সঙ্গে ইহার মহরের তুলনা করা হইতেছে তাহার এবং ইহার বিবাহ এক বয়সে হইয়াছে কি না, সৌন্দর্যের দিক দিয়া উভয়ে একরূপ কি না, উভয়েরই বিবাহ অবিবাহিতা অবস্থায় হইয়াছে কি না; উভয়ই সমান সম্পত্তি-শালিনী কি না? উভয়েরই বিবাহ একই দেশে হইয়াছে কি না? দ্বীনদারী, পরহেযগারীর দিক দিয়া উভয়ে সমান কি না? বুদ্ধিমত্তা ও লজ্জাশীলতা, সচ্চরিত্রতা এবং কর্মপটুতার দিক দিয়া উভয়ে সমান কি না? এলেমের দিক দিয়া সমান কি না? মোটকথা—যুগের পরিবর্তনে, জায়গার পরিবর্তনে, রূপগুণ, বয়স, পাত্র, দ্বিতীয় এবং প্রথম বিবাহের তারতম্যে—মহরের অনেক তারতম্য হইয়া যায়। কাজেই যখন কোন মেয়ের মহরে মেছেলের পরিমাণ বিচার করিতে হইবে, তখন উপরোক্ত সব বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে, নতুবা শুধু খান্দানী মহর দেখিলে চলিবে না। যে যে ক্ষেত্রে মহরে মেছেলের কথা বলা হইয়াছে, সে সব ক্ষেত্রে ইহাই করিতে হইবে যে, মেয়ের পিতৃকুলের (উপরোক্ত সব গুণে সমতুল্য।) একটি মেয়ের মহর কত ধার্য হইয়াছে। তাহাই ঐ মেয়ের মহর সাব্যস্ত করা হইবে। (কোন গুণে কম হইলে, তাহার মহর সেই পরিমাণ কম হইবে। কোন গুণে বেশী হইলে তবে মহরও সেই পরিমাণ বেশী হইতে পারে।)

কাফেরের বিবাহ

১। মাসআলা ঃ (কাফেরের অর্থাৎ, মুসলমান ছাড়া অন্যান্য বিধর্মীদের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করার আবশ্যক এই যে, যদি তাহারা কেহ সৌভাগ্যবশতঃ মুক্তির অন্বেষণে অগ্রসর হয় এবং ইসলাম ধর্মই যে একমাত্র মুক্তিদাতা সত্য-ধর্ম এবং একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মেই যে মুক্তি নাই, এই কথা উপলব্ধি করিয়া মুসলমান হয়, তবে তাহা পূর্ব-বিবাহ সম্বন্ধে কি সাব্যস্ত করা হইবে? তাহার হুকুম শরীঅতের আইন হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।) যদি দুইজন স্বামী-স্ত্রী (অমুসলমান) এক সঙ্গে মুসলমান হয় এবং তাহাদের পূর্ব ধর্ম অনুসারে তাহাদের বিবাহ হইয়া থাকে, (যদি বিবাহ ছাড়া মিলন না হইয়া থাকে বা কোন মাহ্‌রামের সহিত বিবাহ না হইয়া থাকে), তবে মুসলমান হওয়ার পর তাহাদের বিবাহ দোহ্‌রাইতে হইবে না, (পূর্বের বিবাহ ঠিক থাকিবে।)

২। মাসআলা ঃ যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন মুসলমান হয়, অন্য জন না হয়, তবে তাহাদের বিবাহ বাতেল হইয়া যাইবে, এখন আর স্বামী-স্ত্রীর মত থাকিতে পারিবে না। (অবশ্য দ্বিতীয় জনের সামনে পেশ করা হইবে, অর্থাৎ ইসলামের সৌন্দর্য্য ও সত্যতা তাহাকে বুঝাইয়া

দেওয়া হইবে। তাহাতে যদি সেও মুসলমান হইয়া যায়, তবে তাহারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রী থাকিবে এবং স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে পারিবে। আর যদি মুসলমান না হয়, তবে তাহাদের বিবাহ ছুটিয়া যাইবে এবং স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করিতে পারিবে না।)

৩। মাসআলা ঃ যদি কোন বিধর্মী মেয়েলোক মুসলমান হয়, (আর তাহার স্বামী মুসলমান না হয়,) তবে যতদিন ঐ মেয়েলোকের তিনটি হায়েয অতিবাহিত না হইয়া যায়, (বা অল্প বয়স্কা বা অধিক বয়স্কা হওয়ার কারণে হায়েয বন্ধ হইলে তিন মাস অতিবাহিত না হইয়া যায়, বা গর্ভবতী হইলে—যতদিন প্রসব না হয়,) ততদিন পর্যন্ত ঐ মেয়েলোকের বিবাহ দুরুস্ত নহে।

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

১। মাসআলা ঃ যে পুরুষের বিবাহ বন্ধনে একাধিক স্ত্রী থাকিবে, তাহাদের সকলকে সমানভাবে রাখা তাহার উপর ওয়াজেব ; (অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব করা হারাম। কেহ সাইয়্যেদের মেয়ে হউক, ঝোলার মেয়ে হউক বা) একজন দ্বিতীয় বিবাহের হউক, অন্য জন প্রথম বিবাহের হউক, উভয়কে সমানভাবে দেখিতে হইবে। একজনকে যেমন ঘর বা খোরাক-পোশাক দিবে অন্যজনও ঠিক সেইরূপ ঘর এবং সেইরূপ খোরাক-পোশাক পাইবার দাবীকারিণী হইবে। একজনের কাছে এক রাত থাকিলে অন্য জনের কাছেও এক রাত থাকিতে হইবে। যুবতীর কাছে দুই তিন রাত থাকিলে বৃদ্ধার কাছেও দুই তিন রাত থাকিতে হইবে। (হাদীস শরীফে স্ত্রীদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করার কারণে ভীষণ আযাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে ; এমনকি যে স্বামী স্ত্রীদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করিবে, সে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে, এরূপও বর্ণনা করা হইয়াছে।)

২। মাসআলা ঃ নব বিবাহিতা স্ত্রী এবং পুরাতন স্ত্রী উভয়েরই হক এবং দাবী সমান, তাহাতে আদৌ কোন বেশ-কম নাই। (অবশ্য নব বিবাহিতা স্ত্রীর মন রক্ষার্থে যদি তাহার কাছে প্রথম প্রথম কিছু বেশী দিন থাকে, তবে পরে সেই কয়দিন আবার পূর্বের স্ত্রীর কাছে থাকিতে হইবে।)

৩। মাসআলা ঃ রাত্রে থাকার মধ্যে সমতা অর্থাৎ সমান ভাব রক্ষা করা ওয়াজেব বটে, কিন্তু দিনে থাকার মধ্যে সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব নহে। সুতরাং যদি দিনের বেলায় একজনের কাছে কিছু বেশীক্ষণ থাকে, অন্যজনের কাছে কিছু অল্পক্ষণ থাকে, তবে তাহাতে গোনাহ্ হইবে না ; কিন্তু রাত্রের বেলায় যদি একজনের কাছে মগরেবের পর যায় অন্যজনের কাছে এশার পর যায়, তবে গোনাহ্গার হইবে। অবশ্য যদি কোন পুরুষ এমন হয় যে, রাত্রের বেলায় তাহার চাকরির ডিউটি দিতে হয়, দিনের বেলায় সে স্ত্রীদের কাছে থাকিবার সময় পায়, তবে তাহার জন্য দিনের বেলায়ই সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব হইবে।

৪। মাসআলা ঃ সমতা শুধু থাকার মধ্যে ওয়াজেব, সহবাস করার মধ্যে সমতা ওয়াজেব নহে। সুতরাং যদি এক স্ত্রীর পালার রাত্রিতে সহবাস করে, তবে অন্য স্ত্রীর পালার রাত্রিতে সহবাস করা ওয়াজেব হইবে না (এবং সহবাস না করিলে তাহাতে গোনাহ্ হইবে না।)

৫। মাসআলা ঃ স্বামী-স্ত্রী রোগগ্রস্ত হউক বা সুস্থ শরীর থাকুক, কিন্তু কাছে থাকার মধ্যে সমতা রক্ষা করিতেই হইবে।

৬। মাসআলা ঃ (ব্যবহারের বেলায় বা দেওয়া-থাকার বেলায় সমতা রক্ষা করা মানুষের ক্ষমতার ভিতরে, কাজেই তাহা ওয়াজেব ; কিন্তু মনের টানের বেলায় সমতা রক্ষা করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে, কাজেই মনের টান একজনের দিকে বেশী, অন্য জনের দিকে কম হইলে

তাহাতে গোনাহ্ হইবে না। (কিন্তু মনের টানের বশীভূত হইয়া যদি কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ দেওয়া এবং থাকাতে পক্ষপাতিত্ব করিয়া বসে, তবে নিশ্চয়ই গোনাহ্গার হইবে।)

৭। মাসআলা ঃ বিদেশে সফরের সময় সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব নহে, যাকে ইচ্ছা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে। অবশ্য স্ত্রীদের মধ্যে যাহাতে মনক্ষুণ্ণতা না থাকে, সেই জন্য যদি 'কোরা' ঢালিয়া (লটারী করিয়া) নাম বাহির করিয়া লয়, তবে তাহা অতি উত্তম। (মোবাহ্ কাজে অন্য পক্ষের মনঃকষ্ট দূরীকরণার্থে 'কোরা' ঢালা মোস্তাহাব। কোরা ঢালার নিয়ম এই যে, প্রথমতঃ উভয়কে স্বীকার করাইবে যে, কোরায় যাহার নাম উঠিবে তাহাকেই সঙ্গে লইয়া যাইবে, অন্য জন অসন্তুষ্ট হইতে পারিবে না; তারপর সমান দুখানা কাগজে দুইজনের নাম লিখিয়া কাগজ দুইখানাকে পৃথক পৃথক করিয়া বানাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিবে এবং একটি অবোধ বে-গোনাহ্ শিশুকে ডাকিয়া দুইখানা কাগজের একখানা উঠাইতে বলিবে। সে নিজ ইচ্ছায় যে কাগজখানা উঠাইবে, সেই কাগজে যাহার নাম থাকিবে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যদি উভয়কে সন্তুষ্ট করা যায়, তবে তাহাও করা যাইতে পারে।

শিশুকে দুধ পান করান

১। মাসআলা ঃ সন্তান হইলে তাহাকে দুধ পান করান মায়ের উপর ওয়াজেব। অবশ্য যদি বাপ মালদার হয় এবং কোন দাই (ধাত্রী) রাখে, তবে মা দুধ পান না করাইলে গোনাহ্গার হইবে না।

২। মাসআলা ঃ অন্য কাহারও শিশুকে দুধ পান করান স্বামীর বিনা অনুমতিতে জায়েয নহে। অবশ্য যদি কোন শিশু দুধের পিপাসায় ছট্ফট্ করিতে থাকে, এবং দুধ না পাইয়া মরিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে দুধ পান করাইয়া শিশুর জীবন রক্ষা করিতে হইবে, স্বামীর এজাযতের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে না। (এরূপ ক্ষেত্রে এজাযত না হইলে গোনাহ্ হইবে না।)

৩। মাসআলা ঃ ছেলে হউক বা মেয়ে হউক, শিশুকে পূর্ণ দুই বৎসর পর্যন্ত দুধ পান করান যাইবে। দুই বৎসরের বেশী দুধ পান করান হারাম, একেবারেই দুরুস্ত নাই।

৪। মাসআলা ঃ শিশু যদি দুই বৎসরের মধ্যেই অন্য কোন জিনিস খাওয়া-পিয়া শুরু করে এবং তদ্দ্বারা জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তবে দুই বৎসরের আগে দুধ ছাড়াইয়া দিলে তাহাতেও কোন ক্ষতি বা গোনাহ্ নাই।

৫। মাসআলা ঃ শিশু যদি অন্য কোন মেয়েলোকের দুধ পান করে, তবে সেই মেয়েলোকটি ঐ শিশুর দুধ-মা হইবে, আর তাহার স্বামী ঐ শিশুর বাপ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের ছেলে-মেয়েরা ঐ শিশুর ভাই-বোন হইবে, সুতরাং বিবাহ হারাম হইবে। নছবের দিক দিয়া যে সব রেশ্তাদারের সঙ্গে বিবাহ্ হারাম, দুধের দিক দিয়াও সেই সব রেশ্তাদারের সঙ্গে বিবাহ হারাম (ইহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে,) কিন্তু এই হারাম হইবার জন্য শর্ত এই যে, জন্মের দুই বৎসরের মধ্যেই দুধ পান করান চাই, নতুবা বেশী বয়সে দুধ পান করাইলে তাহাতে হারাম হইবে না, ভাই-বোন, মা-বাপ ইত্যাদি রেশ্তাও হইবে না। শুধু আমাদের ইমাম আযম ছাহেব বলেন যে, আড়াই বৎসর পর্যন্ত দুধ পান করাইলে তাহাতেও হারাম হইবে; আড়াই বৎসরের পর দুধ পান করাইলে কোন ইমামের মতেই হারাম হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** শিশুর হলকুম পর্যন্ত সামান্য দুধ গেলেই উপরোক্ত সমস্ত রেশ্‌তা প্রমাণিত হইয়া বিবাহ হারাম হইয়া যাইবে, দুধ বেশী হউক বা কম হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় না।

৭। **মাসআলা ঃ** শিশু যদি স্তন হইতে নিজ মুখে দুধ চুষিয়া পান না করে, বরং মেয়েলোকটি নিজ হাত দিয়া স্তন হইতে দুধ বাহির করিয়া শিশুর মুখে দেয় বা নাকের পথে হলকুম পর্যন্ত পৌঁছায় তাহাতেও উপরোক্ত সমস্ত রেশ্‌তা প্রমাণিত হইয়া যাইবে এবং বিবাহ হারাম হইবে। (অবশ্য দুধ যদি কানের ভিতরে দেয়, হলকুমে না পৌঁছে, তাহাতে কিছুই হইবে না। দুধ যদি কেবল মুখের ভিতরে দেয়, হলকুমে না পৌঁছে তাহাতেও কিছুই প্রমাণিত হইবে না বা বিবাহ হারাম হইবে না।)

৮। **মাসআলা ঃ** কোন মেয়েলোকের দুধ যদি শিশুকে পানির সঙ্গে বা ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পান করান হয়, তবে যদি মেয়ে লোকের দুধ বেশী বা সমান হয় তবে রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে এবং বিবাহ হারাম হইবে, নতুবা যদি ঔষধ বা পানি বেশীর ভাগ হয়, তবে রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে না এবং বিবাহ হারাম হইবে না।

৯। **মাসআলা ঃ**যদি গরু বা বকরীর দুধের সহিত মেয়েলোকের দুধ মিশিয়া যায় এবং সেই দুধ কোন শিশুকে পান করান হয়, তবে দেখিতে হইবে যে, গরু বা বকরীর দুধ বেশী না মেয়েলোকের দুধ বেশী; যদি গরু বা বকরীর দুধ বেশী হয়, তবে রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে না, (এবং বিবাহ হারাম হইবে না,) আর যদি মেয়েলোকের দুধ বেশী বা সমান সমান হয়, তবে রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে (এবং বিবাহ হারাম হইবে।)

১০। **মাসআলা ঃ** ঘটনাক্রমে যদি কোন অবিবাহিতা মেয়ের স্তনে দুধ হয় এবং তাহা কোন শিশু পান করে, তবে ঐ মেয়ে ঐ শিশুর মা হইয়া যাইবে এবং দুধের অন্যান্য রেশ্‌তা প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

১১। **মাসআলা ঃ** মৃতা স্ত্রীলোকের দুধ বাহির করিয়া যদি কোন শিশুকে পান করান হয়, তবে তাহাতে দুধের সমস্ত রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে। (বিবাহ হারাম হইবে।)

১২। **মাসআলা ঃ** দুইজন শিশুকে যদি একই গাই বা বকরীর দুধ পান করান হয়, তবে ইহাতে পরস্পরের মধ্যে রেশ্‌তা প্রমাণিত হয় না এবং বিবাহ হারাম হয় না।

১৩। **মাসআলা ঃ** (যেহেতু দুধের দ্বারা বিবাহ হারাম হওয়ার জন্য বা রেশ্‌তা প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুই বা আড়াই বৎসর বয়সের মুদ্দত শর্ত করা হইয়াছে, কাজেই) যুবক স্বামী যদি নিজ স্ত্রীর দুগ্ধ পান করে, তবে তাহাতে স্ত্রী তাহার মা হইবে না, তাহার উপর হারাম হইবে না বটে, কিন্তু এরূপ করা ভারী গোনাহ্; কেননা দুই বৎসর বয়সের পর মানুষের দুধ পান করা সম্পূর্ণ হারাম।

১৪। **মাসআলা ঃ** একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে উভয়ে একটি মেয়েলোকের দুধ পান করিয়াছে, একই সঙ্গে পান করিয়া থাকুক বা পাঁচ দশ বৎসর আগে পরে পান করিয়া থাকুক, ঐ দুইটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। কারণ, তাহারা উভয়ে ভাই-বোন।

১৫। **মাসআলা ঃ** একটি মেয়ে বকরের স্ত্রীর দুধ পান করিয়াছে, ঐ মেয়ের বিবাহ বকরের সঙ্গে হারাম এবং বকরের বাপ, দাদা পুত্রের-পৌত্রের সঙ্গেও হারাম, এমন কি বকরের অন্য স্ত্রীর পক্ষের ছেলে থাকিলে তাহার সঙ্গেও হারাম।

১৬। **মাসআলা ঃ** আব্বাস নামক একটি শিশু খদিজা নাম্নী একটি মেয়েলোকের দুধ পান করিয়াছিল। খদিজার স্বামী কাসেমের জয়নব নাম্নী অন্য স্ত্রী ছিল। কিছুকাল পরে কাসেম

জয়নবকে তালাক দিয়া দিল। এখন আব্বাস জয়নবকে বিবাহ করিতে পারিবে না, কেননা আব্বাস জয়নবের স্বামীর দুধ-ছেলে। স্বামীর ছেলের সঙ্গে বিবাহ হারাম। এইরূপে আব্বাস যদি নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেয়, তবে কাসেম তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। কেননা পুত্র-বধূর সহিত বিবাহ হারাম। এইরূপে কাসেমের ভগ্নীর সহিত আব্বাসের বিবাহ হইতে পারে না, কারণ কাসেমের ভগ্নী আব্বাসের ফুফু হইয়াছে। অবশ্য আব্বাসের ভগ্নীকে কাসেম বিবাহ করিতে পারে, (কেননা আব্বাসের ভগ্নী যখন কাসেমের স্ত্রীর দুধ পান করে নাই, তখন কাসেমের সহিত আব্বাসের ভগ্নীর কোনই সম্পর্ক নাই।)

১৭। মাসআলা ঃ আব্বাসের এক ভগ্নী ছাজেদা। সে একজন মেয়েলোকের দুধ পান করিয়াছিল, কিন্তু আব্বাস তাহার দুধ পান করে নাই, তবে সেই মেয়েলোককে আব্বাস বিবাহ করিতে পারিবে।

১৮। মাসআলা ঃ আব্বাসের ছেলে জায়েদা খাতুনের দুধ পান করিয়াছে; জায়েদা খাতুনের সহিত আব্বাসের বিবাহ হইতে পারে। (কেননা আব্বাসের সহিত জায়েদা খাতুনের কোনই সম্পর্ক নাই।)

১৯। মাসআলা ঃ কাসেম এবং যাকের দুই ভাই। যাকেরের একজন দুধ-ভগ্নী আছে। যাকেরের দুধ-ভগ্নীর সহিত কাসেমের বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু যাকেরের বিবাহ হইতে পারে না। দুধ-রেশ্‌তা সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলা আছে। বিবাহের সময় খুব তাহ্‌কীক করিয়া লওয়া দরকার এবং শরীঅতে অভিজ্ঞ ভাল আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া দরকার। এই কিতাবে আমরা মাত্র কয়েকটি ছুরত লিখিলাম, সব লিখিলাম না; কারণ সকলের পক্ষে বুঝা একটু কঠিন।

২০। মাসআলা ঃ একটি ছেলের সহিত একটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল। তারপর একজন মেয়েলোক আসিয়া বলিল, আমি তাহাদের দুইজনকেই দুধ পান করাইয়াছি। এই কথা শুধু ঐ একটি মেয়েলোক ছাড়া অন্য কেহ বলে না এবং তাহার কথাও ষোল আনা বিশ্বাস হয় না। এইরূপ অবস্থা হইলে যতদিন হুজ্জতে শরয়ী না পাওয়া যাইবে অর্থাৎ, যতদিন দুইজন বিশ্বস্ত দ্বীনদার পুরুষ অথবা একজন দ্বীনদার পুরুষ এবং দুইজন দ্বীনদার মেয়েলোক সাক্ষী না দিবে, ততদিন দুধের রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে না এবং বিবাহ হারাম হইবে না। তেমন সাক্ষ্য ব্যতীত দুধের রেশ্‌তা ছাবেত হইবে না। অবশ্য যদি একজন পুরুষ বা একজন মেয়েলোক বা দুই তিন জন মেয়েলোকে বলাতে মনের মধ্যে বিশ্বাস হয় যে, তাহারা ঠিকই বলিতেছে, নিশ্চয়ই তেমন হইয়া থাকিবে, তবে তেমন বিবাহ না করা উচিত; অনর্থক সন্দেহের কাজের মধ্যে পড়া উচিত নহে।

২১। মাসআলা ঃ মানুষের দুধের দ্বারা কোন ঔষধ প্রস্তুত করা জায়েয নহে। যদি তাহার দ্বারা কোন ঔষধ তৈয়ার করা হয়, তবে তাহা খাওয়া বা ব্যবহার করা জায়েয নহে, হারাম। এইরূপে কানে বা চোখে মানুষের দুধ দেওয়া জায়েয নহে। মোটকথা, মানুষের দুধ শিশুকে পান করান ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে লাভবান হওয়া বা নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েয নহে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা, বিবাহের ফযীলত এবং পর্দার আবশ্যকতা (পরিবর্ধিত)

১। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى ○

অর্থ—(হে বণিতাগণ!) "তোমরা তোমাদের বাড়ীর ভিতরে থাক, পূর্বেকার অজ্ঞতা যুগের রূপ-প্রদর্শনীর ন্যায় বাহিরে বেড়াইয়া ফিরিও না।" এই আয়াতের দ্বারা নারীর মর্যাদা এবং পর্দার আবশ্যকতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। কেননা, পর্দা পালন ব্যতিরেকে নারীর মর্যাদা রক্ষা হইতে পারে না। বহু মূল্যবান মণিমাণিক্য মূল্যবান এবং মর্যাদাশালী বস্তু বলিয়াই কত পল্লা আবরণের ভিতরে অতি যত্নে রক্ষিত হয়। ঠিকরী চাঁড়ার কোন মূল্য বা মর্যাদা নাই বলিয়াই তাহা যথায় তথায় বা পথেঘাটে পড়িয়া থাকে।

২। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ

অর্থ—"নরগণ নারীগণের উপরিস্থ অধিনায়ক" এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট ও অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, নারীগণ পুরুষগণের নিম্নস্থা এবং অধীনা। কিন্তু এই অধীনতার দ্বারা নারীর মর্যাদার হানি করা হয় নাই; বরং ইহা দ্বারা তাহাদের মর্যাদা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা, উপার্জনের, ক্লেশের,কৃষি, ব্যবসায় এবং রাজত্ব, নেতৃত্ব, সমাজ ও পরিবার পরিচালনার ভার যদি নারী জাতির ঘাড়ে চাপান হইত, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের অবমাননাই করা হইত; তাছাড়া আল্লাহ্র সৃষ্টিরহস্য وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ (কতককে কতকের চেয়ে বড় করিয়া আমি সৃষ্টি করিয়াছি) এবং প্রাকৃতিক নিয়ম, ন্যায়ের মাথায় পদাঘাত করা হইত।

হাদীসঃ فَجَعَلَ الْاَمْرَ اِلَيْهَا - نسائى বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে—কুমারী হউক বা বিধবা হউক 'বালেগা মেয়েকে স্বাধীনতা দান করা হইয়াছে।' এই হাদীস দ্বারা নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার পরিমাণ বুঝা যাইতেছে যে, তাহার বিনা অনুমতিতে এবং তাহার অমতে তাহাকে কেহ বিবাহ দিতে পারিবে না; কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। কারণ, অন্য হাদীসে আছেঃ

اَيُّمَا امْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ○

অর্থাৎ, 'যে কোন মেয়েলোক তাহার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিবে তাহার বিবাহ বাতেল হইবে।' এই দুই হাদীসের মধ্যে স্থূল দৃষ্টিতে কিছু বিরোধ-ভাব দেখা যায়। সামঞ্জস্য এই যে, অভিভাবক উপরিস্থ অধিনায়ক বটেন এবং বিবাহ দেওয়ার কর্তাও তিনিই বটেন, কিন্তু বালেগা মেয়ের সামান্য স্বাধীনতাটুকু তাঁহার হরণ করা উচিত নহে, মেয়ের মতামত লইয়াই বিবাহ দেওয়া উচিত।

৩। কোরআনঃ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

অর্থ—ফরায়েয মতে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুণ ভাগ পাইবার অধিকারী।' এই আয়াত দ্বারাও ন্যায়-ধর্ম ঘোষণা করা হইয়াছে। কেননা, অন্য কোন ধর্মে নারীকে ভাগ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই; কিন্তু ইসলাম নারীর মর্যাদাও রক্ষা করিয়াছে, আবার নারীর মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া নরের মর্যাদাহানি করে নাই।

৪। কোরআন ঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ○

অর্থ—'তোমাদের পুরুষগণ হইতে দুইজন সাক্ষী রাখ। যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে তোমাদের পছন্দনীয় একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক।' এই আয়াতে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, প্রকাশ্য সভা সমিতি, বিচার ব্যবস্থা ক্ষেত্রে যেন নারীর কোন অধিকার নাই; কিন্তু অগত্যা নর অভাবে ইসলাম নারীকে নরের অর্ধেক ক্ষমতা দান করিয়াছে; তাও স্বাধীনভাবে নয়, অন্য একজন নরের সহিত সংযোগ করিয়া।

৫। কোরআন ঃ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

অর্থ—(হে নরগণ! তোমাদিগকে অধিনায়কত্ব দান করিয়াছেন বলিয়া তোমরা দুর্বল ও অধীনগণের ন্যায্য প্রাপ্য দাবী নষ্ট করিও না, খবরদার!) 'নারীদের সহিত তোমরা সদ্ব্যবহার করিও।' একঘেয়ে বুদ্ধিধারী সঙ্কীর্ণচেতাদের ন্যায় ইসলাম একজনকে তাহার অধিকার দিতে যাইয়া অন্য পক্ষের ন্যায্য পাওনা-দাবী আদৌ ভুলে নাই। তাই এই আয়াতে স্পষ্টরূপে নারীর মর্যাদা রক্ষার্থে তাহাদের অধিনায়কদিগকে পূর্ণ তাকীদ করা হইয়াছে।

৬। কোরআন ঃ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থ—'তাহারা (ভার্যারা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (পতিরা) তাহাদের পরিচ্ছদ।' পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বারা মানুষ ধুলা-বালি হইতে শরীরকে বাঁচায়, শীত, গ্রীষ্মের কষ্টে সাহায্য পায়, ভদ্রতা রক্ষা করে, সম্মান বর্ধিত করে। বাস্তবিক এই চারিটি উদ্দেশ্য নিয়াই দাম্পত্য জীবন রচনা করা হয় এবং এক্ষেত্রে নর ও নারী উভয়েরই সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। কিন্তু এই সমতার ভিতর দিয়াও কোরআন ইঙ্গিত করিতে ছাড়ে নাই যে, মেয়েদিগকে বাড়ীর ভিতর পর্দায় অবস্থান করিতে হইবে। কেননা, দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্যগুলি পর্দা ব্যতিরেকে সফল হইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ কন্যাকে বিবাহ দিয়াছেন, তখন তিনি ইহার এই সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, কাজ ভাগ করিয়া দিয়াছেন এবং পজিশন নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। মা ফাতেমাকে বলিয়াছেন, 'মা তোমাকে রান্না করা, কাপড় ধোয়া, আটা পিষা, পানি তোলা, বাড়ী পাহারা দেওয়া ইত্যাদি ঘরের কাজ করিতে হইবে' এবং আলী (রাঃ)কে বলিয়া দিয়াছিলেন, 'বাড়ীর বাহিরের কাজ সব তোমাকে করিতে হইবে।' কাজ ভাগ করা ব্যতিরেকে পরিবার, সমাজ এবং রাজত্ব কিছুরই শৃঙ্খলা রক্ষা হইতে পারে না। একজনে দশ কাজ বা দশজনে এক কাজ করিলেই শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। ভাগ করার বেলায়ও যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক এবং সকলে একজনকে মানিয়া চলা আবশ্যক এবং সেই একজন হইবেন যিনি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হইতে জ্ঞানপ্রাপ্ত। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভাবে কাজ ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং পজিশন ধার্য করিয়া দিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ, পুরুষের বাহিরে বেড়ান এবং মজুরি, কৃষি, ব্যবসা, নেতৃত্ব, রাজত্ব ইত্যাদি বাহিরের কাজ করা; নারীর বাড়ীর ভিতরে অবস্থান করা এবং ঘরের কাজ করা; আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্ধারিত এই সুনিয়ম পালন ব্যতিরেকে শান্তি নাই, পর্দা পরিত্যাগ করিয়া নারী জাতির বাহিরে বিচরণ অপেক্ষা সমাজ ও জাতির পক্ষে অশান্তিজনক আর কোনও কাজ নাই। মেয়েদের আবশ্যকবশতঃ যদি কখনও বাহিরে যাইতে হয়, তার জন্যও ব্যবস্থা আছে—

৭। কোরআন ঃ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

'নারীরা যেন তাহাদের শোভা প্রদর্শন না করে'—

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ○

'নারীরা যেন পায়ের দ্বারা বাহিরে বিচরণ না করে বা নারীরা যেন তাহাদের পায়ের দ্বারা সজোরে ঠোকর না দেয়, তাহা হইলে তাহাদের যে শোভা তাহারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।' আল্লাহ্ পাক আরও বলেন—

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ○

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদিগকে, আপনার কন্যাদিগকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীদিগকে বলিয়া দিন যে, তাহারা যেন বড় চাদর বা বোর্কা দ্বারা ঘোম্‌টা খুব ঝুলাইয়া দেয়।' হাদীস শরীফে আছে, আবশ্যকবশতঃ যদি মেয়েলোকের বাহিরে যাইতে হয়, তবে তাহারা মলিন বেশে, বিনা-সজ্জায়, বিনা সুগন্ধিতে পথের কিনারায় কিনারায় যাইবে, পথের মধ্য দিয়া যাইবে না। হাদীস শরীফে আছে—হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁহার কোন স্ত্রীকে সফরে লইয়া যাইতেন, তখনও তাঁহার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করিতেন। মেয়েলোকের আওয়াজেরও পর্দার ব্যবস্থা শরীঅতে আছে।

মাসআলা ঃ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কন্যা ফাতেমা যাহ্‌রা রাজিআল্লাহু আনহাকে ১৫৷৷০ বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়াছিলেন। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহাকে সৎ-পাত্রে দান করিবার জন্য তাকীদ করিয়াছেন। কাজেই উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেওয়াই আসল সুন্নত এবং আদর্শ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহকে নিষিদ্ধ বলিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। এতটুকু বলিতে হইবে যে, বাল্যবিবাহ জায়েয বটে কিন্তু তাহা সুন্নত নহে।

পিতৃহীন না-বালেগা মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে অন্যান্য ইমামগণ বলেন, না-বালেগা অবস্থায় তাহার বিবাহ আদৌ দুরুস্ত নহে। শুধু আমাদের ইমাম ছাহেব বলেন, দাদা বিবাহ দিলে, তাহার বিবাহ দুরুস্ত হইবে। চাচা বা অন্য কেহ বিবাহ দিলে সে যখন বালেগা হইবে, তখন তাহার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে সেই বিবাহকে সে না-মঞ্জুর করিতে পারিবে, কিন্তু বিবাহ ভঙ্গ করিবার জন্য মুসলমান হাকিমের হুকুমের আবশ্যক হইবে। —অনুবাদক

১। হাদীস ঃ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَّخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ ○

অর্থ—'দুনিয়া বলিতে যাহাকিছু আছে তাহার কোনটিই চিরস্থায়ী নয়, সবই ক্ষণস্থায়ী ব্যবহারের এবং কাজ চালাইবার জিনিস মাত্র। আর ক্ষণস্থায়ী কাজ চালাইবার যত জিনিস আছে, তার মধ্যে সতী-সাধ্বী পতি-ভক্তা নারী সবচেয়ে উৎকৃষ্টা। অর্থাৎ, কেহ যদি সৌভাগ্যক্রমে সতী-সাধ্বী পতি-ভক্তা স্ত্রী পায়, তবে তাহা আল্লাহ্‌র অতি বড় অনুগ্রহের দান। কেননা, এরূপ স্ত্রী দ্বারা স্বামীর ইহকাল এবং পরকাল উভয় কালেরই সাহায্য এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় (কাজেই এহেন নেয়ামতের শোকর করা চাই।)

২। হাদীস ঃ اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ○

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—'বিবাহ আমার সুন্নত ; যে আমার সুন্নতকে প্রত্যাখ্যান করিবে সে আমার (উম্মত) নয়।' এই হাদীসে হযরতের সুন্নত-তরিকা পালনের জন্য অত্যন্ত তাকীদ করা হইয়াছে। কেননা, সুন্নত লঙ্ঘন করার প্রতি হযরত অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সুন্নত তরক্‌কারী হইতে হযরত নিজের সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া লওয়ার

ঘোষণা করিয়াছেন। খোদা যেন এমন দিন না দেখান, যেদিন কোন মুসলমান হযরতের এহেন অসন্তোষ সহ্য করিতে পারিবে। অন্য হাদীসে আছে—হযরত বলিয়াছেনঃ 'তোমরা বিবাহ্ কর, তাহা হইলে আমার উম্মত বেশী হইবে। আমার উম্মত বেশী হইলে আমি অন্যান্য উম্মতদের মোকাবেলায় (প্রতিযোগিতায়) গৌরব করিতে পারিব। তোমাদের মধ্যে যাহারা সঙ্গতি সম্পন্ন আছে অর্থাৎ, এত পরিমাণ অর্থ সম্পত্তি আছে যে, তদ্দ্বারা তাহারা স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ করিতে পারে, তাহাদের বিবাহ করা উচিত এবং যাহাদের সঙ্গতি নাই তাহাদের রোযা রাখা উচিত; ঐরূপ রোযার দ্বারাও মানুষের কাম-রিপু দমন হইয়া যায়।

মাসআলা ঃ পুরুষের কাম-রিপু যদি প্রবল না হয় এবং বিবাহের খরচ বহন করিবার সঙ্গতি থাকে, তবে তাহার জন্য বিবাহ করা সুন্নত, আর যদি কাম-রিপু অনেক প্রবল হয়, তবে তাহার জন্য বিবাহ করা ওয়াজেব; কেননা, খোদা না-করুক, যেনায় লিপ্ত হইলে হারামকারী করার গোনাহ্ হইবে। আর যদি কাম-রিপু প্রবল হয়, কিন্তু বিবাহের খরচ বহনের সঙ্গতি না থাকে, তবে তাহার হামেশা রোযা রাখিতে হইবে এবং যখন খরচ যোগাড় করিতে পারে, তখন বিবাহ করিবে।

৩। **হাদীস** ঃ শিশু সন্তান বেহেশ্তের ফুলস্বরূপ অর্থাৎ বেহেশ্তের ফুল পাইলে যেমন আনন্দ এবং খুশী হয়, সন্তান-সন্ততি পাইয়াও মানুষের মনে তদ্রূপ খুশী এবং আনন্দ পায়। একমাত্র বিবাহ ছাড়া সন্তান লাভ করিবার অন্য কোনই উপায় নাই। কাজেই দেখা গেল যে, বিবাহের দ্বারা বেহেশ্তের ফুল লাভ করা যায়।

৪। **হাদীস** ঃ কিয়ামতের দিন কোন কোন লোকের মর্তবা বেহেশ্তের মধ্যে তাহার আশাতীতরূপে অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, তখন তাহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিবে, 'হে পাক পরওয়ারদেগার! আমরা ত এমন কোন আমল করিয়াছিলাম না, যাহার কারণে এত বড় মর্তবার অধিকারী হইতে পারি।' তখন তাহাদিগকে উত্তর দেওয়া হইবে যে, 'তোমাদের উত্তরাধিকারী সন্তানগণের দো'আর বরকতে তোমাদের মর্তবা এত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।'

৫। **হাদীস** ঃ যে সব সন্তান গর্ভপাত হইয়া মারা যায়, তাহারাও তাহাদের মা-বাপের জন্য (যখন তাহাদের মা-বাপকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে তখন) আল্লাহ্‌র সঙ্গে জিদ করিবে যে, আমাদের মা-বাপকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া দিতেই হইবে এবং বেহেশ্তের মধ্যে আনিয়া দিতেই হইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা দয়াপরবশ হইয়া বলিবেন, 'হে জিদ্দী ছেলে! নে, এই নে, তোর মা-বাপ নিয়া বেহেশ্তে যা।' তখন সে তাহার মা-বাপকে সঙ্গে লইয়া বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে। এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, গর্ভপাতের সন্তানও মা-বাপের কাজে আসিবে এবং বিবাহের উছিলায়ই এই ফযীলত হাছেল হইবে।

৬। **হাদীস** ঃ স্বামী যখন (প্রেম-ভরে) স্ত্রীর দিকে তাকায় এবং স্ত্রী যখন (প্রেম-ভরে) স্বামীর দিকে তাকায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উভয়ের উপর খাছ রহ্‌মতের দৃষ্টি করেন। কারণ, সৎস্বামী নিজের স্ত্রীর দিকেই তাকায়, তা ছাড়া অন্য মেয়েলোকের দিকে তাকায় না এবং সতী স্ত্রী নিজের স্বামীর দিকেই তাকায়, পর পুরুষের দিকে তাকায় না; অথচ শুধু বিবাহের দ্বারাই ইহা রক্ষা পাইতে পারে।

৭। **হাদীস** ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হারাম কৃত (কুনজর, কুচিন্তা, কুকর্ম ইত্যাদি) পাপ কাজ হইতে নিজের আত্মা ও চরিত্রকে পবিত্র রাখিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ এবং রাসূলের তাবেদারীর

নিয়্যতে বিবাহ করিবে, তাহার (পরিবার পরিচালনের আবশ্যকীয় খরচ ইত্যাদিতে) সাহায্যের ভার আল্লাহ্ তা'আলা লইয়াছেন।

৮। হাদীসঃ বিবি বাচ্চাওয়ালা ব্যক্তির দুই রাকা'আত, বিবি-বাচ্চাহীন ব্যক্তির বিরাশি (অন্য এক রেওয়ায়তে সত্তর) রাকা'আতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সত্তর এবং বিরাশির বিরোধ ভঞ্জন এইরূপে হইতে পারে যে, যে আদেশ পালনার্থে সন্তানদের শুধু যরুরী হক আদায় করিবে, তাহার দুই রাকা'আত অন্যের সত্তর রাকা'আতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে। আর যে আল্লাহ্‌র আদেশের যরুরী হক আদায় ছাড়া শারীরিক পরিশ্রম, আর্থিক ব্যয় এবং ভাল ব্যবহার দ্বারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভার্থে বিবি-বাচ্চাদিগকে আরও বেশী ভালবাসিবে তাহার দুই রাকা'আত অন্যের বিরাশি রাকা'আতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে।

৯। মাসআলাঃ মানুষের বড় পাপ এই যে, যাহাদের ভরণ-পোষণ, লালন-পালন এবং তরবীয়তের ভার তাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের সেই হক আদায়ের মধ্যে সে ত্রুটি বা অবহেলা করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

১০। মাসআলাঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'আমি আমার পরে পুরুষ জাতির ধর্ম নষ্টকারী স্ত্রীজাতির ফেৎনার চেয়ে বড় ফেৎনা আর দেখি না।' ফেৎনার অর্থ—মানুষ যে বিভ্রাটে পড়িয়া হতবুদ্ধি হইয়া হিতাহিত জ্ঞান এবং দ্বীন, ঈমান নষ্ট করিয়া ফেলে তাহাকে ফেৎনা বলে। স্ত্রীজাতির কারণে পুরুষের কয়েক প্রকারের ধর্ম নষ্ট হয়—

প্রথমতঃ পুরুষ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ভিতর সৃষ্টিগতভাবে স্ত্রীজাতির প্রতি এক প্রকার আকর্ষণ শক্তি জন্মে। সেই আকর্ষণের ফলে পুরুষের মন আপনা আপনি স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য অবলোকন, কথোপকথন, কাছে উপবেশন এবং মিলন লাভ করিতে চায়। এই উত্তাপ তরঙ্গ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত নবযুবকের মনের ভিতর উঠে, তখন তাহাকে বাধা দিয়া রাখিবার মত জিনিস এক আলেমুল গায়েব ওয়াশ্‌শাহাদাত, (অন্তর্যামী) আল্লাহ্‌র ভয় ব্যতীত আর কিছুই নাই। কারণ, সরকারী পুলিশ বা মা-বাপ, গুরুজন সব সময় মানুষের সঙ্গে থাকিতে পারে না, দুর্নামের ভয় বা আত্মা কলুষিত, চরিত্র ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার ভয় মনের সেই দুর্দমনীয় শয়তানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত শক্তি রাখে না। শয়তান তখন মানুষের কল্পনা শক্তিকেও পরিবর্তিত করিয়া ফেলে। একমাত্র আল্লাহ্‌র গযব ও আযাবের ভয়ই তখন মানুষকে পাপ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে; তাছাড়া অন্য কোন কিছুই পারে না। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা-প্রথা পালন এবং বিবাহ করা ফরয করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ পুরুষ যখন বিবাহ করে তখন তাহার মন সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং তার মন শুধু প্রেম-পাত্রীর মন যোগাইয়া চলিতে চায়। এই জন্যই অনেক হতভাগ্য যুবক তার মা-বাপ ভাই-বোন বা পিতৃকুলের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনগণকে ভুলিয়া শুধু শ্বশুরকুলের মন যোগাইয়া চলিতে আরম্ভ করে। কারণ যৌবনকে হাদীসে বুদ্ধিহীনতা এবং পাগলামির একশাখা বলা হইয়াছে এবং স্ত্রীজাতিকে 'নাকেছাতোল আক্‌ল' অপূর্ণ জ্ঞান-বিশিষ্ট জাতি বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কেননা, সাধারণতঃ যদিও কোন কোন মেয়েলোককে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বিশিষ্টা দেখা যায়, কিন্তু জাতিগতভাবে স্ত্রীজাতির বুদ্ধিতে ব্যাপকতা ও দূরদর্শিতা কম হয়। যাহারা বুদ্ধিমতি মেয়েলোক হয়, তাহাদের বুদ্ধিও সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ হয়, দূরদর্শী হয় না। নিজের ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সুখ-দুঃখ, উপস্থিত লাভ-লোকসান বুঝে, ব্যাপকভাবে জগতজোড়া গোটা জাতির বা

দূরের সুখ-দুঃখ লাভ-লোকসান ভাল মতে বুঝে না। তাছাড়া যৌবন-স্রোতে ভাসমান যুবতীদের মধ্যে বিলাসিতা, অনুকরণপ্রিয়তা এবং প্রবৃত্তির বশবর্তিতা এত অধিক হয় যে, তাহা চাপিয়া রাখা এক আল্লাহ্‌র কঠোর আদেশের পর্দা-প্রথা পালন ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ বেপর্দায় বেড়াইয়া সৌন্দর্য, অলঙ্কার ও কাপড় দেখাইবার প্রবৃত্তি ধর্ম-শিক্ষাবিহীন চরিত্রহীনা সুন্দরী নারীর হইয়া থাকে এবং যুবকগণও প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া বিজাতীয় অন্ধ অনুকরণ করতঃ পর্দা-প্রথা উঠাইয়া দিয়া সৌন্দর্য অবলোকন করিতে চায়। পরিণামে এই পর্দা-প্রথা পালন না করার ফলে মানুষের স্বাস্থ্য, সমাজ, সম্মান, ধর্ম, পরবর্তী বংশ, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি সবই নষ্ট হয়। পুরুষের চক্ষু যখন পর-স্ত্রীর উপরে পড়ে, তখন তাহার মনের ভিতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক এবং এই মনের চাঞ্চল্যের কারণেই তাহার জীবনীশক্তি দুর্বল এবং হীন-বীর্য হইয়া যায়, ফলে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং পরবর্তী নছল অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি নষ্ট হয়; এইরূপে স্ত্রীজাতির সতীত্ব নষ্ট এবং নছল বা সন্তান-সন্ততি ধ্বংস শুধু গোনাহ্ কবীরার দ্বারাই যে হয় তাহা নহে; বরং স্ত্রীর চক্ষু যখন পর-পুরুষের দিকে ধাবিত হয়, তখনই তাহার কোমল মন দোটানায় পড়িয়া যায়; ফলে জ্ঞানহীন, লজ্জাহীন, স্বাবলম্বনহীন, পিতৃ-মাতৃ ভক্তিহীন কুসন্তান জন্মে। কাজেই ইহা অতি বড় ফেৎনা এবং এই ফেৎনার সৃষ্টি স্ত্রীজাতি হইতেই হইয়া থাকে। (অবশ্য শীতপ্রধান দেশে মনের চাঞ্চল্য কম হয় এবং সেই কারণেই ইংরেজগণ পর্দা প্রথা পালন না করা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যবান থাকে। তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট কম হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য কুকর্ম কম হয় না।)

তৃতীয়তঃ মানুষ উপরোক্ত দুইটি পাপ ছাড়া নারীর কারণে আরও অনেক পাপ করিয়া ধর্ম নষ্ট করে। যথা—স্ত্রীর বিলাসিতা, অমিতব্যয়িতা বা বেহুদা কাজকর্ম, রছুম-রেওয়াজ প্রভৃতি কারণে অনেক সময় স্বামীকে সুদ ঘুষ, মাপে কম দেওয়া, মিথ্যা কথা বলিয়া জিনিস বিক্রয় করা ইত্যাদি অসদুপায়ে আয় বাড়াইতে হয়। এখানে মাত্র দুনিয়ার কয়েকটি ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হইল। তাছাড়া দুনিয়ার আরও অনেক রকম ক্ষতি স্ত্রীজাতির ফেৎনার কারণে হয়, আর আখেরাতের ক্ষতি ত অসীম। স্ত্রীজাতির ফেৎনায় যে পড়িবে তাহাকে অনেক প্রকার কঠোর আযাব দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও ভুগিতে হইবে। —অনুবাদক

১১। হাদীসঃ "একজনে যেখানে বিবাহের পয়গাম দিয়াছে যতদিন না সে ছাড়িয়া যায়, বা মেয়ের পক্ষ হইতে জওয়াব দিয়া দেওয়া হয়, সেখানে অন্য কেহ পয়গাম দিবে না। এইরূপে যে মাল একজনে দর করিতেছে—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ছড়িয়া যায় বা বিক্রেতা তাকে জওয়াব দিয়া দেয়, সে মাল অন্য কেহ দর করিবে না" এই হুকুমের মধ্যে মুসলমান অমুসলমান সকলেরই একই হুকুম। অর্থাৎ একজন হিন্দু যে জিনিস দর করিতেছে একজন মুসলমানের সে জিনিস দর করা চাই না,যতক্ষণ না সে ছাড়িয়া যায়। (অবশ্য নিলামের মালের এই হুকুম নহে। নিলামের মালের নিলাম ডাকা এবং বলা সকলের জন্য জায়েয আছে।)

১২। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, "হে আমার উম্মত! কেহ বিবাহ করে সম্পত্তি দেখিয়া, কেহ বিবাহ করে সৌন্দর্য দেখিয়া, (কেহ বিবাহ করে সম্মান ও উচ্চ বংশ দেখিয়া) এবং কেহ বিবাহ করে দ্বীনদারী পরহেযগারী দেখিয়া। অতএব, হে আমার প্রিয় উম্মত! আমি তোমাদিগকে অছিয়ত করি যে, তোমরা দ্বীনদারী-পরহেযগারী দেখিয়া বিবাহ করিবে; তাহা হইলেই ইন্‌শা-আল্লাহ্ তোমাদের জীবন সার্থক ও শান্তিময় হইবে।"

১৩। হাদীসঃ সব চেয়ে ভাল (বিবাহ, ভাল কুটুম্ব এবং) বিবি সেই, (যে বিবাহে কম খরচ হয় এবং যাহারা কুটুম্বিতা করিতে কুটুম্বের উপর বেশী বোঝা না চাপায় এবং) যে বিবির (বিবাহ খরচ এবং) মহর কম হয়। আজকাল বিবাহ কার্যে লোকেরা অনেক আড়ম্বর ও অপব্যয় করিতেছে, গৌরব দেখাইবার জন্য অনেক জেওর কাপড় ও বেশী মহর চাহিতেছে। এই কুপ্রথায় সমাজের এবং ধর্মের অনেক ক্ষতি আছে, কাজেই এই কু-প্রথা বর্জন করা দরকার।

১৪। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা তোমাদের (সন্তানের) বীজ বপনের জন্য উত্তম ক্ষেত্র (স্ত্রী) বাছিয়া লও। কেননা, মেয়েরা ভাই-ভগ্নীদের অনুরূপ সন্তান জন্মায়।" এই হাদীসের মর্ম এই যে, যাহাদের পুরুষগণের মধ্যে কোনরূপ কু-কাজ ও কলঙ্ক নাই, বিবাহ করিবার সময় তেমন সদ্বংশ-জাত মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করা দরকার। কেননা সাধারণতঃ সন্তান মা এবং মাতুল কুলের অনুরূপ বেশী হয়। অতএব, মা বা মাতুল কুলের মধ্যে যদি কোনরূপ চরিত্র-দোষ (চুরি, জেনা, বে-পর্দা, হারামখোরী, বেহায়াপনা ইত্যাদি) থাকে, তবে খুব সম্ভব সন্তানের মধ্যেও সেই দোষ রক্তে টানিয়া আনিবে।

১৫। হাদীসঃ স্ত্রীলোকের উপর সব চেয়ে বড় হক তার স্বামীর, আর পুরুষের উপর সব চেয়ে বড় হক তার মার (অর্থ এই যে, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের হক ত সব চেয়ে বেশী, তারপর স্ত্রীর উপর তার স্বামীর হকের চেয়ে বড় হক আর কাহারও না। এমনকি, মা-বাপের চেয়েও স্ত্রীর উপর তার স্বামীর হক আরও বড়, আর পুরুষের উপর মাতার হক সব চেয়ে বেশী, এমনকি বাপের চেয়েও বেশী।)

১৬। হাদীসঃ যখন তোমরা স্ত্রী-সহবাস করিবার ইচ্ছা কর তখন—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا ○

এই দো'আটি পড়িয়া আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া লইও, তাহা হইলে যদি ঐ সহবাসে সন্তান হওয়া তক্দীরে লেখা থাকে, তবে শয়তান সেই সন্তানের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না। (দো'আটির অর্থ এই—আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিয়া আমি এই কামে লিপ্ত হইতেছি। আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে শয়তানের হাত হইতে বাঁচাও এবং তুমি আমাদেরে যাহা দান করিবে তাহাকেও শয়তানের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিও।)

১৭। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইব্নে-আওফ নামক জনৈক ছাহাবীকে আদেশ করিয়াছেন اولم ولوبشاة অর্থাৎ, অলীমা কর, (যদিও বেশী না পার, মাত্র একটি বকরী যবাহ করিয়া খাওয়াইবার তৌফীক থাকে, তবুও অলীমা করিতে ত্রুটি বা তাকাল্লোফ করিও না। মাত্র একটি বকরীর দ্বারাই অলীমা কর।) অর্থ এই যে, যদি বেশী ধুমধাম করিয়া বা আত্মীয়-স্বজন খেশকুটুম্ব, পাড়া পড়শী গ্রামবাসীদের দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবার তৌফীক না থাকে, তবে ধার করয না করিয়া সহজে যে পরিমাণ পার, সেই পরিমাণই অলীমা খাওয়াইয়া দাও, একেবারে বন্ধ করিও না বা একেবারে খুলিয়া দিয়া দেনা দায়িক হইয়া পড়িও না।

(হযরত নবী আলাইহিস সালাম তাঁহার এক বিবাহে মাত্র দুই সের যবের দ্বারা অলীমা করিয়াছেন এবং সব চেয়ে বড় অলীমা করিয়াছেন হযরত জয়নবের বিবাহে। তখন একটি বকরী যবাহ করিয়া আছহাবগণকে গোশ্ত-রুটি পেট ভরিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। অন্য এক বিবাহে খোরমা, পনির এবং ঘৃত মিশ্রিত ক্ষীর খাওয়াইয়াছেন।)

অলীমা করা মোস্তাহাব। অলীমা কোন্ সময় খাওয়ান চাই, এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রথম মিলনের পরবর্তী দিনই অলীমা করা ভাল। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন যে, বৌ উঠাইয়া আনার পূর্বে ও আক্‌দ হইয়া যাওয়ার পরই অলীমা হইতে পারে (জোর জবরদস্তি করিয়া কাহারও নিকট হইতে দাওয়াত খাওয়া হারাম। ফখরের জন্য পাল্লা দিয়া খাওয়ান বা সেইরূপ দাওয়াতে খাওয়া না-জায়েয। ঋণ করিয়া খাওয়ান বা সেইরূপ দাওয়াত খাওয়া না-জায়েয।)

তালাকের নিন্দাবাদ এবং অপকারিতা

১৮। হাদীসঃ "মোবাহ্ জিনিসের মধ্যে তালাকের চেয়ে ঘৃণিত জিনিস আল্লাহ্‌র নিকট আর নাই।"—হাকিম, আবুদাঊদ, ইবনে মাজা। অর্থ এই যে, বান্দাদের (জরুরতের) জন্য আইনতঃ তালাককে জায়েয রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে (বিনা জরুরতে) যদি কেহ তালাক দেয়, তবে তাহা আল্লাহ্‌র নিকট বড়ই ঘৃণিত। অতএব, প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর খুব সতর্ক হইয়া চলা দরকার। উভয়ের মধ্যে যাহাতে মিল-মহব্বত থাকে তাহারও চেষ্টা করা উভয়ের দরকার। একজনের রাগ, অসুখ বা অন্যায় ব্যবহারের সময় অন্য জনের বিশেষভাবে ছবর বরদাশ্‌ত করিয়া চলা দরকার; নতুবা নানাবিধ খারাবীর আশঙ্কা আছে— দুনিয়ারও খারাবী এবং আখেরাতেরও খারাবী। আখেরাতের খারাবী এই যে, স্বামী স্ত্রীর জন্য এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য আল্লাহ্‌র অতি বড় একটি নেয়ামত এবং অনুগ্রহের দান। আল্লাহ্‌র এই নেয়ামতের না-শুকরী এবং বে-কদরী যে করিবে তাহার উপর আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হইবেন। তাহা ছাড়া একজনের মনে কষ্ট দেওয়া অতি বড় পাপ। দুনিয়ার খারাবী এই যে, দুইটি বংশ বা দুইটি গ্রামের মধ্যে শত্রুতা, আদাওতির সৃষ্টি হইয়া দুর্নাম, বদনাম, ঝগড়া কলহ, মারামারি, কাটাকাটি, মামলা মকদ্দমা কত যে হয় এবং আরও কতদূর যে ইহার জের গড়ায় তাহার সীমা নাই। যদি একজন একটু ছবর করিত, তবে এত অপকর্মের সৃষ্টি হইত না। অবশ্য যখন ছবরের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়াও অন্য পক্ষের ক্ষোভ না মিটে এবং কোন প্রকারেই মিল মহব্বত এবং একতা না হইতে পারে, তখন তালাকের কথা মুখে আনা যাইতে পারে। (এইরূপ প্রয়োজনবোধে তালাক দিতে হইলেও তাহা রাগের বশীভূত হইয়া বা গালাগালি করিয়া দিবে না বা হায়েয-নেফাসের সময়ও তালাক দিবে না এবং এক সঙ্গে তিন তালাক বা দুই তালাক দিবে না। একবার পাক অবস্থায় দুইজন ভাল লোককে সাক্ষী করিয়া মাত্র একটি তালাক দিবে এবং তালাকের পর তিন মাস পর্যন্ত খোরাক ও পোশাক দিবে।)

১৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা বিবাহ কর, কিন্তু তালাক দিও না। কেননা, যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক অনেক জায়গার স্বাদ গ্রহণ করে, তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না।" অর্থ এই যে, বিনা জরুরতে নানা জায়গার স্বাদ গ্রহণ করাকে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ বা স্ত্রীলোক কাহারও জন্য পছন্দ করেন না। —তাবরাণী

২০। হাদীসঃ স্ত্রীকে যতক্ষণ পর্যন্ত ফাহেশা কাজে প্রবৃত্ত না পাও ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে তালাক দিও না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন স্থানের স্বাদ গ্রহণকারীকে পছন্দ করেন না, সে পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক। এই হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি স্ত্রী সতীত্ব এবং নছল নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয় কিংবা এধরনের কোন কাজ করিয়া থাকে, তবে তালাক দেওয়া যায়।

২১। হাদীসঃ বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না। কেননা, তালাক দিলে আল্লাহ্‌র আরশ কম্পিত হয়। —ইবনে আদী

২২। হাদীসঃ ইবলিস শয়তান সমুদ্রের পানির উপর তাহার সিংহাসন পাতিয়া বসে এবং তাহার দলকে দুনিয়ার চতুর্দিকে লোকদিগকে পাপকর্ম করাইবার জন্য প্রেরণ করে। তারপর আবার সকলের নিকট হইতে হিসাব লয়, যে যত বড় এবং যত বেশী পাপ করাইতে পারে, তাহাকে তত বড় পদ এবং অধিক নৈকট্য দান করে। অতঃপর হিসাবের সময় কেহ বলে যে, "আমি অমুক অমুক পাপ করাইয়া আসিয়াছি।" তখন বুড়া শয়তান বলে যে, "তুই কিছুই করিস নাই" অর্থাৎ, বড় কোন কাজ করিতে পারিস নাই। এইরূপ সকলেই বলিতে থাকে। এমনকি যখন কেহ বলে যে, "আমি অমুক স্বামী হইতে তাহার স্ত্রীকে ছাড়াইয়া পৃথক করিয়া দিয়া আসিয়াছি, "তখন বুড়া শয়তান খুব সন্তুষ্ট হয় এবং ঐ কর্মবীরকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার সহিত কোলাকুলি গলাগলি করে এবং বলে, ("সাবাস বেটা! সাবাস!) তুই খুব বড় কাজ করিয়া আসিয়াছিস।" অতএব, প্রত্যেক মুসলমানেরই খুব সতর্ক থাকা দরকার যাহাতে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের মনে কষ্ট দিয়া নিজের দ্বীন ও দুনিয়ার পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া যেন বুড়া শয়তানের মন সন্তুষ্ট না করে। —মোসলেম, আহ্‌মদ

২৩। হাদীসঃ যে মেয়েলোক একান্ত ঠেকা ছাড়া নিজে ইচ্ছা করিয়া স্বামীর নিকট তালাক চাহিবে তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম। অর্থাৎ বড় কঠিন গোনাহ্‌। অবশ্য ঈমানের সহিত মরিলে পাপ কার্যের শাস্তি ভোগ করিয়া অবশেষে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। —আহ্‌মদ, হাকেম

২৪। হাদীসঃ যেসকল মেয়েলোক স্বামীর সহিত এমন খারাপ ব্যবহার করে যাতে সে অবশেষে তালাক দিতে বাধ্য হয়, তাহারা এবং যাহারা একান্ত ঠেকা ছাড়া স্বামীর নিকট খোলা তালাক চাহিবে তাহারা মোনাফেক দলভুক্ত। অর্থাৎ ইহা মোনাফেকের স্বভাব। ভিতরে এক রকম বাহিরে আর এক রকম। বাহ্যতঃ বিবাহ চিরদিনের জন্য হইয়া থাকে অথচ সে চায় বিচ্ছিন্নতা। কাজেই যদি কাফের না-ও হয় গোনাহ্‌গার হইবে।

তালাক

১। মাসআলাঃ আকেল বালেগ স্বামী অর্থাৎ, বালেগ হইয়াছে এবং পাগল নহে, সে তালাক দিলে অবশ্য তালাক হইয়া যাইবে। (আকেল বালেগের মুখের কথা বৃথা যাইবার নহে।) যে স্বামী এখনও বালেগ হয় নাই, সে তালাক দিলে তালাক হইবে না। এইরূপে পাগল স্বামী তালাক দিলে তালাক হইবে না।

২। মাসআলাঃ ঘুমন্ত স্বামীর মুখ দিয়া যদি এইরূপ কথা বাহির হয় যে, 'তোকে তালাক' বা 'আমার স্ত্রীকে তালাক' এরূপ বিড় বিড় করিলে তালাক হইবে না।

৩। মাসআলাঃ কোন যালেম যদি স্বামীর উপর অত্যাচার করিয়া বলে যে, 'তুই তোর স্ত্রীকে তালাক না দিলে তোকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিব' এইরূপ মজ্‌বুরীতে সে তালাক দিল তবুও তালাক হইয়া যাইবে; (কিন্তু ঐ যালেম এইরূপ অত্যাচারের দরুন মহাপাপী হইবে।)

৪। মাসআলাঃ কেহ যদি কোন নেশা পান করিয়া মাতাল হইয়া তালাক দিয়া পরে আক্ষেপ করে, তবে তাহাতেও তালাক হইয়া যাইবে। এইরূপ যদি কেহ রাগে অধীর হইয়া তালাক দেয়, তাতেও তালাক হইয়া যাইবে। (অতএব, সাবধান মুসলমানগণ! রাগ, নেশা ত্যাগ

করার অভ্যাস কর, একান্ত যদি তাহা না পার তবে আর যত কিছুই কর, কিন্তু তালাক শব্দ মুখে উচ্চারণ করিও না।)

৫। মাসআলাঃ তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও নাই। (স্বামীর বাপেরও নাই বা স্ত্রীরও নাই, স্ত্রীর বাপেরও নাই।) অবশ্য স্বামী যদি কাহাকেও তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দেয়, (স্ত্রীকে বা অন্য কাহাকেও) তবে সে তালাক দিতে পারে।

তালাক দেওয়ার কথা

১। মাসআলাঃ তালাক দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বামীকে দেওয়া হইয়াছে, স্ত্রীর তাহাতে আদৌ কোন ক্ষমতা নাই। অতএব, স্বামী যদি তালাক দেয় আর স্ত্রী যদি গ্রহণ না করে, তবুও তালাক হইয়া যাইবে। স্ত্রী নিজের স্বামীকে তালাক দিতে পারে না।

২। মাসআলাঃ স্বামীকে মাত্র তিন তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বেশী তালাক দেওয়ার ক্ষমতা তাহার নাই। যদি কেহ চার পাঁচ তালাক দেয়, তবুও তিন তালাকই হইবে।

৩। মাসআলাঃ স্বামী মুখে বলিল, "আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম" এতটুকু জোরে বলিয়াছে যে, নিজে এই শব্দগুলি শুনিয়াছে। এতটুকু বলাতেই তালাক হইয়া যাইবে। কাহারও সাক্ষাতে বলুক বা কাহারও সাক্ষাতে না বলিয়া একা একাই বলুক অথবা স্ত্রীকে শুনাইয়া বলুক বা না শুনাইয়া বলুক, বা সর্বাবস্থায়ই তালাক হইয়া যাইবে।

৪। মাসআলাঃ তালাক তিন প্রকারঃ ১। তালাকে বায়েন (মোখাফ্‌ফফা) ২। তালাকে বায়েন (মোগাল্লাযা) ৩। তালাকে রজ্য়ী।

বায়েন এমন তালাক যে, তাহাতে বিবাহ সম্পূর্ণ টুটিয়া যায়, পুনরায় বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া স্বামীর জন্য স্ত্রীকে রাখা জায়েয নহে এবং স্ত্রীর জন্য ঐ স্বামীর কাছে থাকা জায়েয নহে । (বায়েন তালাক হওয়া মাত্রই স্ত্রী পৃথক হইয়া যাইবে এবং ঐ স্বামীকে দেখা দেওয়াও জায়েয হইবে না। অবশ্য পরে যদি স্বামী ঐ স্ত্রীকে রাখিতে চায় বা স্ত্রী যদি ঐ স্বামীর কাছে থাকিতে চায়, তবে উভয়ের মত লইয়া বিবাহ পড়াইতে হইবে। এক তালাক বা দুই তালাক পর্যন্ত বায়েন (মোখাফ্‌ফফা) হইতে পারে।

মোগাল্লাযা তালাকঃ তিন তালাক হইলে মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে, (বায়েন বলুক বা না বলুক বা রজয়ী বলুক, এক সঙ্গে এক সময় বলুক বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা বহুকাল পরে বলুক ; মোটকথা তিন তালাক হইলে মোগাল্লাযা হইবে।) তালাকে মোগাল্লাযা হইলে বিবাহ ত যখন তখন টুটিয়া যাইবেই, এমনকি দ্বিতীয়বার বিবাহ দোহ্‌রাইয়া রাখিতে বা থাকিতে চাহিলে তাহাও জায়েয নহে। অবশ্য যদি ঐ স্ত্রী ইদ্দতের পর অন্য কোন জায়গায় বিবাহ বসে এবং স্বামী-স্ত্রী সহবাস করার পর তালাক দেয় অথবা মরিয়া যায় এবং তাহার ইদ্দতের পর প্রথম স্বামী তাহাকে পুনরায় আনিতে চায়, তবে সে রাজি হইলে শরীঅতের নিয়ম অনুসারে পুনরায় বিবাহ করিয়া তাহাকে আনিতে পারিবে।

তালাকে রজয়ী এমন তালাক যে, স্বামী পরিষ্কার শব্দে এক তালাক দিলাম বা দুই তালাক দিলাম বলিবে। ইহাতে বিবাহ সম্পূর্ণ টুটিবে না, যদি পরে পরিণাম চিন্তা করিয়া স্বামী ঐ স্ত্রীকে রাখিতে চায়, তবে বিবাহ দোহ্‌রাইবার দরকার হইবে না, বিবাহ না দোহ্‌রাইয়াও রাখিতে পারিবে। এমনকি, মুখ দিয়া কিছু না বলিয়াও যদি স্বামী স্ত্রীর মত আচার-ব্যবহার করে, তবে তাহাও দুরুস্ত

আছে। অবশ্য যদি রজয়ী তালাক দেওয়ার পর কিছুই না বলে বা না করে এবং রজআত না করে অর্থাৎ নিজের কথা ফিরাইয়া না লয় আর ঐ ভাবেই ইদ্দত শেষ হইয়া যায়, তবে ঐ রজয়ী তালাকই বায়েন তালাকে পরিণত হইয়া যাইবে এবং পরে আর বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া ঐ স্ত্রীকে আনিতে পারিবে না। একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, তিন তালাক রজয়ী হইতে পারে না; এমনকি 'তালাক রজয়ী' নাম উচ্চারণ করা সত্ত্বেও তিন তালাক হইয়া গেলে আর স্বামীর কোন ক্ষমতা থাকিবে না, তালাক বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। (এই জন্যই তিন তালাক দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা কোরআন, হাদীসে আছে। কেননা, তালাক এতই খারাপ জিনিস যে, যদি কেহ এক তালাক দিয়া রজআত করিয়া বা বিবাহ দোহ্‌রাইয়া দুই তিন বৎসর পরে পুনরায় এক তালাক দেয় এবং তারপর দুই তিন বৎসর পরে আবার এক তালাক দেয়, তবুও সব মিলিয়া যোগ হইয়া বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া সম্পূর্ণ ভাবে তালাক হইয়া যাইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, তালাক এতই খারাপ জিনিস যে, শব্দই মুখে আনা চাই না।

৫। মাসআলা ঃ তালাক দিতে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহা দুই প্রকার। এক প্রকার পরিষ্কার অর্থ প্রকাশক এবং একার্থবোধক, ইহাকে 'ছরীহ্' বলে। যেমন কেহ তাহার স্ত্রীকে বলিল, "আমি তোমাকে তালাক দিলাম" বা "আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম।" দ্বিতীয় প্রকার যাহার অর্থ পরিষ্কার নহে, একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে; তালাকের অর্থও হইতে পারে, অন্য অর্থও হইতে পারে, যেমন কেহ তাহার স্ত্রীকে বলিল, "আমি তাহাকে দূর করিয়া দিলাম।" এই কথার অর্থ তালাকও হইতে পারে এবং এই অর্থও হইতে পারে যে, তালাক দেই নাই, বর্তমানে আমি আমার স্ত্রীকে আমার কাছে আসিতে নিষেধ করিয়াছি। এইরূপ শব্দকে 'কেনায়া' বলে। কেনায়ার আরও অনেক শব্দ আছে। যেমন, কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে, "তুই তোর বাপের বাড়ী গিয়া থাক, আমি তোর খবরবার্তা লইতে পারিব না, আমার সঙ্গে তোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, তুই আমার না, আমি তোর না, আমার বাড়ী থেকে চলিয়া যা, দূর হইয়া যা", (আমি তোকে ছাড়িয়া দিলাম, তুই যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যা ইত্যাদি।) এই সব শব্দেরই দুই দুইঅর্থ হইতে পারে, তালাকের অর্থও হইতে পারে, অন্য অর্থও হইতে পারে।

৬। মাসআলা ঃ ছরীহ্ শব্দের দ্বারা অর্থাৎ পরিষ্কার একার্থবোধক শব্দের দ্বারা তালাক দিলে তালাক দেওয়ার নিয়ত হউক বা না হউক, এমনকি হাসি-ঠাট্টারূপে বলিলেও যখন তখন তালাক হইয়া যাইবে। আর এক তালাক বলিলে বা শুধু তালাক বলিলেও এক তালাক রজয়ী এবং দুই তালাক বলিলে বা দুই বার তালাক শব্দ বলিলে—দুই তালাক রজয়ী হইবে। কিন্তু তিন তালাক বলিলে বা তালাক শব্দ তিন বার বলিলে তিন তালাক হইয়া বায়েনে মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। (খবরদার! তিন তালাক এক সঙ্গে দিলে ভারী গোনাহ্ হয়।)

৭। মাসআলা ঃ এক তালাক দেওয়ার পর যত দিন ইদ্দত শেষ না হইয়া যায় তত দিন আরও দুই তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীর থাকে, ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয়, তৃতীয় তালাকও দিতে পারে। (অতএব, ইদ্দতের মধ্যে) যদি আরও এক তালাক বা দুই তালাক দেয়, তবে তাহাও তালাক হইবে।

৮। মাসআলা ঃ 'তালাক দিব' বলিলে তালাক হইবে না। (অর্থাৎ, অতীত কালের বা বর্তমান কালের শব্দ ব্যবহার করিলে তালাক হইবে; কিন্তু ভবিষ্যৎকালের শব্দ ব্যবহার করিলে তালাক হইবে না।) অতএব, যদি তাহার স্ত্রীকে বলে যে, "যদি তুই অমুক কাজ করিস, তবে তোকে

তালাক দিয়া দিব” এইরূপ বলিলে সেই কাজ করুক বা না করুক তালাক হইবে না। অবশ্য যদি এইরূপ বলে যে, “যদি তুই অমুক কাজ করিস, তবে তোকে তালাক (দিলাম বা তবে তোকে তালাক দিতেছি) এইরূপ বলিলে অবশ্য যখন সেই কাজ করিবে, তখনই তালাক হইবে।

৯। মাসআলাঃ যদি কেহ তালাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইনশা-আল্লাহ্ বলিয়া দেয় বা এইরূপ বলে, খোদা চাহে ত তালাক, তাহাতে তালাক হইবে না। অবশ্য তালাক দেওয়ার পর কিছুক্ষণ দেরী করিয়া যদি ইনশা-আল্লাহ্ বলে, তবে তালাক হইয়া যাইবে।

১০। মাসআলাঃ যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে ‘ও তালাক্‌নী’ বলিয়া ডাকে, তবে তাহাতেও তালাক হইয়া যাইবে। যদিও হাসি ঠাট্টারূপে এইরূপ বলে।

১১। মাসআলাঃ যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে, “যখন তুই লক্ষ্ণৌ (তোর বাপের বাড়ী বা অমুক জায়গায়) যাইবি, তখন তোকে তালাক,” এইরূপ বলিলে যখন সে তথায় যাইবে, তখন তালাক হইবে।

১২। মাসআলাঃ যদি ছরীহ অর্থাৎ পরিষ্কার শব্দের দ্বারা তালাক না দেয় বরং গোলমেলে বা ইশারা, কেনায়া শব্দ (অর্থাৎ একাধিক অর্থ-বোধক শব্দের) দ্বারা তালাক দেয়, তবে ঐ সব শব্দ বলিবার সময় যদি তালাকের নিয়ত থাকে, তবে তালাক হইবে অন্যথায় তালাক হইবে না। (কাজেই তালাক্‌দাতা অর্থাৎ স্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, তোমার নিয়ত কি ছিল? সে যদি তালাকের নিয়তে বলিয়া থাকে, তবে ত তালাক হইবে। আর যদি অন্য অর্থে বলিয়া থাকে, তবে তালাক হইবে না) অবশ্য যদি হাবভাবে বুঝা যায় যে, তালাকের নিয়তেই বলিয়াছিল, কিন্তু এখন সে মিথ্যা বলিতেছে, মিছামিছি অস্বীকার করিতেছে তবে স্ত্রী স্বামীর কাছে থাকিবে না। স্ত্রী ইহাই বুঝিবে যে, তাহার তালাক হইয়া গিয়াছে এবং ঐ স্বামী হইতে পৃথক থাকিবে। যেমন স্ত্রী রাগ হইয়া স্বামীকে বলিল যে, “তোমাতে আমাতে বনিবনাৎও হইবে না, তুমি আমাকে তালাক দিয়া দাও”, এই কথার উত্তরে স্বামী বলিল, “যা তোরে ছাড়িয়া দিলাম” তখন স্ত্রী ইহাই বুঝিবে যে, আমাকে তালাক দিয়াছে। অন্য অর্থ লয় নাই; কাজেই এক তালাক বায়েন পড়িবে। স্ত্রী স্বামী হইতে পৃথক থাকিবে।

১৩। মাসআলাঃ কেহ তিনবার বলিল, তোকে তালাক, তালাক, তালাক, তবে তিন তালাক পড়িবে। কিংবা গোলমেলে শব্দে তিনবার বলিল, তবুও তিন তালাক পড়িবে। কিন্তু যদি নিয়ত এক তালাকের হয় শুধু কথা পাকা করিবার জন্য তিন বার বলিয়াছে, তবে এক তালাকই হইবে। কিন্তু স্ত্রীর তো স্বামীর মনের অবস্থা জানা নাই। কাজেই স্ত্রী ইহাই বুঝিবে যে, তিন তালাক দিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বের তালাকের কথা

১। মাসআলাঃ মিলনের পূর্বে (অর্থাৎ, খাল্‌ওয়াতে ছহীহা অথবা সহবাসের পূর্বে) তালাক দিলে বায়েন হইবে। স্পষ্ট কথায় বলুক বা অস্পষ্ট কথায় বলুক। ইহাতে স্ত্রীকে ইদ্দতও পালন করিতে হইবে না, তালাক হওয়ার পরক্ষণেই ইচ্ছা করিলে অন্যত্রও বিবাহ বসিতে পারিবে আর এক তালাক দেওয়ার পর অন্য তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। অবশ্য প্রথম বারই যদি এক সঙ্গে দুই তালাক দেয়, তবে যাহা দিবে তাহাই পড়িবে (যদি এইরূপ বলে যে, ‘তোকে তিন তালাক’ তবে তিন তালাক হইবে,) আর যদি এইরূপ বলে যে, ‘তোকে তালাক, তালাক, তালাক, তবে এক তালাক হইয়া বায়েন হইয়া যাইবে। (পরের দুই তালাক হইবে না।)

তিন তালাকের মাসআলা

১। **মাসআলাঃ** কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, ছরীহ্ শব্দের দ্বারা দেউক বা কেনায়া শব্দের দ্বারা অথবা এক তালাক বা দুই তালাক দেওয়ার দুই চারি বৎসর পর আবার দুই তালাক বা এক তালাক দেউক, সারকথা এই যে, যদি কোন প্রকারে মোট তিন তালাক হয়, তবে সেই স্ত্রী তাহার জন্য একেবারে হারাম হইয়া যাইবে এবং সেই স্ত্রীর জন্য ঐ স্বামীর কাছে থাকা সম্পূর্ণ হারাম হইবে। এমনকি বিবাহ দোহ্‌রাইলেও বিবাহ হইবে না এবং হালালও হইবে না।

২। **মাসআলাঃ** এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহাও তালাক। যেমন, যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে যে, 'তোকে তিন তালাক' বা এইরূপ বলে 'তোকে তালাক' তোকে তালাক, তোকে তালাক তবে তিন তালাক হইয়া বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। এইরূপ যদি পৃথক পৃথক করিয়া তিন তালাক দেয়, যেমন, আজ এক তালাক দিল, কাল এক তালাক দিল, পরশু এক তালাক দিল বা প্রথমে এক তালাক দিল, তার এক মাস পর আর এক তালাক দিল, আবার এক মাস পর আর এক তালাক দিল, অর্থাৎ তিন তালাকই ইদ্দতের মধ্যে দিল। সকলেরই একই হুকুম অর্থাৎ তিন তালাক হইয়া স্ত্রী একেবারে হারাম হইয়া যাইবে। এমনকি, যদি তিন তালাক রজয়ী দেয়, তবুও বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে এবং রজআত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, কেননা রজআত করিবার ক্ষমতা থাকে এক তালাক বা দুই তালাক রজয়ী দিলে, তিন তালাক দিলে রজআত করিবার ক্ষমতা থাকে না।

৩। **মাসআলাঃ** কেহ হয়ত তাহার স্ত্রীকে এক তালাক রজয়ী দিল, তারপর আবার (ইদ্দতের মধ্যে) রজআত করিয়া লইল, আবার দুই চার বৎসর পর রাগ হইয়া আবার এক তালাক রজয়ী দিল, আবার ইদ্দতের মধ্যে রাজী খুশী হইয়া রজআত করিয়া লইল। এই মোট দুই তালাক হইল। তারপর যদি আবার এক তালাক দেয়, তবে সব মিলিয়া তিন তালাক হইয়া যাইবে এবং বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া স্ত্রী একেবারে হারাম হইয়া যাইবে, অন্য স্বামীর ঘর না করিয়া আর এই স্বামীর সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না। এইরূপে যদি এক তালাক বায়েন দেয়, যাহাতে রাখিবার ক্ষমতা থাকেনা, বিবাহ টুটিয়া যায়; অতঃপর লজ্জিত হইয়া স্বামী স্ত্রী সম্মত হইয়া আবার বিবাহ পড়াইয়া লয় এবং কিছু দিন পর আবার রাগের বশীভূত হইয়া আর এক তালাক দেয় এবং রাগ থামিবার পর বিবাহ পড়াইয়া লয়, তবে এই দুই তালাক হইল। এখন যদি তৃতীয় বার তালাক দেয়, তবে তালাকে মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে, সর্বসমেত তিন তালাক হইয়া স্ত্রী একেবারে হারাম হইয়া যাইবে, বিবাহ দোহ্‌রাইলেও হালাল হইবে না।

৪। **মাসআলাঃ** তিন তালাকের হারামের হাত এড়াইবার জন্য যদি কাহারও সহিত এই অঙ্গীকারে বিবাহ হয় যে, বিবাহ করতঃ সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দিবে, তবে সেই অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, (বরং এরূপ অঙ্গীকার লওয়া এবং করা উভয়ই হারাম) এখন তাহার ইচ্ছা, সে ইচ্ছা করিলে ছাড়িতেও পারে, না ছাড়িলেও তাহার কিছু করার উপায় নাই। এইরূপ শর্ত করিয়া

বিবাহ করিলে তাহার উপর খোদার লানত পতিত হয়। কিন্তু যদি কেহ এইরূপ গোনাহ্র কাজ করিয়া একবার সহবাস করিয়া স্ত্রীকে তালাক দেয় বা মরিয়া যায়, তবে ইদ্দত পালনের পর পূর্বের স্বামীর জন্য বিবাহ করা হালাল হইবে।

শর্তের উপর তালাক দেওয়া

১। মাসআলাঃ যদি কেহ কোন বেগানা স্ত্রীলোককে বলে যে, 'যদি আমি তাহাকে বিবাহ করি, তবে তাকে তালাক', পরে যখনই তাহাকে বিবাহ করিবে, তখনই এক তালাক বায়েন হইবে, পুনরায় বিবাহ না দোহ্রাইয়া ঐ স্ত্রীকে ঘরে আনিতে পারিবে না। এইরূপে যদি দুই তালাকের কথা বলে, যেমন, 'যদি তাকে বিবাহ করি, তবে তাকে দুই তালাক।' বিবাহ করা মাত্রই দুই তালাক বায়েন হইবে, (বিবাহ না দোহ্রাইয়া ঐ স্ত্রীকে ঘরে আনিতে পারিবে না; বিবাহ দোহ্রাইয়া আনিতে পারিবে।) আর যদি তিন তালাকের কথা বলে, যেমন, 'যদি তাহাকে বিবাহ করি, তবে তাকে তিন তালাক' এমতাবস্থায় বিবাহ করা মাত্রই তিন তালাক হইবে এবং বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। (পরে আর দোহ্রাইবারও ক্ষমতা থাকিবে না।)

২। মাসআলাঃ উপরের মাসআলায় 'যদি' শব্দ ব্যবহার করার কারণে এই হুকুম হইল যে, বিবাহ করা মাত্রই (এক বার দুই তালাক) হইল বটে কিন্তু পুনরায় বিবাহ করিলে পূর্বের কথার কারণে দ্বিতীয়বার তালাক হইবে না। হাঁ, যদি এইরূপ বলে যে, 'যতবার (বা যখনই বা যখন যখন) তাহাকে বিবাহ করিব ততবার তাকে তালাক' তবে অবশ্য যতবার তাহাকে বিবাহ করিবে, ততবারই তালাক হইবে, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বিবাহ দোহ্রাইলে তাহাতেও তালাক হইবে; এমনকি, তিন তালাক হওয়ার পর অন্য স্বামীর ঘর করিয়া পুনরায় যদি এই লোকই বিবাহ করে, তবুও তালাক হইবে।

৩। মাসআলাঃ যদি কেহ এইরূপ বলে, 'যে কোন স্ত্রীলোককে আমি বিবাহ করিব, তাকে তালাক', এখন যে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে, বিবাহ করা মাত্রই তালাক হইবে। কিন্তু একবার একজনের উপর তালাক হওয়ার পর যদি বিবাহ দোহ্রাইয়া আবার তাকে বিবাহ করে, তবে আর তাহার উপর তালাক হইবে না। (অবশ্য নূতন যাকেই বিবাহ করুক না কেন তাহার উপর তালাক হইবে।)

৪। মাসআলাঃ (যে স্ত্রী নিজের বিবাহে আছে অথবা যে স্ত্রী রজয়ী তালাকের ইদ্দতে আছে শুধু তাহাকে তালাক দেওয়া যায়; কিন্তু যাহার সঙ্গে এখনও বিবাহ হয় নাই বা তালাক বায়েন যাহার হইয়া গিয়াছে, তাহাকে তালাক দেওয়া যায় না। দিলেও তালাক হইবে না; সুতরাং) যদি কেহ কোন বেগানা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বলে যে, যদি সে অমুক কাজ করে, তবে তাকে তালাক, এই কথার কোনই মূল্য নাই, এমনকি পরে যদি ঐ স্ত্রীলোককে সে বিবাহ করে এবং তারপর সেই স্ত্রীলোকটি সেই কাজটি করে, তবুও তালাক হইবে না। অবশ্য বিবাহের বাহিরে স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়ার একটি মাত্র ছুরত আছে, তাহা এইঃ যদি কেহ বলে যে, 'যদি আমি তাহাকে বিবাহ করি, তবে তাকে তালাক', এই ছুরতে বিবাহ করার পর তালাক হইবে (অর্থাৎ যদি শর্তের ভিতর বিবাহের কথার উল্লেখ করিয়া তালাক দেয়, তবে শর্ত পাওয়ার পর তালাক হইবে, নতুবা বিবাহের বাহিরে স্ত্রীলোককে তালাক দিলে বা বিবাহ ছাড়া অন্য কোন শর্ত করিয়া তালাক দিলে তাহাতে তালাক হইবে না।)

৫। মাসআলা ঃ নিজের স্ত্রীকে যদি কেহ কোন শর্ত করিয়া তালাক দেয় যে, যদি তুমি অমুক কাজ কর, তবে তোমাকে তালাক, যদি আমার নিকট হইতে যাও, তবে তোমাকে তালাক, যদি ঐ ঘরে যাও, তবে তোমাকে তালাক, যদি এক ওয়াক্ত নামায না পড়িস তবে তোকে তালাক বা এইরূপ অন্য শর্ত করিয়া তালাক দেয়, তবে যখন সেই কাজ করিবে, তখন এক তালাক রজয়ী হইবে। অবশ্য যদি কোন কেনায়া শব্দ বলে, যেমন বলে, যদি অমুক কাজ কর, তবে তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই, তবে যখন সেই কাজ করিবে, বায়েন তালাক পড়িবে, যদি স্বামী ঐ শব্দ বলার সময় তালাকের নিয়ত করে।

৬। মাসআলা ঃ যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে, 'যদি তুই অমুক কাজ করিস্‌, তবে তোকে দুই তালাক বা তিন তালাক,' আর যদি সে সেই কাজ করে, তবে যখন সেই কাজ করিবে, তখন যে কয় তালাকের কথা বলিয়াছে সেই কয় তালাক হইবে।

৭। মাসআলা ঃ যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে ('যদি' শব্দ ব্যবহার করিয়া শর্তের উপর তালাক দেয়, যেমন) বলিল, যদি তুই অমুক কাজ করিস তবে তোকে তালাক। তারপর সে সেই কাজ করিল এবং তালাক হইল, কিন্তু স্বামী ইদ্দতের মধ্যে রজআত করিয়া লইল বা বিবাহ দোহরাইয়া লইল, তারপর যদি স্ত্রী দ্বিতীয়বার সেই কাজ করে তবে দ্বিতীয়বার আর তালাক হইবে না, (কারণ, একবার সেই কাজ করিতেই শর্ত শেষ হইয়া গিয়াছে।) অবশ্য যদি শর্তের মধ্যে যতবার বা যে কোন সময়, 'যখন যখন' 'যখনই' শব্দ ব্যবহার করে, যেমন, বলিল, 'যতবার তুই অমুক কাজ করিবি তোকে তালাক,' তবে একবার সেই কাজ করিলে এক তালাক হইবে, পুনরায় ইদ্দতের ভিতর বা বিবাহ দোহ্‌রানের পর যদি সেই কাজ আবার করে, তবে আবার এক তালাক হইবে, এমন কি দ্বিতীয় তালাকের ভিতর বা তৃতীয়বার দোহ্‌রাইয়া লওয়ার পর যদি সেই কাজ আবার করে, তবে তিন তালাক হইয়া বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। আর বিবাহ দোহরাইতেও পারিবে না, অবশ্য যদি দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করার পর আবার পূর্বের এই স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হয়, তখন আর সেই কাজ করিলে তালাক হইবে না। (কারণ, দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করার পর আর পূর্বের শর্তের ক্রিয়া থাকিবে না।)

৮। মাসআলা ঃ কেহ তাহার স্ত্রীকে বলিল, যদি তুমি অমুক কাজ কর, তবে তোমাকে তালাক। এখনও স্ত্রী এ কাজ করে নাই অথচ স্বামী আর একটি তালাক দিয়া দিল এবং ছাড়িয়া দিল, কিছু দিন পর আবার ঐ স্ত্রীলোককে বিবাহ করিল। ঐ বিবাহের পর এখন সে ঐ কাজ করিল, তবে আবার তালাক পড়িল। অবশ্য যদি তালাকের পর এবং ইদ্দত গত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিবাহের পূর্বে ঐ কাজ করিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় বিবাহের পর ঐ কাজ করিলে তালাক পড়িবে না। আর যদি তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে ঐ কাজ করে, তবুও দ্বিতীয় তালাক পড়িল।

৯। মাসআলা ঃ শর্তের উপর তালাক শিরোনামা দ্রষ্টব্য।

১০। মাসআলা ঃ যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে, 'যদি তুই রোযা রাখিস্‌, তবে তোকে তালাক' তবে রোযা রাখা মাত্রই তালাক হইবে, আর যদি এইরূপ বলে, 'যদি তুই একটি রোযা রাখিস, তবে তোকে তালাক' বা এইরূপ বলে, 'যদি তুই সারাদিন রোযা রাখিস, তবে তোকে তালাক', এই অবস্থায় যখন রোযা পুরা হইবে (অর্থাৎ, এফতারের ওয়াক্ত হইবে,) তখন তালাক হইবে, যদি (এফতারের ওয়াক্ত হইবার পূর্বে) রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে তালাক হইবে না।

১১। মাসআলাঃ স্ত্রী ঘর হইতে বাহিরে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে এমন সময় স্বামী বলিল, এখন বাহিরে যাইও না; স্ত্রী মানিল না, স্বামী রাগ হইয়া বলিল, যদি বাহিরে যাস্, তবে তোকে তালাক। এইরূপ বলার হুকুম এই যে, যদি তখনই বাহিরে যায়, তবে তালাক হইবে, নতুবা তারপর অন্য সময় বাহিরে গেলে তালাক হইবে না। কেননা এরূপ স্থলে ইহার অর্থ এই হয় যে, এখন যাইও না, এ অর্থ হয় না যে, জীবনে কখনও যাইও না। (আরবীতে এইরূপ কথাকে ইয়ামিনে ফওর বলে। ইয়ামিনে ফওরের অর্থ যখনকার কথা তখন শেষ হইয়া যাওয়া।)

১২। মাসআলাঃ যদি কেহ বলে, যে দিন তারে বিবাহ করিব, তারে তালাক, তবে বিবাহ দিনে করুক বা রাত্রে করুক তালাক হইবে। কেননা এইরূপ স্থলে দিন শব্দের অর্থ রাত্রের বিপরীত যে দিন তাহা নহে; বরং এইরূপ স্থলে দিন শব্দের অর্থ সময়।

তফ্‌বীযে তালাক

(তফ্‌বীযে তালাকের অর্থ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার স্বামীর যে ক্ষমতা ছিল তাহা স্ত্রীকে দান করা। যেমন, স্বামী স্ত্রীকে মৌখিক বলিল বা লিখিয়া দিল যে, যদি আমি ছয় মাসের মধ্যে তোমার কোন খবর-বার্তা না লই, তবে আমি তোমাকে ক্ষমতা প্রদান করিলাম, ছয় মাস অতীত হইয়া গেলে যে কোন সময় তুমি তোমার নফ্‌ছকে (নিজকে) তালাক দিতে পারিবে, স্বামী এইরূপ বলিলে বা লিখিয়া দিলে শর্ত পূর্ণ হওয়ার পর স্ত্রী নিজকে তালাক দিয়া ঐ স্বামী হইতে মুক্ত হইবার ক্ষমাতাশালিনী হইবে বটে, কিন্তু তফ্‌বীয ছহীহ্ হইবার জন্য পাঁচটি শর্ত আছে। প্রথম শর্ত, স্বামীর কথার মধ্যে "নফছ বা নিজ" শব্দের উল্লেখ হওয়া জরুরী। দ্বিতীয় শর্ত বিবাহের আক্‌দ হওয়ার পর এইরূপ কথা বলা বা লিখা জরুরী। বিবাহের আক্‌দ হওয়ার পূর্বে এইরূপ কথা লিখিলে তফ্‌বীয ছহীহ্ হইবে না এবং স্ত্রীর তালাক লওয়ার ক্ষমতাও হইবে না। তৃতীয় শর্ত, স্বামীর কথার মধ্যে অতীত বা বর্তমান কালের ক্রিয়া থাকা চাই, নতুবা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া হইলে তফ্‌বীয ছহীহ্ হইবে না। চতুর্থ শর্ত, স্বামী যে শর্ত করিয়াছে সেই শর্ত পূর্ণ হইয়া যাওয়া চাই; শর্ত পূর্ণ না হইলে স্ত্রীর তালাক লইবার ক্ষমতা হইবে না। পঞ্চম শর্ত, স্বামীর শর্তের মধ্যে 'যে কোন সময়' শব্দের উল্লেখ হওয়া চাই, নতুবা যখন শর্ত পূর্ণ হইবে, তখনই সেই মজলিসেই যদি তালাক লয় তবে তালাক হইবে। মজলিস পরিবর্তন হইয়া গেলে আর তালাক লওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না, অবশ্য 'যে কোন সময়' শব্দের উল্লেখ থাকিলে শর্ত পূর্ণ হওয়ার পর যে কোন সময় ইচ্ছা তালাক লইতে পারিবে)। —অনুবাদক

তাওকীলে তালাক

১। মাসআলাঃ তাওকীলে তালাকের অর্থ নিজে তালাক না দিয়া অন্য কাহাকেও তালাক দিবার জন্য উকীল বানাইয়া দেওয়া, যেমন বাপ ছেলেকে বলিল, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দাও,' ছেলে বলিল, আপনাকে উকীল বানাইলাম, আপনি আমার পক্ষ হইতে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেন। এই কথার দ্বারা বাপ ছেলের পক্ষে উকীল হইবে। অতএব, বাপ যদি এইরূপ বলে যে, আমি অমুকের পক্ষ হইতে উকীল হইয়া অমুকের বেটি অমুককে তালাক দিতেছি, তবে তালাক হইয়া যাইবে। কিন্তু উকীল তালাক দেওয়ার পূর্বে যদি মোয়াক্কেলের রায় বদলিয়া যায় এবং তালাক দেওয়ার মত ফিরিয়া যায় আর উকীলকে ডাকিয়া বলে যে, আপনাকে যে তালাক

দিবার জন্য উকীল বানাইয়াছিলাম সে ওকালতি আমি বাতেল করিতেছি, আপনি তালাক দিবেন না, তবে আর সেই উকীলের তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। এইরূপে উকীল যদি ওকালতি গ্রহণ না করিয়া রদ করিয়া দেয় এবং বলে যে, আমি তোমার ওকালতি গ্রহণ করিতে পারিব না, তবে তাহার আর তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। কিন্তু তফবীযের মধ্যে স্ত্রীর গ্রহণ করারও দরকার নাই বা সে যদি রদ করে, তবে তাহাতেও রদ হইবে না; বরং রদ করার পরও তাহার তালাক লওয়ার ক্ষমতা থাকিবে এবং স্বামীরও একবার ক্ষমতা দেওয়ার পর আর সেই ক্ষমতা ফেরত লওয়ার অধিকার নাই, অবশ্য যদি সময় সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়, তবে সেই সময়ের পর স্ত্রীর আর ক্ষমতা থাকিবে না।

প্রশ্ন ঃ হিন্দু বা ইংরেজ, মুসলমানের উকীল হইতে পারে কি না?

উত্তর ঃ হাঁ, মুসলমান যদি উকীল বানায়, তবে হিন্দু বা ইংরেজ তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত উকীল হইতে পারে, কিন্তু ওলী মুসলমান ছাড়া অন্য জাতি হইতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ হিন্দু, ইংরেজ বা মুসলমান জজ যদি স্ত্রীর দরখাস্ত পাইয়া স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেয়, তবে তাহাতে তালাক হইবে কি না?

উত্তর ঃ না, তাহাতে তালাক হইবে না। এইরূপ হইলে ঐ স্ত্রীর জন্য ঐ স্বামী হইতে পৃথক হওয়া বা অন্য স্বামী গ্রহণ করা হারাম হইবে। হাঁ, জজ সাহেব যদি স্বামীকে হাজির করাইয়া তার মুখ দিয়া তালাক দেওয়াইয়া দেন, তবে অবশ্য তালাক হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন ঃ যে ক্ষেত্রে স্ত্রীর ক্ষমতা থাকে ঠিক রাখার বা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার, যেমন পিতৃহীনা নাবালেগাকে যদি তাহার চাচা বিবাহ দেয়, তবে ঐ মেয়ে যখন বালেগা হইবে, তখন তাহার ক্ষমতা হইবে ঐ বিবাহ ভাঙ্গিয়া ফেলার, এইরূপ ক্ষেত্রে যদি মেয়ে নিজে নিজেই বিবাহ ভাঙ্গিয়া ফেলে বা কোন হিন্দু বা ইংরেজ হাকিমের দ্বারা ভাঙ্গাইয়া ফেলে, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে কি না?

উত্তর ঃ না, তাহা দুরুস্ত হইবে না, মেয়ে নিজে বিবাহ ভাঙ্গিলে তাহাও দুরুস্ত হইবে না, অন্য জায়গায় বিবাহ বসা তাহার জন্য হারাম হইবে এবং হিন্দু বা ইংরেজ আদালতে দরখাস্ত দিলে এবং তাহারা ভাঙ্গিয়া দিলে তাহাও দুরুস্ত হইবে না। (অবশ্য হিন্দু বা ইংরেজ হাকিম যদি স্বামীকে হাজির করাইয়া তার মুখ দিয়া বলাইয়া দেয়, অথবা মুসলমান হাকিম হয় এবং সে ঐ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে দুরুস্ত হইবে।) —অনুবাদক

মৃত্যু-রোগে তালাক দেওয়া

১। মাসআলা ঃ (মৃত্যু-রোগের অর্থ, যে রোগে ভুগিয়া মানুষ মারা যায়, আরোগ্য লাভ করে না।) এইরূপ রুগ্ন অবস্থায় যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকা অবস্থায় যদি স্বামী মারা যায়, তবে (তালাক হওয়া সত্ত্বেও) ফরায়েয অনুসারে স্বামীর সম্পত্তির যে অংশ স্ত্রীর প্রাপ্য তাহা সে পাইবে, (তালাকের কারণে অংশ হইতে বঞ্চিতা হইবে না,) এক তালাক দেউক দুই বা তিন তালাক দেউক বা রজয়ী তালাক দেউক বা বায়েন তালাক দেউক, ইদ্দতের ভিতর মৃত্যু হইলে সর্বাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে। অবশ্য যদি স্বামীর মৃত্যু ইদ্দত পার হইয়া যাওয়ার পর হয়, অথবা ঐ রোগে স্বামী মরে নাই বরং ভাল হইয়াছে, তারপর আবার রোগ হইয়া (ইদ্দতের ভিতর অথবা ইদ্দতের পর) মারা গিয়াছে, তবে স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে না।

২। মাসআলাঃ তালাক যদি স্ত্রী নিজে চাহিয়া লয় এবং সেই কারণে স্বামী স্ত্রীকে (মৃত্যু-রোগে) তালাক দেয় তবে স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে না। চাই ইদ্দতের মধ্যে মরুক বা ইদ্দতের পর মরুক । অবশ্য স্বামী যদি রজয়ী তালাক দেয় তবে ইদ্দতের ভিতর স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাহার মীরাছ পাইবে।

৩। মাসআলাঃ রুগ্নাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে বলিল, তুমি যদি বাড়ীর বাহিরে যাও, তবে তোমাকে বায়েন তালাক। এইরূপ বলা সত্ত্বেও যদি স্ত্রী বাহিরে চলিয়া যায়, তবে তাহার বায়েন তালাক হইবে এবং স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে না; কেননা, এই তালাক স্ত্রীর নিজ ইচ্ছাকৃত কর্মের দোষে হইয়াছে, কাজেই মীরাছ হইতে মাহ্রূম হইবে। অবশ্য স্বামী যদি এমন কোন কাজ করিতে নিষেধ করে, যে কাজ না করিলেই চলে না। যেমন বলিল, যদি তুই ভাত খাস, তবে তোকে বায়েন তালাক বা এইরূপ বলিল, যদি তুই নামায পড়িস, তবে তোকে এক তালাক বায়েন। স্বামী যদি এইরূপ বলে এবং পরে স্ত্রী ভাত খায় এবং নামায পড়ে সেই কারণে তালাক হওয়াতে ইদ্দতের মধ্যে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাহার মীরাছ পাইবে। কেননা, ভাত না খাইয়া এবং নামায না পড়িয়া মানুষ কিরূপে বাঁচিতে পারে? কাজেই স্ত্রীর কোন কছুর নাই। রজয়ী তালাক যে কোন প্রকারে দেউক না কেন স্ত্রীর কছুর হইলেও রজয়ী তালাকের ইদ্দতের ভিতর স্বামী মারা গেলে স্ত্রী মীরাছ পাইবে।

৪। মাসআলাঃ কেহ সুস্থ অবস্থায় (স্ত্রীকে) বলিল, যখন তুমি বাড়ীর বাহিরে যাইবে, তখন তোমাকে বায়েন তালাক, অতঃপর যখন স্ত্রী বাড়ী হইতে বাহিরে গেল তখন স্বামী পীড়িত ছিল এবং ঐ পীড়িতাবস্থায় ইদ্দতের মধ্যে মারা গেল, তবুও মীরাছ পাইবে না।

৫। মাসআলাঃ সুস্থাবস্থায় বলিল, যখন তোমার পিতা বিদেশ হইতে (বাড়ীতে) আসিবে, তখন তোমাকে বায়েন তালাক, যখন সে বিদেশ হইতে আসিল তখন স্বামী অসুস্থ ছিল এবং ঐ রোগেই মরিয়া গেল, তবে মীরাছ পাইবে না। আর যদি অসুস্থ অবস্থায় বলিয়া থাকে এবং ঐ অসুখে ইদ্দতের মধ্যে মারা যায়, তবে অংশ (মীরাছ) পাইবে।

রজআতের মাসায়েল

১। মাসআলাঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাক রজয়ী দেয়, তবে ইদ্দত পার না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্ত্রীকে তাহার বিনা সম্মতিতে ফিরাইয়া রাখিবার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। (এই ফিরিয়া রাখাকে 'রজআত' করা বলে এবং যে তালাকের মধ্যে ফিরাইয়া রাখার ক্ষমতা থাকে, তাহাকে রজয়ী তালাক বলে।) রজয়ী তালাকে যতদিন ইদ্দত পার না হইবে, ততদিন স্ত্রী সম্মত না হইলেও স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া রাখিতে পারে, স্ত্রীর তাহাতে কোনই অধিকার নাই। (পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রজয়ী তালাকের ইদ্দত পার হইয়া গেলে বায়েন তালাক হইয়া যায়। তখন স্ত্রীকে পুনরায় আনিতে হইলে স্ত্রীর সম্মতি লইয়া পুনরায় বিবাহ দোহ্রাইয়া আনিতে হইবে।) এবং তিন তালাক হইলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সম্মত থাকা সত্ত্বেও বিবাহ দোহ্রাইয়াও আনিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

২। মাসআলাঃ রজ্আত করিবার নিয়ম অর্থাৎ সুন্নত তরিকা এই যে, (দুই জন সাক্ষীর সামনে) স্বামী স্ত্রীকে বলিবে যে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন আমি রজআত করিতেছি, তোমাকে ছাড়িব না, তোমাকে ফিরাইয়া রাখিতেছি অথবা এরূপও বলিতে

পারে যে, আমি (তোমাকে পুনরায় আমার বিবি বানাইতেছি বা) পুনরায় তোমাকে বিবাহের মধ্যে আনিতেছি। অথবা যদি স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া স্ত্রীর সাক্ষাতেও মুখ দিয়া বলে যে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন আবার তাহাকে ফিরাইয়া রাখিলাম বা রজআত করিলাম, এইরূপ বলিলে তাহার রজআত হইয়া যাইবে এবং পুনরায় তাহার স্ত্রী হইয়া যাইবে। (মুখ দিয়া এইরূপ বলার পর যদি ছয় মাস সহবাস নাও করে, তবুও বায়েন তালাক হইতে পারে না।) আর যদি মুখ দিয়া কিছু না বলিয়া (রজয়ী তালাকের) ইদ্দতের ভিতর সহবাস করে, স্বামী-স্ত্রীর মত চুম্বন, আলিঙ্গন করে কিংবা কামভাবের সহিত স্পর্শ করে, তাহাতেও রজআত হইয়া যাইবে। পুনরায় বিবাহ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু খবরদার বায়েন তালাকে বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া তাহা কিছুই করা দুরুস্ত নহে। রজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে যদি মুখ দিয়াও কিছু না বলে এবং কার্যতও স্বামী-স্ত্রীর আচার-ব্যবহার না করে, তবে ইদ্দত খতম হইয়া গেলে বায়েন তালাক হইয়া যাইবে।

৩। মাসআলা ঃ রজআত করিবার সময় মৌখিক বলিয়া রজআত করা এবং বলিবার সময় চারজন লোক সাক্ষী রাখা মোস্তাহাব; কেননা, হয়ত পরে কোন মতভেদ সৃষ্টি হইতে পারে। আর যদি সাক্ষী নাও রাখে, তবুও রজআত দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৪। মাসআলা ঃ ইদ্দত পার হইয়া যাওয়ার পর আর রজআত করিবার ক্ষমতা স্বামীর থাকে না। বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া আর স্বামীর ঐ স্ত্রীকে রাখিবার বা স্ত্রীর স্বামীর নিকট থাকিবার অধিকার নাই, বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া যদি স্বামী স্ত্রীকে রাখে বা স্ত্রী থাকে, তবে উভয়ে শক্ত গোনাহ্‌গার হইবে।

৫। মাসআলা ঃ যে স্ত্রীর হায়েয জারী আছে তাহার তালাকের ইদ্দত তিন হায়েয। যখন তিন হায়েয পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন ইদ্দত শেষ হইবে।

এখন জ্ঞতব্য বিষয় এই যে, যদি তৃতীয় হায়েয পূর্ণ দশ দিন পর্যন্ত জারী থাকে, তবে তো যখন রক্ত বন্ধ হয় এবং দশ দিন পূর্ণ হয়, তখনই ইদ্দত শেষ হইয়া যায়। স্ত্রী গোছল করুক বা না করুক স্ত্রীকে রাখিবার অধিকার যাহা স্বামীর ছিল, রহিল না। আর যদি তৃতীয় হায়েয দশ দিনের কম হইয়া থাকে এবং দশ দিনের পূর্বেই রক্ত বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু এখনও গোছল করে নাই কিংবা কোন ওয়াজেব নামাযও তাহার ক্বাযা হয় নাই, তবে এখনও স্বামীর ক্ষমতা বাকী রহিয়াছে, যদি সে নিজ ইচ্ছায় তালাক হইতে বিরত থাকে, তবে সে তাহার হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি রক্ত বন্ধ হওয়ার পর স্ত্রী গোছল করিয়া থাকে কিংবা গোছল তো করে নাই কিন্তু এক নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া গেল অর্থাৎ এক ওয়াক্ত নামাযের ক্বাযা তাহার জিম্মায় ওয়াজেব হইয়া গেল, এই দুই অবস্থায় স্বামীর ক্ষমতা চলিয়া গেল, এখন বিবাহ ব্যতিরেকে স্ত্রীকে রাখিতে পারিবে না।

৬। মাসআলা ঃ যে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহের পর এখনও পর্যন্ত স্বামী সহবাস করে নাই, যদিও নির্জনে স্বামী-স্ত্রী এক জায়গায় থাকিয়া থাকে—আর তাহাকে এক তালাক রজয়ী দেয়, তবে রজয়ী তালাক পড়িবে না; বরং এক তালাক বায়েন পড়িবে।

৭। মাসআলা ঃ স্বামী-স্ত্রী একত্রে নির্জন বাস করিয়াছে, কিন্তু স্বামী বলে, আমি সঙ্গম করি নাই। এই স্বীকারোক্তির পর তালাক দিল, এখন তালাক বায়েন হইবে, রজয়ী হইবে না।

৮। মাসআলা ঃ রজয়ী তালাকের মধ্যে অর্থাৎ এক বা দুই তালাকের রজয়ীতে স্ত্রীর খুব সাজসজ্জা করিয়া সুন্দরী সাজিয়া থাকা উচিত যাহাতে স্বামীর মনে মহব্বত ও আকর্ষণ জন্মিয়া

জলদি রজআত করিয়া লইতে পারে। আর যদি স্বামীর রজআত করার ইচ্ছা না থাকে, তবে ঘরে আসিবার সময় কাশ দিয়া বা শব্দ করিয়া আসা উচিত, (কারণ, যদি কোন বে-কায়দা জায়গায় নজর পড়িয়া যায়, তবে হয়ত রজআত হইয়া যাইতে পারে, অথচ তাহার রজআত করার ইচ্ছা নাই, তারপর আবার তালাক দেওয়ার দরকার পড়িবে এবং ইদ্দত অনেক লম্বা হইয়া যাইবে তাহাতে তাহার কষ্ট হইতে পারে। (যাহা হউক) স্ত্রী ইদ্দত পর্যন্ত স্বামীর ঘরে থাকিয়া ইদ্দত শেষ হইলে তথা হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাইয়া থাকিবে।

৯। মাসআলা ঃ তালাক দিয়া রজআত করার পূর্বে সেই স্ত্রীকে লইয়া ছফর করা বা স্ত্রী তাহার সহিত ছফরে যাওয়া জায়েয নহে।

১০। মাসআলা ঃ যে স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক বায়েন দেওয়া হইয়াছে, সে যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে চায়, তবে ইদ্দত শেষ হইবার পূর্বে তাহা পারিবে না। যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে চায়, তবে ইদ্দত শেষ হইবার পূর্বে তাহা পারিবে না। ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ দুরুস্ত নহে, কিন্তু যদি প্রথম স্বামীই বিবাহ করিতে চায়, তবে সে বিবাহ ইদ্দতের মধ্যেও দুরুস্ত আছে।

খোলা তালাকের মাসায়েল

১। মাসআলা ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি মিল-মহব্বত না হয়, আর স্বামী তালাক না দেয়। ইহার উপায়ের জন্যই শরীঅতে খোলা তালাকের বিধান জারী করা হইয়াছে। স্ত্রীর মন যদি স্বামীর সহিত না মিশে, তবে প্রথমেই তালাক চাহিবে না বা খোলা চাহিবে না, প্রথমে ছবরই করিবে এবং মিল-মহব্বত করিবার জন্য শত প্রকারের চেষ্টা করিবে। একান্তই যদি কিছুতেই মন মিশাইতে এবং ছবর করিতে না পারে, তবে স্বামীকে বলিতে পারে যে, আপনি কিছু টাকা-পয়সা লইয়া আমাকে রেহাই দেন, বা এরূপও বলিতে পারে যে, আপনার জিম্মায় যে মহরের টাকা আমার পাওনা আছে, তাহার আমি কোন দাবী দাওয়া রাখি না, আপনি আমাকে রেহাই দেন। এইরূপ বলাতে স্বামী যদি (সেই মজলিসেই) বলে, আচ্ছা "আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম" তবে এইরূপ উক্তিতে স্ত্রীর উপর এক তালাক বায়েন হইবে। স্বামীর আর তাহাকে ফিরাইয়া রাখিবার ক্ষমতা থাকিবে না। অবশ্য যদি স্বামী ঐ মজলিসে কিছু না বলে, অথবা স্বামী কিছু না বলিয়া চলিয়া যায় বা স্বামী কিছু বলিবার পূর্বেই স্ত্রী উঠিয়া চলিয়া যায়, তারপর স্বামী বলে, আচ্ছা আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, তবে ইহাতে খোলা হইবে না। অর্থাৎ, সওয়াল জবাব একই স্থানে হওয়া চাই। এই উপায়ে স্ত্রীর জান ছুটানকে 'খোলা তালাক' বলে।

২। মাসআলা ঃ স্বামী বলিল, আমি তোমা হইতে খোলা করিলাম। স্ত্রী বলিল, আমি কবূল করিলাম, তখন খোলা হইয়া গেল। আর যদি স্ত্রী ঐ স্থানে উত্তর না দিয়া চলিয়া যায়, কিংবা স্ত্রী কবূলই করিল না, তবে কিছুই হইল না। কিন্তু স্ত্রী স্বস্থানে বসিয়া রহিল এবং স্বামী ইহা বলিয়া চলিয়া গেল এবং স্ত্রী স্বামীর যাওয়ার পর কবূল করিল, তবুও খোলা হইয়া গেল।

৩। মাসআলা ঃ স্বামী যদি শুধু এতটুকু বলে যে, "আমি তোমাকে খোলা করিলাম" এবং স্ত্রী বলে যে, "আমি কবূল করিলাম" টাকা-পয়সা সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রী কেহই উল্লেখ করে নাই, তবে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ সম্পর্কীয় দেনা-পাওনা সব মাফ হইয়া যাইবে, স্ত্রী যাহাকিছু মহর পাওনা ছিল তাহা মাফ হইয়া যাইবে এবং স্বামীও যদি পূর্ণ মহর দিয়া থাকে, তাহা ফেরত দিতে হইবে না।

কিন্তু ইদ্দতের খোরপোষ এবং (থাকিবার) ঘর স্বামীর দিতে হইবে। অবশ্য যদি স্ত্রী স্বামীকে বলিয়া থাকে যে, "আমি খোরপোষ বা ঘরও চাই না।" তবে দিতে হইবে না।

৪। মাসআলা ঃ আর যদি স্বামী টাকা-পয়সা উল্লেখ করিয়া বলে যে, আমি একশত টাকার বিনিময়ে তোমাকে খোলা করিলাম, এবং স্ত্রী তাহা কবূল করে, তবে যদি মহর নিয়া থাকে, তবে একশত টাকা দেওয়া ওয়াজেব হইবে। আর যদি মহর না নিয়া থাকে, তবুও স্ত্রী স্বামীকে তাহার একশত টাকা দিতে হইবে এবং মহরও পাইবে না। কেননা, খোলার কারণে মহর মাফ হইয়া গিয়াছে।

৫। মাসআলা ঃ খোলার ব্যাপারে অন্যায় যদি স্বামীর হয়, তবে স্বামী যে টাকা পাইবে, তাহা তাহার জন্য হারাম হইবে এবং উহা নিজের কাজে ব্যয় করাও হারাম। আর যদি স্ত্রীর অন্যায় হয়, তবে মহর পরিমাণের বিনিময়ে খোলা করিবে। মহর অপেক্ষা অধিক টাকা স্বামীর লওয়া উচিত নহে, কিন্তু যদি বেশী লয়, তবে অন্যায় হইবে, গোনাহ্ হইবে না, কিন্তু খোলা হইয়া যাইবে।

৬। মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি খোলা করিতে স্বইচ্ছায় রাজি না হয়, স্বামী মারপিট করিয়া ধম্‌কাইয়া তাহার দ্বারা খোলা করায়, তবে তালাক হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামী টাকা পাইবে না বা স্বামীর যিম্মায় মহর বাকী থাকিলে উহা মাফ পাইবে না।

৭। মাসআলা ঃ এই বিষয়গুলি ঐ সময়ের, যখন 'খোলা' শব্দ বলা হয়, কিংবা স্ত্রী এইরূপ বলে যে, শ' কিংবা হাজার টাকার বিনিময়ে আমাকে ছাড়িয়া দাও, কিংবা এরূপ বলে যে, আমার মহরের বিনিময়ে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আর যদি এভাবে না বলে বরং তালাক শব্দ উচ্চারণ করে—যথা এরূপ বলিল, একশত টাকার বিনিময়ে আমাকে তালাক দাও, তবে উহাকে, 'খোলা' বলা যাইবে না। যদি স্বামী ঐ মালের বিনিময়ে তালাক দেয়, তবে এক তালাক বায়েন পড়িবে উহাতে কোন হক মাফ হইবে না। স্বামীর উপর যে হক আছে তাহাও না এবং স্ত্রীর উপর যে হক আছে তাহাও না। স্বামী যদি মহর না দিয়া থাকে, তবে তাহা মাফ হইবে না। স্ত্রী উহা দাবী করিতে পারিবে এবং স্বামী স্ত্রী হইতে ঐ একশত টাকা নিয়া নিবে।

৮। মাসআলা ঃ স্বামী বলিল, একশত টাকার বিনিময়ে তালাক দিলাম, তবে স্ত্রীর কবূল করার উপর নির্ভর থাকিবে, স্ত্রী যদি কবূল না করে, তালাক পড়িবে না। আর যদি কবূল করে, তবে এক তালাক বায়েন পড়িবে। কিন্তু যদি স্থান পরিবর্তন করার পর কবূল করে, তবে তালাক পড়িবে না।

৯। মাসআলা ঃ স্ত্রী বলিল, আমাকে তালাক দাও, স্বামী বলিল, তুমি স্বীয় মহর ইত্যাদি নিজের যাবতীয় হক মাফ করিয়া দাও, তবে তালাক দিব, তখন স্ত্রী বলিল, আচ্ছা আমি মাফ করিলাম। ইহার পর স্বামী তালাক দিল না, তবে কিছুই মাফ হইল না, আর যদি ঐ বসাতেই তালাক দিয়া দেয়, তবে মাফ হইয়া গেল।

১০। মাসআলা ঃ স্ত্রী বলিল, তিন শত টাকার বিনিময়ে আমাকে তিন তালাক দাও, অতঃপর স্বামী শুধু এক তালাক দিল, তবে স্বামী শুধু এক শত টাকা পাইবে। আর যদি দুই তালাক দেয়, তবে দুইশত টাকা, আর যদি তিন তালাক দেয়, তবে পুরা তিনশত টাকা স্ত্রী স্বামীকে দিতে হইবে এবং সকল অবস্থাতেই তালাকে বায়েন পড়িবে। কেননা, মালের বিনিময়ে এই তালাক।

১১। মাসআলা ঃ স্বামী নাবালেগ বা পাগল হইলে খোলা করার কোন উপায় নাই, (তাহাদের ওলী তাহাদের পক্ষ হইতে খোলা করিতে পারিবে না। আর যদি স্ত্রী নাবালেগা বা পাগলী হয়

এবং তাহাদের পিতা নিজে টাকার যিম্মা হইয়া খোলা করায়, তবে তালাক হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু মহর মাফ হইবে না।

মাফ্‌কুদের মাসায়েল

১। মাসআলা ঃ যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী একেবারে নিখোঁজ ও লা-পাতা হইয়া যায়, জীবিত আছে, না মরিয়া গিয়াছে তাহার কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া না যায়, তবে সে অন্যত্র বিবাহ বসিতে পারিবে না, হয়ত স্বামী আসিতে পারে এই আশায় তাহার স্বামীর ৯০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছবর করিতে হইবে। তখন হুকুম দেওয়া হইবে যে, সে মরিয়া গিয়াছে। তারপর যদি অন্যত্র বিবাহ বসিবার স্ত্রীর বয়স এবং ইচ্ছা থাকে, তবে স্বামীর ৯০ বৎসর বয়সের পর হইতে (চার মাস দশ দিন) ইদ্দত অতীত হওয়ার পর অন্যত্র বিবাহ বসিতে পারিবে। কিন্তু শর্ত এই যে, কোন মুসলমান হাকিমের দ্বারা ঐ স্বামীর মৃত্যুর হুকুম লাগাইতে হইবে। (মুসলমান হাকিমের হুকুম ব্যতীত অন্যত্র বিবাহ জায়েয হইবে না।)

[এই যে হুকুম বর্ণনা করা হইল ইহাই আমাদের হানাফী মাযহাবের হুকুম। কিন্তু এই হুকুমে আজকাল অনেক স্ত্রীলোকের কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এমন কি কোন কোন হতভাগিনী ছবর করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা বা ঈমান বরবাদ করিয়া বসে। এই অবস্থা দর্শনে মোজাদ্দেদে হক্কানী আলেমে রব্বানী হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেব পাক-ভারতের সমস্ত আলেমের মত সংগ্রহ করিয়া মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ এবং মেছের ও মগরেব হইতে ইমাম মালেক ছাহেবের মাযহাব অনুযায়ী ফৎওয়া সংগ্রহ করিয়া 'আল্‌হীলাতোন্নাজেযাহ,' নামক একখানা কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। সেই কিতাবে এইরূপ হতভাগিনীদের যেমন, (১) যাহার স্বামী লা-পাতা হইয়া গিয়াছে, (২) যাহার স্বামী নপুংসক অথচ স্ব-ইচ্ছায় তালাক দেয় না, (৩) যাহার স্বামী স্ত্রীকে ছাড়েও না আনেও না, (৪) যে পিতৃহীনাকে তাহার চাচা বা ভাই নাবালেগা অবস্থায় বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু মেয়ে বালেগা হইয়া স্বামীকে কবূল করে না, তবুও স্বামী তাহাকে ছাড়ে না, (৫) যাহার স্বামী নিখোঁজ নয় বটে কিন্তু চির পরবাসে বা চির কারাবাসে থাকে, স্ত্রীর কোন খবরগীরি করে না বা করিতে পারে না। তাহার জান ও ঈমান বাঁচাইবার ব্যবস্থা কি এবং তাহার জন্য কি কি শর্ত পালন করিতে হইবে, তাহা সব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তথায় দেখিয়া লওয়া দরকার। এখানে আমি সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম বর্ণনা করিতেছি—এইরূপ হতভাগিনীদের জান ছুটাইবার দুইটি উপায় আছে। একটি এই যে, বিবাহের সময় কাবিননামায় স্বামীর নিকট হইতে শর্ত লাগাইয়া মেয়ের জন্য বা মেয়ের বাপ-ভাই মুরব্বীদের জন্য তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্থাৎ "তফ্‌বীযে তালাক" লইয়া রাখিবে।

তফ্‌বীযে তালাকের কাবিন লিখিতে অনেকে এমন ভুল করিয়া বসে যে, আসল মক্‌ছুদ হাছেল হয় না। এই জন্য আমরা এখানে একটি কাবিননামার নমুনা লিখিয়া দিতেছি।]

—অনুবাদক

তফ্‌বীযে তালাকের শর্ত যুক্ত কাবিননামা

কস্য কাবিননামা পত্র মিদং কার্যাঞ্চাগে—

আমি অমুক, পিং অমুক, পেশা অমুক, সাং অমুক, থানা অমুক, জিং অমুক। আমার বিবাহ মোসাম্মাৎ অমুক, পিং অমুক, পেশা অমুক, সাং অমুক, জিং অমুক এর সহিত নিম্নলিখিত শর্তসমূহের উপর এত টাকা দেন-মহরের পরিবর্তে ধার্য হইয়াছে। নগদ এত, বাকী এত।

অতএব, আমি স্বজ্ঞানে সুস্থ শরীরে স্বইচ্ছায়, অত্র কাবিননামা ও অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতেছি, যাহাতে আমি শর্তসমূহ স্মরণ রাখি এবং পালন করি এবং খোদা-নাখাস্তা যদি আমি শর্তসমূহ পালন না করি, তবে যেন বিবি মজকুরা সহজেই নিজ জান ছুটাইয়া লইতে পারে। অতএব, আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, যতদিন বিবি মজকুরা আমার বিবাহে থাকিবে ততদিন নিম্নলিখিত সমস্ত শর্ত আমি রীতিমত পালন করিব। উভয় পক্ষের এতমিনান করিবার নিমিত্ত লিখিয়া দিতেছি যে, যদি আমি বিবি মজকুরাকে বিবাহ করি, (১) এবং বিবাহের পর নিম্নলিখিত শর্তসমূহ হইতে একটি শর্তও বিবি মজকুরা (অথবা তাহার অমুক গার্জিয়ান) খেলাফ পায়, তবে বিবি মজকুরাকে (অথবা তাহার অমুক মুরব্বিকে) আমি ক্ষমতা অর্পণ করিতেছি যে, শর্ত খেলাফ হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ অথবা তারপর অত্র বিবাহের মধ্যে যে কোন সময় সে (বা তাহার অমুক মুরব্বি) এক তালাক বায়েন, (২) তাহার নফ্‌সকে দিয়া আমার বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করুক।

শর্তসমূহ এই—

অত্র কাবিননামা আমি দেখিয়া বা পড়াইয়া শুনিয়া দস্তখত বা আঙ্গুলের টিপ দিতেছি,

তাং মাস সন বাং ইং হিং

খাকছার সাক্ষী সাক্ষী

সাধারণতঃ আমাদের দেশে ঈজাব-কবূলের পূর্বেই কাবিননামা লেখা হয়, কাজেই কাবিননামায় যদি "আমি বিবি মজকুরাকে বিবাহ করি", কথাটি উল্লেখ থাকা দরকার; নতুবা শর্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কাবিননামায় সাধারণতঃ তিন তালাক বায়েন যেন না হয়, ইহা অত্যন্ত গর্হিত কাজ; কারণ শরীঅত অনুযায়ীও গোনাহ্‌গার হইতে হয়, তাছাড়া দুনিয়াতেও পরে অনেক মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই জন্য আমরা নমুনায় এক তালাক বায়েন লিখিয়াছি। সাধারণতঃ কাবিনে শুধু "আমি" শব্দ লেখা হয়, কিন্তু তাহাতে শুধু সেই মজলিসে থাকাকালে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকে পরে থাকে না অথবা একেবারে ব্যাপকভাবে 'যে কোন সময়' লেখা হয় তাহাতে অত্র বিবাহের পরেও তিন তালাক না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতা থাকে; কাজেই আমরা "যদি"ও লিখিয়াছি "যে কোন সময়"ও লিখিয়াছি অতঃপর "অত্র বিবাহের মধ্যে"ও লিখিয়াছি।

দ্বিতীয় উপায় এই যে, মুসলমান হাকিমের নিকট বিচারপ্রার্থী হইতে হইবে। কারণ বিবাহ বন্ধন এতই শক্ত বন্ধন যে, তাহা ছিন্ন করার মাত্র তিনটিই উপায়; এতদ্ব্যতীত চতুর্থ উপায় নাই! যথা—(১) মৃত্যু, (২) সাবালেগ স্বামীর তালাক, (৩) মুসলমান হাকিমের হুকুম। হাকিমের জন্য

আবার মুসলমান হওয়ার শর্ত এবং মুসলমান হাকিমের জন্য আবার শরীঅতের মোয়াফেক মকদ্দমার শুনানি এবং হুকুম জারী শর্ত। নতুবা যদি কোন অমুসলমান হাকিম মকদ্দমার শুনানি লইয়া ফয়সালা লিখিয়া যায়, পরে কোন মুসলমান হাকিম হুকুম জারী করে অথবা মুলমান হাকিমও শরীঅতের নিয়ম পালন না করিয়া বিচার করে, তবে বিবাহ ফছ্‌খ্ হইবে না।

কিন্তু বিধর্মী রাজত্বের দেশে শর্ত অনুযায়ী মুসলমান হাকিম পাওয়া বড় দুষ্কর। কেননা, গভর্ণমেন্টের আইনে আমাদের এই বিপদ দূর করিবার জন্য খাছ কোন মুসলমান হাকিম নাই; অথচ আমাদের ধর্মের বিধান অনুসারে মুসলমান হাকিম ব্যতিরেকে আমাদের এই বিপদ উদ্ধার হইতে পারেনা। বিশেষতঃ মকদ্দমার শুনানি এবং হুকুম জারী উভয় মুসলমান হাকিমের হাতে হওয়ার শর্ত থাকায়। কারণ, হয়ত হাকিম বদল হইয়া গেলে অমুসলমান হাকিমের হাতে মকদ্দমা পড়িলে সব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কাজেই হয়ত কোন মুসলমান স্বাধীন বা করদ মিত্র রাজ্যে গিয়া হুকুম আনিতে হইবে, না হয় "আদেল জমা'আতে মুসলেমীন"-এর উপর বিচার-ভার ন্যস্ত করিতে হইবে।

আদেল জমা'আতে মুসলেমীনের জন্যও ৪টি শর্ত আছেঃ প্রথম শর্ত—কম পক্ষে তিন জন লোকের জমা'আত হইতে হইবে। দ্বিতীয় শর্ত—জমা'আতের প্রত্যেক মেম্বারকেই আদেল হইতে হইবে অর্থাৎ এরূপ হওয়াই চাই যে, কেহই গোনাহে কবীরা ত আদৌ করেই নাই, ছগীরা গোনাহ্ও পর পর বিনা তওবায় তিনবার করে নাই। যদি কোন সময় ভুল-ত্রুটিবশতঃ গোনাহ হইয়া যায়, তবে অবিলম্বে তওবা করিয়া লয়। অতএব, সুদখোর, ঘুসখোর, মিথ্যাবাদী, বে-নামাযী, অত্যাচারী, শরাবী, জুয়ারী, দাড়ীমুণ্ডনকারী, পর্দা ছেদনকারী প্রভৃতি লোক জমা'আতের মধ্যে মোটেই থাকা উচিত নহে; নতুবা ছহীহ্ হইবে না; তৃতীয় শর্ত—বিচার পদ্ধতি শতীঅতের নিয়ম অনুসারে হওয়া চাই; কাজেই জমা'আতের সব মেম্বার জ্ঞানী আলেম হওয়া চাই, অন্তত এক জন জ্ঞানী আলেম ত হওয়া চাই-ই। জ্ঞানীর অর্থ হইল—তিনি যেমন শরীঅতের মাসআলা মাসায়েল ওয়াকেফ থাকিবেন, বৈষয়িক বিচার-পদ্ধতির জ্ঞানেও তেমন পরিপক্ক থাকিবেন। চতুর্থ শর্ত—জমা'আতের সদস্যদের মধ্যে বিচারে কাহারও আদৌ মতভেদ না থাকা চাই, হুকুমের বেলায় সকলকে একমত হইতে হইবে, যদি একজনেরও সামান্য মতভেদ থাকে, তবে হুকুম ছহীহ্ হইবে না। পঞ্চম শর্ত—বিচার পদ্ধতি, তাহ্কীক্কাত, সাক্ষী, জবানবন্দী, হুকুম জারী সবই শরীঅতের বিধান মতে হওয়া চাই। এই পাঁচ শর্তের একটি শর্তেরও বিন্দুমাত্র খেলাফ হইলে বিবাহ বন্ধন ছেদন হইবে না, অন্যত্র বিবাহও দুরুস্ত হইবে না। নপুংসকের জন্য কি শর্ত, পাগলের জন্য কি শর্ত, মাফ্কুদের মৃত্যুর হুকুমের জন্য চার বৎসর কোন্ তারিখ হইতে ধরিতে হইবে, ইদ্দত কোন তারিখ হইতে হিসাব হইবে, উপস্থিত অত্যাচারী স্বামী বা অনুপস্থিত অত্যাচারী স্বামীর সহিত কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে এবং খেয়ারেবলুগের জন্য কি কি শর্ত, মকদ্দমা দায়ের করার জন্য কত দিন সময়—তাহা সব উক্ত কিতাবে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বড় আলেম ব্যতীত এই সব মাসআলা মীমাংসার ক্ষমতা সাধারণ আলেমের নাই। বড় আলেমেরও উক্ত কিতাব দেখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া হুকুম জারী করা চাই। —অনুবাদক

ইদ্দতের মাসায়েল

১। মাসআলা ঃ স্বামীর মৃত্যু বা তালাক ইত্যাদি কারণে স্ত্রীর যে কিছু মুদ্দতের (কালের) জন্য এক বাড়ীতে থাকিতে হয়, অন্যত্র যাইতে পারে না বা অন্য কোথাও বিবাহ বসিতে পারে না, ইহাকে ইদ্দত বলে। ইদ্দত পুরা হওয়ার পূর্বে অন্যত্র যাওয়া ও বিবাহ বসা হারাম। ইদ্দত পুরা হইলে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে।

২। মাসআলা ঃ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে, রজয়ী তালাক হউক অথবা বায়েন তালাক হউক, এক তালাক হউক অথবা তিন তালাক হউক, স্ত্রীর পূর্ণ তিনটি হায়েয অতীত না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর বাড়ীতেই নির্জন বাসস্থানে থাকিতে হইবে, (রাত্র বা দিনে তথা হইতে অন্য কোথাও যাইতে পারিবে না এবং অন্য কোথাও বিবাহও বসিতে পারিবে না। [তালাকের তারিখের] পর যতদিন পর্যন্ত তিনটি হায়েয পূর্ণরূপে অতীত না হইবে, তত-দিন পর্যন্ত অন্যত্র বিবাহ বসা হারাম ;) অবশ্য যখন পূর্ণ তিনটি হায়েয অতীত হইয়া যাইবে তখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিবে (এবং ইচ্ছামত বিবাহ বসিতে পারিবে।)

৩। মাসআলা ঃ যদি এমন স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয় যে, তাহার বয়স কম হওয়ার কারণে বা বৃদ্ধা হওয়ার কারণে হায়েয আসে না, তবে তাহার তিন হায়েযের পরিবর্তে পূর্ণ তিন মাস ইদ্দত পালন করিতে হইবে। তালাকের তারিখ হইতে তিন মাস পর্যন্ত অন্য কোথাও যাইতে বা বিবাহ বসিতে পারিবে না। পূর্ণ তিন মাস অতীত হওয়ার পর অন্যত্র যাইতেও পারিবে এবং বিবাহও বসিতে পারিবে।

৪। মাসআলা ঃ অল্প বয়স্কা স্ত্রীর তালাক হওয়াতে হায়েয না আসার কারণে মাসের হিসাবে ইদ্দত পালন শুরু করিয়াছিল এক মাস বা দুই মাস অতীত হওয়ার পর হায়েয আসিল, এইরূপ অবস্থায় হায়েযের হিসাবই ধরিতে হইবে। অর্থাৎ, তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি হায়েয শুরু হয়, তবে আর সামনে হিসাব ধরা যাইবে না, পূর্ণ তিনটি হায়েয অতীত না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

৫। মাসআলা ঃ গর্ভাবস্থায় তালাক হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে। যখন সন্তান প্রসব হইবে, তখনই ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। যদি তালাকের কয়েকদিন পরেও সন্তান প্রসব হয়, তবুও সন্তান প্রসব হওয়া মাত্রই ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। (তিন মাস বা তিন হায়েয পুরা করিতে হইবে না।)

৬। মাসআলা ঃ যদি কেহ হায়েযের হালতে তালাক দেয়, তবে ঐ হায়েযকে ইদ্দতের মধ্যে ধরা যাইবে না, উহার পর পূর্ণ তিনটি হায়েয ইদ্দত পালন করিতে হইবে। হায়েযের হালাতে তালাক দেওয়া হারাম।

৭। মাসআলা ঃ যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস বা নির্জনবাস হইয়াছে, নির্জনবাসের কারণে পূর্ণ মহর ওয়াজেব হউক কিংবা না হউক, এধরনের স্ত্রীর উপর তালাকের পর ইদ্দত পালন করা ওয়াজেব। আর যদি কোন প্রকারের নির্জনবাস না হইয়া থাকে, তবে এমন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পালন ওয়াজেব নহে।

৮। মাসআলাঃ কেহ পর স্ত্রীকে নিজ স্ত্রী মনে করিয়া ধোঁকায় পড়িয়া সহবাস করিল। অতঃপর জানা গেল যে, উক্ত রমণী তাহার স্ত্রী ছিল না, তখন ঐ রমণীরও ইদ্দত কাটাইতে হইবে। যতদিন ইদ্দত শেষ না হইবে ততদিন নিজ স্বামীকেও সহবাস করিতে দিবে না। যদি সহবাস করে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পাপী হইবে। উপরোল্লিখিত ইদ্দতই এরূপ সহবাসের ইদ্দত। যদি ঐ দিন গর্ভবতী হইয়া থাকে, তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ছবর করিবে এবং ইদ্দত কাটাইবে। এই সন্তান হারামী হইবে না, ইহার বংশ ঠিক আছে, যে ব্যক্তি ধোঁকায় পড়িয়া সহবাস করিয়াছে তাহারই সন্তান ধর্তব্য হইবে।

৯। মাসআলাঃ শরীঅতের খেলাফ বিবাহ্ হইয়া যদি সহবাস হইয়া যায়, যেমন যদি স্বামীর মৃত্যুর বা তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হইবার পূর্বে বিবাহ্ করে অথবা স্বামী জীবিত থাকিতে তালাক দেওয়ার পূর্বে বিবাহ্ করে (অথবা বিনা সাক্ষীতে বিবাহ্ করে) অথবা দুধ-ভগ্নী ইত্যাদিকে বিবাহ করে, তবে যখন হইতে ঐ ব্যক্তি তওবা করিয়া ঐ স্ত্রীলোকটিকে পরিত্যাগ করিবে, তখন হইতে ইদ্দত গণনা শুরু করিতে হইবে। অবশ্য এইরূপ বে-কায়দা বিবাহে যদি সহবাস না হয়, তবে ইদ্দত পালন করিতে হইবে না (বা ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ্ হইয়া থাকিলে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর যদি সেই ব্যক্তির সহিতই বিবাহ্ সাব্যস্ত হয়, তবেও পুনরায় ইদ্দত পালন করিতে হইবে না।)

১০। মাসআলাঃ ইদ্দত কালের ভরণ-পোষণ এবং অন্য সবই তালাকদাতার যিম্মায়। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা পরে আসিতেছে।

১১, ১২। মাসআলাঃ তালাকে বায়েন দেওয়ার পর পূর্ব স্বামী হইতে সতর্কতার সহিত পূর্ণ মাত্রায় পর্দা করা স্ত্রীর কর্তব্য। তা সত্ত্বেও যদি ভুলক্রমে ইদ্দতের মধ্যে সহবাস হইয়া পড়ে, তবে ঐ সহবাসের পর হইতে পুনরায় ইদ্দত গণনা করিবে। অর্থাৎ ঐ সহবাসের পর হইতে পূর্ণ তিনটি হায়েয অতীত হইলে পর ইদ্দত খতম হইবে।

মওতের ইদ্দত

১। মাসআলাঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গিয়াছে তাহার চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করা ফরয। স্বামীর মৃত্যুর কালে স্ত্রী যে বাড়ীতে ছিল সেই বাড়ীতেই থাকিবে, তাহা হইতে বাহিরে যাওয়া দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি স্ত্রীলোক খুব গরীব হয় এবং বাহিরে কাজকর্ম ব্যতিরেকে খাওয়া-পরার অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে দিনের বেলায় কাজের জন্য বাহিরে যাইতে পারিবে বটে, কিন্তু রাত্রির বেলায় সেই বাড়ীতেই থাকিতে হইবে। বৃদ্ধা হউক বা যুবতী হউক, না-বালেগা হউক বা বালেগা হউক সকলের জন্যই চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালনের হুকুম। অবশ্য যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তবে চার মাস দশ দিন হিসাব ধরা হইবে না, ধরা হইবে সন্তান প্রসব; এমনকি স্বামীর মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পরে যদি সন্তান প্রসব হয়, তবে সন্তান হওয়া মাত্র ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে।

২। মাসআলাঃ বাড়ীর মধ্যে যদি কয়েকটি ঘর বা ঘরের মধ্যে কয়েকটি কামরা থাকে, তবে যে-কোন ঘরে বা যে-কোন কামরায় থাকিতে পারিবে (এবং উঠানের মধ্যেও বাহির হইতে পারিবে। অবশ্য যদি বাড়ীর অন্য ঘরগুলি বা ঘরের মধ্যের অন্য কামরাগুলি অন্যের হয়, তবে তথায় যাইবে না।) কোন কোন স্থানে প্রথা আছে যে, স্ত্রীলোকেরা শোকের জন্য একটি খাছ জায়গা ঠিক করিয়া লয়, সেই জায়গা ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় না। ইহার কোন দলীল নাই।

৩। **মাসআলা ঃ** না-বালেগ স্বামীর মৃত্যুকালে যদি স্ত্রী গর্ভবতী থাকে, তবে গর্ভ খালাস পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে। কিন্তু সন্তান হারামী হইবে স্বামীর হইবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু চাঁদের ১ম তারিখ হইবে, সে (যদি গর্ভবতী না হয়, তবে) চাঁদের হিসাবে চার মাস দশ দিন পূর্ণ করিবে। (চাঁদ ২৯ দিনের হউক বা ৩০ দিনের হউক, চারিটি চাঁদ শেষ হইয়া পঞ্চম চাঁদের ১০ দিন অতীত হইলেই তাহার ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যাইবে। আর যদি স্বামীর মৃত্যু চাঁদের ১ম তারিখে না হয়, তবে ৩০ দিনের চারিটি মাস ধরিতে হইবে এবং তারপর দশ দিন ধরিতে হইবে। (মোট ১৩০ দিন অতীত হইলে ইদ্দত পূর্ণ হইবে। ইহা ত হইল মওতের ইদ্দতের হুকুম।) তালাকের ইদ্দতের হুকুমও ঠিক এইরূপ। অর্থাৎ, ঋতুবতী বা গর্ভবতী মেয়েলোক না হইলে তাহার মাস হিসাবে ইদ্দত পালন করিতে হইবে। অতএব, যদি চাঁদের ১ম তারিখে তালাক দেয়, তবে তিনটি চাঁদ অতীত হইয়া গেলেই ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যাইবে। চাঁদ ২৯ দিনের হউক বা ৩০ দিনের হউক। (চাঁদের বেশী-কমের কারণে ২/১ দিন বেশী কম হইলে তাহা হিসাবে ধরা যাইবে না) আর যদি চাঁদের ১ম তারিখে ছাড়া তালাক হয়, তবে ৩০ দিনের হিসাবে মাস ধরিয়া পূর্ণ ৯০ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে। [প্রকাশ থাকে যে, আমাদের ইসলামী শরীঅতে সবক্ষেত্রেই চান্দ্র মাসের এবং চান্দ্র বৎসরের হিসাব ধরা হয়। চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ দিনে হয়। সৌরবৎসর ৩৬৫ দিনে হয়, কাজেই চান্দ্র বৎসরের চেয়ে সৌরবৎসর ১১ দিন বেশী।

৫। **মাসআলা ঃ** শরার বরখেলাফ কাহারও বিবাহ হইল, যেমন, সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হইয়াছিল বা ভগ্নীপতির বিবাহ বন্ধনে ভগ্নী থাকা সত্বেও ভগ্নীপতির সহিত বিবাহ হইয়াছিল (বা অন্য স্বামীর ইদ্দতের ভিতর বিবাহ হইয়াছিল), তারপর এই শরার বরখেলাফকারীর মৃত্যু হইয়া গেল। এইরূপ অবস্থা হইলে ঐ স্ত্রীলোকটির তখন চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে না; (কারণ সে ত তাহার স্বামীই নয়। অবশ্য অন্যায়রূপে সে এই স্ত্রীলোকটির উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া পবিত্র হওয়ার জন্য) তাহার তিন হায়েয বা হায়েয না আসিলে তিন মাস আর গর্ভবতী হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** মৃত্যু-শয্যায় যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বায়েন তালকা দেয় এবং তালাকের ইদ্দত শেষ না হইতেই স্বামীর মৃত্যু হইয়া যায়, তবে ঐ স্ত্রীর তালাকের ইদ্দত এবং মৃত্যুর ইদ্দত এই দুইটির যেইটি পরে শেষ হইবে সেই পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে আর যদি রজয়ী তালাক দিয়া ইদ্দতের মধ্যেই স্বামী মারা যায়, তবে অবশ্যই মৃত্যুর ইদ্দত পালন করিতে হইবে। (আর যদি উভয় ক্ষেত্রে তালাকের ইদ্দতের পর মৃত্যু হয়, তবে আর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করিতে হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** (বিদেশে) স্বামী মারা গিয়াছে, স্ত্রী খবরও পায় নাই, খবর হয়ত মৃত্যুর চার মাস দশ দিন পর (বা স্ত্রী গর্ভবতী হইলে প্রসবের পর) পাইয়াছে। এমতাবস্থায় খবর পাওয়ার পর আর ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। বে-খবরীর অবস্থায়ই ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। স্বামী তালাক দিয়াছে কিন্তু স্ত্রী জানিল না বা অনেক দিন পর খবর পাইল ইদ্দতের মুদ্দত খবর পাওয়ার পূর্বেই শেষ হইয়াছে তবে তাহার ইদ্দত পুরা হইয়া গেল, এখন ইদ্দত পালন করা ওয়াজেব নহে।

৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রী হয়ত বাহিরে কোথাও গিয়াছিল, ইত্যবসরেই স্বামী মারা গিয়াছে এই অবস্থায় সংবাদ পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর নিজালয়ে চলিয়া আসিয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকিবে।

৯। **মাসআলা ঃ** (তালাকের ইদ্দতের খোরাক-পোশাক স্বামীর যিম্মায়; কিন্তু) মৃত্যুর ইদ্দতের খোরাক-পোশাক স্বামীর যিম্মায় নয়, নিজ হইতে খরচ করিবে।

১০। **মাসআলা ঃ** কোন কোন স্থানে প্রথা আছে, স্বামীর মৃত্যুর পর বৎসরকাল ইদ্দত পালনের ন্যায় বসিয়া থাকে। ইহা একেবারে হারাম।

শোক প্রকাশের বিধান

১। **মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীলোককে রজয়ী তালাক দেওয়া হইয়াছে, তাহার ইদ্দত এই যে, তিনটি হায়েয অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত সে স্বামীর বাড়ী হইতে অন্যত্র যাইতে পারিবে না এবং অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহার জন্য সীতা পাটি এবং সুরমা, খোশ্বু ব্যবহার সবই জায়েয আছে। আর যে স্ত্রীলোকের এক তালাক-বায়েন বা তিন তালাক হইয়াছে, অথবা অন্য কোন প্রকারে বিবাহ টুটিয়া গিয়াছে, অথবা স্বামী মরিয়া গিয়াছে, তাহার হুকুম এই যে, সে ইদ্দতের মুদ্দতের মধ্যে স্বামীর বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্রও যাইবে না, অন্য স্বামীও গ্রহণ করিবে না, সীতা-পাটি এবং সুগন্ধি তৈলও ব্যবহার করিবে না। এই কাজ তাহার জন্য হারাম। এইসব অবস্থায় বিনা পরিপাটিতে মলিন বেশে আবদ্ধ থাকাকেই শোক করা বলে।

২। **মাসআলা ঃ** যতদিন ইদ্দত শেষ না হয়, ততদিন পর্যন্ত সুগন্ধি তৈল বা আতর ব্যবহার করা, কাপড়ে সুগন্ধি লাগান, অলঙ্কার পরিধান করা, নাকফুল পরিধান করা, সুরমা লাগান, পান খাইয়া মুখ লাল করা, পাউডার লাগান, মাথায় ও শরীরে তৈল লাগান, চিরুণী দ্বারা চুল আঁচড়ান, মেহেদী লাগান, সুন্দর কাপড় পরা, রেশমী বা চটকদার রঙ্গীন কাপড় পড়া হারাম। অবশ্য যে-রঙ্গের মধ্যে চমক নাই সে রং জায়েয আছে। মোটকথা, ইদ্দতের শোকের মধ্যে সাজসজ্জা জায়েয নহে।

৩। **মাসআলা ঃ** মাথায় ব্যথা হওয়ার কারণে যদি তৈল লাগান দরকার হয়, তবে খোশ্বু ছাড়া তৈল ব্যবহার করা দুরুস্ত আছে। এইরূপ দরকারবশতঃ সুরমাকে ঔষধরূপে ব্যবহার করা জায়েয আছে বটে, কিন্তু রাত্রিতে লাগাইয়া আবার দিনে মুছিয়া ফেলিবে। আর মাথা ধোয়া ও গোসল করা দুরুস্ত আছে। একান্ত দরকার হইলে মাথা আঁচড়াইতেও পারে, কিন্তু পরিপাটি করিয়া খোপা বাধিবে না বা চিকন চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া চুলকে এমন পালিশ করিবে না যাহাতে বেশী সুন্দর দেখায়।

৪। **মাসআলা ঃ** শোক প্রকাশ করা বালেগা স্ত্রীলোকের উপর ওয়াজেব, না-বালেগাদের জন্য উহা ওয়াজেব নহে। উপরে বর্ণিত নিষিদ্ধ কাজগুলি তাহারা করিতে পারে। তবে দ্বিতীয় বিবাহ করা এবং বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাওয়া ইহাদের জন্যও দুরুস্ত নহে।

৫। **মাসআলা ঃ** যাহার বিবাহ শরীঅত মতে শুদ্ধ হয় নাই, শরীঅতের বরখেলাফ হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে কিংবা এই পুরুষ মরিয়া গিয়াছে, তবে এমন স্ত্রীর শোক প্রকাশ ওয়াজেব নহে।

৬। **মাসআলা ঃ** স্বামী ছাড়া অন্য কেহ মরিলে শোক প্রকাশ করা দুরুস্ত নহে। স্বামী নিষেধ না করিলে আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে তিন দিন পর্যন্ত সাজসজ্জা না করা দুরুস্ত আছে, তিন দিনের বেশী করা হারাম। স্বামী নিষেধ করিলে তিন দিনও করা যাইবে না।

খোর-পোশের বয়ান

১। **মাসআলাঃ** স্ত্রীর খোরাক-পোশাক দেওয়া পুরুষের উপরে ওয়াজেব। স্ত্রীর টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি যতই থাকুক না কেন, তাহার খরচ-পত্রের জন্য পুরুষ দায়ী। বাস করিবার ঘরের জন্যও পুরুষ দায়ী।

২। **মাসআলাঃ** বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীকে বাড়ীতে নেওয়া হয় নাই, তবুও স্ত্রী খোর-পোশের জন্য দাবী করিতে পারে। কিন্তু পুরুষ যদি বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রী যায় নাই, তবে স্ত্রী খোর-পোশের দাবী করিতে পারে না।

৩। **মাসআলাঃ** স্ত্রী এত ছোট যে, সঙ্গম করিবার উপযুক্ত হয় নাই, এই অবস্থায় পুরুষ যদি নিজের কাজ-কর্মের জন্য বা মনকে খুশী করার জন্য তাহাকে নিজের বাড়ীতে নিয়া রাখে, তবে পুরুষের উপর তাহার খোরাক-পোশাক ওয়াজেব হইবে। আর যদি না রাখে, বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়, তবে ওয়াজেব হইবে না। আর যদি স্বামী না-বালেগ হয় এবং স্ত্রী বড় হয়, তবে খোরাক-পোশাক পাইবে। —উঃ বেঃ ৬১ পৃঃ

৪। **মাসআলাঃ** যে পরিমাণ মহর প্রথমতঃ দেওয়ার প্রথা আছে, উহা সম্পূর্ণ না দেওয়ায় স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে যায় না, এই রকম অবস্থায় স্ত্রী খোরাক-পোশাক পাইবে। আর যদি বিনা কারণে স্বামীর বাড়ীতে না যায়, তবে খোরাক-পোশাক পাইবে না। যখন হইতে স্বামীর বাড়ীতে যাইবে, তখন হইতে দেওয়া হইবে।

৫। **মাসআলাঃ** স্বামী হইতে যত দিনের অনুমতি লইয়া মা-বাপের বাড়ীতে থাকিবে, স্বামীর নিকট হইতে ততদিনের খোরাক-পোশাক লইতে পারে।

৬। **মাসআলাঃ** স্ত্রীর অসুখ হইলে সেই অবস্থায় স্বামীর বাড়ীতে থাকুক বা অন্য কোন আত্মীয়ের বাড়ীতেই থাকুক, অসুখের সময়ের খোরাক-পোশাক সে পাইবে। আর অসুখ অবস্থায় যদি স্বামী তাহাকে বাড়ীতে নিতে চায় আর সে না যায়, তবে পাইবে না। অসুখ অবস্থায় শুধু খোরাক-পোশাক পাইবে বটে, চিকিৎসার খরচ সে নিজে দিবে। আর যদি পুরুষ দেয়, তবে উহা তাহার অনুগ্রহ।

৭। **মাসআলাঃ** স্ত্রী হজ্জ করিতে গেলে এই সময়ের খোরাক-পোশাকের জন্য স্বামী দায়ী নহে। যদি স্বামী সঙ্গে থাকে, তবে স্বামীই উহা বহন করিবে। কিন্তু খোরাকী বাবদ বাড়ীতে যে পরিমাণ পাইত ঐ পরিমাণই পাইবে। অতিরিক্ত লাগিলে উহা নিজে খরচ করিবে। যানবাহনের ভাড়াও নিজে বহন করিবে।

৮। **মাসআলাঃ** খোরাক-পোশাকের বেলায় উভয়ের অবস্থার দিকে খেয়াল রাখিতে হইবে। যদি উভয়েই ধনী হয়, তবে আমীরের মত খোরাক-পোশাক পাইবে, যদি উভয়ে গরীব হয়, তবে গরীবের ন্যায় পাইবে। আর যদি স্বামী গরীব স্ত্রী ধনী বা স্বামী ধনী, স্ত্রী গরীব হয়, তবে মাঝামাঝি রকমের খোরাক-পোশাক পাইবে।

৯। **মাসআলাঃ** স্ত্রীর যদি এমন কোন অসুখ থাকে যে, ঘর সংসারের কাজ করিতে পারে না অথবা বড় ঘরের মেয়ে হয়, তাই সে নিজে ধোয়া, ঘসা-মাজা রান্না ইত্যাদি কাজ নিজ হাতে

করিতে পারে না বা ঐ সব করাকে দূষণীয় মনে করে, তবে তাহাকে রান্না-বান্না করাইয়া খাওয়াইতে হইবে। অন্যথায় বাড়ীর কাজ-কর্ম স্ত্রীর নিজ হাতে করা ওয়াজেব। স্বামী লাকড়ী, আনাজ, বরতন ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিবে, স্ত্রী নিজে পাক করিয়া খাইবে।

১০। মাসআলা ঃ তৈল, চিরুণী, সাবান, ওযূ-গোসলের পানি, ধোওয়া মাজার পানি ইত্যাদি ব্যবস্থা করা পুরুষের উপর ওয়াজেব। কিন্তু পান, তামাক, সুরমা মিশী ইত্যাদি পুরুষের উপর ওয়াজেব নহে। ধোপা খরচও পুরুষে দিবে না, যদি সে দেয় এটা তাহার অনুগ্রহ।

১১। মাসআলা ঃ ধাত্রী ও প্রসব করাইবার খরচ, যে ধাত্রীকে ডাকিয়া আনে সেই দিবে। যদি স্বামী ডাকিয়া আনিয়া থাকে, তবে স্বামী, আর যদি স্ত্রী ডাকিয়া আনে তবে স্ত্রীই দিবে। আর যদি বিনা ডাকে আসিয়া থাকে, তবে পুরুষই ঐ খরচ-বহন করিবে।

স্ত্রীর জন্য ঘর

১। মাসআলা ঃ স্ত্রীকে পৃথক একখানা ঘর দেওয়াও স্বামীর যিম্মায় ওয়াজেব অর্থাৎ এমন একখানা ঘর বা কামরা দেওয়া চাই যে, তথায় স্বামীর মা-বাপ, ভাই, বোন, ভগ্নে, ভাতিজা কেহ যেন না থাকে। স্বামী-স্ত্রী যেন পূর্ণ স্বাধীনভাবে তথায় আচার-ব্যবহার উঠা-বসা করিতে পারে। অবশ্য যদি স্ত্রী স্ব-ইচ্ছায় এই হক মাফ করিয়া দিয়া শরীকী ঘরে থাকিতে চায়, তবে স্বামীর গোনাহ্ হইবে না।

২। মাসআলা ঃ স্ত্রী স্বাধীনভাবে তাহার মাল-আসবাব কাপড়-চোপড় রাখিতে এবং বন্ধ করিতে ও খুলিতে পারে, অন্য কেহ তাহাতে কোনরূপ বাধা দিতে না পারে এই পরিমাণ কামরা ঘরই যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশীর দাবী করার হক স্ত্রীর নাই ।

৩। মাসআলা ঃ স্ত্রীর যেমন হক আছে যে, সে স্বামীর নিকট হইতে এমন ঘর দাবী করিয়া নিবে যথায় স্বামীর কোন আত্মীয়-স্বজন থাকিতে বা আসিতে না পারে, তদ্রূপ স্বামীরও হক আছে যে, সে যে ঘর স্ত্রীকে দিয়াছে তথায় স্ত্রীর কোন আত্মীয়কে এমনকি তাহার মা-বাপকেও ঢুকতে বা থাকিতে না দেয়।

৪। মাসআলা ঃ স্ত্রী তাহার মা-বাপকে দেখার জন্য সপ্তাহে একবার যাইবার হক আছে তাছাড়া অন্যান্য মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদারদের (যেমন, আপন চাচা,আপন মামু, আপন ভাই ইত্যাদিকে) দেখার জন্য বৎসরে একবার যাইবার হক আছে, এর বেশী নয়। এইরূপ মা-বাপও সপ্তাহে একবার এবং অন্যান্য মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদার বৎসরে একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারে তাহাতে বাধা দিবার অধিকার স্বামীর নাই। ইহা অপেক্ষা বেশী আসিতে নিষেধ করার ক্ষমতা স্বামীর আছে।

৫। মাসআলা ঃ বাপের যদি রোগ হয় এবং তাহার খেদমত করার জন্য কেহ না থাকে, তবে আবশ্যক মত দৈনিক বাপের খেদমতে যাইতে পারিবে, স্বামী তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। বাপ যদি বে-দ্বীন কাফেরও হয় তাহারও হক আছে। স্বামী যদি নিষেধ করে, তবুও যাওয়া চাই; কিন্তু স্বামীর আদেশ ছাড়া গেলে খোরপোশ পাইবে না।

৬। মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকের জন্য গায়ের মাহ্‌রামদের বাড়ীতে যাওয়া আদৌ উচিত নহে। বিবাহ-শাদীর সময় যদি স্বামী এজাযতও দেয়, তবুও যাওয়া দুরুস্ত নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে স্বামী যদি এজাযত দেয়, তবে স্বামীও গোনহ্‌গার হইবে। এমনকি, বিবাহ-শাদীর মাহ্‌ফেলের সময় মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদারের বাড়ীতে যাওয়াও দুরুস্ত নহে।

৭। মাসআলাঃ যে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হইয়াছে সেও ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর নিকট ভাত কাপড় এবং ঘর পাওয়ার হক্‌দার; অবশ্য মউতের ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর নিকট ভাত কাপড় বা ঘর পাওয়ার হক্‌দার নহে; কিন্তু জওয়িয়তের অংশ তাহার স্বামীর প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই আছে। (এমন কি ঘর-দুয়ার বিছানা-পত্র থাল, বাসনের মধ্যেও আছে।)

৮। মাসআলাঃ স্ত্রীর গোনাহ্‌র কাজ করার কারণে, যদি বিবাহ টুটিয়া যায়, যেমন, কামভাবের সহিত সতাল পুত্রের গায়ে শুধু হাত দিল, তজ্জন্য তালাক দেওয়া হয় কিংবা বে-দ্বীন হইয়া গেল, তবে ইদ্দতের খোরাক-পোশাকের দাবী সে করিতে পরিবে না। অবশ্য থাকিবার ঘর পাইবে কিন্তু যদি স্ত্রী নিজ ইচ্ছায় চলিয়া যায়, তবে স্বতন্ত্র কথা, পরে আর দেওয়া হইবে না।

নছব ছাবেত হওয়ার কথা

১। মাসআলাঃ স্বামীওয়ালা স্ত্রীর সন্তান হইলে স্বামীকেই সন্তানের বাপ বলিতে হইবে, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহের কারণে ইহা বলা জায়েয হইবে না যে, এই সন্তান তাহার স্বামীর নহে, অমুকের অথবা এই সন্তান হারামী; যদি কেহ এরূপ বলে, তবে শরীঅতের বিচার অনুসারে তাহাকে কোড়া লাগাইতে হয়। (এমনকি স্বয়ং স্বামীও এই সন্তানকে অস্বীকার করিতে পারিবে না। যদি চারিজন সাক্ষীর প্রমাণ ব্যতিরেকে সন্তানকে অস্বীকার করে, তবে তাহারও হয় তোহ্‌মতের শাস্তি (৮০ দোর্রা) ভোগ করিতে হইবে, 'না হয়, লেআন' করিতে হইবে। (লেআনের বয়ান দ্রঃ)

২। মাসআলাঃ হামলের মুদ্দত কমপক্ষে ছয় মাস এবং অধিকের অধিক দুই বৎসর অর্থাৎ, ছয় মাসের কমে সন্তান হইতে পারে না এবং দুই বৎসরের বেশীও সন্তান পেটে থাকিতে পারে না। (অতএব, যদি বিবাহের পর ছয় মাসের একদিন কম থাকিতেও সন্তান হয়, সন্তানকে হারামী বলিতে হইবে এবং ঐ স্বামীর সন্তান বলা যাইবে না।)

৩। মাসআলাঃ শরীঅতের হুকুম এই যে, (স্ত্রীকে তোহ্‌মত হইতে বাঁচাইবার জন্য এবং লোকদের ফাহেশা কথার আলোচনা হইতে দূরে রাখিবার জন্য এবং) সন্তানকে যাহাতে হারামী না বলিতে হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য যখন একেবারে অসম্ভব হইয়া যায়, তখন বাধ্য হইয়া সন্তানকে হারামী এবং সন্তানের মাকে হারামকারিণী বলিতে হইবে।

৪। মাসআলাঃ যদি কেহ নিজ স্ত্রীকে রজ্‌য়ী তালাক দেয় এবং তালাকের তারিখ হইতে দুই বৎসরের ভিতর সন্তান জন্মে, তবে সেই সন্তানকে হারামের সন্তান বলা যাইবে না, সে সন্তানের বাপ ঐ স্বামীকেই সাব্যস্ত করা হইবে। শরীঅতের আইন অনুসারে এই সন্তানের নছব ঠিক আছে, তাহার নছব বাতেল করা যাইবে না। যদি দুই বৎসরের মাত্র একদিন বাকী থাকিতে সন্তান হয়, তবুও তাহার এই হুকুম। এইরূপ ঘটনা হইলে মনে করিতে হইবে যে, তালাকের পূর্বেই গর্ভধারণ হইয়াছে । সন্তান দুই বৎসর মাতৃগর্ভে রহিয়াছে, সন্তান হওয়ার পর ইদ্দত শেষ হইয়াছে এবং বিবাহ ছুটিয়াছে। (ইহার পূর্বে ইদ্দতও শেষ হয় নাই এবং বিবাহও ছুটে নাই।) অবশ্য যদি স্ত্রীলোকটি নিজ মুখে স্বীকার করে যে, সন্তান প্রসবের পূর্বেই তাহার ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে বাধ্য হইয়া তাহাকে হারামকারিণী এবং সন্তানকে হারামজাদা বলিতে হইবে। এই রজয়ী তালাকের ছুরতে যদি দুই বৎসরের পরেও সন্তান হয় এবং স্ত্রীলোকটিও ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার না করে, তবে সন্তানের নছব ছাবেত মানিতে হইবে। কেননা, রজ্‌য়ী তালাকের ছুরতে ইদ্দতের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রী মিলনের দ্বারা রজআত করা জায়েয আছে, যত বৎসরই হউক না কেন।

মনে করিতে হইবে যে, তালাকের পর ইদ্দতের ভিতর স্বামী-সহবাসের দ্বারা রজআত করিয়াছে, সন্তান হওয়ার পরও তাহার বিবাহ ছুটে নাই। আর যদি স্বামীর ছেলে না হয়, সে বলিয়া দিবে, ইহা আমার ছেলে নহে। যখন অস্বীকার করিবে, তখন লেআনের হুকুম বর্তিবে।

৫। মাসআলা ঃ আর যদি বায়েন তালাক দিয়া থাকে, তবে অবশ্য দুই বৎসরের ভিতর সন্তান হইলে তাহার নছব ছাবেত হইবে, দুই বৎসরের পরে হইলে আর নছব ছাবেত করা যাইবে না, বাধ্য হইয়া সন্তানকে হারামের সন্তান বলিতে হইবে। কিন্তু যদি স্বামী দাবী করে যে, আমারই সন্তান, তবে ছাবেত হইবে এবং মনে করিতে হইবে যে, হয়ত ইদ্দতের ভিতর ভুলে সহবাস করিয়াছে। ইহাতে গর্ভ হইয়াছে।

৬। মাসআলা ঃ যে মেয়ের বালেগা হওয়ার এখনও কোন আলামত পাওয়া যায় নাই কিন্তু বালেগ হইবার নিকটবর্তী হইয়াছে, সেইরূপ মেয়েকে স্বামী তালাক দিলে যদি বায়েন তালাক দেয়, আর মেয়েটি তিন মাসের মধ্যেই গর্ভবতী আছে বলিয়া প্রকাশ করে, তবে নয় মাসের ভিতর সন্তান হইলে হালালের সন্তান মনে করিতে হইবে ; আর যদি রজয়ী তালাক দেয়, তবে ২৭ মাসের ভিতর সন্তান হইলে হালালের অর্থাৎ ঐ স্বামীর সন্তান সাব্যস্ত করিতে হইবে। সন্তানকে হারামের সন্তান বলা যাইবে না। অবশ্য যদি বায়েন তালাক দিয়া থাকে এবং ইদ্দতের মধ্যে গর্ভের কথা প্রকাশ না করিয়া থাকে এবং নয় মাসের পরে গিয়া সন্তান হয়, তবে বাধ্য হইয়া হারামের সন্তান বলিতে হইবে।

৭। মাসআলা ঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মরিয়া গিয়াছে তাহার যদি দুই বৎসরের মধ্যে সন্তান হয়, তবে সেই সন্তানকে হালালের সন্তান বলিতে হইবে। অবশ্য যদি স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসবের পূর্বেই ইদ্দত শেষ হইয়া যাওয়ার কথা নিজ মুখে স্বীকার করিয়া থাকে অথবা দুই বৎসর পরে গিয়া সন্তান হয়, তখন বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, হালালের সন্তান নয়, হারামের সন্তান।

তাম্বীহ্ ঃ মূর্খ সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর নয় মাসের বেশী এক দুই মাস হইয়া সন্তান জন্মিলেও মেয়েলোকটিকে খামাখা তোহ্মত লাগাইতে থাকে। উপরোক্ত মাসআলার দ্বারা বুঝা গেল যে, ঐরূপ অনর্থক তোহ্মত লাগান জায়েয নহে।

৮। মাসআলা ঃ বিবাহের পর ঠিক ছয় মাসের পরদিন অথবা তাহার দুই এক দিন বেশী হইলে যদি সন্তান হয়, তবে সে সন্তানকে হালালের সন্তান বলিতে হইবে (হারামের বলা দুরুস্ত নহে)। অবশ্য যদি ছয় মাসের কমে হয়, তখন বাধ্য হইয়া হারামের সন্তান বলিতে হইবে বা স্বামী যদি অস্বীকার করে, তবে 'লেআন' করিতে হইবে।

৯। মাসআলা ঃ শুধু কলেমা, আক্দ হইয়া যাওয়ার ছয় মাস পরে বৌ উঠাইয়া আনার পূর্বে যদি সন্তান হয়, তবুও সে সন্তানকে হারামের সন্তান বলা যাইবে না, ঐ স্বামীর সন্তানই বলিতে হইবে। অবশ্য স্বামীর না হইলে স্বামী যদি অস্বীকার করে, তবে লে'আন করিতে হইবে।

১০। মাসআলা ঃ স্বামী অনেকদিন যাবৎ বিদেশে আছে, এমনকি কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে বাড়ী আসে নাই। এদিকে সন্তান পয়দা হইয়াছে। এই সন্তানকে হারামযাদা বলা যাইবে না। স্বামীরই সন্তান বলা যাইবে। সংবাদ পাইয়া যদি স্বামী অস্বীকার করে, তবে লেআনের হুকুম বর্তিবে। (শরীঅতী আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে স্বামীর সন্তান বলা যাইবে। মীরাস ইত্যাদির হুকুম তাহার উপর বর্তিবে। ইহার একটি কারণ এই যে, হয়ত কোন সময় স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইয়া থাকিবে অথচ অন্য লোক তাহা জানিতে পারে নাই।)

সন্তান পালনের মাসায়েল

১। মাসআলা ঃ সন্তান কোলে থাকা অবস্থায় যদি তালাক দেওয়া হয় তবে বাপ সন্তানকে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। সন্তান মায়ের কাছেই থাকিবে ; কিন্তু সন্তানের সমস্ত খরচ বাপকেই দিতে হইবে। আর এই অবস্থায় যদি মা সন্তান পালনের ভার গ্রহণ না করে বাপকে দিয়া দেয়, তবে তাহাকে সন্তান পালনের জন্য মজবুর করিতে পারিবে না ; এই অবস্থায় সন্তান পালনের ভার বাপের উপরই পড়িবে।

২। মাসআলা ঃ মা না থাকা অবস্থায় কিংবা থাকিলেও যদি ভার নিতে অস্বীকার করে, তবে সন্তান পালনের হক নানীর বেশী, তারপর পরনানী, তারপর দাদীর, তারপর পরদাদীর, তারপর সহোদরা ভগ্নীর, তারপর বৈপিত্রেয়া ভগ্নীর, তারপর বৈমাত্রেয়া ভগ্নীর, তারপর খালার, তারপর ফুফুর।

৩। মাসআলা ঃ মা যদি সন্তানের মাহরাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করে তবে ঐ সন্তানের লালন-পালনের হক মার থাকে না। অবশ্য যদি সন্তানের মাহ্‌রামের সহিত বিবাহ হয় যেমন, সন্তানের চাচা কিংবা এ ধরনের অন্য কোন আত্মীয়, তবে সন্তানের লালন পালনের হক মার থাকিয়া যায়। মা ব্যতীত অন্যান্য মেয়েলোক যেমন সন্তানের ভগ্নী, খালা ইহাদের যদি কোন বেগানা পুরুষের সহিত বিবাহ হয় তাহাদেরও এই হুকুম অর্থাৎ শিশুর লালন-পালনের হক তাহাদের থাকে না।

৪। মাসআলা ঃ বেগানার সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর সন্তান পালনের হক চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার পর হয়ত স্বামী তালাক দিয়া দিয়াছে অথবা মারা গিয়াছে এরূপ অবস্থায় পুনরায় সন্তান পালনের ভার পাইবার অধিকারিনী হইবে মা এবং তৎপরবর্তী হক্‌দারগণ।

৫। মাসআলা ঃ সন্তান পালনের জন্য তাহার মা, নানী, খালা, ফুফু ইত্যাদি কোন মেয়েলোক যদি না থাকে, তবে সন্তান পালনের ভার পুরুষ ওলীদের উপর পড়িবে। প্রথমে বাপ, তারপর দাদা, তারপর ভাই, তারপর চাচা ইত্যাদি যেরূপ তরতীব বিবাহের বয়ানে লেখা হইয়াছে। কিন্তু যদি আত্মীয়গণ না-মাহ্‌রাম হয় এবং সন্তানকে তাহার হাতে সোপর্দ করায় ভবিষ্যতে কোন অনিষ্টের আশংকা থাকে, তবে এমন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করিবে, যেখানে সব দিক দিয়া নিরাপদ হয়।

৬। মাসআলা ঃ পুত্র-সন্তানের লালন-পালনের হক সাত বৎসর পর্যন্ত। যখন ছেলের বয়স সাত বৎসর হইবে, তখন তাহার বাপ তাহাকে জোর জবরদস্তিও মা, নানী ইত্যাদির নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারে। কন্যা-সন্তানের লালন-পালনের হক নয় বৎসর পর্যন্ত। যখন মেয়ের বয়স নয় বৎসর হইবে, তখন তাহার বাপ তাহাকে লইয়া যাইতে পারিবে। মা, নানী প্রভৃতির তাহাকে বাধা দিবার কোন অধিকার নাই।

স্বামীর হকের বয়ান

আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীকে অনেক বড় বানাইয়াছেন এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক হক ও অনেক দাবী নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা স্ত্রীর পক্ষে অতি বড় এবাদত এবং স্বামীকে অসন্তুষ্ট বা নারায রাখা অতি বড় গোনাহ্।

১। হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

اَلْمَرْاَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ ○ (مشكواة)

"যে স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায রীতিমত পড়িবে, রমযান মাসের রোযা রীতিমত রাখিবে, রীতিমত পর্দানীতি পালন করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে (এবং রীতিমত সন্তান পালন, মুরব্বী ভক্তি ও গৃহস্থালীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া) স্বামীর তাবেদারী করিয়া চলিবে, বেহেশ্‌তের যে কোন দরওয়াজা দিয়া সে ইচ্ছা করিবে অবাধে তাহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার অধিকার দান করা হইবে।" অর্থাৎ, বেহেশ্‌তের ৮টি দরওয়াজা আছে তাহার যে কোন দরওয়াজা দিয়া সে প্রবেশ করিতে চাহিবে, কেহই কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে পারিবে না।

২। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ○ (ابن ماجه)

"যে কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিয়া ঈমানের সহিত মরিতে পারিবে, সে নিঃসন্দেহে বেহেশ্‌তী হইবে।"

৩। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

لَوْكُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍلَّاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ○ (ترمذى)

"যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সজ্‌দা করা জায়েয হইত, তবে আমি নিশ্চয়ই স্ত্রীকে হুকুম দিতাম যে, সে তাহার স্বামীকে সজ্‌দা করুক।" (কিন্তু এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করা জায়েয নাই, তাই সজ্‌দা করা এবং এবাদত করার ত হুকুম দেওয়া যায় না, এছাড়া অন্যান্য সর্বপ্রকার তাবেদারী এবং পতিভক্তি দেখান স্ত্রীর কর্তব্য।)

৪। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

স্বামী যদি স্ত্রীকে হুকুম করে যে, এই পাহাড়ের পাথরসমূহ বহিয়া ঐ পাহাড়ে এবং সেই পাহাড় হইতে অন্য আর এক পাহাড়ে লইয়া যাও, তবে এই সুকঠিন এবং অনর্থক হুকুম পালনের জন্যও স্ত্রীর তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া যাওয়া উচিত।

৫। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

স্বামী যদি স্ত্রীকে নিজের কাজের জন্য ডাকে, তবে স্ত্রী যদি চুলার কাজেও থাকে, তবুও তৎক্ষণাৎ স্বামীর আদেশ রক্ষা করা স্ত্রীর সর্বপ্রধান কর্তব্য।

৬। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

স্বামী যদি রাত্রে শয়নকালে স্ত্রীকে নিজের কাছে আসার জন্য ডাকে এবং স্ত্রী রাগ করিয়া না আসে, আর স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ে, তবে সারা রাত্রি ফেরেশ্‌তাগণ ঐ স্ত্রীর উপর লা'নত করিতে থাকে।

৭। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

দুনিয়াতে যখন কোন স্ত্রী তাহার স্বামীকে বিরক্ত করে বা কোনরূপ কষ্ট দেয়, তখন বেহেশ্‌তের যে হূর কিয়ামতের দিন তাহার স্ত্রী হইবে, তাহারা ঐ স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলে, ওহে হতভাগিনী! আল্লাহ্ তোর সর্বনাশ করুন। তুই আর তাঁহাকে কষ্ট দিস্ না, তিনি কয়েক দিন মাত্র তোর নিকট মেহ্‌মান স্বরূপ আছেন, অল্পদিন পরেই তিনি তোকে ছাড়িয়া আমাদের নিকট চলিয়া আসিবেন।"

৮। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

তিন প্রকার লোকের নামায বা অন্য কোন এবাদত আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হয় না। (১) গোলাম-বান্দী মালিকের নিকট হইতে পলাইয়া গেলে তাহাদের এবাদত বন্দেগী আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হইবে না, যে পর্যন্ত না ফিরিয়া আসিয়া মাফ চাহিবে। (২) যে স্ত্রীর স্বামী তাহার উপর অসন্তুষ্ট তাহার কোন এবাদত-বন্দেগী কবূল হইবে না, যে পর্যন্ত না সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবে। (৩) মদ্যপায়ী নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির কোন এবাদত কবূল হইবে না, যে পর্যন্ত না তাহার নেশা ছুটিয়া যাইবে।

৯। কেহ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞসা করিয়াছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সব চেয়ে ভাল স্ত্রী কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, (১) যে স্ত্রীকে দেখিলে স্বামীর নয়ন জুড়ায়, (২) যে স্ত্রীকে আদেশ করা মাত্রই স্বামীর আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করে, (৩) যে স্ত্রী তাহার ইজ্জত বা সম্পত্তি সম্বন্ধে স্বামীর বিনা হুকুমে বা স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ না করে।

স্বামীর ইহাও একটি হক যে, স্বামীর উপস্থিতিতে স্বামীর নিকট এজাযত না লইয়া স্ত্রী নফল রোযা ও নফল নামায না পড়ে। ইহাও স্বামীর একটি হক যে, স্বামীর উপস্থিতিকালে স্ত্রী মলিন বেশে না থাকে; বরং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হাসিমুখে সুসজ্জিত হইয়া স্বামীর সামনে আসে। এমন কি, স্বামীর আদেশ সত্ত্বেও যদি স্ত্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হয়, তবে সেই জন্য প্রহার করিবার অধিকার পর্যন্ত স্বামীর আছে। স্বামীর ইহাও একটি হক যে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী স্বামীর বাড়ীর বাহিরে কোথাও যাইতে পারিবে না, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতেও না, অন্য কাহার বাড়ীতেও না।

স্বামীর সহিত মিল-মহব্বত রাখিয়া সুখময় জীবন যাপনের উপায়

এই কথা চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, স্বামী-স্ত্রীর বসবাস দুই এক দিনের জন্য নয়, আজীবন স্বামীর সহিত একত্রে বসবাস করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় খোদা না করুন যদি উভয়ের মধ্যে কিছু মন-ভাঙ্গা ভাব আসিয়া যায়, তবে তার চেয়ে দুঃখ ও পরিতাপের আর জগতে নাই। অতএব, স্ত্রীর প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে সে স্বামীর মন অধিকার করিয়া থাকিতে পারে। ইহার উপায় স্বামীর চোখের ইশারায় চলা। স্বামী যদি হুকুম করে যে, সারারাত্রি হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাক, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিবে। কেননা, দুনিয়া এবং আখেরাত দোজাহানের সুখ লাভ নির্ভর করে স্বামীর মনস্তুষ্টির উপর! কাজেই দুনিয়ার সামান্য একটু কষ্ট ভোগ করিয়া যদি পরম সুখ লাভ করা যায়, তবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিবে না। কোন সময় এমন কোন কথা বলিবে না বা এমন কোন ব্যবহার করিবে না যাহাতে স্বামীর মনে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হইতে পারে। স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবে না বা কোন কাজ করিবে না। এমন কি, স্বামী যদি দিনকে রাত, রাতকে দিন বলে, তবে তাহারও প্রতিবাদ করিবে না।

কোন কোন মেয়েলোক নির্বুদ্ধিতাবশতঃ পরিণাম চিন্তা না করিয়া এমন কথা বলিয়া বসে বা এমন কাজ করিয়া বসে, যাহাতে হয়ত স্বামীর মনে ময়লা আসিয়া যায়, পরে সারাজীবন কাঁদিয়া কাটায়, (কিন্তু সে কান্নায় কোন ফল ফলে না। 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।') মনে রাখিও, একবার দেলে ময়লা আনিয়া দেওয়ার পর যদি হাত পা ধরিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া

রাযী করিয়াও লও, তবুও পূর্বের মত টাট্কা গোলাপ ফুলের সুবাস কি আর হয়? পরেও যখন আবার কোন দিন কোন বিষয় হইবে, তখনই আগের সেই কথা মনে পড়িবে যে, এ'ত সে-ই যে অমুক দিন আমাকে অমুকভাবে মনে আঘাত দিয়াছিল। অতএব, স্বামীর সহিত কথা বলিতে বা ব্যবহার করিতে খুব সতর্ক হইয়া চলা উচিত। কারণ, যেমন, আল্লাহ্ ও রাসূলের খুশীও স্বামীর খুশীতেই, তেমনি নিজের ইহজীবনের এবং পরজীবনের খুশীও স্বামীর খুশীতেই; কাজেই যে ভাবেই হউক না কেন স্বামীর মনকে খুশী রাখিতেই হইবে।

বুদ্ধিমতী মেয়েদের বলিবার ত দরকার করে না, কারণ তাহারা নিজেরাই বুদ্ধি খাটাইয়া যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্মরণ রাখার জন্য আমরা কয়েকটি কথা এখানে লিখিয়া দিতেছি। এই কথাগুলি ভালমত স্মরণ রাখিলে এবং পালন করিলে অন্যান্য ক্ষেত্রের অন্যান্য কথা আল্লাহ্ চাহেন ত আপনাআপনি বুঝে আসিতে থাকিবে। যথা— (১) স্বামীর আর্থিক অবস্থার চেয়ে বেশী খরচ করিবে না। (২) স্বামীর যেমন অবস্থা, স্বামী শাক-ভাত মোটা কাপড় যখন যেমন যোগাইতে পারে তাহাতেই হাসি মুখে সন্তুষ্টচিত্তে জীবন যাপন করিবে, কখনও বেশীর আকাঙ্ক্ষা করিবে না বা মুখ বেজার করিয়া থাকিবে না। (৩) যদি কোন সময় কোন কাপড় বা কোন জিনিস পছন্দ হয়, আর স্বামীর আর্থিক অবস্থায় তাহা কুলাইয়া না উঠে, তবে মনের কথা মনেই চাপা দিয়া রাখিবে, কখনও তাহা মুখে আনিবে না ও স্বামীকে ফরমায়েশ করিবে না বা সে জন্য মুখ ভার বা মন ভারও করিবে না। নিজেই মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, যদি আমি স্বামীকে বলি, তবে তিনি মনে করিবেন যে, দেখ সে আমার দিকে একটুও চায় না, আমার যে এত কষ্ট তা সে একটুও বুঝে না। ইহাতে মনে মিল থাকিতে পারে না, স্বামীর মনে আঘাত লাগিতে পারে অথচ স্বামীর মনের কিঞ্চিৎ আঘাতও সাধ্বী-পত্নীর জন্য অতি অধিক। এই জন্যই জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন, স্বামী ধনী হইলেও নিজে কোন কিছুর জন্য ফরমায়েশ দেওয়া চাই না, কারণ তাহাতে স্বামীর চোখে একটু পাতলা হইতে হয়। অবশ্য স্বামী যদি নিজ খুশীতে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমার মনে কি চায় একটু বল, তবে নিজের মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় কোন দোষ নাই, কিন্তু তাহাও চাপিয়া চাপিয়া চতুর্দিকে খেয়াল রাখিয়া বলা উচিত। তাহা হইলে স্বামী তোমাকে আপন দরদী মনে করিবে; নতুবা তাহার নজরে তোমার সম্মান ও পজিশন কমিয়া যাইবে। (৪) নিজের কথার উপর কখনও জেদ করিবে না। যদি কোন কথা তোমার মতের বিরুদ্ধেও স্বামী বলেন, তবুও তখন তাহার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিবে। পরে হয়ত সুযোগ মত ঠাণ্ডা সময়ে বুঝাইয়া দিবে বা বুঝিয়া নিবে।

স্বামীর সংসারে খাওয়া পরার কিছু কষ্ট হইলে (বা বাড়ী-ঘর জিনিস, কাপড়, ছুরত, চেহারা মন মত না হইলে তাহাতে কখনও মন কালা বা চেহারা মলিন করিবে না,) মুখে কখনও কিছু বলিবে না; বরং হাসি মুখে ও প্রফুল্লচিত্তে কালাতিপাত করিবে যেন স্বামীর মনে কষ্ট না হয়। তুমি যদি সন্তোষ ভাব প্রকাশ কর, তবে স্বামীর মন তোমার অধিকারে আসিয়া যাইবে।

স্বামী যদি তোমার জন্য কোন জিনিস আনেন এবং তাহা যদি তোমার মনমত না হয়, তবুও খুশীর সঙ্গে তাহাই হাসি মুখে প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করিয়া লইও। জিনিস যে তোমার পছন্দ হয় নাই, তাহা ভাষায় বা ভাবে আদৌ কোনরূপ প্রকাশ পাইতে দিও না। কেননা, তাহাতে স্বামীর মন ছোট হইয়া যাইবে এবং আগামীতে কোন জিনিস আনিতে তাহার মন চলিবে না। পক্ষান্তরে যদি তুমি খুশীভাব দেখাও, তবে তাহার মন সন্তুষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে আরও ভাল ভাল জিনিস আনিবার জন্য

তাহার মনে আগ্রহ্ জাগিবে। ফলকথা, মনে রাখিবে শোকরে নেয়ামত বাড়ে, না-শোকরীতে এবং শেকায়েতে নেয়ামত পাওয়া ত যায়ই না, তাছাড়া মনেও আঘাত লাগে। ক্রোধ-রিপুর বশীভূত হইয়া কখনও স্বামীর বাড়ীর বা শ্বশুর, শাশুড়ীর নিন্দাবাদ প্রকাশ করিবে না, কখনও না-শোকরী করিবে না। হাদীস শরীফে আছেঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমি দোযখের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী দেখিয়াছি। লোকেরা আরয করিল, দোযখে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণ কি? হযরত (দঃ) বলিলেনঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রধান দুইটি দোষ আছে, সেই দুইটির কারণেই তাহারা অধিকাংশ দোযখী হইবে। একটি দোষ এই যে, তাহারা সামান্য সামান্য কারণে গালি, বদ-দো'আ এবং অভিশাপ দিতে থাকে। দ্বিতীয় দোষ এই যে, তাহারা পরের বাড়ীর অর্থাৎ স্বামীর বাড়ীর শেকায়েত ও না-শোকরী বহুত করে। চিন্তা করিয়া বুঝা দরকার যে, না-শোকরী করা বড় গোনাহ্ এবং গালি দেওয়া, লা'নত করা, অভিশাপ দেওয়া, বদ-দো'আ দেওয়া কত বড় গোনাহ্! এইসব গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা একান্ত দরকার।

স্বামী যদি রাগান্বিত হয়, তবে তুমি এমন কোন কথা বলিবে না এমন কোন ব্যবহার করিবে না যাহাতে তাহার রাগ আরও বৃদ্ধি পায়; বরং এমন ব্যবহার করিবে যাহাতে তাহার রাগ থামিয়া যায়। সব সময় মাথা খাটাইয়া মেযাজ বুঝিয়া কথা বলিবে। যদি বুঝ যে, এখন হাসি চাতুরীতে সন্তুষ্ট হইবে, তবে হাসি চাতুরীর কথা বলিতে দোষ নাই। আর যদি দেখ যে, এখন হাসি চাতুরী ভালবাসিবে না, তবে তখন কিছুতেই হাসি চাতুরীর কথা বলিবে না। ফলকথা এই যে, মেযাজ বুঝিয়া চলা দরকার। স্বামী যদি কোন সময় গোস্বা করিয়া কথা না বলে, তবে তখন তুমিও মুখ ফুলাইয়া বসিয়া থাকিবে না; বরং খোশামোদ তোষামোদ করিয়া কাকুতি নিমতি করিয়া হাত জুড়িয়া পা ধরিয়া অপরাধ না হইলেও অপরাধ স্বীকার করিয়া স্বামীর অন্যায় হইলেও তুমি তোমার নিজের অন্যায় স্বীকার করিয়া মাফ চাহিবে এবং যে প্রকারেই হউক না কেন স্বামীর মন সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিবে। কখনও তুমি গোস্বা করিবে না বা বেজার হইয়া বসিয়া থাকিবে না; বরং স্বামীর হাত পা ধরিয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাহাকেই প্রকৃত সম্মান মনে করিবে।

নিশ্চয় জানিও, স্বামীর সহিত আপনাআপনি প্রণয় ও মহব্বত হয় না প্রাণপণে স্বামীর খেদমত করিতে হয়, অন্তঃকরণের সহিত স্বামীকে ভক্তি করিতে হয়, প্রাণে সব সময় স্বামীর ভয় ও আদব রাখিতে হয়। নির্বোধ মেয়েলোক বড় বংশের বা রূপের বা আধুনিক কুশিক্ষার গৌরব করিয়া হয়ত স্বামীকে হেয় বা নিজকে স্বামীর সমান সমান বলিয়া মনে করিয়া বসে। নিশ্চয় জানিও, ইহা অতি বড় বে-আদবী। স্বামী হয়ত ভদ্রতা, নম্রতা বা প্রেম পরবশ হইয়া তোমার কোন খেদমত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু খবরদার! তুমি যদি মানুষ হও, তোমার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও মনুষ্যত্ব থাকে, তবে কস্মিনকালেও স্বামীর কোন খেদমত লইবে না। মনে কর কোন পিতা যদি ছেলের পা বা শরীর টিপিতে বা পাখা করিতে বা জুতা বাড়াইয়া দিতে থাকে, তখন ছেলে যদি মানুষ হয়, তবে কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে? নিশ্চয়ই না। ছেলের তুলনায় বাপ যত বড় পদের, স্ত্রীর তুলনায় স্বামী তাহা অপেক্ষা অনেক বড় পদের। কাজেই স্বামীর খেদমত স্ত্রী কিরূপে লইতে পারিবে? অতএব, কথাবার্তা, চলা-ফেরা, খাওয়া-বসা সব কাজেই স্বামীর আদব রক্ষা করিয়া চলা স্ত্রীর পক্ষে একান্ত কর্তব্য। যদিও স্বামী হাসি-ঠাট্টা করিবে, কিন্তু তবুও স্ত্রীর সে হাসি-ঠাট্টাতে ভুলিয়া স্বামীর মর্তবার কথা এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে যদি স্বামীরই অন্যায় হয়, তবে ত তাহাও ধরা চাই না। নিজেরই অন্যায় না

হইলেও অন্যায় স্বীকার করা উচিত, কারণ ইহাতে স্বামীর মন সন্তুষ্ট হইবে। বিশেষতঃ যদি নিজেরই অন্যায় হয়, তবে ত কিছুতেই রাগ গোস্বা করিবে না, তৎক্ষণাৎ ত্রুটি স্বীকার করিয়া মাফ চাহিয়া লওয়া উচিত। অন্যথায় একবার স্বামীর মন ভাঙ্গিয়া গেলে সেই ভাঙ্গা মনকে জোড়া লাগান অনেক কষ্ট।

স্বামী যখন বিদেশ হইতে বা বাহির হইতে বাড়িতে আসেন, তখন অন্য সব কাজ পরিত্যাগ করিয়া আগে আসিয়া স্বামীর সামনে উপস্থিত হওয়া উচিত এবং উপস্থিত হইয়া যাহাতে তাহার ক্লান্তি, শ্রান্তি এবং কষ্ট দূর হয় সেইরূপ কথা বলিবে এবং সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করিবে, আর প্রাণপণে খেদমতে লাগিয়া যাইবে। কখনও নিজের গরজের কথা বা শাশুড়ী-ননদের ঝগড়ার কথা বলিবে না। কোথায় কি খাইয়াছেন? কোথাও কোন কষ্ট পাইয়াছেন না কি? এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিবে। পানির দরকার হইলে পানি আনিয়া দিবে। ক্ষুধা থাকিলে জলদী খাবার যোগাড় করিয়া দিবে। গরমের দিন হইলে পাখা করিবে, হাত-পা টিপিয়া দিবে, ওযূর পানি, জুতা, খড়ম আনিয়া দিবে, কোন কাজ আছে নাকি জিজ্ঞাসা করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার জন্য কি আনিয়াছেন? টাকার থলি কোথায়? বাক্সের মধ্যে কি? ইত্যাদি বিরক্তিজনক কথা কিছুতেই বলিবে না। তিনি কিছু আনিয়া থাকিলে নিজেই যখন দিবেন, তখন যা দেয় তাহাই সন্তুষ্ট চিত্তে হাসিমুখে গ্রহণ করিবে, কোনরূপ অসন্তুষ্টি বা বিরক্তি প্রকাশ করিবে না। অবশ্য যদি কোন কিছুর দরকার থাকে বা স্বামীর অবহেলা অমিতব্যয়িতা, অপরিণামদর্শিতা বা অকর্মন্যতা সম্বন্ধে কিছু বুঝ দিতে হয়, তবে অন্য সময় মেযাজ যখন ঠাণ্ডা হয়, তখন ধীর ও নম্রভাবে বুঝাইয়া বলিবে।

স্বামীর মা-বাপ অর্থাৎ তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন তাঁহাদের খেদমত করিয়া তাঁহাদের মন সন্তুষ্ট রাখাকে তোমার বড় ফরয মনে করিবে। এমন কি, স্বামী টাকা-পয়সা রোযগার করিয়া আনিয়া যদি তোমার কাছে না দিয়া তাহাদের কাছে দেন তাহাতে তুমি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইবে না বা হাবভাবেও কোন বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিবে না; বরং তোমার কাছে দিলেও তোমার বলা উচিত যে, আম্মা মুরুব্বি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে দেন কেন? আম্মার হাতে দেওয়াই ভাল। শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করাতে কোন অপমান বা গৌরবের হানি মনে করিবে না; বরং ইহাতেই প্রকৃত সম্মান এবং সমাদর পাওয়া যাইবে মনে রাখিবে। শাশুড়ী, ননদ হইতে পৃথক হইয়া জীবন যাপন করার কথা কখনও উত্থাপন করিবে না। যদি কোন সময় মনে সেরূপ ভাবনা আসেও, তবে তাহাকে শয়তানের অছঅছা মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিবে। এরূপ খেয়ালকে মনের কোণেও জায়গা দিবে না। শাশুড়ী-ননদের সহিত খুব ভাল ব্যবহার করিবে। বিশেষতঃ ননদের কারণেই সাধারণতঃ শাশুড়ীর মন খারাপ হয়, তারপর নানা কথা কয়। শাশুড়ী, ননদের কোন ব্যবহারে বা কথায় যদি মনে কিছু ব্যথা লাগে, তবে নীরবে তাহা সহ্য করিবে, সে সব কথা আবার মা-বাপের কাছে গিয়া কখনও বলিবে না। কারণ এইরূপ কূটনামিতে লাভ কিছু নাই, শুধু ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং জিন্দিগী বিষময় হইয়া উঠে। তুমি নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার শাশুড়ী আম্মা কত কষ্ট করিয়া তোমার স্বামীকে লালন-পালন করিয়াছেন এবং কত আগ্রহ করিয়াছেন যে, বৌকে দেখিবেন এবং বুড়াকালে বৌ-এর কিছু খেদমত পাইবেন আশা করিয়া ছেলেকে বিবাহ করাইয়াছেন। এখন সে ছেলে যদি ভিন্ন হইয়া যায়, তবে তাতে তাঁহার মনে কত কষ্ট হয় এবং সেই কষ্টের রাগটা গিয়া পড়ে তোমার উপর যে, এমন বৌ আনিয়াছি যে, সে দুই দিনেই আমার সোজা ছেলেকে নিজের

বশ করিয়া লইয়াছে, আমার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। খবরদার! এইরূপ কথা যেন মনে কখনও না হয়, এমন দোষে এবং এমন অভিশাপে যেন তুমি কখনও না পড়। বাড়ীর যাল, ননদ, দেওর, ভাসুরের ছেলেমেয়ে, ননদের ছেলেমেয়ে সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে। কাহাকেও মন্দ জানিবে না বা কাহারও প্রতি হিংসাভাব পোষণ করিবে না। শুরু হইতেই আদব-লেহাযের এবং ছবর বরদাস্তের আচার ব্যবহার করিবে। যাহারা বড় তাহাদের সম্মান করিবে এবং যাহারা ছোট তাহাদের স্নেহ করিবে। নিজের হিস্বামত কাজকর্ম রীতিমত করিবে। নিজের কাজ তো কখনও অন্যের ঘাড়ে ফেলিবেই না; বরং অন্যের কাজও কিছু তুমি করিয়া দিবে এবং অন্যের কাজে কিছু ত্রুটি দেখিলে তাহার শেকায়াত করিবে না বা তাহাতে মনে কষ্ট আনিবে না। এইরূপ ব্যবহার যদি তুমি কর তাহা হইলে দেখিবে যে, সকলেই তোমাকে ভালবাসিতেছে এবং সমাদর করিতেছে। দুনিয়াতেও ভাল থাকিবে এবং আখেরাতেও ভাল থাকিবে। নতুবা প্রতিযোগিতা করিলে বা বুদ্ধি চালাইলেই অথবা শুধু নিজের স্বার্থ টানিলে বা নিজের গৌরব দেখাইলে কেহই ভালবাসিবে না। শাশুড়ী, ননদেরা বা যালেরা যে কাজ করে, সে কাজ করিতে তুমি কখনও লজ্জা বা অপমান বোধ করিও না; বরং তাহাদের হাতের কাজ তুমিও করিয়া দিবে। এইরূপ করিলে তাহাদের মন অধিকার করিয়া লইতে পারিবে।

দুইজনকে চুপিচুপি কিছু কথাবার্তা বলিতে দেখিলে তুমি সেখান হইতে সরিয়া যাও, পাছে কান লাগাইয়া তাহাদের কথা শুনিও না বা এইরূপ মনে কু-ধারণা আনিও না যে, তাহারা বুঝি তোমারই সম্বন্ধে কিছু বলাবলি করিতেছে। এইরূপ বদ-খেয়ালীতেই যত মন ভাঙ্গাভাঙ্গি এবং শত্রুতার সৃষ্টি হয়, কাজেই বদ-খেয়ালী হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

অনেক নির্বোধ মেয়ে এরূপ আছে যে, শ্বশুরালয়ে গিয়া তাহারা সব সময় উদাসীন গমগীন হইয়া বসিয়া থাকে, দুই দিন না যাইতেই বাপের বাড়ী যাইবার জন্য কান্নাকাটা বা মাতলামি শুরু করিয়া দেয়। এইরূপ করা কিছুতেই উচিত নয়। ইহাতে লোকে পাতলা এবং নির্বোধ বলিয়া মনে করে। বেশী কথা বলিবে না (বা বেশী হাসিবে না, কারণ ইহাতে লোকে বে-হায়া বা নির্বোধ বলিয়া মনে করে) বা ইহাও করিবে না যে, একেবারে কথা বন্ধ করিয়া বার বার জিজ্ঞাসা এবং খোশামোদ করা সত্ত্বেও উত্তর নাই। ইহাতেও লোকে ভালবাসে না, লোকে মনে করে, আমাদিগকে বুঝি হেয় মনে করে (বা আকল-বুদ্ধি নাই)।

শ্বশুরালয়ে কোন বিষয়ে কোন কষ্ট হইলে তাহা কখনও মা-বাপের বাড়ীতে কাহারও নিকট বলিবে না। মা-বোনেরা বারবার জিজ্ঞাসা করিবে বটে, কিন্তু তুমি ভাল ছাড়া মন্দ আদৌ প্রকাশ করিবে না। মা-বাপেরও উচিত, মেয়ে যদি স্বামীর বাড়ীর কোন কথা আসিয়া বলে, খবরদার! তাহাতে যেন তাঁহারা কর্ণপাত না করেন। শেকায়েত অভ্যাসটাই ভাল নহে। শোকরে নেয়ামত বাড়ে; আর শেকায়েতে অশান্তি বাড়ে।

স্বামীর মাল-পত্র, কাপড়-চোপড় খুব যত্ন করিয়া হেফাযত করিয়া রাখিবে। সব জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং যে জিনিসের যে স্থান সেইখানে সে জিনিস সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিবে। জমাইয়া বা ছড়াইয়া রাখিবে না। কাপড়-চোপড় সুন্দররূপে ভাঁজ করিয়া রাখিবে; মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিবে। বিশেষতঃ পশমী কাপড় অবশ্য রৌদ্রে দিবে। ভাদ্র মাসে অবশ্য সব কাপড়ই রৌদ্রে দিবে। বাড়ী-ঘর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। লেপার দরকার হইলে লেপিবে। ঝাড়ু দেওয়ার দরকার হইলে ঝাড়ু দিবে। কালির ঝুল ঘরে পড়িতে দিবে না। স্বামীর কাপড় একটু

ময়লা দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বলিয়া কাপড় লইয়া গিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। বিছানা, বালিশের গেলাফ, লেপের খোল যদি ময়লা হয় তৎক্ষণাৎ ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। যদি না থাকে, তবে সেলাই করিয়া লইবে, যদি কিছু ছেঁড়া থাকে তবে রিফু করিয়া দিবে বা তালি লাগাইয়া দিবে, স্বামীর বলার অপেক্ষা করিও না, বলার আগেই কাজ করিয়া ফেলিও। কারণ বলার আগে করিতে পারিলে সেইটাই তারীফের বিষয় নতুবা বলার দরকার পড়িলে এবং বলার পর করিলে সেটা বেশী তা'রীফের বিষয় নহে।

কখনও কোন কাজ-কর্মে চোরামী বা আলসেমী করিও না, আপন কর্তব্য মনে করিয়া সব কাজ সময়মত কাহারও বলার আগেই করিয়া ফেলিও। কখনও মিথ্যা কথা বলিও না। কারণ মিথ্যা কথা বলায় গোনাহ্ ত আছেই, তাছাড়া লোকের কাছেও অপমানিত হইতে হয়। খাওয়ার লোভ সামলাইয়া চলিও, সবাইকে খাওয়াইয়া তারপর নিজে খাইও। সব সময় পাক-ছাফ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিও, জিনিস-পত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিও। কাহারও সহিত ঝগড়া-কলহ বা উচ্চবাচ্য করিও না। বিশেষতঃ কোন মুরুব্বি রাগ করিয়া যদি কোন কথা বলেন, তবে খবরদার! সে কথায় উত্তর দিও না, চুপ করিয়া মুখ বুঝিয়া থাকিও। মনে করিও না যে, সমানে সমানে উত্তর না দিলে বুঝি তোমার হার হইয়া গেল, এ কথা ভুল। চুপ করিয়া থাকিলেই দেখিবে যে, পরিণামে তোমার জিত হইবে, সকলে তোমাকে ভাল বলিবে।

স্বামীর যদি কোন স্বভাব মন্দ থাকে সেজন্য স্বামীর খেদমতের ত্রুটিও করিও না, বা স্বামীর সহিত পাল্লা দিয়া চলিও না, বা রাগ করিয়া তাহাকে সোজা করিতে চাহিও না। কারণ, পুরুষের মেযাজ বাঘের মতই হয়। যাঘ রাগ করিলে তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না, ফাঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলে। আর যদি কেহ বাঘের কাছে নম্রতা স্বীকার করে, তবে বাঘ তাকে কিছুই করে না। ঠিক এরূপ, স্বামীকে বাধ্য করিতে চাহিলে বা তাঁহার কোন কু-অভ্যাস বদলাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহার নিকট খুব নত হইয়া চলিবে। তিনি যা বলেন, গোনাহ্র কাজ না হইলে তাই শুনিবে। কখনও তাঁহার কথার বা মেযাজের খেলাফ কোন কাজ করিবে না। কাহারও নিকট তাঁহার গীবৎ-শেকায়েত করিবে না। এই উপায়ে দেখিবে যে, ক্রমান্বয়ে স্বামী তোমার বশ হইয়া যাইবে, যদি বশ নাও হয়, তবুও অন্ততঃ আখেরাতেও তুমি তোমার ছবরের ফল পাইবে। আর যদি ইহার বিপরীত কর, তবে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় কূলের অশান্তি ভোগ করিতে হইবে। হাঁ, নম্রভাবে গোপনে কোন বিষয় বুঝ দিতে পারিলে সে ভাল কথা; কিন্তু খবরদার! এমন কোন কথা বলিবে না যাহাতে স্বামীর মন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

সন্তান পালনের নিয়ম

ছোট বেলার আদত-আখলাকই সারা জীবন বাকী থাকে। এই জন্যই বাল্যকাল হইতে যৌবন পর্যন্ত যে স্বভাবগুলি শিক্ষা দেওয়ার এবং অভ্যাসে পরিণত করার দরকার তাহার কিছু আমরা এখানে লিখিয়া দিতেছি যাহাতে মাতাগণ উত্তম ছেলেমেয়ে গঠন করিতে সমর্থ হন।

১। নেকবখ্ত ও দ্বীনদার মেয়ে লোকের দুধ পান করান উচিত। কেননা দুধের আছর চরিত্রের উপর অনেক বেশী পড়ে।

২। মেয়েলোকেরা সাধারণতঃ ছেলে-মেয়েকে সিপাহীর বা ভয়াল জিনিসের ভয় দেখাইয়া থাকে, এরূপ করিবে না। ইহাতে ছেলে-মেয়ের দেল কমজোর হইয়া যায়, কাপুরুষ হইয়া যায়।

৩। ছেলে-মেয়েদের দুধ পান করার ও খাওয়ার সময় নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া উচিত যেন সুস্থ থাকে।

৪। ছেলে-মেয়েকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

৫। ছেলে-মেয়েকে বেশী সাজাইয়া গুজাইয়া রাখিও না।

৬। ছেলেদের মাথার চুল বেশী লম্বা হইতে দিবে না।

৭। মেয়েরা যে পর্যন্ত পর্দায় থাকিতে অভ্যস্ত না হয়, সে পর্যন্ত তাহাদের অলংকার পরাইও না। কারণ, একে ত এতে জান-মালের উপর আশঙ্কা আছে, তাছাড়া ছোট বেলা হইতে জেওরের প্রতি আকর্ষণ হওয়া ভাল নহে।

৮। ছেলে-মেয়েদের হাতে দিয়া গরীবদের দান করার এবং ভাই-বোনদের এবং অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মধ্যে খাবার জিনিস ভাগ করার অভ্যাস করাইবে। কারণ, ইহাতে ছাখাওতির অভ্যাস বাড়িবে, লোভের অভ্যাস কমিবে। অবশ্য শরীঅত মতে ছেলেরা যেসব বস্তুর মালিক তাহা কাহাকেও দিতে বলা জায়েয নাই। তোমাদের নিজস্ব বস্তু তাহাদের দ্বারা দান করাইবে।

৯। যাহারা বেশী খায় ছেলে-মেয়েদের সামনে তাহাদের দুর্নাম করিবে। কিন্তু কাহারও নাম লইয়া বয়ান করিবে না। এইরূপ বলিবে, যাহারা বেশী খায়, লোকে তাহাদের ঘৃণা করে ইত্যাদি। (ইহাতে ছেলে-মেয়েদের কম খাওয়ার অভ্যাস হইবে।)

১০। ছেলেদের সাদা কাপড়ের অভ্যাস করাইবে এবং রঙ্গীন কাপড়ের নিন্দা করিবে যে, ইহা মেয়েদের পোশাক। তুমি ত পুরুষ তোমার এসব সাজে না।

১১। মেয়েদের সব সময় বা প্রতিদিনই সীতাপাটি এবং বিলাসিতার অভ্যাস করাইবে না। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে, সীমার ভিতরেই সে জিনিস ভাল, সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে সব জিনিসই খারাপ।

১২। ছেলে-মেয়েদের জেদ সব পুরা করিবে না। কারণ, ইহাতে স্বভাব খারাপ হয়। (হট এবং জেদ করার কু-অভ্যাস হয়।)

১৩। ছেলে-মেয়েদের চীৎকার করিয়া কথা বলিতে দিবে না; বিশেষতঃ মেয়েদের ত খুবই তাকীদ করিবে; নতুবা বড় হইয়াও ঐ কু-অভ্যাস থাকিয়া যাইবে।

১৪। যে সব ছেলেদের স্বভাব খারাপ বা লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয় না; (মুরুব্বির আদব রক্ষা করিয়া চলে না; গালাগালি করে বা) সুন্দর সুন্দর কাপড় পরে বা ভাল ভাল খাবার খায়, এরূপ ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই ছেলে-মেয়েদের মিশিতে দিবে না।

১৫। রাগ, মিথ্যা কথা, হিংসা, চুরি, চুগলি, খামাখা নিজের কথার উপর জেদ করা, বেহুদা কথা বলা, খামাখা হাসা বা বেশী হাসা, কাউকে ধোঁকা দেওয়া, ভাল-মন্দ আদব-তমীয বিবেচনা না করিয়া কথা বলা ইত্যাদি দোষগুলির প্রতি ছেলে-মেয়েদের যাহাতে আন্তরিক ঘৃণা জন্মে সেইরূপ উপদেশ দিবে (এবং ঘটনা শুনাইয়া ভাল স্বভাব এবং মন্দ স্বভাবের ছবি তাহাদের হৃদয় পটে আঁকিয়া দিবে।) যখনই কোন একটি দোষ দেখিবে তখনই তাম্বীহ্ করিবে এবং বুঝাইয়া উপদেশ দিবে।

১৬। ছেলে-মেয়েরা অসাবধানতাবশতঃ যদি কোন জিনিস ভাঙ্গিয়া ফেলে বা নষ্ট করিয়া ফেলে বা কোন ছেলে-মেয়েকে যদি দুষ্টামি করিয়া মারে বা গালি দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার

শাস্তির ব্যবস্থা করিবে যেন আগামীতে এরূপ কাজ আর না করে; নতুবা এইসব ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিলে ছেলে-মেয়ের স্বভাব চিরতরে খারাপ হইয়া যাইবে।

১৭। ছেলে-মেয়েদের অসময় ঘুমাইতে দিবে না, (সময় মত ঘুমাইতে দিবে এবং সময় মত উঠাইবে।)

১৮। ছেলে-মেয়েদের ঘুম হইতে ভোর সকালে উঠার অভ্যাস করাইবে, (ঘুম হইতে উঠিয়া মুরুব্বিগণকে দেখিলেই নম্রভাবে সালাম করিতে অভ্যাস করাইবে।)

১৯। সাত বৎসর বয়স হইলে নামায পড়ার অভ্যাস করাইবে।

২০। মক্তবে যাওয়ার বয়স হইলে সর্বপ্রথমে কোরআন শরীফ পড়াইবে। (খুব ছোট থাকিতে অনেক পড়ার বোঝা চাপাইয়া দিবে না। ইহাতে যেহেন এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। যেমন বয়স তেমন চাপ দিবে। কিছু দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলা আমোদ-স্ফূর্তিও করিতে দিবে। কিন্তু কুসংসর্গে যাইতে দিবে না।)

২১। ছোট বেলার শিক্ষা যাহাতে দ্বীনদার পরহেযগার ওস্তাদের কাছে হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

২২। মক্তবে যাইতে না চাহিলে কখনও প্রশ্রয় বা ঢিল দিবে না। যে প্রকারেই হউক নিয়মিতরূপে মক্তবে যাওয়ার অভ্যাস করাইবে।

২৩। ছেলে-মেয়েদের মাঝে মাঝে আউলিয়াগণের এবং পয়গম্বরদের কেচ্ছা শুনাইবে।

২৪। ছেলে-মেয়েদের নাটক নভেল, বা আশেক-মাশুকের কেচ্ছা পড়িতে দিবে না (এবং বায়স্কোপ থিয়েটার ও অন্যান্য খেলাফে শরা সভা-সমিতিতে যাইতে দিবে না এবং জীব জন্তুর ফটো বিশেষতঃ উলঙ্গ ছবি কিছুতেই দেখিতে দিবে না।)

২৫। ছেলে-মেয়েদের এরূপ বিষয় পড়িতে দিবে, যাহাতে ধর্মজ্ঞান ও নৈতিক উপদেশ লাভ হয় এবং দুনিয়ারও আবশ্যকীয় জ্ঞান লাভ হয়।

২৬। ছেলে মক্তব হইতে আসিলে কিছুক্ষণ তাহাকে খেলিবার সময় দিবে (সব সময় পড়াতে লাগাইয়া রাখিবে না। ইহাতে যেহেন কমজোর হইয়া যায়।) কিন্তু এমন খেলা খেলিবে যাহাতে গোনাহ্ না হয়, হাত পা ভাঙ্গিবার আশঙ্কা না থাকে (এবং খারাপ বালকদের সঙ্গে না মিশে)।)

২৭। কোনরূপ বাঁশী, বাদ্য বা আতশবাজি কিনিবার জন্য ছেলেদের পয়সা দিবে না।

২৮। ছেলে-মেয়েদের (বায়স্কোপ, যাত্রা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদির) খেল-তামাশা দেখিতে দিবে না।

২৯। ছেলে-মেয়েদের এমন কোন হাতের কাজ অবশ্য শিক্ষা দিবে, যাহা দ্বারা দরকার পড়িলে হালাল রুজি কামাই করিয়া নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিতে পারে।

৩০। (মেয়েদের দুনিয়ার বিদ্যা বা লেখা বেশী শিখাইবে না, যাহাতে চরিত্রের উন্নতি হয় এমন বিদ্যা শিক্ষা দিবে।) লেখা এত পরিমাণ শিখাইবে যাহাতে আবশ্যকীয় হিসাব এবং আবশ্যকীয় চিঠি-পত্র লিখিতে পারে; (হাতের শিল্প কাজ এবং পাকের কাজ বেশী শিক্ষা দিবে)।

৩১। ছেলে-মেয়েদের সব কাজ নিজ হাতে করিবার অভ্যাস করাইবে যাহাতে অকর্মা বা অলস না হইয়া যায়। রাত্রে শুইবার সময় বিছানা নিজ হাতে বিছাইবে। সকালে উঠিয়া নিজ হাতে বিছানা গুটাইয়া রাখিবে। নিজের কাপড়-চোপড়ের হেফাযত নিজেই করিবে। কাপড়ের সেলাই খুলিয়া গেলে বা ছিড়িয়া গেলে নিজ হাতে সেলাই করিয়া লইবে। (যে বাড়ীতে পানি আনার, ধান ভানার অভ্যাস আছে সে বাড়ীতে পানি আনার, ধান ভানার অভ্যাস করাইবে। ভালকথা,

নিজের মালের যত্ন এবং দরদ যাহাতে পয়দা হয় ও সতর্কতা জন্মে তাহার জন্য চেষ্টা করিবে এবং অকর্মন্য, অলস বা অসতর্ক হইতে দিবে না।)

৩২। মেয়েদের গায়ে যে সব জেওর থাকে তাহা ঘুমাইবার পূর্বে এবং ঘুম হইতে উঠিয়া যেন ভাল করিয়া দেখিয়া লয় যে, ঠিক আছে কিনা, ইহার তাকীদ করিবে।

৩৩। ছেলে-মেয়ের দ্বারা যখন কোন ভাল কাজ হয়, তখন তাহাদিগকে খুব সাবাস দিবে এবং পেয়ার করিবে বরং কিছু পুরস্কার দিলে আরও ভাল হয়। কারণ এই উপায়ে তাহাদের ভাল কাজ করার প্রতি আগ্রহ বাড়িবে। যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন সকলের সামনে শরম না দিয়া নির্জনে নিয়া বুঝাইবে যে, দেখ এমন কাজ করিলে সমস্ত লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে, কেহই তোমাকে ভালবাসিবে না, শরীফ লোকেরা এমন কাজ করে না, লোকে বলিবে ছোট লোকের ছেলে, গোনাহ্‌র কাজ করিলে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে ইত্যাদি। নির্জনে বুঝাইবে যাহাতে শরম ভাঙ্গিয়া একেবারে বে-শরম না হইয়া যায়। পুনরায় যদি এরূপ করে, তবে কিছু শাস্তি দিবে।

৩৪। পাক করা, সেলাই করা, চরখা ঘুরান, ফুল বুটা করা, কাপড় রঙ্গান ইত্যাদি যে কাজ বাড়ীতে হয়, মেয়েদের সেই সব খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিতে এবং শিখিতে বলিবে।

৩৫। বাপের ভয় ও হায়বত ছেলে-মেয়েদের দেলে পয়দা করা মার কর্তব্য।

৩৬। ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-লওয়া বা খেলাধুলা কোন কাজই গোপনে করিতে দিবে না। কারণ, তাহারা যে কাজ গোপনে করে, সে কাজ তাহাদের নিকট মন্দ বলিয়া তাহারা গোপনে করে। অতএব, বাস্তবিকই যদি কাজ মন্দ হয়, তবে ত তাহা করিতেই দিবে না। আর যদি বাস্তবিক পক্ষে মন্দ না হয়, তবে সকলের সামনে তাহা করিতে ক্ষতি কি?

৩৭। পরিশ্রমের কোন না কোন কাজ ছেলে-মেয়েদের জন্য নিয়মিতরূপে নির্ধারিত করিয়া দিবে যাহাতে তাহাদের পরিশ্রমের অভ্যাসও থাকে, কর্ম-প্রিয়তা এবং নিয়মানুবর্তিতাও শিখে। যেমন, ছেলেদের জন্য আধ মাইল বা এক মাইল দৌড়ান, মুগুর চালনা (বোঝা উঠান, কোদাল দ্বারা কোপান, নৌকা চালান, সাঁতার কাটা ইত্যাদি এবং মেয়েদের জন্য চরখা কাটা, যাঁতা পিষা, (ধান ভানা) ইত্যাদি, এইসব কাজ করাতে এই উপকারও আছে যে, এইসব কাজকে ঘৃণা করিবে না।

৩৮। ছেলে-মেয়েদের হাঁটার সময় যেন উপরের দিকে চাহিয়া বা (এদিক ওদিক চাহিয়া বা) অতি তাড়াতাড়ি না হাঁটে, ইহার তাকীদ করিবে (এবং খাওয়ার সময়ও যেন এদিক ওদিক না চায়, খাবার দিকে চাহিয়া ধীরভাবে খায় এবং পথের দিকে চাহিয়া ধীরভাবে হাঁটে এই অভ্যাস করাইবে)।

৩৯। ছেলে-মেয়েদের নম্রতা, ভদ্রতা শিক্ষা দিবে, ফখর বা গৌরব করিতে দিবে না এবং নিজের কাপড়, নিজের বাড়ী, নিজের বংশ, নিজের বই-পুস্তক, দোয়াত-কলম ইত্যাদির উপর গৌরব করিতে দেখিলেও নিষেধ করিবে (যে, নিজের তারীফ নিজে করিলে ইহাতে গৌরব প্রকাশ পায়, ইহা দূষণীয়)।

৪০। ছেলে-মেয়েদের মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছা মত (রাখিবার জন্য বা) কোন জিনিস কিনিয়া লইবার জন্য দুই চারিটা পয়সা দিবে; কিন্তু গোপনে কিনিবার অভ্যাস করিতে দিবে না, (যাহা কিনিবে সাক্ষাতে কিনিবে বা বলিয়া কিনিবে।)

৪১। ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-পিয়ার এবং মজলিসে উঠা-বসার আদব কায়দা শিক্ষা দিবে। আমরাও এখানে অল্প কিছু আদব লিখিয়া দিতেছি।

খানাপিনার আদব-কায়দা

খানাপিনার শুরুতে 'বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলিবে, তারপর ডান হাত দিয়া লোকমা ধরিয়া খাইবে এবং (পানির গ্লাস বা চায়ের পেয়ালা ডান হাতে ধরিয়া পান করিবে।) এক বর্তনে কয়েকজন খাইতে বসিলে নিজের সামনে হইতে খাইবে। (এক মজলিসে কয়েকজন খাইতে বসিলে সকলের সামনে যখন ভাত তরকারী পৌঁছিয়া যাইবে, তখন সকলে এক সঙ্গে "বিসমিল্লাহ্" বলিয়া খাওয়া শুরু করিবে।) নিজে একা একা আগে খাওয়া শুরু করিবে না, অন্যের খাওয়ার দিকেও তাকাইবে না। অন্যকে খাইতে দেখিলে সেখানে যাইবে না। কেহ কোন খাওয়ার জিনিস দিলে তাহা লইবে না (অবশ্য মুরুব্বির হুকুম হইলে তখন লইবে।) খুব জলদি খাইবে না (এবং অনেক আস্তেও খাইবে না। ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইবে কিন্তু চিবাইবার সময় যেন চপ্ চপ্ শব্দ না হয়।) এক লোক্মা ভাল মত না গিলিয়া আর এক লোক্মা ধরিবে না তরকারীর দাগ যেন কাপড়ে বা বিছানায় না লাগে এবং হাতেও যেন আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা বেশী না লাগে সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। (মজলিসের আগে খাওয়া হইলে আগে উঠিয়া যাইবে না। এক সঙ্গে উঠিবে বা এজাযত লইয়া উঠিয়া যাইবে। খাওয়ার কোন জিনিস অপছন্দ হইলে তাহা প্রকাশ করিবে না। খাওয়া শেষ হইলে 'আল্হামদু লিল্লাহ' বলিয়া আল্লাহ্র শোকর করিবে।)

মজলিসে উঠা-বসার নিয়ম

(মজলিসে গিয়া নম্রভাবে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলিয়া সকলকে সালাম করিবে। কোন খাছ মুরুব্বি তথায় থাকিলে তাঁহাকে খাছভাবে সালাম করিবে।) নম্রভাবে কথা বলিবে এবং নম্রভাবে বসিবে। মজলিসের মধ্যে থুথু ফেলিবে না বা নাক ছাফ করিবে না। যদি একান্ত দরকার পড়ে, তবে মজলিস হইতে উঠিয়া গিয়া নাক ঝাড়িয়া আসিবে। মজলিসের মধ্যে যদি হাই বা হাঁচি আসে তবে মুখের উপর হাত বা রুমাল রাখিয়া লইবে (হাইয়্যের মধ্যেও আদৌ আওয়াজ না হওয়া চাই,) হাঁচির মধ্যেও যথাসম্ভব কম আওয়াজ করিবে। কাহাকেও পাছে ফেলিয়া বসিও না বা কাহারও দিকে পা মেলিয়া বসিও না। মুখের নীচে হাত লাগাইয়া বসিও না, মজলিসের মধ্যে আঙ্গুল ফুটাইও না। বার বার কাহারও দিকে তাকাইও না। আদবের সহিত বসিয়া থাকিবে। বেশী কথা বলিও না। কথায় কথায় কছম খাইও না। (নিজের বড়াই দেখাইবার জন্য) নিজে নিজে কথা শুরু করিও না, (অন্যে যখন আদেশ করে তখন শুরু করিও।) অন্যে যখন কথা বলে, তখন তাহার কথা খুব কান লাগাইয়া শুন এবং তাহার কথার মধ্যে কথা বলিও না বা এদিকে-ওদিকে দেখিও না, এরূপ করিলে তাহার অপমান করা হয় এবং মনে কষ্ট পায়। অবশ্য যদি কোন গোনাহ্র কথা গীবৎ-শেকায়েত ইত্যাদি হয়, তবে তাহা শুনিবে না, হয় বন্ধ করিয়া দিবে, না হয় নিজে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। মজলিসের মধ্যে বসা অবস্থায় যদি অন্য কেহ তথায় আসে, তবে একটু সরিয়া তাহার জন্য জায়গা করিয়া দিবে। প্রথম সাক্ষাৎ বা মোলাকাতের সময় 'আস্সালামু আলাইকুম' বলিয়া সালাম করিবে (এবং নম্রভাবে 'মেযাজ-শরীফ' বা ভাল আছেন ত, বলিয়া

কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবে) এবং রোখ্ছতের সময় ('আমি এজাযত চাই' বা 'এখন আসি' বলিয়া এজাযত লইয়া) আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিয়া বিদায় হইবে।

॥ কাহার কি হক তাহার বয়ান ॥

মা-বাপের হক

১। মা-বাপ যদি অন্যায়ভাবেও কষ্ট দেয় তবুও মা-বাপকে কষ্ট দিবে না।

২। কথায়, কাজে এবং ব্যবহারে সবক্ষেত্রে মা-বাপের তা'যীম করিবে।

৩। (আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানির কথা না হইলে) মোবাহ কাজে মা-বাপের আদেশ অবশ্য পালন করিবে।

৪। মা-বাপ কাফের হইলেও দরকার হইলে তাহাদের ভরণ-পোষণের খেদমত করিবে।

৫। মা-বাপ মারা গেলে আজীবন তাঁহাদের গোনাহ্ বখশাইবার জন্য এবং আল্লাহ্‌র রহ্‌মত পাইবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিতে থাকিবে এবং নফল নামায, রোযা, তসবীহ, তাহ্‌লীল ইত্যাদি পড়িয়া এবং দান-খয়রাত করিয়া তাঁহাদিগকে ছওয়াব পৌঁছাইতে থাকিবে।

৬। মা-বাপের প্রিয়জনের সহিত (মা-বাপের খাতিরে) ভাল ব্যবহার করিবে। তাহাদের উপকার করিবে। তাহাদের খাওয়া পরার অভাব হইলে নিজের শক্তি অনুসারে তাহাদের সাহায্য করিবে।

৭। মা-বাপের ঋণ পরিশোধ করিবে এবং জায়েয অছিয়ত পালন করিবে।

৮। মা-বাপের মৃত্যুর পর চীৎকার করিয়া কাঁদিবে না; কারণ ইহাতে তাঁহাদের রূহের কষ্ট হয়।

দাদা, দাদী এবং নানা, নানীর হক মা-বাপেরই তুল্য। এইরূপে খালা এবং মামুর হক মার তুল্য, চাচা এবং ফুফুর হক বাপের তুল্য। হাদীস শরীফের ইশারায় এইরূপই প্রমাণিত হয়।

দুধ-মার হক

দুধ-মার সহিত আদব তা'যীমের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। যদি তাঁহা খাওয়া পরার অভাব হয়, তবে নিজের সাধ্য অনুসারে তাঁহার সাহায্য করিবে।

বিমাতার হক

সতাল মা নিজের জননী মা নন বটে, কিন্তু মার মতই তাঁহার আদব করিতে হইবে এবং যেহেতু তিনি পিতার প্রিয়জনের মধ্যে একজন প্রধান প্রিয়া, কাজেই তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার এবং জানে-মালে তাঁহার খেদমত করিতে হইবে।

ভাই-বোনের হক

হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বড় ভাই পিতৃ-তুল্য। অর্থাৎ, ছোট ভাই বড় ভাইকে পিতার ন্যায় সম্মান করিবে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, বড় ভাই ছোট ভাইকে সন্তানের ন্যায়

স্নেহ করিবে। এইরূপে বড় ভগ্নীকে মার মত সম্মান করিবে এবং ছোট ভগ্নীকে মেয়ের মত আদর করিবে।

অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হক

চাচা, ফুফু, ভাতিজা, ভাতিজী ভাগিনা, ভাগ্নী, মামু, খালা ইত্যাদি যাহাদের সহিত জন্মগত ভাবেই আত্মীয়তা হয়, তাহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে। সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যদি তাহাদের খাওয়া-পরার কষ্ট হয়, তবে সঙ্গতি অনুসারে তাহাদের সাহায্য করিতে হইবে। মাঝে মাঝে তাহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে হইবে। তাহাদের দ্বারা যদি কোন কষ্ট হয়, তবে তাহা সহ্য করিতে হইবে। আত্মীয়তা ছেদন করা যাইবে না।

শ্বশুর, শাশুড়ী, শালা, ভগ্নিপতি, জামাই, বৌ, স্ত্রীর আগের ঘরের সন্তান, স্বামীর অন্য পক্ষের সন্তান ইত্যাদি যাহাদের সহিত বিবাহের কারণে আত্মীয়তা হয়, তাহাদেরও কিছু হক কোরআন শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব, তাহাদের সহিতও সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে বেশী সদ্ব্যবহার করা দরকার। তাহারা কোন কষ্ট দিলে তাহা সহ্য করা দরকার। সাধ্যমত তাহাদের উপকার ও সাহায্য করা দরকার।

সাধারণ মুসলমানের হক

১। কোন মুসলমান কোন অন্যায় করিলে তাহা মাফ করিয়া দিবে। ২। কোন মুসলমানকে কাঁদিতে দেখিলে (বা কষ্টে দেখিলে) তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। ৩। কোন মুসলমানের দোষ অন্বেষণ করিবে না। ৪। কোন মুসলমান কোন ওজর পেশ করিলে বা মাফ চাহিলে তাহা গ্রহণ করিবে। ৫। কোন মুসলমানের কোন কষ্ট দেখিলে বা জানিতে পারিলে, তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। ৬। প্রত্যেক মুসলমানের খায়েরখাহী অর্থাৎ হিতকামনা করিবে। ৭। কোন মুসলমানের ভালবাসাকে উপেক্ষা করিবে না (এবং চিরজীবন তাহা নির্বাহ করিয়া চলিবে।) ৮। মুসলমানদের সহিত অঙ্গীকারের খেয়াল রাখিবে। ৯। কোন মুসলমান পীড়িত হইলে তাহার যত্ন নিবে। ১০। কোন মুসলমান মরিয়া গেলে (তাহার দাফন-কাফনে শরীক হইবে এবং) তাহার জন্য দো'আয়ে মাগফেরাত করিবে। ১১। কোন মুসলমান (ডাকিলে তাহার ডাকে সাড়া দিবে, কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিবে, আর্জু করিয়া, মহব্বত করিয়া) দাওয়াত করিলে তাহা গ্রহণ করিবে। ১২। কোন মুসলমান কোন তোহ্‌ফা হাদিয়া দিলে তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার মন সন্তুষ্ট করিয়া দিবে। ১৩। কোন মুসলমান সামান্য কোন উপকার করিলেও (তাহা সারা জীবন স্মরণ রাখিবে,) তাহার প্রত্যুপকারের জন্য আজীবন চেষ্টা করিবে। ১৪। কোন মুসলমান সামান্য নেয়ামত দান করিলেও (তাহা অতি বড় মনে করিয়া) তাহার শোকর গুজারী করিবে। ১৫। কোন মুসলমানের কোন কাজে ঠেকা পড়িলে সকলে মিলিয়া সেই কাজ উদ্ধার করিয়া দিবে। ১৬। যে কোন মুসলমানের বিবি বাচ্চার হেফাযত করিবে। ১৭। যে কোন মুসলমানের কাজ করিয়া দিবে (তাহাতে লজ্জাবোধ করিবে না বা বখীলী করিবে না বা পর মনে করিবে না।) ১৮। যে কোন মুসলমান কোন কথা বলিতে চাহিলে (কিছু সময় দিয়া মনোযোগ দিয়া) তাহা শুনিবে। ১৯। কোন মুসলমান কোন সুপারিশ করিলে তাহা যথাসম্ভব গ্রহণ করিবে। ২০। কোন মুসলমান কোন আশা করিয়া আসিলে আশায় তাহাকে নিরাশ বা বঞ্চিত করিবে না। ২১। কোন

মুসলমান হাঁচি দিয়া 'আলহাম্‌দু লিল্লাহ্, বলিলে, "ইয়ারহামুকাল্লাহ্" বলিয়া তাহাকে আল্লাহ্‌র রহমতের দো'আ দিবে। ২২। কোন মুসলমানের হারান জিনিস পাইলে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবে। ২৩। (কোন মুসলমানকে দেখিলে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিয়া সালাম করিবে এবং) কেহ সালাম করিলে "ওআলাইকুমুস্‌সালাম" বলিয়া তাহার জওয়াব দিবে। ২৪। প্রত্যেক মুসলমানের সহিত নম্রভাবে হাসিমুখে মিষ্টি ভাষায় কথা বলিবে। ২৫। (কোন মুসলমানেরই কোন ক্ষতি বা অপকার করিবে না ;) প্রত্যেক মুসলমানেরই উপকার করিবে (এবং করাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে।) ২৬। কোন মুসলমান যদি কোন বিষয়ে ন্যায্য কসম খাইয়া বসে, তবে তাহা পূর্ণ ও রক্ষা করার জন্য সকলে চেষ্টা করিবে। ২৭। কোন মুসলমানের উপর অত্যাচার হইতে দেখিলে তাহার সাহায্য করিবে এবং কোন মুসলমানকে অত্যাচার করিতে দেখিলে তাহাকে বাধা দিবে। ২৮। কোন মুসলমানের সহিত শত্রুতা করিবে না। প্রত্যেক মুসলমানকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ভালবাসিবে। ২৯। কোন মুসলমানকে লজ্জা দিবে না বা অপমান করিবে না। ৩০। নিজে যেইরূপ ব্যবহার পাইতে ভালবাস, প্রত্যেক মুসলমানের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিবে। ৩১। পুরুষের সহিত পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের সহিত স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ হইলে একে অন্যকে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিয়া সালাম করিবে এবং হাতে হাতে ধরিয়া মুছাফাহা করিয়া দেল মিশাইয়া রাখিবে। ৩২। যদি কোন কারণবশতঃ মুসলমানে মুসলমানে কিছু দ্বন্দ্ব-কলহ হইয়া যায়, তবে তিন দিনের বেশী তাহা মনে রাখিবে না, তিন দিনের মধ্যে তাহা আপোষ-মীমাংসা করিয়া ফেলিয়া রীতিমত সালাম কালাম করিবে। ৩৩। কোন মুসলমানের উপর বদগোমানী অর্থাৎ কু-ধারণা পোষণ করিবে না। ৩৪। মুসলমানের সহিত হিংসা-বিদ্বেষ করিবে না এবং কোন মুসলমানের সহিত মনোমালিন্য রাখিবে না। ৩৫। প্রত্যক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানকে সৎ-কাজে আদেশ এবং বদ-কাজ হইতে নিষেধ করিতে থাকিবে। ৩৬। প্রত্যেক মুসলমানই বড়কে আদব এবং ছোটকে স্নেহ করিবে। ৩৭। দুইজন মুসলমানের মধ্যে কোন ঝগড়া-কলহ হইয়া পড়িলে প্রত্যেক মুসলমানের তাহা মিটাইয়া দেওয়া ওয়াজেব। ৩৮। কোন মুসলমানেরই অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা বা গীবত করিবে না। ৩৯। কোন মুসলমানেরই কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি বা সম্মানের লাঘবজনক কোন কাজ করিবে না। ৪০। (মজলিসের মধ্যে) কোন মুসলমানকে তাহার জায়গা হইতে উঠাইয়া দিয়া তাহার জায়গায় বসিবে না।

প্রতিবেশীর হক

১। প্রতিবেশীর উপকার করিবে। প্রতিবেশীর সহিত অসদ্ব্যবহার করিবে না। (প্রতিবেশীর দ্বারা বা তাহার গরু-বাছুর ছাগল মুরগী বা ছেলে-মেয়ের দ্বারা যদি কিছু নষ্ট বা ক্ষতি হয়, তবে সে কারণে তাহার সহিত ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারি করিবে না, ছবর করিবে।)

২। প্রতিবেশীর বিবি-বাচ্চার, (গরু-বাছুর) ইত্যাদির হেফাযত করিবে। (তাহার অনুপস্থিতিতে বা তাহার অপারগ অবস্থায় লাকড়ি, পানি, বাজার সদায় ইত্যাদি কাজে তাহার সহায়তা করিবে। প্রতিবেশী গরীব হইলে তাহাকে বা তাহার ছেলে-মেয়েদের দেখাইয়া তাহাদের না দিয়া তুমি ভাল ভাল জিনিস খাইবে না বা ব্যবহার করিবে না।)

৩। মাঝে মাঝে প্রতিবেশীর বাড়ীতে তোহ্ফা হাদিয়া পাঠাইবে; তোমার ঘরে যাহাকিছু খাবার তৈয়ার হয়, তাহা হইতে কিছু তাহাদের দিবে। বিশেষতঃ প্রতিবেশী যদি গরীব হয় এবং খাওয়া পরার কষ্ট থাকে, তবে অবশ্য তাহাকে খাবার দিয়া তাহার সাহায্য করিবে।

৪। প্রতিবেশীকে কিছুতেই কোনরূপ কষ্ট দিবে না।

জানিয়া রাখিবে, প্রতিবেশী যেরূপ শহরের বা গ্রামের বাড়িতে হয়, তদ্রূপ সফরে এবং বিদেশেও হয়। বাড়ি হইতে যাহার সহিত একত্রে সফরে যায় বা বিদেশে গিয়া এক সঙ্গে সফর করে (বা স্কুলে বা মাদ্রাসায় বা অফিসে থাকে) এই সবই প্রতিবেশী। প্রতিবেশী সম্বন্ধে মোটামুটি এতটুকু খেয়াল রাখা দরকার যে, (নিজের কষ্টের চেয়ে তাহার কষ্টকে বড় মনে করিবে) নিজের আরামের চেয়ে তাহার আরামের জন্য বেশী চেষ্টা করিবে। কোন কোন নির্বোধ লোক গাড়ীর বা জাহাজের সহযাত্রীদের সহিত অনেক নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, ইহা বড়ই জঘন্য।

নিরাশ্রয়ের হক

১। যাহারা এতীম, বিধবা, অন্ধ, চিররোগা, আতুর, কর্মশক্তিহীন, দরিদ্র, ভিক্ষুক, মুসাফের, তাহাদের দয়া করা এবং তাহাদের সাহায্য করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য।

২। টাকা-পয়সা বা খাওয়া-পরার জিনিস দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে।

৩। তাহাদের বাড়ীর কাজ নিজ হাতে করিয়া দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে।

৪। কথার দ্বারা সান্ত্বনা দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে।

৫। এইরূপ হতভাগ্যের আকাঙ্ক্ষা রক্ষা করিয়া তাহাদের আবদার রদ না করিয়া তাহাদের সান্ত্বনা দিবে।

অমুসলমানের হক

১। (হিন্দু-খ্রীষ্টান প্রভৃতি অমুসলমানগণ মুসলমান না হইলেও তাহারা মানুষ। কাজেই মানুষ হওয়ার কারণে তাহাদেরও হক আছে।।) তাহাদের হক এই যে, অন্যায়ভাবে কাহারও জানে কষ্ট দিবে না বা কাহারও মালের কোন ক্ষতি করিবে না।

২। অন্যায়ভাবে কাহাকেও মন্দ বলিবে না বা গালি দিবে না বা কাহারও সহিত খামাখা ঝগড়া করিবে না।

৩। কাহাকেও খাওয়া-পরার অভাবে বা রোগের যন্ত্রণায় কষ্টভোগ করিতে দেখিলে বা বিপদগ্রস্ত দেখিলে বা আগুনে পুড়িতে বা পানিতে ডুবিতে দেখিলে তাহার জান-মাল বাঁচাইয়া দিবে, কষ্ট দূর করিয়া দিবে।

৪। শরীঅতের আইন অনুসারে কেহ শাস্তির উপযুক্ত হইলে ন্যায্য বিচার এবং ন্যায্য শাস্তি দিবে, অন্যায়ভাবে বিচার করিবে না বা শাস্তি দিবে না।

পশুপক্ষী, জীবজন্তু ইত্যাদির হক

১। (পশুপক্ষী, জীবজন্তু ইত্যাদি মানুষেরই উপকারার্থে সৃষ্টি করা হইয়াছে; কিন্তু অযথা কাহাকেও কষ্ট দেওয়ার কাহারও অধিকার নাই। কাজেই,) যে-সব পক্ষী বা পশুর দ্বারা মানুষের

কোন কাজ হয় না, উহাদের অনর্থক আবদ্ধ করিয়া রাখা চাই না। বিশেষতঃ বাসা হইতে শাবকদের নিয়া আসা এবং উহাদের মা-বাপকে এইরূপে কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা।

২। যে-সমস্ত পশু বা পক্ষী খাওয়ার উপযুক্ত নহে তাহাদের শুধু মনের আনন্দের জন্য বধ করিবে না।

৩। গৃহপালিত পশুপক্ষীদের খাওয়া-পিয়া এবং থাকার সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিবে, তাহাদের যাহাতে কষ্ট না হয়, আরামে থাকিতে পারে সে ব্যবস্থা করা দরকার এবং যেসব পশুর দ্বারা কাজ নেওয়া হয় তাহাদের শক্তির চেয়ে অতিরিক্ত কাজ তাহাদের দ্বারা নিবে না এবং নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের প্রহার করিবে না।

৪। যেসমস্ত জানওয়ার খাওয়ার জন্য যবাহ্ করা হয় বা মানুষের কষ্টদায়ক হওয়ার কারণে বধ করিয়া ফেলা হয় তাহাদেরও ধারাল অস্ত্র দ্বারা অতি শীঘ্র কাজ শেষ করিয়া দিবে। ক্ষুধার কষ্ট দিয়া বা ভোঁতা ছুরি দ্বারা কষ্ট দিবে না।

একটি জরুরী বিষয়

যদি কাহারও হক আদায় করার মধ্যে কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে (সে হক কি প্রকার।) যদি পরিশোধ করার উপযুক্ত হক হয় (যেমন কাহারও নিকট হইতে কোন মাল ধার আনিয়া তাহা দেয় নাই বা করয আনিয়া তাহা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে নাই বা বাকী সদায় আনিয়া দোকানদারের পয়সা দেয় নাই বা সুদ ঘুষ খাইয়াছে বা চুরি ডাকাতি করিয়াছে বা আমানত খেয়ানত করিয়াছে, যদি এই প্রকারের হক হয়,) তবে পরিশোধ করিয়া দিবে অথবা মাফ চাহিয়া লইবে। আর যদি পরিশোধ করার উপযুক্ত হক না হয় (যেমন কাহারও গীবত করিয়াছে বা কাহাকেও গালি দিয়াছে বা কাহাকেও অনর্থক মারিয়াছে) তবে শুধু মাফ চাহিয়া লইবে। আর যদি কোন কারণবশতঃ (হয়ত নিজের কাছে টাকা না থাকার দরুন বা হকদারের কোন ঠিকানা না পাওয়ার দরুন) হকদারের দেনা পরিশোধও করিতে পারে না এবং তাহাদের থেকে মাফও লইতে পারে না, তবে জীবন ভরিয়া হামেশা তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আয়ে মাগফেরাত করিতে থাকিবে। হয়ত এইরূপে চিরজীবন কান্না-কাটার ফলে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে রাযী করিয়া তাহাদের থেকে মাফ লইয়া দিতে পারেন। কিন্তু যদি পরে আবার কোন সময় মাফ লওয়ার বা পরিশোধ করার সুযোগ হয়, তবে অবহেলা করিলে চলিবে না, মাফ চাহিয়া লইবে অথবা পরিশোধ করিয়া দিবে। (এইসব হকুকুল এবাদের ব্যাপার বড়ই কঠিন বিষয়। এসম্বন্ধে কিছুতেই অবহেলা করিবে না।)

আর তোমার যেসব হক (পাওনা) অন্যের কাছে রহিয়া গিয়াছে তাহা যদি উসুল হওয়ার আশা থাকে, তবে নরমির সহিত উসুল করিয়া লইবে ; আর যদি উসুল হওয়ার আশা না থাকে বা হকই এমন হয় যে, তাহা উসুল হওয়ার উপযুক্ত নহে (যেমন গীবত, গালি ইত্যাদি) তবে যদিও ঐ সব হকের পরিবর্তে কিয়ামতের দিন নেকী পাওয়ার আশা আছে তবুও মাফ করিয়া দেওয়াতে আরও অধিক নেকী পাওয়ার আশা আছে; কাজেই একেবারেই মাফ করিয়া দিলে অধিক নেকী পাওয়ার আশা। তাই একেবারেই মাফ করিয়া দেওয়াই অধিক উত্তম। বিশেষতঃ যদি কেহ মাফ চায় বা খোশামোদ করে, তবে ত অবশ্যই মাফ করিয়া দেওয়া উচিত।

পরিশিষ্ট (জমীমা)

যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম

১৭। মাসআলা ঃ কোন পুরুষ অপর এক স্ত্রীর সহিত যিনা করিল। এখন ঐ স্ত্রীলোকের মা, ঐ স্ত্রীলোকের মেয়ে (বা মেয়ের মেয়ে অর্থাৎ নিম্নদিকে কোন মেয়ের সহিত (ই) ঐ পুরুষের বিবাহ দুরুস্ত হইবে না।

১৮। মাসআলা ঃ কোন স্ত্রীলোক কামভাবের সহিত বদ নিয়্যতে অপর কোন পুরুষের শরীর স্পর্শ করিল। এখন এই স্ত্রীলোকের মা এবং তাহার সন্তানের সহিত ঐ পুরুষের বিবাহ দুরুস্ত হইবে না। এইরূপে যদি কোন পুরুষ কামভাবসহ অপর কোন স্ত্রীলোকের শরীর স্পর্শ করিল, এখন ঐ পুরুষ, তাহার মা এবং সন্তানগণ ঐ স্ত্রীলোকের জন্য হারাম হইয়া যাইবে।

১৯। মাসআলা ঃ রাত্রে নিজের স্ত্রীকে জাগাইবার জন্য উঠিল। কিন্তু ভুলে তাহার কন্যার বা শাশুড়ীর গায়ে হাত এবং নিজ স্ত্রী মনে করিয়া কামভাবের সহিত তাহার গায়ে হাত দিল। এমতাবস্থায় এই পুরুষ তাহার স্ত্রীর জন্য চিরতরে হারাম হইয়া গেল। কোন প্রকারেই তাহাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না। এই পুরুষের তাহার স্ত্রীকে তালাক দিতেই হইবে।

২০। মাসআলা ঃ কোন ছেলে কুমতলবে তাহার বিমাতার শরীরে হাত লাগাইল। এখন ঐ ছেলের পিতার জন্য ঐ স্ত্রীলোক একেবারেই হারাম হইয়া গেল। কোন প্রকারে তাহার জন্য হালাল হইবে না। আর যদি বিমাতাও তাহার বিপুত্রের শরীরে কুমতলবে হাত লাগায়, তবেও ঐ একই হুকুম। অর্থাৎ স্বামীর জন্য একেবারে হারাম হইয়া যাইবে।

২১। মাসআলা ঃ কোন স্ত্রীলোকের স্বামী নাই। কিন্তু বদকারীতে হামল (গর্ভবতী) হইল। এই স্ত্রীলোকের বিবাহ দুরুস্ত আছে। কিন্তু সন্তান প্রসবের পূর্বে স্বামী-সহবাস দুরুস্ত নহে। অবশ্য যে ব্যক্তি যিনা করিয়াছে তাহার সহিত বিবাহ হইলে সহবাস দুরুস্ত হইবে।

জরূরী মাসআলা

তালাক দেওয়া অতি জঘন্য কাজ। একান্ত জরুরতবশতঃ অপারগ অবস্থায় যদি তালাক দিতে হয়, তবে নিম্নোক্ত তরীকা (নিয়ম) অবলম্বন করিবে। তালাকের তিনটি তরীকা আছে। ১। অতি উত্তম, ২। বেদ'আত এবং ৩। হারাম।

১। তালাকে অতি উত্তম তরীকা—স্ত্রী যখন হায়েয হইতে পাক হইবে, তখন (দুই হায়েযের মধ্যবর্তী পাকীর সময়কে ত্বহুর বলে) অর্থাৎ ত্বহুরের সময় এক তালাক দিবে। কিন্তু শর্ত হইল, যে ত্বহুরে তালাক দিবে ঐ পূর্ণ ত্বহুরের মধ্যে তাহার সহিত সহবাস হইতে বিরত থাকিবে। ইদ্দতের সময় কোন তালাক দিবে না; ঐ তালাকের ইদ্দত অতীত হইলে বিবাহ টুটিয়া যাইবে। বেশী তালাকের দরকার নাই। কারণ শরীঅতে একান্ত প্রয়োজনের সময়ে তালাকের অনুমতি আছে। সুতরাং প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক তালাকের কি দরকার থাকিতে পারে?

২। উত্তম তরীকা—স্ত্রী হায়েয হইতে পাক হইলে তিন তুহুরে তিন তালাক দিবে। ঐ সময় ঐ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না।

৩। তালাকের বেদ'আত এবং হারাম তরীকা—ইহা হইল উপরোক্ত তরীকার বিপরীত নিয়মে তালাক দেওয়া। যেমন, এক সঙ্গেই তিন তালাক দেওয়া, অথবা হায়েযের সময় তালাক দেওয়া, বা যে তুহুরে সহবাস করিয়াছে ঐ তুহুরে তালাক দেওয়া। শেষোক্ত তরীকার যে কোন অবস্থায় তালাক দিলে তালাক নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হইয়া যাইবে; কিন্তু গোনাহ্ হইবে। শরীঅতের এই মাসআলাটি বিশেষভাবে অনুধাবনীয় ও পালনীয়। উপরে যে হায়েযের সময় তালাক দেওয়া অবৈধ বলা হইয়াছে উহা ঐ স্ত্রী সম্বন্ধে যাহার সহিত সহবাস বা নির্জন-মিলন হইয়াছে। যদি স্বামী-সহবাস বা নির্জন-মিলন না হইয়া থাকে হায়েযের সময়েই হউক বা পাকীর সময়েই হউক উভয় অবস্থায়ই তালাক দেওয়া দুরুস্ত হইবে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় এক তালাক দিবে। তিন তালাক দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই।

ওলীর বয়ান

১০। মাসআলা ঃ (বিবাহের প্রস্তাব পেশ করার পর) কন্যা জবান দ্বারা স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করে নাই। কিন্তু বর যখন সহবাস করিতে আসিয়াছে তখন সে অস্বীকার করে নাই, এরূপ অবস্থায় হইলেও বিবাহ দুরুস্ত হইয়া গিয়াছে।

১৫। মাসআলা ঃ পিতা বা দাদা ব্যতীত অন্য কেহ (ভাই বা চাচা) বিবাহ দিয়া দিল। বিবাহের কথা মেয়ের জানা ছিল, পরে বালেগা হইল (স্বামী এখনও তাহার সহিত সহবাস করে নাই। কিন্তু যেইমাত্র বালেগা হইল তন্মুহূর্তেই সে বিবাহের কথা অস্বীকার করিয়া বলিল, 'আমি এই বিবাহে রাযী নাই' অথবা বলিল, 'আমি এই বিবাহ বাকী রাখিতে চাই না'। তথায় আর কেহ চাই উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, চাই একাই বসা থাকুক তবুও বিবাহ ভঙ্গ করাইতে হইলে ঐ কথা আওয়ায করিয়া বলিতেই হইবে যে, 'আমি এই বিবাহে রাযী নহি' কিন্তু শুধু এতটুকু বলাতেই বিবাহ ভঙ্গ হইবে না। শরয়ী হাকিমের নিকট যাইতে হইবে, তিনি যদি বিবাহ ভঙ্গ করিয়া দেন, তবে বিবাহ ভঙ্গ হইবে, অন্যথায় বিবাহ বিচ্ছেদ হইবে না। বালেগা হওয়ার পর এক মুহূর্তও যদি চুপ থাকে, তবে আর বিবাহ ভঙ্গ করাইবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু যদি বিবাহের কথা মেয়ের জানা না থাকে, বালেগা হওয়ার পর জানিতে পারিয়াছে, তবে যে মুহূর্তে জানিতে পারিয়াছে সেই মুহূর্তেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে হইবে। তখন এক মুহূর্তও যদি চুপ থাকে, তবে বিবাহ ভঙ্গ করাইবার অধিকার থাকিবে না। (এই হুকুম হইল মেয়ের বেলায়। ছেলে বালেগ হইলে তৎমুহূর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা জরুরী নহে; বরং তাহার রেযামন্দী বা সম্মতি কার্যে বা কথায় প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কবূল করা না করার অধিকার বজায় থাকিবে।

১৬। মাসআলা ঃ স্বামী সহবাস করার পর মেয়ে বালেগা হইল। এই অবস্থায় যদি বিবাহ ভঙ্গ করিতে চায়, তবে বালেগা হওয়া মাত্র কিংবা বিবাহের সংবাদ জ্ঞাত হওয়া মাত্রই এন্কার করা জরুরী নহে; বরং যে পর্যন্ত তাহার রেযামন্দীর (সম্মতির) অবস্থা জানা না যাইবে, সে পর্যন্ত কবূল করা না করার অধিকার বাকী থাকিবে—যত সময়ই অতীত হউক না কেন। অবশ্য সে যখন মুখে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিল যে, অমি মঞ্জুর করিলাম অথবা অনুরূপ কোন কথা প্রকাশ পাইল

যাহাতে রেযামন্দী ছাবেত হয়। যেমন, নির্জনে স্বামীর সহিত স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় রহিল তবে আর বিবাহ ভঙ্গের অধিকার থাকিবে না। বিবাহ লাযেম হইয়া যাইবে।

মহর

মাসআলাঃ নিজ অবস্থানুযায়ী ১০·০০, ২০·০০, ১০০·০০, বা হাজার টাকা। মহর ধার্য করিয়া বিবিকে নিজের বাড়ীতে নিয়া আসিল এবং তাহার সহিত সহবাস করিল কিংবা সহবাস করে নাই বটে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী এমন নির্জন স্থানে অবস্থান করিল যেখানে সহবাসের কোনও প্রতিবন্ধকতা ছিল না, এখন নির্ধারিত পূর্ণ মহর দিতে হইবে। অথবা এরূপ কোন অবস্থা হয় নাই, অথচ স্বামী বা স্ত্রী মারা গেল, তবুও পুরা মহর ওয়াজেব হইবে। আর যদি উক্তরূপ কোন অবস্থা না হইয়া স্বামী তালাক দিয়া থাকে, তবে নির্ধারিত মহরের অর্ধেক দিতে হইবে। মোটকথা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি উক্তমত নির্জন-মিলন হইয়া থাকে অথবা উভয়ের মধ্যে কেহ মারা যায়, তবে পুরা মহর ওয়াজেব হইবে। আর যদি উপরোক্ত মতে নির্জন-মিলন হওয়ার পূর্বে তালাক হইয়া যায়, তবে অর্ধেক মহর ওয়াজেব হইবে।

৪। মাসআলাঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কোন একজন অসুস্থ ছিল অথবা রমযানের রোযা রাখিয়াছিল অথবা হজ্জের এহ্রাম বাঁধিয়াছিল অথবা স্ত্রী হায়েয ছিল অথবা তথায় কেহ উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল, এসকল অবস্থায় যদি তাহাদের নির্জন-মিলন হইয়া থাকে, তবে তাহা নির্জন-মিলন বলিয়া ধরা হইবে না। ইহাতে পুরা মহর ওয়াজেব হইবে না। এমতাবস্থায় যদি তালাক দেওয়া হয়, তবে স্ত্রী অর্ধেক মহর পাইবার অধিকারিণী হইবে। রমযানের রোযা রাখে নাই, নফল বা ক্বাযা রোযা বা মান্নতের রোযা রাখিয়াছে এবং নির্জন-মিলন হইয়াছে, এমতাবস্থায় স্ত্রী পুরা মহরের হকদার হইবে এবং স্বামী পুরা মহর দিতে বাধ্য হইবে।

৫। মাসআলাঃ স্বামী 'না-মরদ', এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নির্জন-মিলন হইয়াছে, এরূপ হইলে পুরা মহর ওয়াজেব হইবে। এইরূপ নপুংসক বিবাহ করিয়া নির্জন-মিলনের পর তালাক দিয়াছে, তবুও পুরা মহর ওয়াজেব হইবে।

৬। মাসআলাঃ স্বামী-স্ত্রী নির্জনে রহিল; কিন্তু স্ত্রী এত ছোট যে, সহবাসের যোগ্য নহে, কিংবা স্বামী খুব ছোট, সহবাসে সক্ষম নহে, এরূপ অবস্থায় নির্জন-মিলন হইলেও পুরা মহর ওয়াজেব হইবে না।

১৫। মাসআলাঃ কেহ বে-কায়দা বিবাহ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন, গোপন বিবাহ করিয়াছে, যথারীতি দুইজন সাক্ষী সম্মুখে ছিল না অথবা দুইজন সাক্ষী উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহারা বধির ছিল, বিবাহ বন্ধনের শব্দগুলি শুনিতে পায় নাই, কিংবা পূর্ব স্বামী তালাক দিয়াছিল, অথবা মারা গিয়াছিল এখনও ইদ্দত পূর্ণ হয় নাই, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছে। এইরূপ কোন (শরীঅত বিরোধী) বেকায়দা কাজ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু স্বামী এখনও সঙ্গম করে নাই, তবে কোন মহর পাইবে না। যদি সঙ্গম করিয়া থাকে, তবে মহরে মেছেল দিতে হইবে। কিন্তু যদি বিবাহকালে কোন মহর নির্ধারিত করিয়া থাকে, মহরে মেছেল তদপেক্ষা বেশী হয়, তবে ঐ নির্ধারিত মহরই পাইবে, মহরে মেছেল পাইবে না।

১৬। মাসআলা ঃ কেহ আপন স্ত্রী মনে করিয়া ভুলে অন্য স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিল তাহাকেও মহরে মেছেল দিতে হইবে। এই সঙ্গমকে যেনা বলা যাইবে না এবং ইহাতে গোনাহ্ও হইবে না। ইহাতে যদি গর্ভ হয়, তবে তাহার নছব ঠিক থাকিবে। নছবে কোন দোষ বা কলঙ্ক হইবে না, উহাকে হারামী বলা দুরুস্ত হইবে না। যখন জানা যাইবে যে, সে তাহার স্ত্রী নহে, তখন তাহাকে ঐ স্ত্রী হইতে পৃথক থাকিতে হইবে, পুনরায় সঙ্গম করা দুরুস্ত হইবে না। ঐ স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা ওয়াজেব হইবে। ইদ্দত পুরা করা ব্যতীত নিজ স্বামীর সহিত অবস্থান করা এবং স্বামীরও তাহার সহিত সঙ্গম করা দুরুস্ত হইবে না। ইদ্দতের বিধান পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭। মাসআলা ঃ যে পরিমাণ মহর অগ্রিম দেওয়ার নিয়ম আছে, সেই পরিমাণ মহর পূর্বে দেয় নাই। এমতাবস্থায় স্বামীকে সহবাস করিতে না দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর আছে। একবার সঙ্গম করিয়া থাকিলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারও সহবাস হইতে বঞ্চিত রাখার অধিকার স্ত্রীর থাকিবে। স্বামী বিদেশে সফরে নিতে চাহিলে ঐ মহর আদায় না করিয়া নিতে পারিবে না। আর যদি এমতাবস্থায় স্ত্রী নিজের কোন প্রিয় মাহ্রাম আত্মীয়ের সহিত বিদেশে যায় বা নিজের পিত্রালয়ে চলিয়া যায়, তবে স্বামী তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। ঐ নির্ধারিত মহর পরিশোধ করিয়া দিলে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঐসব কিছুই করিতে পারিবে না। স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোথাও আসা-যাওয়া করা জায়েয হইবে না। স্বামী যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারিবে তাহাতে অস্বীকার করিতে পারিবে না।

কাফেরের বিবাহ

৩। মাসআলা ঃ স্ত্রী মুসলমান হইয়া গেল, স্বামী মুসলমান হইল না। (এখন বিবাহ রহিল না, কিন্তু) এই স্ত্রী পূর্ণ তিন হায়েয অতীত না হওয়া পর্যন্ত অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে না।

স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

৪। মাসআলা ঃ রাত্রে সকল স্ত্রীর ঘরে সমভাবে থাকা ত ওয়াজেব; কিন্তু সকল স্ত্রীর সহিত সমপরিমাণ সঙ্গম করা ওয়াজেব নহে। একজনের পালায় সঙ্গম করিলে অন্য জনের পালায়ও জরুরী নহে।

স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে তালাক

স্বামী-স্ত্রী যদি নির্জনে মিলিত হইয়া থাকে, সঙ্গম হউক বা না হউক এখন স্ত্রীকে পরিষ্কার শব্দে তালাক দিলে তালাকে রজয়ী হইবে, পুনঃ বিবাহ ব্যতীত স্ত্রীকে রাখিবার এখ্তিয়ার স্বামীর থাকিবে। একাধিক অর্থবোধক শব্দের দ্বারা তালাক দিলে বায়েন তালাক পড়িবে; (পুনর্বিবাহ ব্যতিরেকে স্বামী তাহাকে পুনর্বার গ্রহণ করিতে পারিবে না।) কিন্তু স্ত্রীর ইদ্দত পালন করিতে হইবে, ইদ্দত পুরা হইবার পূর্বে অন্যের সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না। এই ইদ্দতের মধ্যে তাহার স্বামী ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালাক দিতে পারে।

তিন তালাকের মাসআলা

১। মাসআলা ঃ (তিন তালাকের পর) যদি পুনরায় ঐ পুরুষের সহিত থাকিতে চায় এবং বিবাহে আবদ্ধ হইতে চায়, তবে উহার একটি মাত্র ছুরত (উপায়) আছে। তাহা এই—প্রথমে অন্য কোন পুরুষের সহিত বিবাহে আবদ্ধ হইবে এবং সহবাসও করিবে। যখন এই স্বামী মরিয়া যায় বা স্বইচ্ছায় তালাক দিয়া দেয়, তখন ইদ্দত পুরা করার পর প্রথম স্বামীর নিকট বিবাহ বসিতে পারিবে। অন্য স্বামী গ্রহণ ব্যতীত প্রথম স্বামী বিবাহ করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিল, এখনও স্ত্রী-সহবাস হয় নাই কিন্তু স্বামী মারা গেল অথবা সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়া দিল, এই বিবাহ ধর্তব্য নহে। প্রথম স্বামীর সহিত ঐ সময় বিবাহ হইতে পারিবে যখন দ্বিতীয় স্বামীর সহিত সহবাসও হইবে। দ্বিতীয় স্বামীর সহিত সহবাস ব্যতীত প্রথম স্বামী পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(প্রকাশ থাকে যে, অনেক দুষ্ট লোক পরামর্শ করিয়া 'এক দুই রাত রাখিয়া তালাক দিয়া দিবেন' এই শর্ত করিয়া দ্বিতীয় স্বামীর নিকট বিবাহ দেয় এবং উহাকে হিলাশরা বলে, ইহা অতি জঘন্য পাপ। হাদীস শরীফে আছে, এইরূপ যে করিবে এবং যাহার কথায় বা পরামর্শে করিবে উভয়ের উপর লা'নত।)

৪। মাসআলা ঃ যদি দ্বিতীয় স্বামীর সহিত এই শর্তে বিবাহ হইয়া থাকে যে, সহবাসের পর স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিবে। এরূপ এক্‌রার লওয়া ধর্তব্য নহে। তাহার ইচ্ছা, ছাড়িয়াও দিতে পারে, নাও দিতে পারে। এরূপ এক্‌রার করিয়া বিবাহ করা হারাম। ইহাতে বড় গোনাহ হয়। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে লা'নত পতিত হয়; কিন্তু বিবাহ হইয়া যায়, দ্বিতীয় স্বামী সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দেউক বা মারা যাউক, প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হইবে।

শর্তের উপর তালাক

১। মাসআলা ঃ কেহ তাহার স্ত্রীকে বলিল, যদি তোমার হায়েয আসে, তবে তোমাকে তালাক। ইহার পর তাহার রক্ত দেখা দিল, তখনই তাহার উপর তালাকের হুকুম বর্তিবে না; বরং পূর্ণ তিন দিন তিন রাত রক্ত আসিলে এই তিন দিন তিন রাত্রির পর যে সময় হইতে রক্ত আসিয়াছিল, সেই সময় তালাক বর্তিবে।

আর যদি একথা বলিয়া থাকে যে, যখন তোমার এক হায়েয আসিবে, তখন তোমাকে তালাক। এই অবস্থায় যখন হায়েয শেষ হইবে, তখন তালাক পতিত হইবে।

রজআতের বয়ান

২। মাসআলা ঃ (রজয়ী তালাক দেওয়ার পর) রজআতের এক তরীকা ইহাও যে, মুখে ত কিছুই বলে নাই, কিন্তু তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে, অথবা তাহাকে চুম্বন করিয়াছে বা পেয়ার করিয়াছে বা কামভাবের সহিত তাহার শরীরে হাত লাগাইয়াছে, এসমস্ত অবস্থায় সে স্ত্রী হইয়া যাইবে, পুনরায় বিবাহের প্রয়োজন নাই।

৫। মাসআলাঃ যে নারীর হায়েয আসে তাহার তালাকের ইদ্দত তিন হায়েয। তিন হায়েয পুরা হইয়া গেলে ইদ্দত পুরা হইয়া যাইবে। এখন বুঝিয়া লও যে, তৃতীয় হায়েয পুরা দশ দিন আসিল, তখন যে সময় রক্ত বন্ধ হইল এবং দশ দিন পূর্ণ হইল, ঐ সময়েই তাহার ইদ্দত শেষ হইল। রজয়ী তালাকের পর ফিরাইয়া লওয়ার যে অধিকার পুরুষের ছিল তাহা আর কোনদিন থাকিবে না, স্ত্রী গোসল করুক বা না করুক ইহা ধর্তব্য নহে। যদি তৃতীয় হায়েয দশ দিনের কম আসিয়া রক্তও বন্ধ হইল, আওরত এখনও গোসল করে নাই এবং তাহার উপর কোন নামাযও ওয়াজেব হইল না, তবে এখনও পুরুষের এখ্‌তিয়ার থাকিবে, এখনও যদি স্বেচ্ছায় মত ফিরাইয়া লয়, তবে সে নারী তাহার স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু রক্ত বন্ধ হওয়ার পর নারী গোসল করিল, অথবা গোসল করে নাই বটে, কিন্তু এক নামাযের সময় অতীত হইয়া গেল, অর্থাৎ এক নামাযের ক্বাযা তাহার উপর ওয়াজেব হইল, এই উভয় অবস্থাতেই পুরুষের এখ্‌তিয়ার থাকিবে না। এখন বিবাহ ব্যতীত আর তাহাকে রাখা যাইবে না।

৬। মাসআলাঃ যে স্ত্রীর সহিত এখনও সহবাস করে নাই যদিও নির্জন মিলন হইয়া থাকে, তাহাকে এক তালাক দিয়া ফিরাইয়া রাখার এখতিয়ার থাকে না। কেননা, তালাক দিলে বায়েন তালাক বলিয়া গণ্য করা হইবে। এসম্বন্ধে উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ভাল করিয়া স্মরণ রাখিবে।

৭। মাসআলাঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একস্থানে নির্জনে রহিল। কিন্তু পুরুষ বলে, আমি সহবাস করি নাই। এমতাবস্থায় তালাক দিয়া দিল, এখন আর তালাক হইতে রজ'আত করার এখতিয়ার রহিল না।

স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার কসম

১। মাসআলাঃ এক ব্যক্তি কসম খাইয়া বলিল খোদার কসম, এখন আর সহবাস করিব না; খোদার কসম, তোর সহিত কখনও সহবাস করিব না; কসম খাইতেছি যে, তোমার সহিত ছোহ্‌বত করিব না, অথবা অন্য কোন প্রকারে বলিল, এ সমস্ত অবস্থায় হুকুম হইল এই—যদি সহবাস না করিয়া থাকা অবস্থায় চারি মাস অতীত হইয়া যায়, তবে স্ত্রীর উপর বায়েন তালাক পড়িবে। এখন পুনঃ বিবাহ ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় সহবাস করিতে পারিবে না। যদি চারি মাসের ভিতর কসম ভঙ্গ করে এবং সহবাস করে, তবে তালাক হইবে না, অবশ্য কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হইবে। এইরূপ কসমকে শরীঅতের ভাষায় "ঈলা" বলে।

২ মাসআলাঃ হামেশার জন্য সহবাস না করার কসম খাইল না; বরং শুধু চারি মাসের জন্য কসম খাইল, যেমন বলিল, খোদার কসম চারি মাস কাল তোমার সহিত সহবাস করিব না, ইহাতে ঈলা হইয়া যাইবে। ইহারও বিধান এই যে, ৪ মাস সহবাস না করিলে বায়েন তালাক পতিত হইবে। ৪ মাসের পূর্বে সহবাস করিলে কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। কসমের কাফ্‌ফারা সম্বন্ধে পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

৩। মাসআলাঃ চারি মাস হইতে কম সময়ের কসম খাইলে তাহাতে ঈলা হইবে না। এমন কি, চারি মাসের একদিন কমের কসম খাইলেও ঈলা হইবে না। অবশ্য যত দিনের কসম খাইবে, ততদিনের পূর্বে সহবাস করিলে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। সহবাস না করিলে তালাক বর্তিবে না, কসমও পুরা থাকিবে।

৪। **মাসআলা ঃ** কেহ শুধু চারি মাসের জন্য কসম খাইল, কসম ভাঙ্গিল না, চারি মাসের পর তালাক বর্তিল। তালাকের পর ঐ পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হইল। এখন চারি মাস পর্যন্ত সহবাস না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

হামেশার জন্য কসম খাইল, যেমন বলিল, 'কসম খাইতেছি যে, এখন হইতে আর তোমার সহিত সহবাস করিব না'। অথবা বলিল, 'খোদার কসম, তোমার সহিত কখনও সহবাস করিব না'। সে কসম ভঙ্গ করিল না। চারি মাস পর তালাক হইয়া যাইবে। ইহার পর তাহাকে বিবাহ করিল, বিবাহের পর চারি মাস পর্যন্ত সহবাস করিল না, এখন পুনরায় তালাক হইয়া যাইবে। তৃতীয় বার তাহাকেই বিবাহ করিল, তাহারও হুকুম এই যে, এই বিবাহের পর যদি চারি মাস সহবাস না করে, তবে তৃতীয় তালাক পতিত হইবে। এখন অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ইহার সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না। অবশ্য যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিবাহের পর সহবাস করিত, তবে কসম ভঙ্গ হইত। তাহা হইলে আর কখনও তালাক পড়িত না, অবশ্য কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হইত।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি এইরূপে আগে পিছে তিন বিবাহেই তিন তালাক পড়িয়া গেল। ইহার পর স্ত্রী অপর স্বামী গ্রহণ করিল, এখন এই স্বামী তালাক দিল। এমতাবস্থায় ইদ্দত শেষে প্রথম স্বামীর সহিত পুনরায় বিবাহ হইল, সে সহবাস করিল না। এখন তালাক পড়িবে না, যত দিনই সহবাস না করুক না কেন। কিন্তু যখনই সহবাস করিবে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হইবে। কারণ, সে যে কসম খাইয়াছিল "কখনও তাহার সহিত সহবাস করিবে না" সে কসম ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

৬। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেওয়ার পর যদি তাহার সহিত সহবাস করার কসম খায়, তবে ঈলা হইবে না। এখন যদি পুনরায় বিবাহের পর সহবাস না করে তবে তালাক বর্তিবে না। কিন্তু সহবাস করিলে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হইবে। যদি রজয়ী তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের ভিতর এইরূপ কসম খায়, তবে ঈলা হইবে। যদি রজ'আত করে এবং সহবাস না করে, তবে চারি মাস পর তালাক বর্তিবে। যদি সহবাস করে, তবে কসমের কাফ্ফারা দিবে।

৭। **মাসআলা ঃ** খোদার কসম খায় নাই; বরং বলিল, 'যদি তোমার সহিত সহবাস করি, তবে তুমি তালাক। ইহাতেও ঈলা হইয়া যাইবে। সহবাস করিলে রজয়ী তালাক হইবে, কসমের কাফ্ফারা দিতে হইবে না। সহবাস না করিলে চারি মাস পর বায়েন তালাক হইবে।

আর যদি বলে, 'তোমার সহিত সহবাস করিলে আমার উপর এক হজ্জ অথবা এক রোযা, এক টাকা খয়রাত অথবা এক কোরবানী,' এই সকল ছুরতেও ঈলা হইবে। যদি সহবাস করে, তবে যে কথা বলিয়াছে উহা করিতে হইবে, কাফ্ফারা দিতে হইবে না। যদি চারি মাস সহবাস না করে, তবে তালাক হইবে।

বিবিকে মাতার সমতুল্য বলা

[ঈলা ও যেহারের বয়ান দ্রষ্টব্য]

১। **মাসআলা ঃ** কেহ আপন স্ত্রীকে বলিল, "তুমি আমার মায়ের সমতুল্য অথবা বলিল, 'তুমি আমার জন্য মায়ের সমতুল্য, তুমি আমার হিসাবে মার তুল্য, এখন তুমি আমার নিকট মাতার ন্যায় বা মাতার মত'। এই সকল অবস্থায় দেখিতে হইবে, তাহার মতলব কি। যদি এই মতলব

হয় যে, তা'যীম ও বুযুর্গীতে মায়ের বরাবর অথবা এই মতলব হয় যে, তুই একেবারে বুড়ি, বয়সে আমার মায়ের সমান, তাহা হইলে এরূপ বলায় যেহার হইবে না। আর যদি বলার সময় কোন নিয়্যত না থাকে এবং কোন মতলব না থাকে, এমনি বলিয়া ফেলিয়াছে তাহাতেও যেহার হইবে না। যদি তালাক বা ছাড়িয়া দিবার নিয়্যত থাকিয়া থাকে, তবে এক তালাক বায়েন হইবে; যদি তালাক দিবারও নিয়ত না থাকিয়া থাকে, স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিবারও নিয়্যত ছিল না; বরং মতলব শুধু এই যে, যদিও তুমি আমার স্ত্রী, তোমা হইতে বিবাহ ছিন্ন করিতেছি না, কিন্তু তোমার সঙ্গে কখনও সহবাস করিব না, তোমার সহিত সহবাস করা আমার উপর হারাম করিয়া লইলাম। ভরণ-পোষণ নিয়া পড়িয়া থাক। মোটকথা, তাহাকে ছাড়িয়া দিবার নিয়্যত ছিল না, সহবাস করাকে হারাম করিয়া লইয়াছে। ইহাকে শরীঅতের বিধানে 'যেহার' বলে। ইহার হুকুম হইল এই—সে স্ত্রী স্ত্রীই থাকিবে, কিন্তু স্বামী কাফ্‌ফারা আদায় না করা পর্যন্ত তাহার সহিত সহবাস করা, কামভাবের সহিত তাহাকে স্পর্শ করা, চুম্বন করা, পেয়ার করা ইত্যাদি হারাম থাকিবে। এই অবস্থায় যত বৎসরই অতীত হউক না কেন কাফ্‌ফারা আদায় করিলে উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় থাকিতে পারিবে, পুনরায় বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইহার কাফ্‌ফারা রোযা ভঙ্গে কাফ্‌ফারার ন্যায় দিতে হইবে।

২। মাসআলাঃ কাফ্‌ফারা দিবার পূর্বেই যদি সহবাস করে, তবে বড় গোনাহ্‌ হইবে। তজ্জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট গোনাহ্‌ মাফের জন্য তওবা এস্তেগফার করিবে। আর দৃঢ় সংকল্প করিবে যে, কাফ্‌ফারা না দিয়া আর কখনও সহবাস করিবে না। কাফ্‌ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীও স্বামীকে তাহার নিকট ঘেঁষিতে দিবে না।

৩। মাসআলাঃ যদি ভগ্নী, মেয়ে, ফুফু অথবা এমন এক স্ত্রীলোকের সহিত তুলনা করে যাহার সহিত চিরকাল বিবাহ হারাম, তবে তাহারও এই একই হুকুম।

৪। মাসআলাঃ কেহ বলিল, তুই আমার জন্য শূকর সদৃশ, তবে যদি তালাক বা ছাড়িয়া দিবার নিয়্যত থাকিয়া থাকে, তবে ত তালাক হইবেই। আর যদি যেহারের নিয়্যত করিয়া থাকে অর্থাৎ মতলব ছিল যে, তালাক ত দিতাম না; বরং সহবাস করা নিজের উপর হারাম করা, তবে কিছুই হয় নাই, তদ্রূপ যদি কোন নিয়্যত না করিয়া থাকে, তবেও কিছু হয় নাই।

৫। মাসআলাঃ যদি যেহারে চারি মাস কিংবা তদপেক্ষা অধিককাল স্ত্রী-সহবাস না করিয়া থাকে এবং কাফ্‌ফারা না দিয়া থাকে, তবে তালাক হইবে না ইহাতে ঈলাও হইবে না।

৬। মাসআলাঃ কাফ্‌ফারা না দেওয়া পর্যন্ত দেখা ও কথাবার্তা বলা হারাম নহে, তবে গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দুরুস্ত নহে।

৭। মাসআলাঃ সর্বদার জন্য যেহার না করিয়া একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিল। যেমন বলিল, "এক বৎসরের জন্য বা চারি মাসের জন্য তুই আমার মায়ের সমতুল্য" তাহা হইলে নির্ধারিত সময় যেহার থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে সহবাস করিতে চাহিলে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের পর সহবাস করিলে কিছুই দিতে হইবে না। স্ত্রী তাহার জন্য হালাল হইবে।

৮। মাসআলাঃ যেহারেও যদি তৎক্ষণাৎ ইন্‌শাআল্লাহ্‌ বলিয়া ফেলে, তবেও কিছুই হয় নাই।

৯। মাসআলাঃ নাবালেগ ছেলে এবং উন্মাদ পাগল যেহার করিতে পারে না। করিলেও কিছুই হইবে না। যাহার সহিত এখনও বিবাহ হয় নাই, এমন স্ত্রীলোকের সহিত যেহার করিলেও কিছু হইবে না। এখন তাহার সহিত বিবাহ দুরুস্ত হইবে।

১০। মাসআলাঃ যদি যেহারের শব্দ কয়েকবার বলে। যেমন, দুইবার তিনবার এই কথাই বলিল যে, তুই আমার জন্য মায়ের ন্যায়; এরূপ যে কয়বার বলিয়াছে, ঐ পরিমাণ কাফ্ফারা দিতে হইবে। অবশ্য দুই বা তিনবার যদি কথাটি পাকা ও মজবুত করার নিয়্যতে বলিয়া থাকে এবং নূতন করিয়া বলিবার ইচ্ছা না থাকিয়া থাকে, তবে একই কাফ্ফারা দিবে।

১১। মাসআলাঃ যদি কয়েক স্ত্রীকে এরূপ বলিয়া থাকে, তবে যে কয়েকজন স্ত্রী থাকিবে, তত কাফ্ফারা দিবে।

১২। মাসআলাঃ যদি 'তুমি আমার মার তুল্য, তুমি আমার ভগ্নীর তুল্য' না বলিয়া থাকে (অর্থাৎ তুল্য শব্দ না বলে) শুধু 'তুমি আমার মা' 'তুমি আমার ভগ্নী' বলিয়া থাকে, তবে ইহাতে যেহার হইবে না, স্ত্রী হারাম হইবে না। অবশ্য এরূপ বলা অন্যায় ও গোনাহ্। তদ্রূপ ডাকিবার সময় এরূপ বলা যে, আমার বোন, অমুক কাজ কর, এরূপ বলাও অন্যায়, তবে ইহাতে যেহার হইবে না।

১৩। মাসআলাঃ কেহ বলিল, যদি তোমাকে রাখি, তবে মাকে রাখিলাম। অথবা বলিল, যদি তোমার সহিত সহবাস করি, তবে যেন মায়ের সহিত সহবাস করি। ইহা অত্যন্ত খারাপ কথা, অত্যন্ত গোনাহের কথা, কিন্তু ইহাতে যেহার হইবে না।

১৪। মাসআলাঃ যদি বলে, তুমি আমার জন্য মায়ের ন্যায় হারাম, তবে তালাকের নিয়্যতে বলিয়া থাকিলে তালাক হইবে, আর যেহারের নিয়্যত করুক বা কিছুই নিয়্যত না করুক, যেহার হইবে, কাফ্ফারা দিয়া সহবাস করিতে পারিবে।

কাফ্ফারার বয়ান

১। মাসআলাঃ যেহারের কাফ্ফারা রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারার ন্যায়। এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পূর্বেই পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তথায় ভাল করিয়া দেখিবে। এখানে কতকগুলি জরুরী কথা বর্ণনা করিতেছি, তাহা তথায় বর্ণনা করা হয় নাই।

২। মাসআলাঃ সামর্থ্য থাকিলে পুরুষ একলাগা ৬০টি রোযা রাখিবে। মাঝখানে কোন রোযাই ছুটিতে পারিবে না। রোযা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সহবাস করিতে পারিবে না। রোযা শেষ হইবার পূর্বে, রাত্রেই হউক বা দিনেই হউক, স্বেচ্ছায় হউক, বা ভুলে হউক যদি স্ত্রী-সহবাস করে, তবে পুনঃ প্রথম হইতে শুরু করিয়া সমস্ত রোযা রাখিতে হইবে।

৩। মাসআলাঃ যদি চাঁদের মাসের প্রথম তারিখ হইতে রোযা রাখা শুরু করে, তবে পুরা দুই মাস রোযা রাখিবে। ৩০, ৩০ করিয়া পুরা ৬০ দিন হউক, অথবা তার চেয়ে কম দিন হউক। উভয় প্রকারের কাফ্ফারা আদায় হইয়া যাইবে। প্রথম তারিখ হইতে শুরু না করিয়া থাকিলে পুরা ৬০ দিন রোযা রাখিতে হইবে।

৪। মাসআলাঃ রোযার দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করিতে শুরু করিয়াছে। কাফ্ফারা পুরা হইবার পূর্ব দিনে বা রাত্রে ভুলে সহবাস করিয়া ফেলিয়াছে, এখন কাফ্ফারা দোহ্রাইতে হইবে। (অর্থাৎ, পুনরায় প্রথম হইতে রোযা শুরু করিতে হইবে।)

৫। মাসআলাঃ রোযা রাখার শক্তি না থাকিলে ৬০ জন গরীব-মিসকীনকে দুই বেলা আহার করাইবে, অথবা প্রত্যেককে /২ সের করিয়া গেঁহু দিবে।

সমস্ত ফকীরকে যদি এখনও আহার করাইয়া শেষ করে নাই, মাঝখানে হঠাৎ সহবাস করিয়া ফেলিয়াছে ইহাতে গোনাহ্ হইবে কিন্তু কাফ্‌ফারা দোহ্‌রাইতে হইবে না। খানা খাওয়াইবার ছুরত (নিয়ম) পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

৬। মাসআলা ঃ কাহারও জিম্মায় যেহারের দুইটি কাফ্‌ফারা ছিল। সে ৬০ জন মিস্‌কীনকে চার চার সের গেঁহু দিয়া দিল এবং মনে করিল, প্রত্যেক কাফ্‌ফারার জন্য দুই সের করিয়া দিতেছি। এমতাবস্থায় এক কাফ্‌ফারাই আদায় হইবে। অপর কাফ্‌ফারা আবার দিবে। আর যদি রোযা ভঙ্গের জন্য এক, যেহারের জন্য এক কাফ্‌ফারা থাকিয়া থাকে, উহা আদায়ের জন্য যদি এরূপ করিয়া থাকে, তবে উভয় কাফ্‌ফারা আদায় হইয়া যাইবে।

লে'আনের বয়ান

১। মাসআলা ঃ কেহ আপন স্ত্রীর উপর যিনার তোহ্‌মত লাগাইল, অথবা যে সন্তান পয়দা হইল তাহাকে বলিল, ইহা আমার নহে, জানি না কাহার সন্তান। ইহার বিধান হইল এই—স্ত্রী কাজী কিংবা মুসলমান শরয়ী হাকেমের নিকট নালিশ দায়ের করিবে। হাকেম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কসম লইবেন। প্রথমে স্বামী হইতে এইভাবে বলাইবেন—আমি খোদাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, যে তোহ্‌মত, তাহার উপর লাগাইয়াছি, ইহাতে আমি সত্য আছি। অর্থাৎ, ঘটনা সত্য। এইভাবে চারিবার বলিবে। পঞ্চমবার বলিবে, আমি যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি, তবে আমার উপর খোদার লা'নত পড়ুক।

পুরুষ পাঁচবার বলার পর স্ত্রী চারিবার বলিবে, আমি খোদাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, তিনি আমার উপর যে তোহ্‌মত লাগাইয়াছেন উহা মিথ্যা। আর পঞ্চমবার বলিবে, এই তোহ্‌মত লাগাইবার ব্যাপারে যদি তিনি সত্য হন, তবে আমার উপর খোদার গযব পড়ুক। এইরূপে উভয়ে কসম খাওয়ার পর হাকেম উভয়কে পৃথক করিয়া দিবেন এবং ইহাতে বায়েন তালাক বর্তিবে। এই সান্তানকে পিতার সন্তান বলা যাইবে না, উহাকে মায়ের হাওলা করিয়া দিবে। এরূপ কসম করাকে শরীঅতের ভাষায় "লে'আন" বলে।

কোরআন শরীফ পাঠের ফযীলত

১। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথাবার্তা বলিতে চায়, তবে সে কোরআন শরীফ পড়ুক। (অর্থাৎ কোরআন শরীফ পড়া যেন আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথা বলা।) মানবের মধ্যে সমধিক ধনী ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ্‌র কোরআন বহনকারী। (অর্থাৎ যাহাদের সিনার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফ রাখিয়াছেন।) উদ্দেশ্যগত অর্থ যাহারা কোরআন শরীফ পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, তাহাদের চাইতে ধনী আর কেহ নাই। উহা আমল করার বরকতে আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করিয়া বাতেনী ধন প্রদান করেন। আর যাহেরী আর্থিক সচ্ছলতাও লাভ হয়। —আহ্‌মদ, হাকেম

এ সম্পর্কে হযরত হাসান বছরী (রাঃ) হইতে একটি বাস্তব ঘটনা বর্ণিত আছে—

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্যে খলীফার দ্বারদেশে যাতায়াত করিত। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, যাও বেশী করিয়া আল্লাহ্‌র কিতাব (কোরআন মজীদ) তেলাওয়াত কর। ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি চলিয়া গেল। ইহার পর

হযরত ওমর (রাঃ) দীর্ঘদিন যাবৎ তাহাকে দেখিতে পান নাই। এক দিন তিনি স্বয়ং তাহার সন্ধান করিয়া অনুযোগ করিলেন (অর্থাৎ বলিলেন,) আমি তোমার সন্ধান করিতেছিলাম। কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে? (কেহ যদি কাহারও নিকট সর্বদা যাতায়াত করে, আর হঠাৎ ঐ যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেয়, তবে স্বভাবতঃই সে চিন্তিত হইয়া পড়ে যে, লোকটার কি হইল, কি অবস্থায় আছে ইত্যাদি।) উত্তরে লোকটি আরয করিল, আমি আল্লাহ্র কিতাবে এমন জিনিস পাইয়াছি যাহা আমাকে ওমরের দরওয়াজার মুখাপেক্ষী হইতে বে-পরোয়া করিয়া দিয়াছে। (অর্থাৎ, পবিত্র কোরআন মজীদে আমি এমন আয়াত প্রাপ্ত হইয়াছি যাহার বরকতে সৃষ্টজীব হইতে আমার দৃষ্টি উঠিয়া গিয়াছে এবং সমস্ত বিষয়ের অভাব মোচনকারী আল্লাহ্র উপর আমার ভরসা জন্মিয়াছে।) তোমার কাছে দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই আসিতাম। এখন আসিয়া কি করিব? এই ব্যক্তি যে আয়াতের বরকতে হযরত ওমরের দ্বারদেশ ত্যাগ করিয়াছিল, সম্ভবতঃ উহা নিম্ন আয়াতের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতই হইবে—যেমন বলা হইয়াছে— وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ○

অর্থাৎ, তোমাদের রিযিক আসমানেই রহিয়াছে (তথা হইতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তোমাদের রিযিক পাঠান হয়) এবং যে বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের সহিত ওয়াদা করা হইয়াছে (উহাও আসমানে আছে) অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের রিযিক ইত্যাদি যাবতীয় কার্যের ব্যবস্থা আমারই দরবার হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আমা ব্যতিরেকে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার কি সার্থকতা থাকিতে পার? —সূরা যারিয়া

২। **হাদীসঃ** افضل العبادة تلاوة القرآن রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সর্বোত্তম এবাদৎ কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা। (অর্থাৎ, ফরয এবাদৎসমূহের পর সর্বোত্তম নফল এবাদত হইল কোরআন মজীদ পাঠ করা)। —কান্যুল উম্মাল

৩। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যাহারা কোরআন মজীদ ইয়াদ করিয়াছে তাহাদের তা'যীম কর। কোরআন ইয়াদকারীকে যাহারা তা'যীম করিবে, তাহারা যেন আমাকেই তা'যীম করিল। (আর রাসূলুল্লাহ্কে তা'যীম করা ওয়াজেব, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।) [কোরআন শরীফ ইয়াদকারীকে তা'যীম করা যখন হুযূরকে তা'যীম করার সমতুল্য তখন কোরআন ইয়াদকারীকেও তা'যীম করা জরুরী বলিয়া প্রমাণিত হইল।] —দায়লমী

(**হাদীসঃ** তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি, যে কোরআন শিক্ষা করিয়াছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়াছে। —ইব্নে মরদুবিয়া)

৪। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা দিয়াছে এবং উহাতে যাহা আছে তদনুযায়ী আমল করিয়াছে, (অর্থাৎ, যাবতীয় হুকুম-আহ্কামের উপর আমল করিয়াছে) আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির পিতামাতাকে এমন একটি নূরের টুপী পরাইয়া দিবেন, যাহার আলো দুনিয়ায় তোমাদের ঘরে সূর্যের আলো পতিত হইলে ঘর যেরূপ আলোকিত হইয়া যায়, উহা অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল হইবে। (কোরআন অনুযায়ী আমলকারীর পিতাকে আল্লাহ্ পাক যখন এত উচ্চ মার্যাদা দান করিবেন; তখন স্বয়ং কোরআন অনুযায়ী আমলকারীকে কত অধিক মর্যাদা দান করিবেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।)

৫। **হাদীসঃ** যে ব্যক্তি কোরআন পড়িল (শিক্ষা করিল) আর মনে করিল যে, সে যে নেয়ামত প্রাপ্ত হইয়াছে খোদার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কোরআন শিক্ষায় বঞ্চিত অন্য কোন শিক্ষায়

শিক্ষিত অপর কাহাকেও ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর নেয়ামত প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে সে নিশ্চয় ঐ জিনিসকে ছোট করিল, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা বড় করিয়াছেন এবং ঐ জিনিসকে বড় করিল আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ছোট করিয়াছেন।

কোরআন শিক্ষিতদের সঙ্গত নহে যে, যদি তাঁহার সঙ্গে কেহ কঠোর ব্যবহার করে তিনিও তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিবেন, আর যে তাঁহার সহিত মূর্খোচিত ব্যবহার করিবে, তিনিও তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিবেন, বরং কোরআনের মাহাত্ম্যের দরুন তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া উচিত। (অর্থাৎ, আলেম ও কোরআন শিক্ষিতদের উচিত তাঁহারা যেমন পৃথিবীর যাবতীয় নেয়ামত অপেক্ষা কোরআনের এল্‌মকে সর্বাধিক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। যদি তাঁহারা অন্য কোন জিনিসকে কোরআন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তবে খোদা যাহাকে বড় করিয়াছেন তাহাকে হেয় ও ছোট করিলেন। আর হাকেম (খোদা) যাহাকে বড় করিয়াছেন তাহাকে ছোট করা কত বড় গুরুতর অপরাধ (তাহা চিন্তা করা উচিত)। কোরআন শিক্ষিতদের উচিত তাহারা যেন জনগণের সহিত মূর্খোচিত এবং দুর্ব্যবহার না করেন; কোরআনের আয্‌মত এবং ইজ্জত ইহাই চায়। জনগণের মধ্যে যদি কেহ তোমাদের সহিত মূর্খোচিত ব্যবহার করে, তবে তাহা মা'ফ করিয়া দেওয়া উচিত।

৬। হাদীস ঃ

اَلْقُرْاٰنُ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ ○ (رواه ابو نعيم عن ابن عمر)

আসমান, যমীন এবং তন্মধ্যে যাহারা আছে, তাহাদের চেয়ে কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয়। অর্থাৎ, কোরআন মজীদের মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টির উপরে। আর কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমধিক প্রিয়।

[**হাদীস ঃ** হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, লোহায় পানি লাগিলে যেমন মরিচা পড়ে, ক্বলব অর্থাৎ হৃদয় মধ্যেও (আল্লাহ্ হইতে গাফেল থাকিলে ও পাপ করিলে) মরিচা পড়িয়া থাকে। ছাহাবিগণ আরয করিলেন, মরিচা পরিষ্কারের উপায় কি ? তিনি ফরমাইলেন, ইহার উপায় মৃত্যুকে অত্যধিক স্মরণ করা ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। —বায়হাকী। —অনুবাদক]

৭। হাদীস ঃ

مَنْ عَلَّمَ عَبْدًا اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ مَوْلَاهُ لَايَنْبَغِىْ لَهٗ اَنْ يَّخْذُلَهٗ وَلَايَسْتَاْثِرَ عَلَيْهِ فَاِنْ هُوَ فَعَلَهٗ قَصَمَ عُرْوَةً مِّنْ عُرَى الْاِسْلَامِ - (رواه ابن عدى و الطبرانى)

"রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র) কোন বান্দাকে খোদার কিতাব (কোরআন শরীফ) হইতে একটি আয়াত শিক্ষা দিল এই (শিক্ষাদাতা) তাহার (ঐ শিক্ষার্থীর) মনিব হইয়া গেল। অতএব, এই শিক্ষার্থীর (তালেবে এলমের) পক্ষে প্রয়োজনের সময় ঐ ওস্তাদের সাহায্য হইতে বিরত থাকা সঙ্গত হইবে না এবং ঐ ওস্তাদের উপর অন্য কাহাকেও অধিক মর্যাদা দান করাও সঙ্গত হইবে না, যে প্রকৃতপক্ষে ঐ ওস্তাদের তুলনায় অধিক মর্যাদাশালী না হয়। যদি ঐ তালেবে এল্‌ম এরূপ করে, তবে সে ইসলামের হল্‌কা (কড়া) সমূহের একটি হল্‌কা ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অর্থাৎ, এরূপ অসঙ্গত কাজ করিলে সে ইসলামের মধ্যে ভীষণ

ফেৎনা সৃষ্টিকারী এবং শরীঅতের মহা বিধান লঙ্ঘনকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে; যাহার ফলে ইহ্‌কাল ও পরকালে অকল্যাণ ও কঠিন শাস্তির আশঙ্কা রহিয়াছে।”

৮। হাদীসঃ

عَنْ عُبَادَةَبْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ لَّمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهٗ ـ اسناده حسن

অর্থাৎ, “রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমাদের বড়দিগকে সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ (সুলভ ব্যবহার) করে না এবং আমাদের আলেমদের হক ও মর্যাদা বুঝে না (শ্রদ্ধা করে না) সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নহে। এখানে যে কোরআন শরীফ পড়ে এবং যে শিক্ষা দেয় উভয়েই আলেম শব্দের অন্তর্ভুক্ত [কাজেই আলেম ও তালেবে এল্‌ম উভয়কে শ্রদ্ধা করা জরুরী] যে ব্যক্তি এই হাদীস অনুযায়ী কার্য না করিবে, সে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উম্মতের বাহিরে, তাহার ঈমান দুর্বল। সুতরাং বড়কে সম্মান করা, ছোটকে স্নেহ করা এবং আলেমের হক ও মর্যাদা বুঝা এবং আলেমদের শ্রদ্ধা করা একান্ত কর্তব্য।”

৯। হাদীসঃ যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ শিক্ষা করিয়াছে, উহার অর্থ ও তফসীর বুঝিয়াছে অথচ তদনুযায়ী আমল করিল না, সে দোযখকে আপন বাসস্থান নির্ধারিত করিয়া লইল। (অর্থাৎ, কোরআন শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আমল না করা অত্যন্ত কঠিন গোনাহ্। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া জাহেলদের খুশী হইবার কারণ নাই যে, আমরা তো কোরআন পড়িই নাই, সুতরাং তদনুযায়ী আমল না করিলে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা, এই সমস্ত জাহেল ডবল আযাবের উপযোগী হইবে। একটি এল্‌ম হাছেল না করার, অপরটি আমল না করার) —আবুনঈম

১০। হাদীসঃ

قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فُلَانًا يَّقْرَأُ بِالَّيْلِ كُلِّهٖ فَاِذَا اَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ سَتَنْهَاهُ قِرَائَتُهٗ

ـ(سعيد بن منصور عن جاب)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করা হইল, অমুক (ব্যক্তি) সারা রাত্রি জাগিয়া কোরআন শরীফ পড়ে, কিন্তু যখন রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসে, তখন চুরি করে। (উত্তরে) তিনি বলিলেন, অদূর ভবিষ্যতে তাহার এই কোরআন পাঠ তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে। (অর্থাৎ, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের বরকতে শীঘ্রই তাহার এই অভ্যাস দূর হইয়া যাইবে।)

১১। হাদীসঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়িবে এবং উহা হেফ্‌য করিবে, উহার (নির্দেশিত) হালালকে হালাল মান্য করিবে এবং উহার (নির্দেশিত) হারামকে হারাম মান্য করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করিবেন এবং তাহার খান্দানের এমন দশ ব্যক্তির জন্য তাহার সুপারিশ কবূল করিবেন, যাহাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। —আহ্‌মদ, তিরমিযী

১২। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি খোদার কিতাব (কোরআন শরীফ) হইতে ওযূর সহিত একটি অক্ষর শুনিল, তাহার আমলনামায় দশটি নেকী (দশটি নেকীর সওয়াব) লিখা হইবে এবং তাহার দশটি গোনাহ দূর করিয়া (মিটাইয়া) দেওয়া হইবে, তাহার দশটি মরতবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অক্ষর নামাযে বসিয়া পড়িবে, (যখন বসিয়া নামায পড়িবে) তাহার আমলনামায় পঞ্চাশটি নেকী (৫০টি নেকীর ছওয়াব) লিখা হইবে। তাহার পঞ্চাশটি গোনাহ্ মিটাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার পঞ্চাশটি মরতবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হইবে। উল্লিখিত নামাযের মুরাদ হইতেছে নফল নামায। কেননা, ফরয নামায বিনা ওযরে বসিয়া পড়া জায়েয নাই। ওযরবশতঃ বসিয়া পড়িলেও খাড়া হইয়া পড়ার পূর্ণ ছওয়াব পাইবে। ওযর ব্যতীত নফল নামায বসিয়া পড়া জায়েয আছে। (কিন্তু অর্ধেক ছওয়াব পাওয়া যাইবে। ওযরের কারণে নফল নামায বসিয়া পড়িলেও পূর্ণ ছওয়াব পাইবে।) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব হইতে (নামাযে) দাঁড়াইয়া একটি হরফ পড়িবে, তাহার আমলনামায় একশত নেকী (একশত নেকীর ছওয়াব) লিখা হইবে। তাহার একশত গোনাহ্ মিটাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার একশত (দরজা) মরতবা বুলন্দ করা হইবে। যে ব্যক্তি কোরআন পড়িতে পড়িতে উহা (পূর্ণ) খতম করিল—আল্লাহ্ তা'আলা (আপন দরবারে) তাহার জন্য দো'আ লিখিয়া লইবেন, যাহা হয়ত তৎক্ষণাৎ কবূল হইবে। অথবা ভবিষ্যতে কবূল হইবে। (অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে হউক বা পরে হউক তাহার দো'আ কবূল হইবে।)

১৩। হাদীসঃ

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ وَصَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مَكَانَهٗ ـ (رواه البيهقى)

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পাঠ করিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার তা'রীফ প্রশংসা করিল (আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলুক বা অনুরূপ অর্থবোধক অন্য কোন শব্দ বলুক ইহাতে আল্লাহ্‌র তা'রীফ হইয়া যাইবে)এবং নবী আলাইহিস্‌সালামের উপর দুরূদ পড়িল এবং আল্লাহ্‌র নিকট নিজের গোনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল, নিঃসন্দেহ সে কল্যাণকে উহার স্থান হইতে চাহিয়া লইল। অর্থাৎ দ্রুত কবূল হওয়ার জন্য দো'আ করার যে নিয়ম আছে তদনুযায়ী সে দো'আ করিয়াছে; সুতরাং তাহার দো'আ দ্রুত কবূল হওয়ার আশা রহিয়াছে। (মোটকথা, কোরআন পাঠ করিয়া পরে আল্লাহ্‌র হামদ তা'রীফ ও দুরূদ পড়িয়া দো'আ করিলে দো'আ কবূল হওয়ার প্রবল আশা থাকে।)

১৪। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদের স্ত্রীদিগকে সূরা-ওয়াক্বিয়া শিখাও। নিশ্চয় এই সূরা ধন-সম্পদ আনয়নকারী অর্থাৎ সূরা-ওয়াক্বিয়া পাঠ করিলে ধনাগম হয় ও স্বচ্ছলতা আসে; রূহানী সম্পদও লাভ হয়। যেমন, অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা-ওয়াক্বিয়া পড়িবে কখনও রিযিকের অভাব তাহার হইবে না। স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের অন্তর বেশী দুর্বল থাকে। সামান্য অভাব অনটনে ইহারা পেরেশান হইয়া পড়ে। তাই স্ত্রীলোকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য অভাব অনটন দূর হওয়ার জন্য সূরা-ওয়াক্বিয়া পাঠ করা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই উপকারী। —দায়লমী

১৫। হাদীসঃ اَحْسَنُ النَّاسِ قِرَائَةً نِ الَّذِىْ اِذَا قَرَءَ اٰيَةً اِنَّهٗ يَخْشَى اللّٰهَ ـ (كنز العمال)

"কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকারীদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে কোরআন শরীফ পাঠকালে মনে করে যে, সে খোদাকে ভয় করে। (অর্থাৎ তেলাওয়াতকারীকে দেখিয়া দর্শক এ কথা মনে করে যে, সে খোদাকে ভয় করিতেছে।) মোটকথা, এমন সতর্কতার সহিত পড়ে, যেন কোন ভীত ব্যক্তি হাকেমের সম্মুখে কোন প্রকার ত্রুটি ও বেআদবী প্রকাশ পাইবার ভয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কথা বলিয়া থাকে।"

কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করিবার উত্তম পন্থা এই যে, ওযূ সহকারে ক্বেব্‌লামুখী হইয়া বসিবে। ভক্তি ও নম্রতার সহিত পাঠ করিবে। আর একথা মনে করিবে যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথা বলিতেছি। অর্থ জানা থাকিলে অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া পড়িবে। যেখানে রহ্‌মতের আয়াত আসিবে, সেখানে রহ্‌মতের দো'আ করিবে। যেখানে আযাবের আয়াত আসিবে, সেখানে দোযখ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। পড়া শেষ হইলে প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা তৎপর রাসূলের প্রতি দুরূদ পাঠ করিয়া গোনাহ্ মা'ফ চাহিবে। অথবা যে কোন নেক দো'আ করিবে এবং পুনরায় দুরূদ শরীফ পড়িবে। কোরআন তেলাওয়াতের সময় মনে বাজে খেয়াল আসিতে দিবে না। যদি কোন খেয়াল আসিয়াই যায়, তবে ঐ দিকে লক্ষ্য করিবে না। আপনা হইতেই ঐ খেয়াল চলিয়া যাইবে। তেলাওয়াতের সময় যথাসম্ভব পাক ছাফ কাপড় পরিবে।

(হাদীসঃ শরহে এহ্‌ইয়াউল উলুম গ্রন্থে হযরত আমর ইব্‌নে ময়মুন (রাঃ) হইতে (একটি হাদীস) বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তি প্রত্যহ ফজরের নামায পড়িবার পর কোরআন শরীফ খুলিয়া একশত আয়াত পরিমাণ পড়িয়া লইবে, তাহার নামে সমগ্র দুনিয়া পরিমাণ ছওয়াব লিখিত হইবে।

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন—যাহার প্রত্যেক রাবী বলেন, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কম ছিল। তিনি তাঁহার ওস্তাদের নিকট অভিযোগ করিলে ওস্তাদ তাঁহাকে কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতে বলিলেন। তিনি এইরূপ করিয়া উপকার পান—দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়াতে বিশেষ উপকার আছে। —ফাযায়েলে কোরআন

হযরত আউস সাক্বাফী (রাঃ) বলেন, জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোরআন শরীফ না দেখিয়া (মুখস্থ) পড়িলে হাজার দরজা সওয়াব পাওয়া যায় আর দেখিয়া পড়িলে উহার সওয়াব দুই হাজার দরজা পর্যন্ত বর্ধিত হইয়া যায়।

—বায়হাকী, ফাযায়েলে কোরআন

তজবীদের বয়ান (পরিবর্ধিত)

[ছহীহ্ করিয়া কোরআন শরীফ পড়ার নিয়মাবলী]

মাসআলাঃ তজবীদ অর্থ কোরআন শরীফ ছহীহ্ পড়া। কোরআন শরীফ ছহীহ্ করিয়া পড়ার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরই ফরয। এ সম্বন্ধে অবহেলা বা আলস্য করা শক্ত গোনাহ্। (ছহীহ্ করিয়া পড়ার অর্থ আরবী অক্ষরগুলিকে আরববাসী যেরূপ উচ্চারণ করে তদ্রূপ উচ্চারণ করা এবং ইমামগণ যে সমস্ত ক্বায়দা লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত ক্বায়দা অনুসারে আরবী লাহ্‌জায় কোরআন শরীফ পাঠ করা। উপযুক্ত ওস্তাদের নিকট মশ্‌ক্ করা ব্যতিরেকে শুধু কিতাব দেখিয়া কোরআন শরীফ ছহীহ্ করিয়া পড়া যায় না। কাজেই প্রত্যেকেরই উপযুক্ত ওস্তাদ অন্বেষণ করা দরকার। এখানে আমরা ওস্তাদ ও শাগরেদের সাহায্যার্থে অতি সহজে ও সংক্ষেপে মোটামুটি ক্বায়দাগুলি লিখিয়া দিতেছি—)

ক্বায়দা ঃ যে হরফগুলি ভাল মত লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চারণ না করিলে এক হরফের পরিবর্তে আর এক হরফ উচ্চারণ হইয়া যাওয়ার আশংকা আছে, সেই হরফগুলি লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, যাহাতে এক হরফের পরিবর্তে আর এক হরফ "লাহানে জলী" হইয়া গোনাহ্‌গার না হইতে হয় যথা—

(১) আলিফ ا 'আয়েন ع এবং হামযা ء (-আয়েনকে গলার মাঝখান হইতে ডাবাইয়া নরম করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। এবং হামযাকে গলার নীচ ছিনার কাছ হইতে শক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। হামযা যেন নরম না হয়। হামযার আওয়ায গলার মধ্যে বাজিয়া উঠিবে।)

(২) ت এবং ط -(ت কে বারিক করিয়া এবং ط কে মুখ গোল করিয়া মোটা করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।)

(৩) ج এবং ز - ج কে শক্ত করিয়া জিহ্বার মাঝখানের এবং তালুর সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হইবে এবং ز কে জিহ্বার আগা দিয়া দাঁতের গোড়ার সাহায্যে নরম করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৪) ح এবং ه -বড় হে বা হায়েহুত্তি এবং ছোট হে বা হায়ে হাওয়ায। ح কে গলার মধ্য হইতে গলা ডাবাইয়া এবং ه কে গলার নীচ হইতে ছিনার কাছ হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৫) ث এবং س - ث কে নরম করিয়া জিহ্বার অগ্রভাগকে সামনের দাঁতের অগ্রভাগে লাগাইয়া উচ্চারণ করিতে হইবে এবং س কে কিছু শক্ত করিয়া দাঁতের গোড়া হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৬) س এবং ص -(س বারিক হইবে এবং ص মোটা হইবে)

(৭) د এবং ض - د কে সামনের দাঁতের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হইবে; কিন্তু ض কে সামনের দাঁতের সাহায্যে উচ্চারণ করিলে ভয়ানক গলতি হইবে। —১০ নং দ্রষ্টব্য

(৮) ذ এবং ز - ذ কে সামনের দাঁতের অগ্রভাগের সাহায্যে নরম করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে এবং ز কে দাঁতের গোড়ার সাহায্যে কথঞ্চিৎ শক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৯) ذ এবং ظ - ذ বারিক হইবে এবং ظ মোটা হইবে।

(১০) ظ -ض- ظ কে সামনের দাঁত এবং জিহ্বার অগ্রভাগের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হইবে এবং ض কে জিহ্বার পার্শ্বদেশ এবং মাড়ির দাঁতের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হইবে।

(১১) ع - غ কে গলা ডাবাইয়া গলার ভিতর হইতে উঠাইতে হইবে।

(১২) ق এবং ك -বড় এবং ছোট ক্বাফ- ق কে গলা ডাবাইয়া গলার ভিতর হইতে উঠাইবে এবং ك কে গলার বাহির হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে। —অনুবাদক

(১৩) ف কে উপরের সামনের দাঁতের অগ্রভাগ ও নীচের ঠোঁটের ভিতরাংশের সাহায্যে উচ্চারণ করিবে। —অনুবাদক

১। ক্বায়দা ঃ خ ص ض ط ظ غ (এবং) ق এই সাতটি হরফ সর্বাবস্থায় পোর অর্থাৎ, মোটা হইবে, কোন অবস্থাতেই বারিক বা চিকন হইবে না। পক্ষান্তরে ر -এর উপর যদি যবর বা পেশ থাকে, তবে মোটা হইবে, নতুবা বারিক হইবে; আর ل হামেশা চিকন হইবে, শুধু লফ্‌যে আল্লাহ্‌র মধ্যে যখন লামের আগে পেশ বা যবর থাকিবে, তখন পোর হইবে।

২। ক্বায়দাঃ م - ن -এর উপর তশ্‌দীদ থাকিলে গুন্না করিতে হইবে। অর্থাৎ, আওয়ায নাকের মধ্যে নিয়া এক আলিফ পরিমাণ দেরী করিয়া উচ্চারণ করিবে।

৩। ক্বায়দাঃ যবরের পরে যদি আলিফ না থাকে, তবে যবরকে টানিয়া পড়িবে না, খাট করিয়া পড়িবে। এইরূপে যেরের পর যদি ى এবং পেশের পরে যদি و না থাকে, তবে যেরকে এবং পেশকেও টানিয়া পড়িতে হইবে না। (এইরূপ টানিয়া পড়া অতি বড় দোষ। খুব লক্ষ্য করিয়া এই দোষ এড়াইয়া চলিবে।) কোন কোন লোক الحمد কে الحمدو এবং ملك কে ملكى এবং اياك কে ايا كا করিয়া পড়ে ইহা অতি মারাত্মক ভুল। এই ভুল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবসময় সতর্ক থাকিবে।

এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে যেখানে যবরের পর আলিফ বা খাড়া আলিফ আছে এবং যেরের পর যেখানে ى আছে, বা খাড়া যের আছে অথবা পেশের পরে যেখানে و আছে অথবা উল্টা পেশ আছে সেখানে এক আলিফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হইবে। (এইরূপ জায়গায় খবরদার যেন কমান না হয়।)

৪। ক্বায়দাঃ (উরদু ও পার্সীতে সাধারণতঃ যেরকে আমাদের বাংলা এ-কারের মত এবং পেশকে ও-কারের মত পড়া হয়; কিন্তু কোরআন শরীফের মধ্যে যেরকে (হ্রস্ব ই-কারের মত) একটু ى -এর গন্ধ দিয়া এবং পেশকে (হ্রস্ব উ-কারের মত) একটু و -এর গন্ধ দিয়া পড়িতে হইবে; (কিন্তু খবরদার যেন পুরা ى অর্থাৎ দীর্ঘ ঈ-কার এবং পুরা و অর্থাৎ, দীর্ঘ উ-কার না হইয়া যায়, অন্যথায়, মস্ত বড় ভুল হইয়া যাইবে।)

৫। ক্বায়দাঃ যেখানে নূনের উপর জযম থাকিবে এবং তারপর নিম্নের ১৫টি অক্ষরের কোন একটি অক্ষর থাকিবে, সেখানে গুন্না করিয়া অর্থাৎ, নাকের মধ্যে আওয়ায নিয়া এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করিয়া পড়িতে হইবে। ১৫টি অক্ষর এই—

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

যেমন

أَنْتُمْ - مِنْ ثَمَرَةٍ - فَأَنْجَيْنَاكُمْ - أَنْدَادًا - أَنْذَرْتَهُمْ - أَنْزَلَ مِنْسَاتَهٗ يَنْشُرُ - لِمَنْ صَبَرَ - مَنْضُوْدٍ - فَإِنْ طِبْنَ - فَانْظُرْ - يُنْفِقُوْنَ - مِنْ قَبْلِكَ - إِنْ كُنْتُمْ ○

৬। ক্বায়দাঃ এইরূপে যদি কোন হরফের উপর দুই পেশ বা দুই যবর বা দুই যের থাকে এবং সে কারণে একটি নূন উচ্চারিত হয় এবং তাহার পর উপরোক্ত ১৫টি হরফের মধ্যে কোন একটি হরফ আসে, তবে সে ছুরতেও ঐ উচ্চারিত নূনের কারণে গুন্না করিতে হইবে। যেমন—

جَنّٰتٌ تَجْرِىْ - جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى - مِنْ نَّفْسٍ شَيْئًا - رِزْقًا قَالُوْا - رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ - وَغَيْرَهٗ ○

৭। ক্বায়দাঃ যে নূনের উপর জযম থাকে, তাহার পরে যদি ر বা ل আসে তবে নূনের উচ্চারণ মাত্রই থাকিবে না; গুন্নাও থাকিবে না; বরং ر এবং ل -এর দ্বিত্ব অর্থাৎ, তাশ্‌দীদ হইয়া যাইবে। যেমন— وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ○

৮। ক্বায়দাঃ এইরূপে যদি কোন হরফের উপর দুই পেশ, দুই যবর বা দুই যের থাকে এবং সে কারণে নূনের আওয়ায উচ্চারিত হয় তারপর ر বা ل আসে তবে ঐ ছুরতেও নূনের আওয়ায মাত্রই থাকিবে না, গুন্নাও থাকিবে না; বরং ر এবং ل -এর দ্বিত্ব হইয়া যাইবে;

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

৯। ক্বায়দা ঃ যদি নূনের উপর জযম থাকে এবং তাহার পর ب থাকে তবে ঐ নূনকে মীমের মত পড়িতে হইবে এবং গুন্না করিতে হইবে। যেমন اَنْبِئْهُمْ কে اَمْبِئْهُمْ পড়িতে হইবে। এইরূপ যদি দুই যবর, দুই যের বা দুই পেশওয়ালা হরফের পর ب থাকে, তবেও নূনের আওয়ায না পড়িয়া মীমের আওয়ায পড়িতে হইবে এবং গুন্নাও করিতে হইবে। যেমন— اَلِيْمٌ بِمَا কে اَلِيْمٌ بِمَا পড়িবে। কোন কোন ছাপার কোরআন শরীফে এইরূপ স্থানে ছোট একটি মীম অতিরিক্ত লিখিয়া দিয়া থাকে, আবার কোন জায়গায় লিখে না ; কিন্তু এই ক্বায়দা যেখানে পাওয়া যাইবে সেখানে লিখুক বা না লিখুক মীম পড়িতে হইবে।

১০। ক্বায়দা ঃ যেখানে মীমের উপর জযম থাকিবে এবং তাহার পর ب আসিবে, সেখানে গুন্না করিতে হইবে— يَعْتَصِمْ بِاللهِ

১১। ক্বায়দা ঃ যে ক্ষেত্রে কোন হরফের উপর দুই যবর বা দুই পেশ বা দুই যের থাকিবে এবং তারপর যে হরফ আছে তাহার উপর জযম থাকিবে, সে ক্ষেত্রে দুই যবরের পরিবর্তে এক যবর পড়িতে হইবে এবং দুই যবরের পরে যে আলিফ থাকে, সে আলিফ পড়িতে হইবে না; বরং আলিফের স্থানে একটি নূনে যের দিয়া পরের হরফের সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে। যেমন— خَيْرًا الْوَصِيَّةُ কে خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ হইবে। এইরূপে দুই যেরের স্থানে এক যের পড়িবে এবং একটি নূনে যের দিয়া পরের হরফের সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে। যেমন— فَخُوْرٍ الَّذِيْنَ কে فَخُوْرِنِ الَّذِيْنَ পড়িতে হইবে। এইরূপে দুই পেশের স্থানে এক পেশ পড়িতে হইবে। যেমন— نُوْحُ ابْنَهٗ কে نُوْحُ نِ ابْنَهٗ পড়িতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রায় ছাপাতেই কোরআন শরীফের মধ্যে ছোট একটি 'নূন কুতনী' আকারে লিখিয়া দিয়া থাকে যদি নাও লিখে তবুও এই ক্বায়দা যেখানে পাওয়া যাইবে, সেখানে পড়িতে হইবে চাই লিখুক চাই না লিখুক।

১২। ক্বায়দা ঃ ر -এর উপর যদি যবর বা পেশ থাকে, তবে ر কে পোর পড়িতে হইবে। যেমন— رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَمْرُهُمْ شُوْرٰى ر-এর নীচে যদি যের থাকে, ر কে বারীক পড়িতে হইবে। যেমন— غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ ر এর উপর যদি জযম থাকে এবং আগের হরফে যবর বা পেশ থাকে, তবে ر পোর হইবে (যেমন— اَنْذَرْتَهُمْ - مُرْسَلٌ আর যদি আগের হরফে যের থাকে, তবে ر বারীক হইবে। যেমন— لَمْ تُنْذِرْهُمْ ; ر -এর পোর এবং বারীক হওয়া সম্বন্ধে আরও কিছু ক্বায়দা আছে, তাহা এখন বুঝে আসিবে না বলিয়া এখানে লিখা হইল না। ওস্তাদের কাছে জানিয়া লইবে বা উপরের কিতাবে জানিতে পারিবে।

১৩। ক্বায়দা ঃ اَللهُ এবং اَللّٰهُمَّ এই দুই লফ্‌যের মধ্যে যে লাম আছে, এই লামের পূর্বে যদি যবর বা পেশ থাকে, তবে লামকে পোর পড়িবে। যেমন— فَزَادَهُمُ اللهُ - وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ خَتَمَ اللهُ আর যদি লামের আগে যের থাকে, তবে লামকে বারীক পড়িবে।
যেমন— اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - بِسْمِ اللهِ

১৪। ক্বায়দা ঃ যেখানে গোল 'তে' লেখা থাকে, সেই লফ্‌যের উপর যদি 'অক্‌ফ করা হয়, তবে ঐ গোল ة 'তে' পৃথক লেখা থাক বা অন্য হরফের সহিত যোগে লেখা থাক, কিংবা ঐ গোল (ة) তে-এর উপর পেশ থাক, যবর থাক বা যের থাক অথবা দুই যবর থাক বা দুই পেশ থাক বা দুই যের থাক সব ছুরতেই ঐ গোল (ة) 'তে' (ه) হে ছাকেনের মত পড়িতে

হইবে। যেমনঃ طَيِّبَةً কে طَيِّبَهْ এবং قَسْوَةً কে قَسْوَهْ এবং وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ কে وَاٰتُوا الزَّكٰوهْ পড়িতে হইবে।

১৫। ক্বায়দাঃ একমাত্র গোল 'তে' (ة) ব্যতীত অন্য কোন হরফের উপর যদি যবর থাকে এবং সেই হরফের উপর অক্‌ফ্ করিতে হয়, তবে সেই হরফের পরে একটি আলেফ বাড়াইয়া পড়িতে হইবে। (প্রায়ই আলেফ লেখা থাকে, কোন ক্ষেত্রে যদি লেখা নাও থাকে, তবুও পড়িতে হইবে।) যেমন— نداء কে نداءا পড়িতে হইবে। এতদ্ব্যতীত দুই যের বা দুই পেশওয়ালা হরফের উপর অকফ্ করিতে হইলে যেরূপ এক যবর এক পেশ এক যেরওয়ালা হরফকে ছাকেন করিয়া অকফ করিতে হয়, তদ্রূপই করিতে হইবে।

১৬। ক্বায়দাঃ কোরআন শরীফের কোন কোন শব্দে এইরূপ চিহ্ন ~ ~ থাকে, ইহাকে মদ বলে। যেখানে মদ থাকে সেখানে কিছু টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন— فِيْٓ اٰذَانِهِمْ এখানে অন্য জায়গা হইতে কিছু বাড়াইয়া পড়িবে قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ এখানে অন্য জায়গা হইতে কিছু বাড়াইয়া পড়িবে وَلَا الضَّآلِّيْنَ এখানে অন্য জায়গা হইতে বাড়াইয়া পড়িবে।

১৭। ক্বায়দাঃ কোরআন শরীফের যেখানে ط বা م বা قف বা ق চিহ্ন থাকে সেখানে শ্বাস ছাড়িয়া দিয়া অক্‌ফ করিবে; আর যেখানে س বা سكته বা وقفه লেখা থাকে, সেখানে শ্বাস না ছাড়িয়া শুধু একটু চুপ করিয়া সামনে পড়িবে এবং যেখানে لا লেখা থাকে, সেখানে না থামা উচিত এবং যেখানে এক আয়াতের মধ্যে দুই জায়গায় তিন নোক্‌তা থাকে সেখানে দুই জায়গার এক জায়গায় থামা উচিত, যেখানে উপরে নীচে দুই রকম চিহ্ন থাকে সেখানে উপরটির আমল করিবে। আর যেখানে গোল আয়াত থাকে, সেখানেও থামা ভাল, তাছাড়া অন্য চিহ্নের জায়গায় অক্‌ফ করিতে পারে, নাও করিতে পারে। (যদি একান্ত শ্বাস টুটিয়া যায়, তবে শব্দের মাঝখানে ত কিছুতেই অক্‌ফ করিবে না করিলে শব্দটি শেষ করিয়া অকফ করিবে এবং পুনরায় ঐ শব্দ দোহ্‌রাইয়া পড়িবে।)

১৮। ক্বায়দাঃ কোরআন শরীফে কোন হরফের উপর জযম থাকিলে এবং তাহার পরের অক্ষরের উপর তাশদীদ থাকিলে জযমওয়ালা হরফকে পড়িতে হইবে না। যেমন— قَدْتَّبَيَّنَ -এর মধ্যে د পড়া যাইবে না قَالَتْ طَّآئِفَةٌ এর মধ্যে ت পড়া যাইবে না لَئِنْ بَسَطْتَّ এর মধ্যে ط পড়া যাইবে না। اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ -এর মধ্যে ت পড়া যাইবে না اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمْ -এর ت পড়া যাইবে না اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ -এর মধ্যে ق পড়া যাইবে না। অবশ্য যদি জযমওয়ালা হরফ নূন ছাকেন বা নূনে তন্‌বীন হয় এবং তাহার পরে ى বা و -এর উপর তাশ্‌দীদ থাকে, তবে গোন্না করিয়া তাশ্‌দীদ আদায় করিতে হইবে। যেমন— ظُلُمَاتٌ وَّ رَعْدٌ - وَمَنْ يَّقُوْلُ অর্থাৎ ن -এর আওয়ায নাকে পয়দা করিবে।

১। ফায়দাঃ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ (১২শ) পারার ৪র্থ রুকূতে ৬ষ্ঠ আয়াতে যে مَجْرِيهَا শব্দটি আছে। এই শব্দটি ر -এর নীচে যে খাড়া যের লেখা থাকে, তাহা অন্যান্য খাড়া যেরের মত পড়া যাইবে না; (উহাকে বাংলা একারের মত পড়িতে হইবে এবং একারকে) একটু টানিয়া পড়িতে হইবে। যেমন—উর্দুতে ستارے -এর ر কে একার কিছু টানিয়া পড়িতে হয়।

২। ফায়দা ঃ حٰمٓ (২৬শ) পারার সূরা-হুজুরাত ২য় রুকূ ১ম আয়াতে যে بِئْسَ الْاِسْمُ শব্দটি আসিয়াছে, এই শব্দটি পড়ার নিয়ম এই যে, প্রথম ছিনের যবর পরের লামের সহিত মিলাইতে হইবে না; বরং লামে যের পড়িতে হইবে। এইরূপ পড়িতে হইবে بِئْسَ لِسْمُ

৩। ফায়দা ঃ تِلْكَ الرُّسُلُ (তৃতীয়) পারার সূরা-আলে ইমরান-এর শুরুতে যে الم 'আলিফ লাম মীম' আছে এবং তাহার পর الله। লফ্য আছে। এই মীমকে আল্লাহ্ শব্দের লামের সহিত মিশাইতে হইবে। হেজ্জে এইরূপ হইবে মীম ইয়া যের মী, মীম লাম যবর মাল, মীমাল। কোন কোন লোক মীমমাল পড়িয়া বসে, উহা ভুল।

৪। ফায়দা ঃ কতকগুলি মকাম এরূপ আছে যে, লেখা হয় এক রকম এবং পড়া হয় অন্য রকম তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। কোরআন শরীফের এই মকামগুলি দেখিয়া বুঝিয়া লইবে। যথা—

১। মকাম ঃ কোরআন শরীফের মধ্যে যত লফ্যে اَنَا (অর্থ আমি) আছে সেখানে নূনের বাদের আলেফ পড়িতে হইবে না, শুধু নূন-যবর نَ পড়িতে হইবে।

২। মকাম ঃ কোরআন শরীফের মধ্যে যেখানে يَبْصُطُ লিখিয়াছে, প্রায় স্থানে ص দিয়া লিখিয়াছে এবং ص-এর উপর একটি ছোট س বানাইয়া দিয়াছে; এইরূপে بَسْطَةً ও ص দিয়া লিখিয়াছে এবং ص-এর উপর একটি ছোট س বানাইয়া দিয়াছে। এই সব জায়গায় ছোট س উপরে লেখা থাকুক বা না থাকুক ص পড়িতে হইবে না, س ই পড়িতে হইবে।

৩। মকাম ঃ لَنْ تَنَالُوْا (৪র্থ) পারায় ৬ষ্ঠ রুকূর প্রথম আয়াতে اَفَئِنْ এখানে ف-এর পর একটি আলেফ থাকে কিন্তু ঐ আলেফ পড়িবে না পড়িতে হইবে এইরূপ اَفَئِنْ

৪। মকাম ঃ لَنْ تَنَالُوْا (৪র্থ) পারায় ৮ম রুকূর তৃতীয় আয়াতে লেখা আছে لَاِلَى اللهِ অথচ পড়িতে হইবে لَ اِلَى اللهِ অর্থাৎ, লামের বাদে যে আলেফ লিখিয়াছে উহা পড়িতে হইবে না।

৫। মকাম ঃ لَايُحِبُّ اللهُ (৬ষ্ঠ) পারার নবম রুকূর তৃতীয় আয়াতে লেখা আছে لن تبوءٔ অর্থাৎ, হামযার বাদে আলেফ লেখা আছে, এই আলেফ পড়িতে হয় না।

৬। মকাম ঃ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ (৯ম) পারার তৃতীয় রুকূর ৪র্থ আয়াতে লেখা আছে, ملائه অর্থাৎ লামের বাদে একটা আলেফ লেখা আছে, এই আলেফটি পড়িতে হইবে না। পড়িতে হইবে ملئه এইরূপে এই শব্দটি আরও কয়েক জায়গায় আছে সব জায়গায় এইরূপ আলেফ ছাড়িয়া দিয়াই পড়িতে হইবে; কিন্তু مَلَائِكَتِهٖ এর মধ্যে আলেফ পড়িতে হইবে, স্মরণ থাকে যেন।

৭। মকাম ঃ وَاعْلَمُوْا (১০ম) পারার ১৩ রুকূর ৪র্থ আয়াতে লেখা আছে, لَااَوْضَعُوْا কিন্তু পড়িতে হইবে, ل اَوْضَعُوْا অর্থাৎ, লামের বাদের আলেফ পড়িতে হইবে না।

৮। মকাম ঃ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ (১২শ) পারার ৬ষ্ঠ রুকূর ৮ম আয়াতে ثَمُوْدَا-এর মধ্যে د-এর পর একটি আলেফ লিখিয়াছে, ঐ আলেফ পড়িতে হইবে না, ثَمُوْدَ পড়িতে হইবে। এইরূপে এই লফ্যটি সূরা-অন্নাজমের والنجم ৩নং রুকূর ১৯ আয়াতের মধ্যেও এইরূপ লিখিয়াছে, সেখানেও ثَمُوْدَ ই পড়িতে হইবে। আলেফ পড়িতে হইবে না।

৯। মকাম ঃ وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِىْ (১৩শ) পারার ১০ম রুকূর ৪র্থ আয়াতে لِتَتْلُوَا-এর মধ্যে و এর পর আলেফ লেখা আছে, কিন্তু এই আলেফ পড়িতে হইবে না, পড়িতে হইবে لِتَتْلُوَ

১০। মকাম ঃ سُبْحَانَ الَّذِىْ (১৫শ) পারার ১৪শ রুকূর ২য় আয়াতে আছে لَنْ نَّدْعُوَا কিন্তু পড়িতে হইবে لَنْ نَّدْعُوَ ওয়াও و -এর পর আলেফ পড়িতে হইবে না এইরূপ এই পারার ১৬ রুকূর প্রথম আয়াতে লেখা আছে لِشَاىْءٍ শীনের (ش) বাদে আলেফ লেখা আছে, এই আলেফ পড়িতে হইবে না; বরং পড়িতে হইবে لِشَىْءٍ

১১। মকাম ঃ سُبْحَانَ الَّذِىْ (১৫শ) পারার ৭ম আয়াতে লেখা আছে لٰكِنَّا নূনের বাদে আলেফ লেখা আছে, এই আলেফ পড়িতে হইবে না, পড়িতে হইবে لٰكِنَّ

১২। মকাম ঃ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ (১৯শ) পারার ১৭ রুকূর ৭ম আয়াতে লেখা আছে لَااَذْبَحَنَّهٗ লামের বাদে দুই আলেফ লেখা আছে এক আলেফ পড়িতে হইবে না, বরং পড়িতে হইবে, لَاَذْبَحَنَّهٗ

১৩। মকাম ঃ وَمَالِىَ (২৩শ) পারার ৬ষ্ঠ রুকূর ৫৭ আয়াতে লেখা আছে لَاِلَى الْجَحِيْمِ কিন্তু পড়িতে হইবে, لَ اِلَى الْجَحِيْمِ লামের বাদের আলেফ পড়া যাইবে না।

১৪। মকাম ঃ حٰمٓ (২৬শ) পারার সূরা-মোহাম্মদের প্রথম রুকূর ৪র্থ আয়াতে লেখা আছে, لِيَبْلُوَا এইরূপে এই সূরার ৪র্থ রুকূর তৃতীয় আয়াতে লেখা আছে, لَنَبْلُوَا কিন্তু পড়া যাইবে لِيَبْلُوَ এবং لَنَبْلُوَ দোনো জায়গায় و -এর পরের আলেফ পড়া যাইবে না।

১৫। মকাম ঃ تَبَارَكَ الَّذِىْ (২৯শ) পারার সূরা-দাহ্‌রের প্রথম রুকূর ৪র্থ আয়াত লেখা আছে, سَلَاسِلَا দ্বিতীয় লামের পরে যে আলেফ লেখা আছে উহা পড়িতে হইবে না, পড়িতে হইবে, سَلَاسِلَ এইরূপে এই সূরার এই রুকূতেই ১৫, ১৬ আয়াতে قَوَارِيْرَا قَوَارِيْرَا দুই বার আসিয়াছে ও দোনো স্থানে দ্বিতীয় ر -এর পর আলেফ লেখা আছে। ইহার হুকুম এই যে, প্রায়ই লোকে প্রথম قَوَارِيْرً -এর উপর অক্‌ফ করিয়া থাকে, দ্বিতীয় قَوَارِيْرَا -এর উপর অক্‌ফ করে না, যদি এইরূপ করে, তবে প্রথম জায়গায় আলেফ পড়িতে হইবে। দ্বিতীয় জায়গায় قَوَارِيْرَا ই পড়িতে হইবে। আর যদি প্রথম قَوَارِيْرَا -এর উপর অক্‌ফ না করে, তবে প্রথম জায়গায়ও আলেফ পড়া যাইবে না, দ্বিতীয় জায়গায় ত যাইবেই না, চাই অক্‌ফ করুক বা না করুক।

১৬। মকাম ঃ وَاعْلَمُوْا (১০ম) পারার মধ্যে সূরা-তওবা আছে। সূরা শুরু হয় بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ হইতে। এই সূরার শুরুতে بِسْمِ اللهِ লেখা নাই। ইহার হুকুম এই যে, যদি উপর হইতে পড়িয়া আসিতে থাকে, তবে بِسْمِ اللهِ পড়িবে না, আর যদি এই সূরা হইতে তেলাওয়াত শুরু করে, তবে আউযুবিল্লাহ্, বিছমিল্লাহ্ পড়িতে হইবে। আর যদি উপরের 'সূরা পড়িয়া বন্ধ করিয়া থাকে এবং অনেকক্ষণ পর আবার সূরায়ে তওবা হইতে পড়া শুরু করে, তবুও আউযু বিল্লাহ্ বিছমিল্লাহ্ পড়িয়া শুরু করিবে, অন্যান্য জায়গায়ও এইরূপ করিতে হয়।

॥ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

পঞ্চম খণ্ড (পরিশিষ্ট)

হালাল মাল অন্বেষণ করার ফযীলত[১]

عَنْ عَبْدِاللّٰہِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْہِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَالْفَرِيْضَةِ (بيهقى)

১। হাদীসঃ হাদীসে আছে, অন্যান্য ফরযের পর হালাল (মাল) অন্বেষণ করা ফরয। অর্থাৎ যে ফরযগুলি ইসলামের আরকান (খুঁটি) যেমন—নামায, রোযা ইত্যাদি সেগুলি আদায়ের পর। —মেশকাত

হালাল মাল অন্বেষণ করা ফরয বটে, কিন্তু এই ফরযের দর্জা অন্যান্য ফরযের চেয়ে কম, যাহা ইসলামের আরকান বা খুঁটিস্বরূপ। এই ফরয ঐ ব্যক্তির জিম্মায় যে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খরচের জন্য মালের মুখাপেক্ষী, তাহা নিজস্ব জরুরত দূর করার জন্য হউক কিংবা পরিবারবর্গের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য হউক। আর যাহার নিকট আবশ্যক পরিমাণ অর্থ মওজুদ আছে, যেমন বিত্তশালী লোক, কিংবা অন্য কোন উপায়ে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার উপর এই ফরয থাকে না। কেননা, সম্পত্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা জরুরত মিটাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যেন বান্দা জরুরী অভাব পূরণ করিয়া আল্লাহ্ পাকের এবাদত বন্দেগীতে মশ্‌গুল হইতে পারে। কেননা, পানাহার ব্যতীত এবাদত সম্ভব নহে। কাজেই সম্পত্তি আসল উদ্দেশ্য নহে, বরং অন্য কারণে কাম্য। অতএব, যখন দরকারোপযোগী মাল সম্পদ হস্তগত হয়, তখন অযথা লোভে পড়িয়া উহার অন্বেষণ করা এবং বাড়ান উচিত নহে। অতএব, যাহার নিকট আবশ্যক পরিমাণ (মাল) মওজুদ আছে তদপেক্ষা অধিক বাড়ান ফরয নহে, বরং সম্পত্তির লোভ লিপ্সা (মানুষকে) আল্লাহ্ হইতে গাফেল করে এবং উহার আধিক্য গোনাহের কাজে লিপ্ত করে। ভাল ভাবে বুঝিয়া লও। আর এদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন হালাল মাল হস্তগত হয়। হারাম মালের দিকে মুসলমানের বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নহে। কেননা, ঐ সমস্ত মালে বরকত হয় না এবং হারামখোর লোক দ্বীন ও দুনিয়ার লাঞ্ছনা এবং আল্লাহ্‌র লা'নতে নিপতিত থাকে। কোন কোন নির্বোধের এই ধারণা যে, আজকাল হালাল মাল রোজগার করা অসম্ভব। এমন কি হালাল মাল পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা একেবারেই ভুল ধারণা এবং শয়তানী ধোঁকা মাত্র।

টিকা

১ ইহা মূল কিতাবের শেষে আছে!

মনে রাখিও, যাহারা শরীঅতের উপর আমল করে, গায়েব হইতে তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ইহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত যে, হালাল খাওয়া এবং হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকা যাহার নিয়্যত থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সে ধরনের মালও দান করেন। কোরআন হাদীসেও বহু স্থানে এই ওয়াদার উল্লেখ আছে। এই দুর্দিনে আল্লাহ্ তা'আলার যে সমস্ত বান্দা হারাম এবং সন্দেহযুক্ত মাল হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখে তাহাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম হালাল মাল দান করিয়া থাকেন। যাহারা নিজেদের এবং অন্যান্য বুযুর্গদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার এই ব্যবহার দেখিতে পায় এবং কোরআন হাদীসের বিভিন্নস্থানে এই বিষয়ের বর্ণনা দেখিতে পায়, তাহারা এ ধরনের নির্বোধদের উক্তির প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিতে পারে না। আর যদি কোন বিশ্বাসযোগ্য কিতাবে এই ধরনের বিষয় নজরে পড়ে, তবে তাহার মর্ম অজ্ঞ লোকেরা যাহা বুঝিয়া লইয়াছে তাহা নহে। অতএব, যখন এ ধরনের কোন বিষয় দেখিতে পাও, তখন কোন অভিজ্ঞ দ্বীনদার আলেমের নিকট হইতে উহার অর্থ ও মর্ম জানিয়া লইবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ তোমার বুঝে আসিবে, মন শান্ত হইবে এবং এ সকল বেহুদা উক্তির ওছওছা অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। ভালরূপে বুঝিয়া লও, মানুষ অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে অতি অল্পই সাবধানতা অবলম্বন করে। শরীঅত বিরোধী নাজায়েয চাকুরী করে, অন্যের হক নষ্ট করে, এ সবই হারাম। আর খুব স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্র দরবারে কোন বিষয়েরই অভাব নাই, অদৃষ্টে যে পরিমাণ লিখা আছে নিশ্চয়ই পাইবে, তবে নিয়্যত খারাপ করা এবং দোযখে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা কোন্ বিবেক সম্মত কথা?

যেহেতু হালাল মালের দিকে মানুষের লক্ষ্য খুবই কম, এজন্য বারংবার তাকীদ সহকারে বর্ণনা করা হইল। দুনিয়াতে মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ্র বন্দেগী করিবে। কাজেই সর্বক্ষেত্রে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। আর পানাহারের উদ্দেশ্য হইল দেহে শক্তি সঞ্চয় করা যেন আল্লাহ্র নাম লওয়া যায়। পানাহারের উদ্দেশ্য এই নয় যে, দিন রাত ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকা, আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলিয়া যাওয়া এবং তাঁহার নাফরমানি করা। কোন কোন নির্বোধের ধারণা—দুনিয়াতে শুধু খাওয়া পরা ও ভোগ-বিলাসের জন্য আসিয়াছে। সাবধান, ইহা নিতান্ত বদদ্বীনী। আল্লাহ্ তা'আলা নির্বুদ্ধিতার অবসান করুন। কি জঘন্য আপদ!

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِىْ كَرَبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ـ (رواه البخارى)

২। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নিজের দুই হাতে অর্জিত খাদ্যের চেয়ে কোন উত্তম খাদ্য নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নবী হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে অর্জিত খাদ্য খাইতেন। অর্থাৎ নিজ হাতের অর্জিত বস্তু অতি উত্তম জিনিস। যেমন, কোন শিল্প বা ব্যবসা করা ইত্যাদি। অযথা কাহারও উপর বোঝা চাপাইবে না। কোন পেশাকেই তুচ্ছ মনে করা উচিত নহে। যখন এ ধরনের কাজ হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামগণ করিয়াছেন, তবে আর কে এমন ব্যক্তি আছে, যাহাদের মান মর্যাদা তাঁহাদের চেয়ে বেশী? বরং কাহারও মর্যাদা তাঁহাদের সমতুল্যই নহে, তদপেক্ষা বেশীর তো প্রশ্নই উঠে না। এক হাদীসে আছে, এমন কোন নবী নাই যিনি বকরী চরাণ নাই। ভালরূপে বুঝিয়া লও এবং নির্বুদ্ধিতা হইতে বাঁচিয়া থাক। কোন কোন লোকের এই ধারণা যে, যদি কাহারও নিকট হালাল মাল থাকে, কিন্তু স্বীয় হস্তে অর্জিত নহে, বরং ওয়ারিসী সূত্রে পাইয়াছে, কিম্বা অন্য কোন হালাল উপায়ে হস্তগত

হইয়াছে, অথচ অযথা নিজে অর্জনের চিন্তা করে এবং উহাকে বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে উত্তম মনে করে, ইহা নিতান্ত ভুল; বরং এমন লোকের জন্য এবাদতে মশ্‌গুল হওয়া উত্তম। যখন আল্লাহ্ তা'আলা শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং জীবিকার চিন্ত-ভাবনা হইতে নিশ্চিন্ত করিয়াছে, তখন নেহাত না-শুকরি যে, তাঁহার নাম ভাল ভাবে লয় না এবং অর্থ-সম্পদ বাড়াইতেই থাকে। অথচ হালাল মাল যে ভাবেই হস্তগত হউক না কেন বিনা অপমানে উহা সবই উত্তম ও আল্লাহ্ তা'আলার বড় নেয়ামত। ইহার খুব যত্ন করা উচিত এবং নিয়মিতভাবে ব্যয় করা উচিত, অযথা অপব্যয় করিবে না। হাদীসের মর্ম এই যে, মানুষ যেন নিজের ব্যয়ভার অন্যের উপর না চাপায় এবং লোকদের কাছে ভিক্ষা না করে, যে পর্যন্ত না কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হয়—যাহাকে শরীঅতে মজবুরী বলে। আর কোন পেশাকেই যেন হেয় মনে না করিয়া হালাল মাল অন্বেষণ করে, কামাই রোজগারকে দূষণীয় মনে না করে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়কে গুরুত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, যেন লোকেরা নিজ হাতে কামাই রোযগার করাকে দূষণীয় মনে না করে এবং কামাই রোযগার করিয়া নিজেরা খায়, অন্যকে খাওয়ায় ও দান-খয়রাত করে। হাদীসের এই উদ্দেশ্য নহে যে, নিজ হাতে অর্জন ব্যতীত যে সমস্ত হালাল মাল অন্য কোন উপায়ে পাওয়া যায় উহা হালাল নহে, কিংবা স্বহস্তে অর্জিত অর্থের সমতুল্য নহে, অথচ কোন কোন মাল নিজ হাতে উপার্জিত অর্থ অপেক্ষা উত্তম হইয়া থাকে।

আর কোন কোন নির্বোধ লোক আল্লাহ্‌র সত্যিকারের বিশিষ্ট বান্দাদের উপর যাহারা তাওয়াক্কুলের অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করে তাহাদের বিরূপ সমালোচনা করে এবং প্রমাণ স্বরূপ অত্র বর্ণিত হাদীস পেশ করে। তাহারা বলে, তাহাদের উচিত নিজ হাতে উপার্জন করা। শুধু আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করিয়া বসিয়া থাকা এবং হাদিয়া তোহ্‌ফার উপর জীবন যাপন করা ভাল নহে। এইরূপ সমালোচনা করা আমাদের নিতান্ত বোকামি। এই অমূলক সমালোচনা জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছে। তাহাদের ভয় করা উচিত যে, ঐ সকল বুযুর্গদের সহিত বে-আদবি এবং তাঁহাদের প্রতি তিরস্কার ও ভৎর্সনা করায় কঠিন মছীবতে নিপতিত হইবার আশংকা রহিয়াছে যে, এইরূপ তিরস্কারকারীকে ধ্বংস করিয়া দিবে। আউলিয়াদের সাথে বে'আদবীর কারণে ঈমান চলিয়া যাওয়ার এবং বেঈমান হইয়া মরিবার আশংকা রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোককে ধ্বংস করুন ঐ সময়ের পূর্বে যখন বুযুর্গদের সম্পর্কে এইরূপ সমালোচনা করে। কেননা তাহার জন্য ইহাই উত্তম। আমি বলি, কোরআন, হাদীসে গভীর চিন্তা করিলে বুঝা যায়, যদি ন্যায় ও ইনছাফ সহকারে সত্যের অন্বেষণে গভীর চিন্তা করা হয় যে, যাহার মধ্যে তাওয়াক্কুলের (নির্ভরতার) শর্তাবলী পাওয়া যায়, তাহার পক্ষে তাওয়াক্কুল করা উপার্জনের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। ইহা বেলায়েতের মকামসমূহের মধ্যে অতি উচ্চ মকাম। জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং মুতাওয়াক্কেল ছিলেন এবং মুতাওয়াক্কেলদের আমদানি হাতের উপার্জনের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। উহাতে বিশেষ বরকত এবং বিশিষ্ট নূর নিহিত আছে। যাহাকে আল্লাহ্ এই মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং জ্ঞান চক্ষু, বিবেক-বুদ্ধি এবং বাতেনী নূর প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইহার বরকতসমূহ দর্শন ও অনুধাবন করিয়া থাকেন। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা কোন বিশেষ স্থানে বর্ণিত হইবে। যেহেতু ইহা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, এজন্য বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ নাই। এতটুকু বুঝিয়া লওয়াই যথেষ্ট যে, এই উক্তি নিতান্তই ভুল যেমন উপরে বর্ণিত হইল।

আর বড় অন্যায় কথা যে, একে তো নিজে নেক কাজ হইতে বঞ্চিত, অন্যে করিলে তাহার প্রতি দোষারোপ ও কটুক্তি করিতেছ? কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে মুখ দেখাইবে, যখন তাঁহার ওলীদের অপমান করিতেছ?

উপরোক্ত উপকারিতা ব্যতীত তাওয়াক্কুল করাতে আরও অনেক দ্বীনী উপকারিতা নিহিত আছে। আরও ঐ সমস্ত মুতাওয়াক্কেল যাহারা লোকদিগকে এলম শিক্ষা দেন তাঁহাদের প্রয়োজনীয় খরচ পরিমাণে তাহাদের খেদমত করা ফরয। অতএব, তাহাদের স্বীয় হক হাদিয়া তোহ্ফা হইতে গ্রহণ করাকে কেন অন্যায় মনে করা হইতেছে? অথচ যাহারা তাওয়াক্কুলের ধার ধারে না তহারা নিজেদের প্রাপ্য মারামারি ঝগড়া-ফাসাদ করিয়া উসুল করিয়া লয়। পক্ষান্তরে মুতাওয়াক্কেলগণ লোকদের অতিশয় অনুনয় বিনয়ের পর আদবের সহিত আপন হক্ কবূল করেন। নজরানা, হাদিয়া কবূল করাতে যদি অপদস্ত হইতে হয় এবং মুহ্তাজ না হইয়া বেপরোয়াভাবে লওয়া হয়—বিশেষতঃ যখন উহা ফেরত দিলে দাতার মনে কঠিন আঘাত লাগে! ইহাতে বুঝা যায়, ইহা ভাল না মন্দ? মুদ্দা কথা সত্যিকারের মুতাওয়াক্কেলগণ বড়ই মান সম্মানের জীবিকা পাইয়া থাকেন, যদি তাঁহাদের নিয়্যত এবং লক্ষ্য শুধু আল্লাহ্র উপর ভরসা হয়, মানুষের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি না হয়। যাহারা মানুষের উপর আশা রাখে এবং দৃষ্টি রাখে তাহাদের মালের উপর, সে তো ধোঁকাবাজ, সে আমাদের এই উক্তির বাহিরে। আমি তো সত্যিকারের মুতাওয়াক্কেলদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি। কাহাকেও হেয় মনে করা, বিশেষতঃ আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দাগণকে—বড় শক্ত গোনাহ্। ইহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই বরং লাভ। কেননা মন্দ উক্তিকারীদের নেকীসমূহ রোজ কিয়ামতে তাঁহারা পাইবেন। সর্বনাশ তো উহাদের যাহারা মন্দ বলে। কেননা, তাহাদের দ্বীন দুনিয়া বরবাদ হয়।

আর এই কথাও স্মরণযোগ্য যে, শরীঅতে তাওয়াক্কুলের অনুমতি সকলকেই দান করে নাই। ইহাতে সৎসাহস করা এবং উহার শর্তাবলী পুরা হওয়া বড়ই কঠিন! এ জন্যই এধরনের বুযুর্গ বিরল। আর অনেক ভাল ও উত্তম জিনিস সর্বদা কমই হয়। আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শোক্র যে, এই অধ্যায়টা একটু সাধারণ দৃষ্টিপাত করাতেই খুব উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়া গেল। আল্লাহ্ যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে আমলের তৌফীক দেন, আমীন।

৩। **হাদীস**ঃ নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র অর্থাৎ সর্বগুণ সম্পন্ন এবং যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কবূল করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ্ পবিত্র। পবিত্র (হালাল) মাল কবূল করেন, হারাম মাল তথায় গৃহীত হয় না। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, হারাম মাল খয়রাত করিয়া ছওয়াবের আশা রাখা কুফরী। নিশ্চই আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদিগকে ঐ জিনিসের আদেশ করিয়াছেন যাহার আদেশ নবীগণকে করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইয়াছেন, হে নবীগণ! পবিত্র বস্তু অর্থাৎ হালাল মাল ভক্ষণ করুন আর নেক আমল করুন। (আল্লাহ্ তা'আলা) আরও ফরমাইয়াছেন, হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদিগকে যে পবিত্র বস্তু দান করিয়াছি তাহা হইতে খাও। অতঃপর জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির কথা বলিয়াছেন, যেব্যক্তি (হজ্জ করিতে, এল্‌ম শিক্ষা করিতে ও অন্যান্য নেক কাজে দূর দেশে ভ্রমণ করে এ অবস্থায় যে, সফরের কষ্টে এলোমেলো কেশে ধুলায় ধূসরিত অবস্থায় আসমানের দিকে হাত বাড়ায় এবং) বলে, হে আমার পরওয়ারদেগার! হে আমার পরওয়ারদেগার! অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের দরবারে বারংবার প্রার্থনা করে—দয়া করিয়া

উদ্দেশ্য সফল কর, অথচ তাহার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, তাহার পরিহিত বস্ত্র হারাম। অর্থাৎ খাদ্য, পানীয় ও পরিহিত বস্ত্র হারাম উপায়ে অর্জিত, আর প্রতিপালিত হইয়াছে হারাম (মাল) দ্বারা (অর্থাৎ হারাম মালে জীবন ধারণ করে, উহা দ্বারা প্রতিপালিত হয়; অবশ্য যাহার মাতা-পিতা নাবালেগ অবস্থায় হারাম মাল দ্বারা লালনপালন করিয়াছে; কিন্তু বালেগ হইয়া সে হালাল মাল অর্জন করিয়া নিজের ভরণ পোষণে ব্যয় করিয়াছে, এমন ব্যক্তি এই হুকুমের আওতায় নহে। নাবালেগ অবস্থার গোনাহ্ শুধু পিতা-মাতার উপর।) কাজেই কিরূপে কবূল করা হইবে (সেই দো'আ) অর্থাৎ এত কষ্ট করা সত্ত্বেও হারাম মাল ব্যবহারের কারণে কিছুতেই দো'আ কবূল হইবে না। আর যদি কোন সময় উদ্দেশ্য সাধন হইয়াও যায়, তবে তাহা দো'আর কারণে নহে; বরং ঐ উদ্দেশ্য সাধন হওয়া তাহার অদৃষ্টের লিখনের কারণে যেমন, কাফেরদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। দো'আ কবূল হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর রহ্‌মতের দৃষ্টি করেন এবং ঐ রহ্‌মতের ওছিলায় তাহাকে তাহার কাম্যবস্তু দান করেন এবং ঐ কাম্য বস্তুর উপর নেকী দান করেন। সুতরাং ইহা ঐ ব্যক্তিই পায়, যে শরীঅতের পাবন্দী করে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কামনা করে। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, হালাল খাদ্যে নেহায়েত বরকত আছে, আর বাস্তবিকই তার একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া আছে। এমন মাল ভক্ষণ করিলে নেক কাজের শক্তি সঞ্চয় হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জ্ঞান বিবেকের তাবেদারী করে। —মেশকাত শরীফ, লুমআত

হযরত ছাইয়্যেদুনা মাওলানা আবুহাম্মাদ মোহাম্মাদ গাজ্জালী [(রঃ) তাঁহার কবরকে আল্লাহ্ আলোকিত করুন] একজন অতি বড় দরবেশ—হযরত সোহাইল (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হারাম খায়, দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উহার (বিবেকের) তাবেদারী ছাড়িয়া দেয় (অর্থাৎ বিবেক সৎকাজের আদেশ করে) আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার বিরোধিতা করে, আদেশ পালন করে না। কিন্তু এই বিষয় শুধু মাত্র ঐ সকল বুযুর্গগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যাঁহাদের অন্তর-চক্ষু দীপ্তিমান, আলোকিত; নচেৎ যাহাদের অন্তর কলুষিত ও কালিমাময় তাহারা দিন রাত ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, তাহাদের নেক আমলের বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হয় না। আল্লাহ্ মানুষের অন্তরের অনুভূতি এবং দিলের দৃষ্টি শক্তি এবং জ্ঞান বিবেককে কায়েম রাখুন। আমীন!

৪। হাদীসঃ হযরত ছাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক [যিনি অতি বড় বিখ্যাত নামজাদা আলেম ও বড় বুযুর্গ এবং ইমাম আবুহানিফা (রঃ)-এর শাগরেদ] বলেন, আমার মতে সন্দেহযুক্ত মালের একটি দেরহাম (যাহা আমি হাদিয়াস্বরূপ বা অন্য উপায়ে পাইয়াছি) ফিরাইয়া দেওয়া ছয় লক্ষ টাকা খয়রাত করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ও উত্তম। ইহা দ্বারা অনুভব করা উচিত যে, সন্দেহযুক্ত মালের কি মূল্য? দুঃখের বিষয় যাহারা পরিষ্কার হারামকেও বর্জন করে না, যেভাবেই হউক টাকা পাওয়া চাই। অথচ বুযুর্গানে দ্বীন সন্দেহযুক্ত মালকে কতই না খারাপ মনে করিতেন! সুতরাং প্রত্যেকেরই হারাম মাল হইতে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। ইহাতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। খারাব মাল ভক্ষণ করিলে অসংখ্য দোষ-ত্রুটি নফসের মধ্যে সৃষ্টি হয়, ইহা মানুষকে বিনাশ করে।

৫। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হালাল প্রকাশ্য এবং হারামও প্রকাশ্য। এতদুভয়ের মধ্যে সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলি বিদ্যমান। (অর্থাৎ ইহাদের হালাল বা হারাম হওয়াতে সন্দেহ আছে। এক দিক দিয়া হালাল এবং অন্য দিক দিয়া হারাম বলিয়া মনে হয়।) যাহা অধিকাংশ লোকে জানে না। যাঁহারা উহা জানেন, এমন লোক অতি অল্প। তাঁহারা

অতি বড় মুত্তাক্বী আলেম, যাঁহারা স্বীয় এল্‌ম অনুযায়ী উত্তমরূপে আমল করেন।) অতএব, যে পরহেযগারী এখ্‌তিয়ার করিল সে সন্দেহযুক্ত জিনিস হইতে স্বীয় দ্বীনকে বাঁচাইয়া রাখিল (অর্থাৎ, দোযখের আযাব হইতে আশ্রয় পাইল) এবং মান সম্মানকে বাঁচাইয়া রাখিল (অর্থাৎ, কুৎসা রটনাকারীদের হইতে স্বীয় সম্মান রক্ষা করিল।) কেননা, শরীঅতের বিরোধীদেরকে লোকেরা দোষারোপ করে, গালিগালাজ করে (আর একথা সকলেই জানে যে, দ্বীন দুনিয়ার বেইজ্জতি হইতে বাঁচিয়া থাকা সকল বুদ্ধিমানেরই কর্তব্য)। আর যে ব্যক্তি সন্দেহের জিনিসগুলিতে পতিত হইবে সে হারামে নিপতিত হইবে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্দেহের বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকে না, সে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হারাম কাজে লিপ্ত হইয়া যায়। যেখানেই নফ্‌সকে একটু অবকাশ দেওয়া গেল, ব্যাস সে একটু একটু করিয়া এমন মারাত্মক কাজ করিয়া বসিবে যে, আল্লাহ্‌র পানাহ্‌ ব্যতীত উপায়ান্তর থাকিবে না। মানুষকে একেবারেই বিনাশ করিয়া ফেলিবে।)

অতএব, যে ব্যক্তি ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করে, যাহা পায় তাহাই গ্রহণ করে, কোন সন্দেহযুক্ত মাল সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপও করে না, সে অতি সত্বরই হারাম খাইতে অভ্যস্ত হইবে। নফ্‌সকে সর্বদা শরীঅতের বন্দী বানাইয়া রাখিবে, কখনও স্বাধীনতা দিবে না। আর যদিও এমন সন্দেহের মাল যাহার সঠিক অবস্থা জানা নাই যে, উহাতে কতটুকু হালাল আছে, আর কতটুকু হারাম, উহা খাওয়া জায়েয আছে বটে, কিন্তু মকরূহ। কিন্তু একটু একটু করিয়া সন্দেহ হইতে স্পষ্ট হারামে পতিত হওয়ার আশংকা খুব বেশী আছে। কাজেই সন্দেহের বিষয় হইতেও বাঁচিয়া থাকা উচিত! কেননা, আসল উদ্দেশ্য এবং সাহসের কথা তো ইহাই।

ভালরূপে ঐ রাখালের দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও, যে রাখাল ঐ চারণ ভূমির আশেপাশে পশু চরায় যাহাকে বাদশাহ স্বীয় গবাদির জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন। সম্ভাবনা আছে হয়ত সেই (নিষিদ্ধ) মাঠে চরাইয়া বসিবে। অর্থাৎ যে রাখাল এমন (নিষিদ্ধ) চারণ ভূমির আশেপাশে চরায় সে শীঘ্র বিশিষ্ট চারণ ভূমিতে চরাইতে থাকিবে। এরূপ চরাণ অবস্থায় যে পশুগুলি সীমা অতিক্রম করিবে না বা স্বয়ং রাখালেরই হয়ত এরূপ দুঃসাহস হইতে মোটেই সতর্কতা অবলম্বন করিবে না, তাহা বলা অসম্ভব। এরূপে নফসের সতর্কতা থাকে না, কখনও বা শুরুতেই সন্দেহস্থলে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই হারামে লিপ্ত হইয়া পড়ে। অথবা কোন সময় হয়ত কিছু দিন পর এই অবস্থায় পড়িতে হয়।

মনে রাখিবে, যে সমস্ত ঘাস বিনা তদ্‌বীরে নিজে নিজে উৎপন্ন হয় এমন ঘাসের মাঠকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া এবং চরাইতে বারণ করা ভূমির মালিকের জন্য জায়েয নহে। এখানে শুধু দৃষ্টান্ত দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল।

সাবধান! প্রত্যেক বাদশার একটি চারণভূমি আছে (এবং) সাবধান আল্লাহ্‌র চারণভূমি (যাহা সংরক্ষিত) তাহার হারামসমূহ (অর্থাৎ যে জিনিস তিনি হারাম করিয়াছেন)।যে ব্যক্তি ঐ হারামে পতিত হইবে, সে আল্লাহ্‌র খেয়ানত করিবে। আর ইহা পরিষ্কার কথা যে, বাদশার সহিত খেয়ানত করা রাষ্ট্রদ্রোহিতা! আল্লাহ্‌ তা'আলা যেহেতু সর্বোচ্চ বাদশাহ, কাজেই তাঁহার খেয়ানত উচ্চ স্তরের রাষ্ট্রদ্রোহিতা, যাহার শাস্তিও অতি ভীষণ। জানিয়া রাখ, মানুষের শরীরে এমন একটা মাংস-টুকরা আছে। যখন উহা সুস্থ থাকিবে অর্থাৎ উহাতে আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক দোষ না থাকিবে, তখন সমস্ত শরীর সুস্থ থাকিবে। যখন উহা ফাসেদ ও খারাব হইবে, তখন সমস্ত শরীর খারাব হইবে। জানিয়া রাখ, উহা (মাংস টুকরা হইল) দিল বা অন্তর (অর্থাৎ দিল শরীরের রাজা।) দিল সুস্থ

থাকিলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে। আর দিলের সুস্থতা আল্লাহ্‌র এবাদতের উপর নিবদ্ধ। গোনাহ্‌ করিলে দেল অন্ধ হইয়া যায়। সারকথা, আত্মার সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত নেক কাজ সম্ভব নহে। হালাল খাওয়া দিলের পরিচ্ছন্নতার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহা দ্বারা হালাল খাওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইল। —মেশ্‌কাত শরীফ

৬। হাদীসঃ জনাব রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহুদীদের ধ্বংস করুক। তাহাদের প্রতি চর্বি হারাম করা হইয়াছিল (অর্থাৎ গরু বকরীর চর্বি। যেমন, কোরআন পাকে উল্লেখ আছে) তখন তাহারা উহাকে গলাইয়া তরল করিল। অতঃপর তাহারা উহা বিক্রয় করিল (অর্থাৎ তাহারা এই হিলা-বাহানা করিল যে,) হুবহু চর্বি খাইল না, বরং উহার মূল্য খাইল। তাহারা মনে করিল, ইহা চর্বি খাওয়া নহে। অথচ ঐ আদেশের মর্ম এই ছিল যে, চর্বি দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হইতে পারিবে না। বিক্রয় করিয়া দাম খাওয়াও উহার শামিল ছিল। আজকাল কোন কোন সুদখোর এই ধরনের বাহানা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে, যেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদ হইতে বাঁচিয়া যায় এবং বাস্তবে সুদ খাইতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা আলেমুল গায়েব, মনের নিয়্যত ভাল ভাবেই জানেন। কিছুতেই এরূপ বাহানা করা ঠিক নহে। —মেশ্‌কাত শরীফ

৭। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহা সম্ভব নহে যে, হারাম মাল রোজগার করিয়া তাহা হইতে দান করিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা উহা কবূল করিবেন। উহা খরচ করিলে উহাতে বরকত হইবে না। আর ইহা নিশ্চিত যে, মাল ত্যাজ্য সম্পত্তিরূপে রাখিয়া গেলে উহা দোযখে পৌঁছিবার সম্বল হইবে। অর্থাৎ হারাম উপায়ে মাল রোজগার করিয়া দান করিলে কবূল হইবে না এবং ছওয়াব পাইবে না। এমনকি, কতক আলেম বলিয়াছেন, হারাম মাল খয়রাত করিয়া ছওয়াবের আশা রাখা কুফরী। যদি কেহ ছওয়াবের নিয়্যতে কোন ভিক্ষুককে হারাম মাল দান করে, আর সেই ভিক্ষুক উহা হারাম মাল জানিয়াও যদি দাতার জন্য দো'আ করে উক্ত ওলামাদের মতে কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি এই ধরনের ধন-সম্পত্তি অন্য কোন কাজে ব্যয় করা হয়, তবু বিন্দুমাত্র বরকত হইবে না। (আর নিজের মৃত্যুকালে যদি ত্যাজ্য সম্পত্তিরূপে এই ধরনের সম্পত্তি রাখিয়া যায়, তবে উহার কারণে দোযখে দাখিল হইবে। খাইবে তো ওয়ারিশান আর দোযখে যাইবে সেই সঞ্চয়কারী। মোটকথা, হারাম মালে ক্ষতি ছাড়া কোনই লাভ নাই।) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনও মন্দকে মন্দ দ্বারা দূর করেন না। অর্থাৎ, যেহেতু হারাম মাল খয়রাত করা নিষেধ এবং গোনাহ্‌, কাজেই ঐ গোনাহ্‌র দ্বারা অন্য গোনাহ্‌ মাফ হইতে পারে না। কিন্তু ভাল দ্বারা মন্দকে মিটাইয়া দেন (অতএব, যখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে শরীঅত অনুযায়ী হালাল মাল দান করা হয়, ঐ দান গোনাহের কাফ্‌ফারা হইবে।) নিশ্চয় খবিছ (অর্থাৎ হারাম মাল) খবিছকে (অর্থাৎ গোনাহ্‌কে) দূর করে না। —মেশ্‌কাত শরীফ

৮। হাদীসঃ দেহের যে গোশত হারাম মাল দ্বারা পালিত ও বর্ধিত হইয়াছে, উহা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না আর এমন প্রত্যেক মাংস যাহা হারাম মালে পালিত ও বর্ধিত হইয়াছে জাহান্নামই উহার উপযুক্ত। (অর্থাৎ হারামখোর শাস্তি ভোগ করা ব্যতীত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহার অর্থ এই নহে যে, কাফেরের মত কস্মিনকালেও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না; বরং যদি ইসলামের উপর মরিয়া থাকে, কিন্তু ছিল হারামখোর; তবে নিজের গোনাহ্‌র শাস্তি

ভোগ করিয়া বেহেশ্‌তে যাইবে। যদি মৃত্যুর আগে হারাম খাওয়া হইতে তওবা করে এবং তার জিম্মায় যার যার হক আছে উহা আদায় করিয়া দেয়, তবে আল্লাহ্ তাহার এ সকল গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। এই হাদীসে যে আযাবের কথা উল্লেখ আছে, উহা হইতে রক্ষা পাইবে।
—মেশ্‌কাত শরীফ

৯। হাদীসঃ বান্দা পুরাপুরি পরহেযগার হইতে পারে না যাবৎ ঐ হালালকে বর্জন না করে যাহাতে হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ কোন বস্তু সম্পূর্ণ হালাল এবং কোন কাজ মোবাহ্ এবং জায়েয; কিন্তু উহাতে আকৃষ্ট হইয়া এমন মাল ভক্ষণ করিলে গোনাহে পতিত হইবার আশংকা আছে। তখন এমন হালাল মালও খাইবে না এবং এমন জায়েয কাজও করিবে না। কেননা যদিও এই মাল খাওয়া এবং এই কাজ করা গোনাহ্ নহে, কিন্তু উহার দ্বারা গোনাহে পতিত হওয়ার আশংকা আছে। কারণ, অন্যায় কাজের উপায় উপকরণও অন্যায়। যেমন, ভাল ভাল দ্রব্য খাওয়া-পরা জায়েয ও হালাল। কিন্তু অতিরিক্ত ভোগবিলাসে লিপ্ত হইলে গোনাহে জড়িত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য পূর্ণ খোদাভিরুতা এবং উচ্চস্তরের পরহেযগারী হইল এই ধরনের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা। সন্দেহের মাল লওয়া মকরূহ, কিন্তু উহা খাওয়ার সাহস করিলে ভয় আছে যে, অদূর ভবিষ্যতে হারাম খাইতে বাধ্য হইবে। অতএব, এমন মাল হইতে বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য।)
—মেশ্‌কাত শরীফ

১০। হাদীসঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর একটি গোলাম ছিল। সে হযরত আবুবকর (রাঃ) কে তাহার সমস্ত আয়ের (নির্ধারিত) অংশ খেরাজ বা মাসুল দিত। হযরত আবুবকর (রাঃ) গোলাম প্রদত্ত ঐ খেরাজ আহার করিতেন। একদিন ঐ গোলাম কিছু খাওয়ার বস্তু আনিল, হযরত আবুবকর (রাঃ) উহা হইতে কিছু খাইলেন। তখন গোলাম বলিল, আপনার কি জানা আছে, আপনি যাহা খাইলেন তাহা কি ছিল? (এবং কোথা হইতে আসিল?) তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, উহা কি জিনিস ছিল (যাহা আমি খাইলাম?) সে বলিল, আমি (ইসলাম-পূর্ব) অজ্ঞ যুগে এক ব্যক্তিকে গণকদের নিয়মানুযায়ী কোন একটা খবর দিয়াছিলাম, অথচ ঐ কাজে আমার জ্ঞান ছিল না। (অর্থাৎ গণকেরা যাহাকিছু বলে তাহা কখনো সত্য ও ঠিক হয় আবার কখনো ভুল হয়। কিন্তু উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা নিষেধ। আর তাহাদের ঐ বিষয়ের নির্ধারিত নিয়ম-কানুন আমি ভালরূপে জ্ঞাত ছিলাম না) আমি ঐ ব্যক্তিকে ধোঁকা দিয়াছিলাম। অতঃপর তার সাথে আমার দেখা হইলে (আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার বিনিময়ে) সে আমাকে (এই জিনিস) দিয়াছে যাহা আপনি খাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া হযরত আবুবকর (রাঃ) সতর্কতা ও পূর্ণ তাকওয়ার কারণে নিজের হাত গলায় ঢুকাইয়া দিয়া পেটের সমস্ত ভুক্ত বস্তু বমি করিয়া দিলেন। কেননা, শুধু ঐ ভুক্ত বস্তু বাহির করা ত সম্ভব ছিল না, কাজেই সমস্ত পেট খালি করিয়া দিলেন। অথচ তিনি যদি বমি না করিতেন, তবুও গোনাহ্ হইত না। —মেশ্‌কাত শরীফ

১১। হাদীসঃ যে ব্যক্তি দশ টাকার কোন কাপড় খরিদ করিল, উহাতে এক টাকা হারামের ছিল। যতদিন পর্যন্ত ঐ কাপড় তাহার শরীরে থাকিবে আল্লাহ্ তাহার নামায কবূল করিবেন না। (অর্থাৎ যদিও ফরয আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু নামাযের ছওয়াব পুরা পাইবে না। এরূপে অন্যান্যগুলি, অনুমান করিয়া লইবে। আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত। একেতো মানুষ এবাদত করেই

বা কি ? আর যাহাকিছু করা হয় তাহাও যদি এরূপে বরবাদ হয়, তবে কিয়ামতের দিন কি জওয়াব দেওয়া হইবে আর কিভাবে যন্ত্রণাময় আযাব সহ্য হইবে। —মেশ্‌কাত শরীফ

١٢ ـ رواه ابن ابى الدنيا فى القناعة والبيهقى فى المدخل و قال انه منقطع ونص الحديث

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنِّىْ لَااَعْلَمُ شَيْئًا يُّقَرِّبُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ وَيُبَعِّدُكُمْ مِّنَ النَّارِ اِلَّا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ وَلَااَعْلَمُ شَيْئًا يُّبَعِّدُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ وَيُقَرِّبُكُمْ مِّنَ النَّارِ اِلَّا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَالرُّوْحُ الْاَمِيْنُ نَفَثَ فِىْ رَوْعِىْ اِنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَوْفِىَ رِزْقَهَا وَاِنْ اَبْطَاَعَنْهَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَايَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ شَىْءٍ مِّنَ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعْصِيَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَايُنَالُ مَاعِنْدَهٗ مِنَ الرِّزْقِ وَغَيْرِهٖ بِمَعْصِيَّةٍ

১২। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ নিশ্চয় আমার জানামতে যে সব কাজ তোমাদিগকে বেহেশ্‌তের নিকটবর্তী করিয়া দেয় এবং দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে আমি তোমাদিগকে সে কাজের হুকুম দিয়াছি। (অর্থাৎ, বেহেশ্‌তে যাওয়ার এবং দোযখ হইতে বাঁচিয়া থাকার যাবতীয় কাজ আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছি) এবং আমার জানামতে যাহা তোমাদিগকে বেহেশ্‌ত হইতে দূরে সরাইয়া দেয় এবং দোযখের নিকটবর্তী করিয়া দেয়, আমি তোমাদিগকে উহা হইতে নিষেধ করিয়াছি। (অর্থাৎ দোযখে প্রবেশ করায় এবং বেহেশ্‌ত হইতে দূরে সরাইয়া দেয় এমন সব কাজ হইতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছি যে, এমন কাজ করিও না।) এবং রূহুল আমিন (জিব্‌রায়ীল আঃ) আমার অন্তরে এলহাম করিয়াছেন যে, নিশ্চয় কেহই মরিবে না, যে পর্যন্ত না পুরাপুরি তাহার জীবিকা ভোগ করে। (অর্থাৎ, অদৃষ্টে যে পরিমাণ রিযিক প্রত্যেকটি সৃষ্টজীবের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে ঐ পরিমাণ পাওয়ার পূর্বে কেহ মরিতে পারে না) যদিও ঐ জীবিকা দেরিতে পায় (অর্থাৎ পাইবে ত নিশ্চয়, যে সময়ের জন্য লিখিয়াছেন ঐ সময়ে পৌঁছিবে। নিয়্যত খারাব করিলে এবং হারাম উপার্জন করিলে জল্‌দী পাওয়া সম্ভব নহে) আল্লাহ্‌কে ভয় কর (অর্থাৎ, তাঁহার উপর ভরসা কর তাঁহার ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস কর এবং হারাম উপার্জন হইতে বাঁচিয়া থাক) এবং (জীবিকা) অন্বেষণে সংক্ষেপ কর (অর্থাৎ দুনিয়া উপার্জনে সীমা অতিক্রম করিও না এবং লোভী হইও না। শরীঅত বিরোধী অবৈধ উপার্জন হইতে বাঁচিতে থাক)। আর খবরদার জীবিকা প্রাপ্তিতে দেরী হওয়া যেন তোমাদিগকে (একথার উপর) উৎসাহিত না করে যে, আল্লাহ্‌র নাফরমানী পন্থায়—উহা অর্জনে লাগিয়া যাও। (অর্থাৎ, রিযক পৌঁছিতে যদি কিছু দেরী হয়, তবে গোনাহ্ এবং হারাম উপায়ে উপার্জন করিও না। কেননা, সময়ের পূর্বে কিছুতেই পাইবে না অযথা বিস্বাদ পাপে লিপ্ত হইবে।) কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে রিযিক ইত্যাদি যাহাকিছু আছে তাঁহার নাফরমানীর দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নহে। —ইবনে আবিদ্দুনিয়া

১৩। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, দশ ভাগের নয় ভাগ জীবিকা ব্যবসার মধ্যে (অর্থাৎ, তেজারত অতি বড় আমদানির উপায়, উহা অবলম্বন কর।)

—বায়হাকী শরীফ

১৪। হাদীসঃ আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন ঐ মু'মিনকে যে পরিশ্রমী এবং শিল্পকাজ দ্বারা জীবিকা উপার্জনকারী কি পরিতেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। (অর্থাৎ মেহনত ও পরিশ্রমকালে

সাধারণ ময়লা কাপড় পরে। এতটুকু অবসর নাই এবং এমন সুযোগ নাই যে, কাপড় বেশী ছাফ রাখিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি মজবুর ও অপারগ না হয় তাহার উচিত সাদাসিধাভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।)

১৫। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার নিকট এই মর্মে ওহী আসে নাই যে, আমি ধন-সম্পত্তি জমা করি। (অর্থাৎ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিতে এবং ব্যবসায়ী হইবার জন্য আমার নিকট ওহী আসে নাই। অবশ্য এই মর্মে আমার নিকট ওহী আসিয়াছে যে, তুমি আল্লাহ্‌র তসবীহ্ (সোবহানাল্লাহে ওয়াবেহামদিহি) পড় এবং সজ্‌দাকারীদের শামিল হও, (অর্থাৎ সদাসর্বদা নামায কায়েম রাখ এবং ঐ সকল লোকদের শ্রেণীভুক্ত হও যাহারা সর্বদা নামায পড়ে এবং এবাদত করে) এবং আমৃত্যু স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবাদত কর, (প্রয়োজনের অধিক দুনিয়াতে লিপ্ত হইবে না। কেননা, আবশ্যক পরিমাণ জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা সকলের প্রতিই ওয়াজিব। অবশ্য যাহার মধ্যে তাওয়াক্কুলের শক্তি ও তাওয়াক্কুলের শর্তাবলী পাওয়া যায় এমন ব্যক্তি যাবতীয় কাজকর্ম ছাড়িয়া শুধু এল্‌মী ও আমলী এবাদতে মশ্‌গুল হইবে।
—বায়হাকী শরীফ

١٦ ـ عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَابَاعَ وَ اِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا قَضٰى ـ بخارى

১৬। হাদীসঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সরওয়ারে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, রহম করুন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর যে নম্র ব্যবহার করে যখন (কোন জিনিস) বিক্রি করে আর যখন (কিছু) ক্রয় করে, আর ঋণ উসুল করে। (সোবহানাল্লাহ্! কেনাবেচা, ঋণ উসুল করার হালতে নরম ব্যবহার ও খাতির করার কত বড় দর্জা যে, জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির জন্য খাছভাবে দো'আ করিতেছেন এবং হুযূরের দো'আ নিশ্চিতরূপে মকবুল।) যদি নম্র ব্যবহারের শুধু এতটুকু ফযীলতই হইত এবং উহা ব্যতীত অন্য সওয়াব পাওয়া নাও যাইত তথাপি অতি বড় নেয়ামত ছিল। অথবা এই খাতির ও নম্র ব্যবহারের সওয়াবও সে পাইবে কাজেই ব্যবসায়ীদের কর্তব্য এই হাদীসের উপর আমল করিয়া জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহের পাত্র হওয়া। আর নম্র ব্যবহারে পার্থিব উপকারিতা এই যে, ইহাতে লোক সন্তুষ্ট হয়, ব্যবসা ভাল চলে, এমন বিনয়ীদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশী হয়। এমন কি, কোন কোন সময় সন্তুষ্ট হইয়া দো'আ দেয়। মোদ্দা কথা, যাহারা শরীঅতের উপর আমল করে দ্বীন দুনিয়ায় তাহারা যেন বাদশাহর ন্যায় থাকে এবং বড় শান্তিতে ও আরামে জীবন যাপন করে। ঐ ব্যক্তির চেয়ে সৌভাগ্যশালী আর কে আছে যাহার দ্বীন ও দুনিয়ার বরকতসমূহ হাছেল হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার ও অধিকাংশ লোকের প্রিয়পাত্র হয়।

১৭। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মাল বিক্রি করার সময় বেশী কসম খাইও না (যে, মাল খুব বিক্রি হইবে।) বেশী কসম খাইও না। (কেননা, বেশী কসমের মধ্যে কোন না কোন একটা মিথ্যা হইতে পারে। ইহাতে বরকত চলিয়া যায় এবং আল্লাহ্‌র নামের বেআদবী হয়। অবশ্য ঘটনাক্রমে যদি হঠাৎ এরূপ হইয়া পড়ে, তবে দোষ নাই। কেননা, একথা সত্য যে, উহাতে (অর্থাৎ, বেশী কসমে) মাল কাটতি হয় (কসমের কারণে মাল

সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকেরা বিশ্বাস করে) কিন্তু পরে বরকত উঠিয়া যায় (যদ্দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হয়।) —মেশ্‌কাত শরীফ

১৮। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যবসায়ী (কথায় ও ব্যবহারে) অতিশয় সত্যবাদী, বড় আমানতদার; (কিয়ামতে) আম্বিয়া, ছিদ্দিকীন (যাঁহারা আল্লাহ্‌র বড় বড় ওলী আর যাঁহারা প্রত্যেক কথায় ও কাজে উচ্চস্তরে সত্যবাদিতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগী অতি উচ্চ ধরনে করিয়াছেন) এবং শহীদগণের সাথে হইবে। (অর্থাৎ, যে ব্যবসায়ীর মধ্যে উপরোল্লিখিত গুণাবলী রহিয়াছে কিয়ামতে সে ব্যবসায়ী আম্বিয়া (আলাইহিমুচ্ছালাতু ওয়াসসালাম,) ছিদ্দিকীন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) শহীদ (রাহেমাহুমুল্লাহ)-গণের সঙ্গী হইবে এবং দোযখ হইতে নাজাত পাইবে। সঙ্গী হওয়ার অর্থ এই নহে যে, তাঁহাদের সমান মর্যাদা পাইবে; বরং ইহার অর্থ এক বিশিষ্ট ধরনের সম্মান, যাহা বড়দের সঙ্গে থাকিলে হাছিল হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বুযুর্গকে দাওয়াত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন খাদেমকেও দাওয়াত করিল। তখন ইহা তো জানা কথা যে, ঐ বুযুর্গের খাবারস্থল এবং খানা এবং ঐ খাদেমের খাবারস্থল এবং খানা একই ধরনের হইবে। কিন্তু গৃহস্বামীর কাছে ঐ বুযুর্গের যে মর্যাদা হইবে খাদেমের তদ্রূপ নহে। অবশ্য সঙ্গ লাভ হওয়ার মান ইজ্জত এবং খাওয়া বসায় শরীক হওয়া অতি বড় মর্তবার কথা যাহা খাদেমগণ পাইল। বিশেষতঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভ হওয়া অতি বড় দৌলত মনে কর, যদি খানাও না পাওয়া যায়, সঙ্গলাভে কোন সম্মানও পাওয়া গেল না; শুধু মাত্র সঙ্গলাভই হাছিল হইল, তবে হুযূরকে যে মুসলমান অন্তর দিয়ে ভালবাসেন তার জন্য হুযূরের একটু দীদার এবং হুযূরের একটু সঙ্গলাভই বড় দৌলত। দীদার তো অতি বড় বস্তু বটে, হুযূরের পড়শী হওয়াও বড় নেয়ামত। কাজেই মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য যে, জনাব রাসূলুল্লল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মোবারক দো'আ পাওয়ার হকদার হওয়া। —মেশ্‌কাত শরীফ

১৯। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হে ব্যবসায়ী দল! বস্তুতঃ বেচা-কেনা এমন জিনিস যে, উহাতে (অনেক সময়ে) অযথা কথাবার্তা হইয়া থাকে এবং কসম খাওয়া হয়। অতএব, তোমরা উহাতে দান খয়রাত মিশাইয়া লও। (অর্থাৎ অযথা কথাবার্তা এবং কসম খাওয়া অন্যায়। কাজেই দান খয়রাত করা উচিত যাহাতে ঐ অনিচ্ছাকৃতভাবে যে সব অযথা কথাবার্তা ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে উহার কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে। আর অন্তরে যে ময়লা সৃষ্টি হইয়াছে উহা দূর হইয়া যাইবে। —আবুদাউদ

২০। হাদীসঃ ব্যবসায়ীকে কিয়ামতের দিন বদকার গোনাহ্‌গাররূপে উঠান হইবে কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়াছে এবং সত্য বলিয়াছে (এবং বেচা কেনায় কোন গোনাহ্ করে নাই। সে মহা বিপদ হইতে বাঁচিয়া যাইবে।) —মেশ্‌কাত শরীফ

অযথা করয করার নিন্দাবাদ

১। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করিতেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ "হে খোদা আমাকে কুফর এবং করয হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।" একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন হুযূর; আপনি করযকে কুফরের সঙ্গে মিলাইয়া দিতেছেন? হুযূর বলিলেন, 'হাঁ' (করয বড় ভাড়ী বিপদ।) —তরগীব হাকিম

২। **হাদীস** ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ধার করয ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ্র ঝাণ্ডা, যখন তিনি কোন বান্দাকে অপদস্থ করিতে চাহেন, তখন তাহার ঘাড়ে দেনার বোঝা চাপাইয়া দেন।

৩। **হাদীস** ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, তিনি এক ব্যক্তিকে এভাবে ওছিয়ত (নছীহত) ফরমাইতেছিলেন যে, গোনাহ্ কম কর, তোমার মৃত্যু সহজ হইবে এবং ধার-করয কম কর, স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে পারিবে।

৪। **হাদীস** ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ যদি কেহ ঠেকাবশতঃ করয লয়, পরিশোধ করিবার নিয়্যতও রাখে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহা পরিশোধ করাইয়া দিবেন। আর যদি কেহ মানুষের ক্ষতি করিবার জন্য মানুষের টাকা-পয়সা নেয়, তবে আল্লাহ্ তাহাকে ধ্বংস করিয়া দেন।" (যদি কোন মুমিন মুসলমান ভাই অত্যন্ত ঠেকাবশতঃ করয করিয়া ফেলেন, তবে তিনি যেন 'খবরদার!' একান্ত খাওয়া-পরার ঠেকা জরুরী জিনিস ব্যতীত অন্যান্য জিনিস ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দেন—বেহুদা অতিরিক্ত খরচ যেন একদম বন্ধ করেন। ঘরের অতিরিক্ত জিনিস বিক্রয় করিয়া করয পরিশোধ করিয়া দিবেন। এইরূপভাবে জীবনযাপন করিয়া যাহাকিছু বাঁচে, কম হউক বেশী হউক তদ্দ্বারা করয পরিশোধ করিতে থাকিবেন। ইহাতে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার করয পরিশোধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।) —তরগীব তরহীব

৫। **হাদীস** ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির উপর করযের (দেনার) ভারী বোঝা চাপে, অতঃপর উহা পরিশোধ করিতে পূর্ণরূপে চেষ্টা করে, কিন্তু পরিশোধ করিবার পূর্বে মারা যায়, তবে আমি তাহার সহায় হইব। —আহ্মদ, তাবরানী

৬। **হাদীস** ঃ ময়'মন কুরদী তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলা-ইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ যদি কেহ কম বা বেশী মহর দিবার অঙ্গীকারে কোন মেয়েলোককে বিবাহ করে অথচ সেই মেয়েলোকের হক আদায়ের নিয়্যত করে নাই, ধোঁকা দিয়াছে, তবে কিয়ামতের দিন সেই লোককে আল্লাহ্র দরবারে যেনাকাররূপে হাযির করা হইবে। তদ্রূপ যদি কেহ কাহারও নিকট হইতে করয লইয়া থাকে কিন্তু অন্তরে উহা পরিশোধের নিয়্যত না থাকে; ধোঁকা দিয়া মাল লইয়াছে এবং সেই করয পরিশোধ না করিয়া মারা যায়, তবে কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে চোররূপে আল্লাহ্র দরবারে হাযির করান হইবে। —তাবরানী

৭। **হাদীস** ঃ উমর ইবনে শোয়ায়েব তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ঋণ পরিশোধ না করে, তাহার আবরু-ইজ্জত, মাল-সম্পত্তি পাওনাদারের জন্য হালাল হইয়া যায়। অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি দেনা পরিশোধ না করে তবে উক্ত দেনাদারকে শক্ত কথা বলা, তাহার দুর্নাম প্রচার করা, শেকায়েত করা, মামলা করা, (মিথ্যা মামলা নয়) এবং গোপনে বা প্রকাশ্যে যে কোন উপায়ে তাহার হক উসুল করিয়া লওয়া পাওনাদারের পক্ষে জায়েয হইয়া যায়। —ইবনে হিব্বান

৮। **হাদীস** ঃ আবুযর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং তাহাদিগকে খুব বেশী

ঘৃণা করেন। যথা—(১) যে বৃদ্ধ হইয়াও যেনা করে, (২) দরিদ্র হইয়াও যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে। (৩) ধনী অত্যাচারী। অর্থাৎ টালবাহানা করিয়া করযদারের প্রতি যুলুম করে। —তিরমিযি, নাসায়ী, আবু দাউদ। (অর্থাৎ পাপের মধ্যে ছোট বড় আছে। বড় পাপের মধ্যেও অধিক বড় পাপ আছে। এইরূপ যেনা করা মহা পাপ, কিন্তু যে পড়শী বা বন্ধু বিশ্বাস করিয়া তাহার বাড়ী-ঘর মান-ইজ্জত বন্ধুর হাতে বা পড়শীর হাতে আমানত রাখে, তাহার আমানতে খেয়ানত করা তাহার মান-ইজ্জত নষ্ট করা আরও অধিক মহাপাপ। এইরূপ ধনী হইয়া অহঙ্কার করা, অন্যকে হিংসা হেকারত করা মহাপাপ। কিন্তু গরীব হইয়া ধনীদের প্রতি হিংসা বা অহঙ্কার করা আরও অধিক পাপ। সাধারণভাবে মিথ্যা তো মহাপাপ আছেই, কিন্তু রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্র পরিচালক হইয়া মিথ্যা বলা প্রজাদের ধোঁকা দেওয়া মিথ্যা ওয়াদা করিয়া প্রতিপালন না করা আরও মহাপাপ।)

এইরূপ কাহারও নিকট হইতে করয করিয়া সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উহা পরিশোধ না করা আরও অধিক মহাপাপ। সামর্থ্য না থাকিলে পাওনাদারের নিকট ঘন ঘন যাইবে এবং অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করিয়া ক্ষমা চাহিবে। অন্যথায় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি না দিবার জন্য টালবাহানা করে, ওয়াদা খেলাফ করে, তবে উহা আরও অধিক মহাপাপ।)

করয আদায়ের দো'আ

৯। হাদীসঃ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহুর নিকট একদিন একজন দেনাদার মোকাতাব গোলাম নিজের অবস্থা জানাইয়া কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে এমন একটি দো'আ শিখাইয়া দিতেছি, যাহা হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, ছবীর পাহাড় সমান দেনা থাকিলেও পূর্ণ ঈমানের সহিত, পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে ইহা পড়িলে তাহা ইন্‌শাআল্লাহ্ আদায় হইয়া যাইবে।' তিরমিযী শরীফের দো'আটি এইঃ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

১০। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মোআয-ইবনে-জাবালকে আর একটি দো'আ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, পাহাড় সমান করয হইলেও (ঈমান ও আমলের শর্তে) উহা ইন্‌শাআল্লাহ্ আদায় হইয়া যাইবে। দো'আটি এই—

اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا تُعْطِيْهِمَا مَنْ تَشَاۤءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاۤءُ اِرْحَمْنِىْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِىْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةٍ مَّنْ سِوَاكَ ـ (طبرانى)

(দো'আ কবূল হওয়ার জন্য ভক্তি বিশ্বাস, নেক-নিয়্যত, নেক-আখলাক' নেক-আমল, খাদ্য হালাল, সত্য কথা এবং যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাধনা শর্ত।)

দানের ফযীলত (বর্ধিত)

১। হাদীসঃ হযরত আবুযর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—
هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ অর্থাৎ, "এই কা'বা গৃহের মালিকের শপথ—তাহারা বড় হতভাগা।"

আমি আরয করিলাম, আমার মা-বাপ, আমার জান-মাল আপনার উপর কোরবান হউক, কাহারা এত দুর্ভাগ্য, যাহাদের ভাগ্যবান বানাইবার জন্য এত বেচায়েন হইয়া আল্লাহ্র তরফ হইতে এই সংবাদ আমাদিগকে দান করিয়াছেন? হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ধনপতি ও পুঁজিপতিরা যদি সাখাওতি করে অবারিতভাবে হামেশা সৎকাজে লাগিয়া থাকে, ডানে বামে পশ্চাতে সব দিকে দান করিতে থাকে, তবে এই এক উপায়ে তাহারা ভাগ্যবান হইতে পারে। অন্যথায় বড়ই হতভাগা বড়ই ভাগ্যহারা।

২। **হাদীসঃ** হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলিতেন, আমার নিকট ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি আসে, তাহা হইলেও তিন দিনের বেশী আমি উহা আমার নিকট রাখা পছন্দ করিব না। অবশ্য করয পরিশোধের পরিমাণ ও জরুরী খরচের পরিমাণ রাখিব।

৩। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ ছখী ব্যক্তিকে ফেরেশ্তারা রহ্মত ও বরকতের দো'আ দেয় এবং বখীলকে বদদো'আ দেয়।

৪। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বোন আসমা (রাঃ)-কে বলিতেন, আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিতে বখিলী করিও না, হিসাব করিয়া দান করিও না। তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলাও হিসাব না করিয়া তোমাকে দান করিবেন।

৫। **হাদীসঃ** হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ পাক বলেন, হে ইবনে-আদম! তুমি আমার কাজে আমার মখলুককে দান কর। আমি তোমাকে দান করিব।

৬। **হাদীসঃ** আবু উমামা (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) বলিতেন, হে আদম সন্তান! তোমাদের জরুরত পরিমাণ মাল রাখিতে পার। ইহাতে তোমাদের উপর কোনরূপ দোষারোপ বা পাপ নাই। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহা থাকিবে, তাহা দান করিয়া দেওয়াই তোমাদের জন্য মঙ্গল। দানের বেলায় যাহারা তোমার উপর নির্ভরশীল সর্বাগ্রে তাহাদিগকে দান করিবে।

৭। **হাদীসঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামেশা বলিতেন, যুল্ম এবং বখিলী এই দুইটি রোগই মানবাত্মাকে ধ্বংস করার জন্য প্রধান রোগ। খবরদার! তোমরা এই রোগ হইতে বাঁচিয়া থাকিও।

৮। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ ـ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ ○

অর্থঃ ছখী আল্লাহ্রও নিকটে, বেহেশ্তেরও নিকটে, মানুষেরও নিকটে, দোযখ হইতে দূরে; বখীল আল্লাহ্ হইতে দূরে, অর্থাৎ, আল্লাহ্র নিকট ঘৃণিত, বেহেশ্ত হইতে দূরে, জনগণের অন্তর হইতে দূরে, দোযখের নিকটে। বখীল আবেদ হইতে মূর্খ ছখী আল্লাহ্র নিকটে অধিক প্রিয়— (বখীল আবেদ নহে।)

৯। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

لَاَنْ يَّتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِىْ حَيَاتِهٖ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَّه مِنْ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهٖ ـ

অর্থাৎ, সুস্থ শরীরে (যখন মানব মনে ধন-দৌলতের মহব্বত থাকে এবং গরীব ও অভাবে পতিত হওয়ার আশঙ্কা শয়তান মনে জাগাইয়া দেয়, তখন) এক টাকা দান করা (আসন্ন) মৃত্যুকালে একশত টাকা দান করা অপেক্ষা অধিক উত্তম।

১০। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

خَصْلَتَانِ لَايَجْتَمِعَانِ فِىْ مُؤْمِنٍ اَلْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلْقِ ـ

অর্থাৎ, দুই খাছলত মুমিনের মধ্যে একত্রে সমাবেশ হইতে পারে না। একটি বখিলী, অপরটি কর্কশ ব্যবহার এবং বদ আখলাক।

১১। হাদীসঃ شَرُّ مَافِى الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ جُبْنٌ خَالِعٌ ـ ابو داؤد

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষের দুইটি খাছলত বড়ই নিন্দনীয়। বখিলীর কারণে হক কাজে সাহায্য করিতে না পারা এবং কাপুরুষতার কারণে হক কথা বলিতে না পারা।

مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا ـ

হযরত (দঃ) কছম করিয়া বলিয়াছেন, (সৎকাজে) দান ধনকে কমায় না; ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ্ কাহাকেও শক্তি ও সম্মান বাড়ান ছাড়া কমান না। —অনুবাদক

ক্রয় বিক্রয়

১। মাসআলাঃ একজন বলিল, এত দামে আমি এই জিনিস বিক্রয় করিলাম। অপরজন বলিল, আমি ক্রয় করিলাম। দুই পক্ষ হইতে এই দুইটি কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করায় ঐ জিনিস বিক্রয় চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন যদি বিক্রেতা মাল না দিতে চায় বা ক্রেতা মাল নিতে না চায়, তবে সে অধিকার আর তাহাদের কাহারও নাই। এরূপ পরিষ্কার কথায় ঈজাব-কবূলের নামই ক্রয়-বিক্রয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে চুক্তি হয়, তাহাকে 'আক্‌দ' বলে।

২। মাসআলাঃ যদি একজন বলে, এই জিনিস দুই পয়সায় আমি আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম, অপর জন বলিল, আমি গ্রহণ করিলাম। উভয় পক্ষের এরূপ উক্তির দ্বারা জিনিস বিক্রয় এবং ক্রয় হইয়া গিয়াছে। জিনিসের মালিক এখন ক্রেতা হইল। এখন ঐ জিনিস ক্রেতাকে না দিবার এখতিয়ার বিক্রেতার নাই এবং ক্রেতারও এখতিয়ার নাই যে, ঐ জিনিস না নিয়া পারে। কিন্তু এই আইন প্রয়োগ হওয়ার শর্ত এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই একই স্থানে মজলিস বদলিবার পূর্বেই উভয় পক্ষের কথা চূড়ান্ত হইবে। আর যদি বিক্রেতা দুই পয়সা বলার পর ক্রেতা কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে, অথবা সেখান হইতে চলিয়া গিয়া থাকে অথবা কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য গিয়া থাকে বা অন্য কোন কাজে গিয়া থাকে, তবে ঈজাব বাতেল হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া যদি বলে যে, হাঁ, আপনার কথিত মূল্যে খরিদ করিতেছি, তবে আইনতঃ এই কথার কোন মূল্য নাই। অবশ্য যদি বিক্রেতা রাজী হইয়া মাল দেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু বিক্রেতাকে বাধ্য করা যাইবে না। তদ্রূপ ক্রেতা কবূল করার পূর্বে বিক্রেতা যদি উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহা হইলেও ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে না। আইনতঃ ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত করার জন্য পুনরায় উভয়ের রাযীনামা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। ফলকথা, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের স্থান পরিবর্তনের পূর্বেই যদি ঈজাব-কবূল হইয়া যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে। অন্যথায় ইচ্ছামূলক থাকিবে;

৩। মাসআলাঃ খরিদ্দার বলিল, আপনার এই জিনিসটা এত মূল্যে দিয়া দেন, দোকান-দার বলিল, দিয়া দিলাম। ঈজাব-কবূল পুরা হয় নাই। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে না। অবশ্য পরে যদি খরিদ্দার বলে যে, আমি নিয়া নিলাম তবে ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইয়া যাইবে।

(আবেদন বা প্রশ্নবাচক বা ভবিষ্যতবাচক শব্দ ব্যবহার করিলে তিনবার বলিতে হইবে) আদান প্রদানবাচক বা বর্তমানকাল বাচক শব্দ ব্যবহার করিলে দুইবার বলাতেই হইবে।)

৪। মাসআলাঃ ক্রেতা বলিল, এই জিনিসটি এক পয়সায় নিলাম। বিক্রেতা বলিল, নিন। ইহাতে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া যাইবে।

৫। মাসআলাঃ আলোচনা দ্বারা দ্রব্যের মূল্য ঠিক করিয়া ক্রেতা যদি মুখে কিছু না বলিয়া মূল্য বিক্রেতার হাতে দিয়া দ্রব্য উঠাইয়া লয় এবং বিক্রেতাও রাযী হইয়া মূল্য গ্রহণ করে, মুখে কিছু না বলে, তবেও বিক্রয় দুরুস্ত হইয়া যায়। উভয় পক্ষের রাযী রগবতে আদান-প্রদানই বাচনিক ঈজাব-কবূলের কায়েম-মকাম হইয়া যাইবে।

৬। মাসআলাঃ আলোচনা দ্বারা মূল্য ঠিক না করিয়াও যদি কেহ বাজার দর জানার কারণে জিনিস হাতে লইয়া বিক্রেতার হাতে পয়সা দিয়া দেয়, বিক্রেতা রাযী হইয়া পয়সা গণিয়া গ্রহণ করে, তাহাতেও ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত হইবে। রাযী না হইলে হইবে না।

৭। মাসআলাঃ যে সকল জিনিস গোছা বা ছড়া হিসাবে বিক্রয় হয়, সে সকল জিনিস যদি ১২ দানার গোছা বা ২০ টার ছড়া থাকে, আর বিক্রেতা বলে যে, গোছার দাম এত বা ছড়ার দাম এত, তবে ক্রেতার গোছা বা ছড়া ভাঙ্গিয়া নেওয়ার অধিকার থাকিবে না, পুরা গোছা বা পুরা ছড়া নিতে হইবে। যদি বিক্রেতা প্রত্যেক দানা পৃথক পৃথক মূল্য বলিয়া দেয়, তবে ক্রেতার ৫ বা ৭ দানা ৫টা বা ৭টা পৃথক করিয়া নেওয়ার অধিকার থাকিবে।

৮। মাসআলাঃ কাহারও নিকট চারি প্রকারের জিনিস আছে। সে বলিল, এইসব চারি আনায় বিক্রয় করিলাম। এখন তাহার অনুমতি ছাড়া কোনটি লওয়া এবং কোনটি না লওয়ার অধিকার নাই। (কেননা, সে সবগুলি একত্রে বিক্রয় করিতে চায়।) অবশ্য যদি প্রত্যেকটি জিনিসের দাম পৃথক পৃথক করিয়া বলে, তবে উহা হইতে এক আধটা খরিদ করিতে পারে।

৯। মাসআলাঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সমস্ত কথা এমন পরিষ্কার হওয়া দরকার যাহাতে ভবিষ্যতে কোন ঝগড়ার সৃষ্টি না হইতে পারে। সওদা এবং মূল্য উভয় সম্পর্কে কথা পরিষ্কার হইতে হইবে। (কোন কথাই যেন গোলমাল না থাকে। যদি এই উভয়ের মধ্যে একটি কথাও ভালরূপে জানা না যায় এবং নির্ধারিত না হয়, তবে বিক্রয় ছহীহ্ হইবে না।)

১০। মাসআলাঃ একজন এক টাকার একটি জিনিস ক্রয় করিয়াছে। এখন ক্রেতা বলে, আপনি আগে জিনিস দেন, পরে টাকা দিব। বিক্রেতা বলে, আপনি আগে টাকা দিলে জিনিস দিব। এখানে শরীঅতের আইন এই যে, আগে ক্রেতা টাকা দিবে পরে জিনিস পাইবে। ক্রেতা টাকা না দেওয়া পর্যন্ত জিনিস না দেওয়ার অধিকার বিক্রেতার আছে। অবশ্য যদি উভয় দিকে একই রকমের জিনিস হয়, যেমন, যদি টাকার বিনিময়ে পয়সা নেয় অথবা কাপড়ের বিনিময়ে কাপড় নিতে হয়, তবে উভয়ের আদান-প্রদান এক সঙ্গে হইবে। এক্ষেত্রে কাহারও আগে-পাছে দেওয়া-নেওয়ার অধিকার নাই।

বিক্রয় দ্রব্যের মূল্য স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া

১। মাসাআলাঃ কেহ মুঠ বন্ধ করিয়া বলিল, আমার মুঠের ভিতর যত মূল্য আছে, তত মূল্যের জিনিস আমাকে দিন। অথচ মুঠের মধ্যে টাকা আছে, না পয়সা আছে, না গিনি আছে, একটা আছে, না দুইটা আছে কিছুই জানা নাই—এরূপ ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত নাই।

২। মাসআলা ঃ যে দেশে দুই রকমের মুদ্রা প্রচলিত আছে, তথায় কোন্ প্রকারের মুদ্রায় আদান-প্রদান হইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে। যদি ক্রয়-বিক্রয়ের ঈজাব-কবূলের সময় পরিষ্কার বলিয়া না থাকে যদি শুধু এতটুকু বলে যে, আমি এই জিনিস এক পয়সায় বিক্রয় করিলাম, ক্রেতা বলিল, আমি নিলাম। তবে শরীঅতের বিধান মতে যে মুদ্রা অধিক পরিমাণে প্রচলিত আছে, তাহাই ধর্তব্য হইবে। যদি উভয়ই সমান প্রচলিত থাকে, ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইয়া যাইবে। (তওবা করিয়া উভয়ে রাযী হইয়া পুনরায় পরিষ্কার ভাষায় ক্রয়-বিক্রয়ের ঈজাব-কবূল করিতে হইবে।)

৩। মাসআলা ঃ যদি পয়সা, টাকা বা নোট মুঠা খুলিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, কিংবা পয়সার স্তূপ দেখাইয়া দেওয়া হয়, সংখ্যা বা পরিমাণ বলা না হয়, বিক্রেতাও সংখ্যা না জানিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া মাল বিক্রয় করে, তবে পরে সংখ্যা সম্পর্কে গোলমাল করার অধিকার বিক্রেতার থাকিবে না ; যাহা দেখিয়াছে তাহারই বিনিময়ে মাল বিক্রয় হইয়া যাইবে ; কেননা, চোখের সামনে দেখিয়া লইলে কারবার দুরুস্ত হওয়ার জন্য সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে না। ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত হওয়ার জন্য সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে। অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত হইবে না।

৪। মাসআলা ঃ বিক্রেতা যদি বলে যে, আপনি জিনিস নিয়া নেন, দাম নির্ধারণ করার কি দরকার? আপনার নিকট হইতে কি আর বিশী নিব? ন্যায্য মূল্যই নেওয়া হইবে। অথবা যদি এরূপ বলে যে, আপনি জিনিস নিয়া যান, আমি আমার আব্বার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তিনি যে দাম বলেন, তাহাই আপনার নিকট হইতে নিব। অথবা যদি এরূপ বলে, ঠিক এই নমুনার মালই অমুকে নিয়াছেন, তিনি যে দাম দেন, আপনিও ঠিক তাহাই দিবেন। অথবা যদি বলে, আপনার যাহা মর্জি হয় তাহাই দিবেন, এখন মাল লইয়া যান, আমি তাহাতে একটুও অমত করিব না বা গোলমাল করিব না। অথবা যদি বলে, বাজার যাচাই করিয়া নেন, পাঁচ জায়গায় যে দাম হয় তাহাই দিবেন, আমি নিয়া নিব। অথবা যদি বলে, আপনি মাল নিয়া আপনার আব্বাকে দেখান, তিনি যাহা বলেন, তাহাই নিয়া নিব। এই সব ছুরতে যেহেতু ঈজাব-কবূলের সময় কথা পরিষ্কার হয় নাই—কাজেই এই সব অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইয়াছে। অবশ্য উভয়ে ঐ জায়গায় থাকাকালেই যদি কথা পরিষ্কার করিয়া লইত, তবে ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত হইত। নতুবা জায়গা পরিবর্তন হইয়া যাওয়ার পর যদি কথা পরিষ্কার করা হয়, তবে পুনরায় নূতন করিয়া উভয়ে রাযী খুশী হইয়া ঈজাব-কবূল করিতে হইবে। পূর্বের ঈজাব কবূল ঠিক হয় নাই। (তাহা তওবা করিয়া পূর্ব ঈজাব কবূল ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।)

৫। মাসআলা ঃ দোকান নির্ধারিত আছে, যখন জিনিসের প্রয়োজন হয় তথা হইতে আনা হয়, যেমন আজ সুপারি, কাল ডাল ইত্যাদি আনায় এবং দাম জিজ্ঞাসা করা হয় না। মনে করে যখন হিসাব হইবে, তখন চুকাইয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ করা দুরুস্ত আছে। এইরূপে ঔষধের দোকান হইতে ঔষধ আনিয়াছে, দাম জিজ্ঞাসা করে না। মনে করিয়াছে ভাল হওয়ার পর দাম দিব ; ইহাও দুরুস্ত আছে।

৬। মাসআলা ঃ কাহারও হাতে হয়ত একটা টাকা আছে। তিনি বলিলেন, এই টাকাটার পরিবর্তে আপনার ঐ মালটা আমাকে দিন। এরূপ কারবার করিলে অবিকল ঐ টাকাটাই যে দিতে হইবে, তার কোন মানে নাই। মোটের উপর একটা টাকা দিতে হইবে। অবশ্য যে টাকা দিবে তাহা যেন অচল না হয়। চল টাকাই দিতে হইবে।

৭। **মাসআলাঃ** এক টাকার মাল কিনিলে একটি টাকা বা দুইটি আধুলি বা চারিটি সিকি দিলে বিক্রেতা তাহা নিতে বাধ্য থাকিবে, অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি এক টাকার পয়সা দেয়, তবে বিক্রেতার ইচ্ছা, নিতেও পারে, নাও নিতে পারে। পয়সা নিতে না চাহিলে টাকাই দিতে হইবে।

৮। **মাসআলাঃ** কলমদান কিংবা বাক্স বিক্রয় করিলে সঙ্গে সঙ্গে চাবিও বিক্রয় হইয়া গেল। চাবির দাম পৃথক লইতে পারিবে না। চাবি নিজের কাছেও রাখিতে পারিবে না। তদ্রূপ তালা বিক্রয় করিলে তার চাবিও সে সঙ্গে দিতে হইবে। বিক্রেতা একথা বলিতে পারিবে না যে, আমি তালা বিক্রয় করিয়াছি, চাবি তো বিক্রয় করি নাই। (অবশ্য যদি প্রথমেই বলিয়া দেয় যে, আমি তালা বা চাবি বিক্রয় করিতেছি, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। নতুবা সাধারণ কথার অর্থ সর্বজন প্রচলিত [ওরফের] মোতাবেকই গৃহীত হইবে।)

বিক্রেয় দ্রব্যের সঠিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া

১। **মাসআলাঃ** ধান, চাউল, গম, যব, ছোলা, মটর, মসুরী ইত্যাদি খাদ্য-শস্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তার রকম, তার গুণ, তার পরিমাণ নির্দিষ্টরূপে জ্ঞাত থাকা চাই। গুণ এবং রকম দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া লইবে। পরিমাণ জানার জন্য নিক্তির ওজনে হউক বা কাঠা পোয়ার দ্বারা হউক বা এক জায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া দেখিয়া হউক তিনো প্রকারেই দুরুস্ত আছে। যে দেশে যেরূপ প্রচলন আছে সেরূপে করিলেও তাতে কোন দোষ নাই। মোটের উপর সঠিকভাবে জানা থাকা চাই। যে পরিমাণ ক্রয় করিবে সেই পরিমাণের অধিকারী ক্রেতা হইবে এবং বিক্রেতা সেই পরিমাণ পুরাপুরি দিতে বাধ্য থাকিবে।

২। **মাসআলাঃ** আম, আমরুদ, লেবু, শশা, কুসি ঝিংগা, তরৈ ইত্যাদি ফল-ফলারি বা তরি-তরকারী গণনা হিসাবে হউক বা ওজন হিসাবে হউক উভয় প্রকারে দুরুস্ত আছে। টুকরী বা স্তূপ (টাল) দেখাইয়াও বিক্রয় দুরুস্ত আছে। যে পরিমাণ বিক্রয় করিবে, তাহা সম্পূর্ণ ক্রেতার হইয়া যাইবে।

৩। **মাসআলাঃ** কেহ কুল জাম ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আসিল। তাহাকে বলা হইল, এক পয়সার বিনিময়ে এই ইটের ওজনে মাপিয়া দাও। বিক্রেতা ইহাতে রাযী হইল। কিন্তু ইটের ওজন কতটুকু তাহা কাহারও জানা নাই। এমতাবস্থায় এই ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত আছে।

৪। **মাসআলাঃ** আম বা আমরুদের টুকরী যদি এইভাবে বিক্রয় করে যে, এই টুকরীতে একশত আছে, এক টাকায় বিক্রয় করিতেছি। গণিয়া দেখা গেল ৭৫টা আম আছে, তবে যদি ক্রেতা ইচ্ছা করে, তবে হিসাব করিয়া একশত আমের মূল্য এক টাকা হিসাবে ৭৫টির দাম বার আনা দিতে পারিবে। পুরা এক টাকা তাহার দিতে হইবে না। যদি গণনার পর দেখা যায় যে, ১২৫টি আম আছে, তবে ক্রেতা ১০০টি এক টাকায় নিতে পারিবে, বাকী ২৫টি বিক্রেতার থাকিবে অতিরিক্ত ২৫টি নেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকিবে না। অবশ্য যদি সংখ্যার উল্লেখ আদৌ না করিয়া থাকে, তবে কম বেশী কিছুই দেখা যাইবে না, পুরা টুকরী ক্রেতা পাইবে চাই কম হউক, চাই বেশী হউক।

৫। **মাসআলাঃ** ধুতি, শাড়ী, চাদর ইত্যাদি যে সব কাপড় গজ হিসাবে কাটিয়া বিক্রয় হয় না, কিন্তু গজ, হাত ফুট ইত্যাদি বা গিরার মাপ থাকে, সেই সব কাপড় যদি এইভাবে বিক্রয় হয় যে,

৩ গজি চাদর বা পাঁচ গজি ধুতি ৬.০০ বা ৭.০০ টাকায় ক্রয়-বিক্রয়ের ঈজাব-কবূল দ্বারা বিক্রয় সাব্যস্ত হইল। পরে মাপিয়া দেখা গেল যে, চাদর ৬ হাতের জায়গায় ৫ হাত আছে এবং ধুতি ১০ হাতের স্থলে ৯ হাত আছে, এরূপ অবস্থা হইলে ক্রেতার এই অধিকার হইবে না যে, এক হাত কমের পরিবর্তে এক টাকা কম দিবে। অবশ্য ক্রয়-বিক্রয় নিয়ম মত সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে এই অধিকার দেওয়া হইবে যে, ইচ্ছা করিলে নাও দিতে পারিবে। যদি ৬ হাতের স্থলে ৬১/২ হাত ১০ হাতের পরিবর্তের ১০১/২ হাত হয়, তবুও ক্রেতার এই আধ হাতের দাম অতিরিক্ত দিতে হইবে না। বিক্রেতাও ঐ অতিরিক্ত আধ হাত কাটিয়া রাখিতে বা উহার মূল্য আদায় করিতে পারিবে না।

৬। মাসআলাঃ এক ব্যক্তি দুইটি রেশমী ইজারবন্দ রাতে এক সঙ্গে এক টাকায় খরিদ করিয়াছে। দিনের বেলায় দেখিল একটা সূতী অপরটি রেশমী। এরূপ অবস্থা হইলে উভয়টির ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত হয় নাই। বিক্রেতার উভয়টা ফেরত নিতে হইবে। এইরূপে যদি দুইটি আংটি এই শর্তে খরিদ করে যে, উভয়টির পাথর ফিরোজা। পরে জানা গেল যে একটার ফিরোজা নাই, অন্য কিছু, তবে উভয়টির বিক্রি নাজায়েয হইবে। ক্রেতা যদি একটা নিতে চায়, তবে পুনরায় দাম দস্তুর করিয়া দিতে হইবে। পূর্বের দাম দস্তুর ও আকদ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

বাকী ক্রয়-বিক্রয়

১। মাসআলাঃ বাকী ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত আছে। কিন্তু, সময় নির্ধারিত করিয়া দিতে হইবে। ক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয় ঈজাব-কবূল এবং আকদ করার সময়েই বলে যে, আমি বাকী নিব, তবে টাকা দেওয়ার তারিখ ও সময় নির্ধারিত করিয়া বলিতে হইবে, নতুবা ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইবে। আর যদি আকদের সময় কিছু না বলে, পরে বলে যে, টাকা কিছুদিন পরে দিব, তবে আক্‌দ ফাসেদ হইবে না, দুরুস্ত হইবে। কিন্তু বিক্রেতা তখনই মূল্য পাইবার অধিকারী হইবে। অবশ্য ইচ্ছা করিলে সময় দিতে পারে, নাও দিতে পারে।

২। মাসআলাঃ ক্রেতা বিক্রেতাকে বলিল, আপনার অমুক জিনিসটি আমাকে দিয়া দিন, যখন আমার আব্বাজান বাড়ী আসিবেন বা টাকা পাঠাইবেন, যখন ধান কাটা পড়িবে বা পাট কাটা পড়িবে, তখন দাম দিব। অথবা বিক্রেতাই ক্রেতাকে বলিল, আপনি নিয়া নেন, যখন টাকা হাতে হয় তখন দাম দিবেন। এরূপ ছুরতে ক্রয়-বিক্রয় করিলে তাহা ফাসেদ হইবে এবং গোনাহ্‌ হইবে। (কেননা সময় নির্দিষ্ট করা হয় নাই, পরে ঝগড়া হইবে। হয়ত বিক্রেতা আগে তাগাদা করিবে, ক্রেতা পরে দিতে চাহিবে। এইজন্য সময় নির্দিষ্ট হওয়া চাই।) অবশ্য যদি কেনা-বেচার সময় এরূপ কথা না বলিয়া খরিদ করার পর বলে (ক্রয়-বিক্রয়) দুরুস্ত হইবে বটে, কিন্তু যখনই দাম দেওয়া হইবে এবং বিক্রেতার তখনই দাম আদায় করিয়া নেওয়ার অধিকার হইবে। (বায়-ফাসেদ হইলে সে বায় তুড়িয়া দিয়া পুনরায় ছহীহ্‌ভাবে বায় করা উচিত। তাহা হইলে বায়ে-ফাসেদের গোনাহ্‌ হইতে রেহাই পাইবে।)

৩-৪। মূল মাসআলাঃ এক টাকায় ত্রিশ সের গেঁহু নগদ মূল্যে বিক্রয় হয়, কিন্তু কেহ ধারে ক্রয় করিতে চাহিলে তাহার নিকট টাকায় ১৫ সের গেঁহু বিক্রয় করিল, ইহা দুরুস্ত আছে। কিন্তু ঐ সময় জ্ঞাত হওয়া চাই যে, ধারে বিক্রয় হইতেছে। এই হুকুম ঐ সময়ে প্রযোজ্য যখন ক্রেতার নিকট প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়া লয় যে, নগদ না বাকী। নগদ বলিলে দিল ২০ সের আর বাকী

বলিলে ১৫ সের দিল, ইহা জায়েয। আর যদি বিক্রেতা বলে যে, নগদ দামে টাকায় ২০ সের আর বাকী নিলে টাকায় ১৫ সের তবে ইহা জায়েয হইবে না।

৫। মাসআলাঃ কেহ এক মাসের ওয়াদায় একটি জিনিস ধারে ক্রয় করিল বহু চেষ্টা চরিত্রের পর সময় মত মূল্য পরিশোধ করিতে পারিল না। পরে অনেক বলিয়া কহিয়া আরও ১৫ দিনের সময় চাহিল। বিক্রেতা রাযী হইয়া ১৫ দিনের সময় দিল, ইহা দুরুস্ত আছে। যদি বিক্রেতা রাযী না হয়, তবে সে মূল্য প্রাপ্তির জন্য তাগাদা করিতে পারে। (অভাবগ্রস্তকে সময় দিলে পাওনাদার নেকী পাইবে। দেনাদার ত যেহেতু ওয়াদার সময় হাযির হইয়া মাফ চাহিয়াছে সেজন্য সেও ওয়াদা খেলাফীর গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবে। শরীঅত মত দ্বিতীয় সময় শেষ হওয়ার পূর্বে তাগাদা করিতে পারিবে না। অতিরিক্ত সময় দেওয়ার বিনিময়ে যদি দাম কিছু বাড়াইতে চায়, তবে উহা তাহার জন্য হালাল হইবে না। —অনুবাদক)

৬। মাসআলাঃ দেয় মূল্য নিকটে থাকা সত্ত্বেও আজ নয় কাল, এখন নয় তখন, ভাংতি টাকা নাই, টাকা ভাঙ্গাইলে দাম পাইবে, এইরূপ টালবাহানা করা হারাম। চাওয়া মাত্র টাকা ভাঙ্গাইয়া দাম দেওয়া উচিত। অবশ্য ধারে খরিদ করিয়া থাকিলে যে কয়দিনের ওয়াদা করিয়াছে তাহা পুরা হওয়ার পর দেওয়া ওয়াজিব (পাওনাদারও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাগাদা করিতে পারিবে না) নির্ধারিত সময় শেষ হইলে পর টালবাহানা বা খামাখা দৌড়ান ও পেরেশান করা জায়েয নহে। অবশ্য সত্য সত্যই যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজের নিকট হইতে বা অন্য কোথাও হইতে সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে স্বতন্ত্র কথা। সংগ্রহ হওয়া মাত্র দেনা শোধ করিবে। (হক্কুল এবাদের খুব বেশী খেয়াল রাখিবে।)

ফেরত দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয়
(খেয়ারে শর্ত)

১। মাসআলাঃ ক্রেতা যদি মাল কিনিবার সময় বলে যে একদিন, দুইদিন বা তিন দিন (৩দিনের বেশী নহে) আমাকে সময় দিন, আমি চিন্তা ও পরামর্শ করিয়া ঠিক করি মাল নিব কি না। এইরূপে শর্ত করা দুরুস্ত আছে। (তিন অথবা তিনের কম) যে কয় দিনের কথা বলিয়াছে সেই কয় দিনের মধ্যে তাহার এখতিয়ার আছে, নিতেও পারিবে, ফেরতও দিতে পারিবে। এই সময়ে বিক্রেতা অন্যের নিকট মাল বিক্রয় করিতে পারিবে না।

২। মাসআলাঃ 'আমাকে তিন দিনের সময় দেন'—এই কথা বলিয়া ক্রেতা টাকা দিয়া অথবা দিবার ওয়াদা করিয়া মাল নিয়া গিয়াছে। তিন দিনের মধ্যে আর কোন জওয়াব দেয় নাই। এইরূপ অবস্থা হইলে ক্রেতার আর মাল ফেরত দিবার অধিকার থাকিবে না, মাল নিতে বাধ্য হইবে। অবশ্য বিক্রেতা যদি নিজে স্বেচ্ছায় ফেরত নেয়, তবে সে তাহার মেহেরবানী। তাহার অসম্মতিতে ফেরত দিতে পারিবে না।

৩। মাসআলাঃ তিন দিনের বেশী শর্ত করা দুরুস্ত নহে। যদি ৪ দিন কিংবা ৫ দিনের শর্ত করিয়া থাকে, তবে তিন দিনের মধ্যে মাল ফেতর দিলে ফেরত হইয়া যাইবে, বায় থাকিবে না। আর যদি বলিয়া থাকে যে, আমি মাল নিলাম, তবে বায় ছহীহ্ হইয়াছে। তিন দিনের মধ্যে কিছু না বলিয়া থাকিলে বা কিছু না করিয়া থাকিলে, 'বায়' ফাসেদ হইয়া যাইবে।

৪। মাসআলা ঃ উক্তরূপে বিক্রেতাও তিন দিনের শর্ত করিতে পারে যে, আমি মাল বিক্রয় করিব কি না—তজ্জন্য (এক, দুই বা) তিন দিনের সময় চাই। এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইচ্ছা করিলে সে মাল নাও দিতে পারিবে বা ফিরাইয়া লইতে পারিবে। ইহা জায়েয।

৫। মাসআলা ঃ ক্রেতা মাল নিবে কিনা, তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তিন দিনের সময় চাহিল। একদিন বা দুই দিন পর দোকানে আসিয়া বলিল, মাল ফেরত দিব না বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি, মাল নিতেছি। এমন কি, মাল নিয়া বাড়ী আসিয়াই বলে যে, আমি মাল নিতেছি, এখন আর ফেরত দিব না। এইরূপ একবার বলা মাত্রই মাল ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে না। পুনরায় ফেরত দেওয়া স্থির করিলে তাহা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য হইবে না। ইহা হইল মাল রাখার রায় স্থির করিলে তাহার বিধান। যদি ফেরত দেওয়ার মত করে, তবে বিক্রেতার সম্মুখে গিয়া বলিতে হইবে, বা অন্ততঃ তাহাকে খবর পৌঁছাইতে হইবে। অগোচরে বলিলে দুরুস্ত হইবে না। (নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খবর না পৌঁছাইলে মাল ফেরত দিবার অধিকার ক্রেতার থাকিবে না।)

৬। মাসআলা ঃ ক্রেতা বলিল, আমি তিন দিনের সময় দিতেছি, যদি আমার মার মত হয়, তবে মাল রাখা হইবে, তাঁহার মত না হইলে ফেরত দেওয়া হইবে। এইরূপও দুরুস্ত আছে। তিন দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়ার এখ্‌তিয়ার থাকিবে। তিন দিনের মধ্যে সে বা তাহার মা বলিল, "মাল নিলাম"; এখন আর ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৭। মাসআলা ঃ দুই কিংবা তিন খানা জিনিস লইল। বলিল, তিন দিন পর্যন্ত আমার এখতিয়ার থাকিবে যে, পছন্দ হইলে ইহার যে কোন একখানা দশ টাকায় লইব। এইরূপ তিনটি জিনিসের তিন দিনের মধ্যে একখানা পছন্দ করিয়া লওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু ৪/৫ খান লইয়া যদি বলে যে, ইহার মধ্যে হইতে একখানা পছন্দ করিয়া লইব, তবে দুরুস্ত হইবে না। (অর্থাৎ তিনের বেশী জিনিস তিন দিনের জন্য লওয়া দুরুস্ত হইবে না। তিন দিনের মধ্যে যদি একটিও ফেরত না দেয়, তবে তিনটি জিনিসই রাখিতে বাধ্য হইবে। তিনটির বেশী জিনিস লইলে 'বায়' ফাসেদ হইবে।)

৮। মাসআলা ঃ ক্রেতা একটি জিনিস তিন দিনের সময় লইয়া বাড়ী নিয়া উহা ব্যবহার করিতে লাগিল। এখন আর উহা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৯। মাসআলা ঃ অবশ্য যদি জামা বা চাদর গায়ে ঠিকমত লাগে কি না, সতরঞ্জি কামরার সমান হয় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য নেয় এবং একবার মাত্র দেখিয়া (মাল লাট না করিয়া) সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে।

অদেখা জিনিস ক্রয়ের বিধান
(খেয়ারে রুইআত)

১। মাসআলা ঃ না দেখিয়া জিনিস ক্রয় করা জায়েয আছে কিন্তু দেখার পর ক্রেতার এখতিয়ার থাকিবে, যদি পছন্দ হয় তবে নিবে। পছন্দ না হইলে ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকিবে। জিনিসের কোন আয়েব না থাকিলেও শুধু দেখিয়া রাখা না রাখার অধিকার ক্রেতার আছে।

২। মাসআলা ঃ উক্ত বিক্রেতা যদি কোন জিনিস না দেখিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে ক্রেতাকে জিনিস দিতে বাধ্য থাকিবে। দেখার পর এখতিয়ার থাকে কেবল ক্রেতার, বিক্রেতার নহে।

৩। মাসআলা ঃ ধান, চাউল, গম, মটর ও শুপারি ইত্যাদি জিনিস সাধারণতঃ (উপরে নীচে এক রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপরে ভাল নীচে মন্দ এরূপ ধোঁকা দেওয়া উচিত নহে।) যে সব জিনিস নমুনা দেখাইয়া বিক্রয় হয় নমুনার খেলাফ হওয়া চাই না। এই ধরনের জিনিস যদি ক্রেতার সরল বিশ্বাসে শুধু উপরে দেখিয়া ক্রয় করে, আর উপরে নীচে একই রকম মাল নমুনার মোতাবেক পাওয়া যায়, তবে বায় দুরুস্ত এবং চূড়ান্ত হইয়া যাইবে। ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু যদি নীচে নমুনার খেলাফ খারাব মাল পাওয়া যায়, তবে ঐ মাল সম্পূর্ণ ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকিবে।

৪। মাসআলা ঃ যে সব জিনিস সাধাণতঃ উক্ত রকম হয় না, ছোট বড় হয় সেই সব জিনিস শুধু উপরে দেখিয়া কেনা উচিত নহে। উপরে নীচে ভালরূপে দেখিয়া ক্রয় করিবে। উপরে নীচে ভালমত না দেখা পর্যন্ত খেয়ারে রুইয়াত থাকিবে। অর্থাৎ দেখিয়া পছন্দ না হইলে ফেরত দিতে পারিবে। উপরে নীচে ভালরূপে দেখিয়া ক্রয় করিলে ফেরত দিতে পারিবে না।

৫। মাসআলা ঃ পানাহারের জিনিস যাহা চাখিয়া দেখিতে হয় তাহা শুধু চোখে দেখিয়া ক্রয় করিলে ফেরত দিবার এখতিয়ার চলিয়া যাইবে না; বরং চাখিয়াও দেখিতে হইবে। চাখিয়া দেখার পরে অপছন্দ হইলে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে (এরূপ ঘ্রাণ লইবার বা হাতে ধরিয়া দেখার জিনিসেরও এই একই হুকুম।)

৬। মাসআলা ঃ অনেক দিন আগে একটি জিনিস দেখিয়াছিল, এখন তাহা খরিদ করিল, কিন্তু এসময় দেখে নাই। ঘরে নিয়া দেখিল পূর্বে যেরূপ দেখিয়াছিল ঠিক সেরূপ আছে, এখন দেখার পর ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে না। কিন্তু অনেক দিনের পর কিছু পরিবর্তন হইয়া থাকিলে নেওয়া না নেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে।

বিক্রয় দ্রব্যে দোষ প্রকাশ পাওয়া

১। মাসআলা ঃ বিক্রয় করার সময় মালে যদি কোন প্রকার দোষ থাকে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া বিক্রেতার উপর ফরয। দোষের কথা না বলিয়া ধোঁকা দিয়া মাল চালাইয়া দেওয়া হারাম। (যে এরূপ করিবে সে ফাসেক দলভুক্ত হইবে।)

২। মাসআলা ঃ এক থান কাপড় কিনিয়া বাড়ী আনার পর দেখা গেল যে, তাহাতে দোষ আছে; এখন ক্রেতার এখতিয়ার আছে, থান ফেরত দিয়া তাহার টাকা সে ওসুল করিয়া নিতে পারিবে। আর যদি পূর্ণ দাম দিয়া উহা রাখিতে চায় তাহাও সে পারিবে, দোষের কারণে দাম কম দিতে পারিবে না। দোষ থাকায় যদি স্বেচ্ছায় কিছু দাম ফেরত দেয় তাহা সে দিতে পারে।

৩। মাসআলা ঃ ক্রেতা একখানা কাপড় কিনিয়া বাড়ী আনিয়াছে। ছেলেমেয়েরা উহার একটি কোনায় কিছু ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে অথবা কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে, তারপর দেখিল যে, কাপড়ে আরও পূর্বের দোষ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় সে ঐ মাল ফেরত দিতে পারিবে না। কারণ, বিক্রেতার বাড়ীর পুরাতন আয়েব ছাড়া ক্রেতার নিকট আসার পর আরও নূতন আয়েব লাগিয়া গিয়াছে। এখন এই করিতে হইবে যে, উভয়ে দুইজন ন্যায়বান সালিস মানিয়া তাহারা পূর্বের পুরাতন আয়েবের কারণে যত দাম কম করিতে বলে তত দাম কম করিতে হইবে।

৪। মাসআলা ঃ ক্রেতা জামার কাপড় কিনিয়া দরজির দ্বারা কাটানোর পর কাপড়ে আয়েব প্রকাশ পাইয়াছে। এখন আর এই কাপড় ফেরত দিবার এখতিয়ার ক্রেতার থাকিবে না। অবশ্য

উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী সালিস মাধ্যমে আয়েব পরিমাণ দাম ফেরত পাইবার অধিকারী হইবে। কিন্তু যদি বিক্রেতা ঐ কাটা অবস্থায়ই পুরা দাম ফেরত দিয়া সম্পূর্ণ কাপড় ফেরত নিতে চায়, তবে সে অধিকার তাহার হইবে, ক্রেতা তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। জামা সেলাই করার পর আয়েব ধরা পড়িলে বিক্রেতা উহা ফেরত নিবার অধিকারী হইবে না। আয়েব পরিমাণ মূল্য তাহার ফেরত দিতে হইবে। যদি ক্রেতা ঐ কাপড় বিক্রয় করিয়া থাকে বা নিজের নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের জামা বানাইয়া দেওয়ার নিয়তে কাপড় কাটাইবার পর আয়েব ধরা পড়ে, তবে আয়েবের পরিবর্তে দাম ফেরত দিতে পারিবে না। যদি বালেগ ছেলে-মেয়েদের জামা বানাইবার নিয়তে কাটাইয়া থাকে, তবে আয়বের পরিমাণ দাম ফেরত নিতে পারিবে।

৫। মাসআলা ঃ ক্রেতা প্রতিটি আণ্ডা এক আনা করিয়া এক কুড়ি আণ্ডা খরিদ করিয়া ভাঙ্গিয়া দেখিল সবগুলি খারাব। এমতাবস্থায় ক্রেতা সমস্ত পয়সা ফেরত লইতে পারিবে। আর যদি কতকগুলি খারাব বাহির হইয়া থাকে, তবে খারাবগুলির দাম প্রতি আণ্ডায় এক আনা করিয়া ফেরত লইতে পারিবে। যদি গণনা হিসাবে না কিনিয়া ঝাঁকা হিসাবে কিনিয়া থাকে যে, এই ঝাঁকা আণ্ডার দাম পাঁচ টাকা, তবে দেখিতে হইবে, খারাব কি পরিমাণ বাহির হইয়াছে। যদি শতের মধ্যে ৪/৫টা খারাব বাহির হইয়া থাকে, তবে উহার কোন হিসাব নাই। আর যদি বেশী খারাব বাহির হইয়া থাকে, তবে মোট আণ্ডা হিসাব করিয়া পড়তা হিসাবে খারাবগুলির দাম ফেরত লইতে পারিবে।

৬। মাসআলা ঃ ক্রেতা কদু, কুমড়া, পটল, ঝিঙ্গা, কুসি ইত্যাদি তরকারি অথবা আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল ক্রয় করিয়াছে; ভাঙ্গিয়া ভিতরে দেখে যে, একেবারে সব পচা বা পোকা বা খাওয়ার অনুপযুক্ত। এমতাবস্থায় দেখিতে হইবে, কোন কাজে লাগিতে পারে কি না, যদি কাজের অনুপযুক্ত হয়, তবে এই বেচাকিনাই শুদ্ধ হয় নাই, এসমস্ত মূল্য ফেরত লইতে পারিবে। আর যদি কোন কাজের উপযুক্ত থাকে, তবে বাজারে ইহার দাম যাহা হইতে পারে বিক্রেতা সেই দামই পাইবে, অতিরিক্ত পাইবে না।

৭। মাসআলা ঃ বাদাম, পটল ইত্যাদি জিনিসের মধ্যে যদি শতকরা ৪/৫টা খারাব বাহির হয়, তবে তাহার কোন হিসাব নাই। এর চেয়ে বেশী খারাব বাহির হইলে অবশ্য সেই হিসাবে দাম কাটিয়া লওয়া হইবে।

৮। মাসআলা ঃ এক টাকায় ১৫ সের গম কিনিল বা এক টাকায় দেড় সের ঘি কিনিল বা কোন একটি জিনিস ক্রয় করিলে যদি অনেক অংশ ভাল থাকে এবং কতক অংশ আয়েবদার থাকে, অথবা যে-জিনিস মাপে ওজনে বিক্রি হয়—যেমন, ধান, চাউল ইত্যাদি সেই জিনিস যদি কতক ভাল থাকে, কতক আয়েবদার হয়, তবে ক্রেতার এই অধিকার হইবে না যে, ভাল অংশ বাছিয়া রাখিয়া অন্য অংশ ফেরত দেয়। যদি তার নিতে হয়, সব অংশ নিতে হইবে নচেৎ সব ফেরত দিতে হইবে। অবশ্য যদি বিক্রেতা নিজে খুশী হইয়া বলে যে, আপনি ভাল অংশ নিতে পারেন অন্য অংশ ফেরত দিতে পারেন, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে। বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া ক্রেতার নিজের ইচ্ছামত এরূপ করিতে পারিবে না।

৯। মাসআলা ঃ মালের মধ্যে আয়েব ধরা পড়লে আয়েবের কারণে মাল ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার ততক্ষণ থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা না বুঝা যায় যে, সে ঐ আয়েবদার মালই রাখিতে রাযী আছে। যদি তার কথা দ্বারা বা কাজ দ্বারা বুঝা যায় যে, সে ঐ আয়েব সমেত

মাল রাখিতে রাযী আছে, তবে তারপর আর মাল ফেরত দেওয়ার অধিকার তাহার থাকিবে না। যেমন, একজন ক্রেতা একটি গাভী বা বকরী ক্রয় করিল। বাড়ী আনিয়া আয়েব দেখিল, আয়েব দেখা সত্ত্বেও যদি বলে যে, এই আয়েব সহই আমি এই গাভী রাখিব, তবে তাহার আর ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে না। অথবা যদি মুখে না বলিয়া এমন কাজ করে, যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে ঐ আয়েবসহ মাল রাখিবে। যেমন হয়ত গাভীর গায়ে যখম ছিল, সে সেই যখমের চিকিৎসা করা শুরু করিয়া দিল, তবে আর সেই গাভী ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার তাহার থাকিবে না। অবশ্য যদি বিক্রেতা নিজে ইচ্ছা করিয়া ফেরত নেয় তাহা ভিন্ন কথা।

১০। মাসআলা ঃ ক্রেতা বকরীর গোশ্ত কিনিয়া আনিয়াছে। পরে ধরা পড়িয়াছে যে, বকরীর গোশ্ত নহে, ভেড়ার গোশ্ত, তবে ক্রেতা গোশ্ত ফেরত দিতে পারিবে।

১১। মাসআলা ঃ মোতির হার অথবা অন্য কোন জেওর অথবা জুতা খরিদ করিয়াছে। যদি উহা ব্যবহার (এস্তেমাল) শুরু করিয়া দেয়, জুতা পরিয়া চলাফেরা করে, বা গলায় হার, হাতে জেওর পরিয়া রাখে, তবে আর ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না। অবশ্য যদি হাতে, পায়ে বা গলায় ফিট হয় কিনা তাহা দেখার উদ্দেশ্যে অল্প সময়ের জন্য পরিয়া যখন তখন খুলিয়া থাকে, তবে ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে। কেহ হয়ত একখানা তখতপোষ বা পালঙ্ক খরিদ করিয়াছে। যদি কোন যরূরতবশতঃ এস্তেমাল করে, বিছাইয়া বসে বা নামায পড়ে, তবে আর ফেরত দিতে পারিবে না।

(**জ্ঞাতব্য ঃ** আয়েব এমন দোষ-খোঁতকে বলা হয় যাহার কারণে মালের মূল্য কম হইয়া যায়। আর যার কারণে মালের মূল্য কমে না তাহাকে আয়েব বলা হয় না।)

১২। মাসআলা ঃ বিক্রেতা মাল বিক্রয় করার সময় ক্রেতাকে বলিয়া দিয়াছে—ভাই! আপনি খুব ভাল করিয়া দেখিয়া নিন। পরে কোন দোষ খুঁত বাহির হইলে আমি তার জন্য দায়ী নহি। ইহা বলা সত্ত্বেও ক্রেতা ক্রয় করিয়া নিয়াছে। পরে যদি কোন আয়েব বাহির হয়, ক্রেতার মাল ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না। এইরূপ বলিয়া বিক্রয় করা দুরুস্ত আছে। আর এরূপ বলিলে আয়েবের কথা বলিয়া দেওয়াও বিক্রেতার জিম্মায় ওয়াজিব থাকে না।

বায়'য়ে বাতেল ও বায়'য়ে ফাসেদ

[বায়' চারি প্রকারঃ ১। বায়'য়ে জায়েয, ২। বায়'য়ে মওকুফ ৩। বায়'য়ে বাতেল, ৪। বায়'য়ে ফাসেদ।

(১) বায়'য়ে জায়েযের দ্বারা শরীঅত অনুসারে ক্রেতা বিক্রেতার ঈজাব-কবূল হইয়া যাওয়ার পরক্ষণেই মালের উপর ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হয়।

(২) বা'য়য়ে মওকুফ। পরের মাল তাহার বিনা অনুমতিতে বিক্রয় করিলে মালের আসল মালিকের বিনা অনুমতিতে ক্রেতার প্রমাণিত স্বত্ব প্রমাণিত হইবে না। অর্থাৎ, ঐ মাল ব্যবহার করা, অধিকার করা তাহার জন্য জায়েয হইবে না। কিন্তু আসল মালিক অনুমতি দিলে ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হইবে এবং তাহার সকল রকমের দখল ব্যবহার জায়েয হইবে।

(৩) বায়'য়ে বাতেল হইলে তাহার দ্বারা আদৌ কোন রকমের মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হইবে না এবং আদৌ কোন রকমের দখল ব্যবহার জায়েয হইবে না। ক্রয়-বিক্রয়, ঈজাব-কবূলও জায়েয হইবে না।

(৪) বায়'য়ে ফাসেদ হইলে তাহার দ্বারা মালিকের অনুমতির পর মাল হস্তগত করিলে ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হইবে বটে, কিন্তু আদৌ কোনরূপ ব্যবহার, খাওয়া পেওয়া বা পরিধান করা জায়েয হইবে না। ঐ বায়'কে তুড়িয়া দেওয়া প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব হইবে।]

১। **মাসআলাঃ** শরীঅত মতে আদৌ বায়'য়ে বাতেলের কোনরূপ অস্তিত্ব বা মূল্য নাই বরং ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। তা সত্ত্বেও যদি কেহ ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে তার কারণে ক্রেতা জিনিসের মালিক হইবে না, কাহাকেও সে দান করিলে তাহাও জায়েয হইবে না এবং তার নিজের জন্যও ঐ জিনিস ব্যবহার করা জায়েয হইবে না। ঐ জিনিস লাভে বিক্রয় করিলে ঐ লাভ খয়রাত করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েয নহে। (যেমন, শরাব বা শূকর যদি কোন মুসলমান বিক্রয় করে, তবে তাহা হারাম হইবে এবং বাতেল হইবে। নদী, খাল, বিল, বাঁক, গোল ইত্যাদির মাছের কেহই মালিক নহে। সেই মাছ শিকার না করিয়া যদি কেহ বিক্রয় করে, তবে বায়'য়ে বাতেল হইবে। জঙ্গলী পাখীর মালিকও কেহই হয় না। সেই পাখী শিকার না করিয়া যদি কেহ বিক্রয় করে, তবে তাহা বায়'য়ে বাতেল হইবে।)

২। **মাসআলাঃ** কিন্তু যদি কেহ মাছের জন্য পুকুর খুদিয়া রাখিয়া থাকে সেই পুকুরে মাছ আটকিয়া গিয়া থাকে বা নিজে মাছ ধরিয়া পুকুরে ছাড়িয়া থাকে, তবে পুকুরের মালিকই সেই পুকুরের মাছের মালিক হইবে। মাছ সে বিক্রি করিতে পারিবে। অবশ্য যদি না জানা যায় যে, পুকুরে কি পরিমাণ মাছ আছে, ক্রেতার বা বিক্রেতার ঠকিবার আশংকা আছে, তবে বায়' ফাসেদ হইবে। বায়' ফাসেদ হইলে সেই বায়'কে তুড়িয়া দেওয়া ওয়াজিব; অতএব, যদি কেহ পুকুরের মাছ না ধরিয়া বিক্রি করে, তবে এই করা যাইতে পারিবে যে, পানি সেচিয়া দেখিবে বা মাছ শিকার করিয়া লইলে যখন জানা যাইবে যে, এত পরিমাণ মাছ আছে তখন আগের বায়' তুড়িয়া দিয়া এখন রাযী হইয়া নূতন করিয়া বায়' লইতে হইবে। তাহা হইলে বিক্রেতার পক্ষে ঐ মাছের পয়সা হালাল হইবে। নতুবা হালাল ও পাক হইবে না এবং ক্রেতার পক্ষেও যদি বায়' না তুড়িয়া থাকে, তবে ঐ মাছ ভক্ষণ করা, বিক্রি করা হালাল ও পাক হইবে না। আর যদি কিছু লাভ করিয়া থাকে, তবে লাভের সেই পয়সাও তাহার জন্য হালাল হইবে না। সেই পয়সা গরীব-দুঃখীকে দান করিয়া দিতে হইবে। আর যদি আগের আকদ তুড়িয়া দিয়া রাযী খুশী হইয়া নূতন করিয়া আকদ লইয়া থাকে, তবে হালাল ও পবিত্র হইবে।

৩। **মাসআলাঃ** কাহারও নিজস্ব জমিতে আপনাআপনি মালিকের বিনা তদবীরে যে ঘাস হয় ঐ ঘাস বিক্রি করা জমির মালিকের জন্য জায়েয নহে, ঐ ঘাসের কেহই মালিক নহে। ঐ ঘাস যে ইচ্ছা কাটিয়া নিতে পারে বা গরু ছাগল দিয়া খাওয়াইতে পারে। কিন্তু জমির মালিক যদি ঐ ঘাসের জন্য কোন তদবীর করিয়া থাকে, চাষ করিয়া থাকে, সার দিয়া থাকে বা বীজ লাগাইয়া থাকে, তবে ঐ ঘাসের মালিক সে-ই হইবে এবং সে ঘাস বিক্রি করাও তার জন্য জায়েয হইবে। অন্যের জন্য তাহার অনুমতিতে সে ঘাস কাটিয়া নেওয়া বা গরু দিয়া খাওয়ান জায়েয হইবে না।

৪। **মাসআলাঃ** বকরী, গরু, বা ঘোড়া ইত্যাদি জীবের পেটে যে বাচ্চা আছে সেই বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নহে, হারাম এবং বাতেল। বাচ্চা প্রসব হইলে তারপর ক্রয়-বিক্রয় করিবে। কেহ কেহ এইরূপ করিয়া থাকে যে, গাই বিক্রি করিল কিন্তু পেটে যে বাছুর আছে তা বিক্রি করিল না, এইরূপ করা জায়েয নাইঃ (গাই বিক্রি করিলে তার পেটের বাছুরও তার সঙ্গে বিক্রি হইয়া যাইবে।)

৫। মাসআলা ঃ গাইয়ের বাঁটে যে দুধ আছে, না দুহিয়া তাহা বিক্রয় করা বাতেল। দুধ দুহিয়া তারপর ক্রয়-বিক্রয় করিবে।

৬। মাসআলা ঃ কড়ি বর্গা যাহা দালানের ছাদে লাগান আছে, পৃথক করা ব্যতীত তাহা বিক্রয় করা জায়েয নহে।

৭। মাসআলা ঃ মানুষের চুল, দাড়ি, পশম ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা দুরুস্ত নহে, হারাম। (এই হারাম, মানুষের মর্যাদার জন্য।)

৮। মাসআলা ঃ (শূকরের হাড্ডি, পশম ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। এই হারাম, শূকরের নাজাস ও পলীদ হওয়ার কারণে।) শূকর ব্যতীত অন্যান্য মৃত জীবের পশম হাড় এবং শিং ক্রয়-বিক্রয় করা দুরুস্ত আছে।

৯। মাসআলা ঃ কেহ হয়ত কোন জিনিস ক্রয় করিয়াছে কিন্তু এখনও তার দাম চুকাইয়া দিতে পারে নাই। এমন অবস্থায় বিক্রেতা তার নিকট হইতে ঐ জিনিস কম দামে ক্রয় করিয়া নিতে চায়, এইরূপ ক্রয় করা জায়েয নহে। নিলে পুরা দাম দিয়া নিতে হইবে, যেমন কেহ ৫ টাকায় একটি বকরী কিনিয়া নিয়াছে এখনও দাম দেয় নাই। পরে দাম দিতে না পারায় এবং রাখিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় বিক্রেতাকে বলে, ইহা ৪ টাকায় নিয়া যাও বকরীর সঙ্গে একটি টাকা দিয়া দিব। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নাই। বিক্রেতাকে পুরা দাম না দেওয়া পর্যন্ত বিক্রেতার কাছে বিক্রি জায়েয নাই।

১০। মাসআলা ঃ বাড়ী, জমি বা অন্য কোন জিনিস এইরূপ শর্ত করিয়া বিক্রয় করা যে, বিক্রি করিলাম বটে, কিন্তু এত দিন পর্যন্ত দখল দিব না, আমার দখলেই থাকিবে অথবা এইরূপ শর্ত করা যে, এত টাকায় বিক্রি করিলাম বটে, কিন্তু এত টাকা আমাকে করয দিতে হইবে। অথবা এইরূপ শর্ত করা যে, আপনার নিকট হইতে কাপড় কিনিলাম বটে, কিন্তু শর্ত এই যে, জামা সিলাই করিয়া দিতে হইবে। এই ধরনের শর্ত করিয়া একটার মধ্যে আর একটা ঢুকাইয়া গড়-বড় করিয়া বিশৃঙ্খলা করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা না-জায়েয। এইরূপ করিলে বায়'য়ে ফাসেদ হইবে। (সেই আক্দ ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। একটা আকদের দায়িত্ব এবং প্রাপ্য চুকানের পর আর একটা আকদ পৃথকভাবে করা যাইতে পারে, তাতে দোষ নাই। কিন্তু একটার মধ্যে আর একটি ঢুকাইয়া দিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ইসলামী তাহ্যীব-বিরুদ্ধ।)

১১। মাসআলা ঃ এইরূপ শর্ত করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা যে, এই গাইটা পাঁচ সের দুধ দিবে, এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় না-জায়েয। এইরূপ করিলে বায়'য়ে ফাসেদ হইবে। অবশ্য জিনিসের সত্য সত্য তারিফ যে টুকু আছে তাহা বর্ণনা করা যাইবে। কিন্তু মিথ্যা তারীফ বর্ণনা করা যাইবে না। তাহা হারাম হইবে।

১২। মাসআলা ঃ মাটির, চীনা মাটির বা রবারের মূর্তির খেলনা অথবা ফটো ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। শরীঅতের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের হইলে ঐরূপ মালের বিক্রেতা দাম পাইবে না; কেহ ঐ ফটো বা মূর্তি নষ্ট করিয়া ফেলিলে মালিক তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারীও হইবে না।

১৩। মাসআলা ঃ ধান, চাউল, তৈল ও ঘি ইত্যাদি যেসব জিনিস ওজন করিয়া বা মাপিয়া ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং উহার মূল্য ঠিক করিয়া ক্রয় করার পর যদি উহা ক্রেতার বা ক্রেতা যে লোক (উকিল) পাঠাইয়াছে তাহার সামনে ওজন করিয়া দিয়া থাকে, তবে বাড়ী যাইয়া ঐ জিনিস পুনরায়

না মাপিয়াও খাওয়া, বেচা বা ব্যবহার করা জায়েয হইবে কিন্তু ক্রেতা বা তাহার উকিলের সামনে না মাপিয়া থাকিলে বরং আগেই মাপিয়া রাখে বা বলে যে, মাপিয়া পাঠাইয়া দিব, এমতাবস্থায় বাড়ী যাইয়া পুনরায় না মাপিয়া ঐ জিনিস খাওয়া, বেচা বা ব্যবহার করা দুরুস্ত হইবে না। না মাপিয়া বিক্রয় করিলে বায়' ফাসেদ হইবে। পরে যদি মাপিয়াও লয়, তবুও বিক্রয় দুরুস্ত হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের আগে যদি ক্রেতার সামনেও মাপা হইয়া থাকে, তবে সে মাপের এ'তেবার করা হইবে না। ক্রেতার আবার মাপিতে হইবে, না মাপিয়া খাওয়া বা বিক্রয় করা দুরুস্ত নাই।

১৫। মাসআলা ঃ জমিন, বাড়ী ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য অস্থাবর দ্রব্য ক্রয় করিলে তাহা হস্তগত (কবযা) করার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করিলে বায়'য়ে ফাসেদ হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ একটা বকরী, একটা গরু বা একখানা নৌকা একজনের কাছ থেকে আপনি কিনিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে একজন আসিয়া বলে যে, এ নৌকা ত আমার; কে যেন চুরি করিয়া আনিয়া আপনার নিকট বিক্রি করিয়া দিয়াছে।' এই দাবীদার তাহার দাবী যদি শরীঅতের আদালতে দুইজন সত্যবাদী সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করিতে পারে, তবে ঐ জিনিস তাহাকে দিয়া দিতে হইবে এবং তার কাছ থেকে কোন দাম বা ক্ষতিপূরণ আপনি আদায় করিতে পারিবেন না। (কারণ, ভুল আপনারই, তাহার ভুল নহে।) অবশ্য আপনি যদি আপনার বিক্রেতাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন, তবে তাহার নিকট হইতে জিনিসের দাম এবং ক্ষতিপূরণ উসুল করিবার আপনি হকদার হইবেন।

১৭। মাসআলা ঃ মরা মুরগী, বকরী বা গরু বিক্রয় করা হারাম, মৃত জানোয়ার মেথর চামারকে খাইতে দেওয়া হারাম, অবশ্য যদি ফেলাইয়া দিবার জন্য তাহাকে দেওয়া হয় এবং সে লইয়া গিয়া খায়, তবে জানোয়ারের মালিক গোনাহ্‌গার হইবে না। অবশ্য যদি কেহ ঐ জানোয়ারের চামড়া তুলিয়া নিয়া দাবাগাত করিয়া বিক্রয় করে বা নিজে ব্যবহার করে, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে।

১৮। মাসআলা ঃ একজনে একটা জিনিস দাম ঠিক করিতেছে। যাবৎ সে ছাড়িয়া না যায় তাবৎ অন্য একজনের ঐ জিনিসের দাম ঠিক করা জায়েয নহে। (অবশ্য নিলাম ডাকের ছুরত হইলে যাহার যত ইচ্ছা দাম বাড়াইতে পারে।)

একজন একটা জিনিস একজনের নিকট হইতে কিনিতেছে তখন ঐ খরিদ্দারকে ভাগাইয়া নিজের দিকে আনা অর্থাৎ এইরূপ বলা যে, আপনি ওর কাছ থেকে কিনিবেন না, আমি ওর চেয়ে কম দামে দিব, এরূপ করা জায়েয নহে।

১৯। মাসআলা ঃ আপনি একজনের নিকট হইতে চারিটি পেয়ারা চারি পয়সায় ক্রয় করিয়াছেন। তারপর একজন আসিয়া অনেক ঝগড়া ও তাকরার করিয়া তাহার কাছ থেকেই চারি পয়সায় পাঁচটি পেয়ারা লইয়াছে। এখন আপনি তার কাছ থেকে আর একটি পেয়ারা নিতে পারেন না। যদি জবরদস্তি করিয়া নেন, তবে তাহা আপনার জন্য হারাম হইবে এবং অন্যায় হইবে। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে যার সঙ্গে যেরূপ সাব্যস্ত হয়, তার তদ্রূপই নিবার অধিকার আছে। তার চেয়ে বেশী নিবার ন্যায়সংগত অধিকার নাই।

২০। মাসআলা ঃ একজন লোক একটা জিনিস বেচিতে চায়, কিন্তু আপনার নিকট বেচিতে চায় না। এইরূপ অবস্থায় আপনার তাহার উপর জবরদস্তি করার আধিকার নাই। আপনি যদি

জোর জবরদস্তি তাহার নিকট হইতে ঐ জিনিস নেন, তবে এইরূপ নেওয়া হারাম হইবে। পুলিশেরা (বা গ্রামের মাতব্বরেরা) অনেকে এইরূপ করে। কিন্তু খবরদার, এইরূপ করা চাই না। (বাড়ীর মেয়েলোকদের তাহ্‌কীক করিয়া লওয়া দরকার যে, পুরুষেরা জবরদস্তি করিয়া কোন জিনিস আনে কি না।)

২১। মাসআলাঃ আট আনা করিয়া আলুর সের বিক্রয় হয়। আপনি আট আনা দিয়া এক সের আলু কিনিয়া আরও ৪/৫টি আলু জোর জবরদস্তি বেশী নিয়া নিলেন। ইহা আপনার জন্য হারাম। অবশ্য বিক্রেতা যদি খুশি হইয়া আপনাকে কিছু বেশী দিয়া দেয়, তবে তাহা আপনার জন্য হালাল হইবে। এইরূপে যে মূল্য ধার্য করা হইয়াছে, সেই মূল্যই আপনার দিতে হইবে। (জিনিস হাতে নিয়া মূল্য দেওয়ার সময় জোর জবরদস্তি বা বিক্রেতাকে লাজে শরমে ফেলিয়া দুই-এক আনা কম দেওয়া আপনার জন্য জায়েয নাই। অবশ্য বিক্রেতা যদি খুশী হইয়া, এক আনা দুই আনা কম নেয়, তাহা সে কম নিতে পারে। সে খুশী হইয়া কম নিলে সেটা আপনার জন্য হালাল হইবে।

২২। মাসআলাঃ যদি কাহারো বাড়ীতে বা জমিতে মৌমাছি বাসা বাধে, তবে ঐ মৌচাকের মালিক বাড়ীওয়ালা বা জমিওয়ালাই হইবে। অন্যের জন্য তাহার বিনা অনুমতিতে ঐ চাক কাটিয়া নেওয়া জায়েয নহে। কিন্তু একটি বন্য (জঙ্গলী) পাখী যদি কাহারও গাছে বাসা বাঁধে এবং বাচ্চা দেয়, তবে সে পাখীর মালিক ঐ গাছওয়ালা হইবে না। যে ধরিবে সে-ই মালিক হইবে। কিন্তু পাখীর শাবক ধরিয়া পাখীকে কষ্ট দেওয়া জায়েয নহে।

২৩। মাসআলাঃ বেশী লাভ পাইবার আশায় দুধের সঙ্গে পানি মিলান। পাটে পানি মিশান, তূলায় মাটি মিশান, ঘিয়ে নারিকেল তৈল মিশান, চাউলের মধ্যে কঙ্কর মিশান ইত্যাদি-এক কথায় ভাল জিনিসের মধ্যে মন্দ জিনিস মিশান বা মাপে কম দেওয়া অতি জঘন্য কাজ। শরীঅত অনুসারে ইহা অতি বড় ভীষণ পাপ এবং সাংঘাতিক হারাম। —অনুবাদক

লাভের উপর মুনাফা চুক্তিতে বিক্রয় করা এবং আসল দামে বিক্রয় করা

১। মাসআলাঃ এক টাকা দিয়া মাল কিনিয়া সে মাল দশ-বিশ টাকায় বিক্রয় করাও জায়েয আছে; কিন্তু যদি ধোঁকা বা ফাকি হয় তবে এইরূপ ফাকি দিয়া এক পয়সা লাভ হইলেও তাহা হারাম হইবে এবং গোনাহ্‌ কবীরা হইবে। যদি মোয়ামালা এইরূপ সাব্যস্ত হয় যে, টাকায় চারি আনা লাভ দেওয়া হইবে অথবা আসল দামে বিক্রয় হইবে—অর্থাৎ, ক্রেতা এইরূপ বলিয়াছে যে, মোটের উপর চারি আনা লাভে মালটা আমাকে দিন, অথবা এইরূপ বলিয়াছে যে, মোটের উপর চারি আনা লাভ নিন, অথবা এইরূপ বলিয়াছে যে, আসল দামে মালটা আমাকে দিন এবং বিক্রেতা তদ্রূপই স্বীকার করিয়া নিয়া এইরূপ বলিয়াছে যে, টাকায় চারি আনা লাভে বিক্রয় করিতেছি, অথবা এইরূপ বলিয়াছে যে, মোটের উপর চারি আনা লাভে আপনার নিকট বিক্রয় করিতেছি অথবা এইরূপ বলিয়াছে যে, আসল দামে আপনার নিকট বিক্রয় করিতেছি, তবে ক্রয় দাম ঠিক ঠিক বলিয়া দেওয়া ফরয। এক পয়সা অতিরিক্ত বলিলেও মহাপাপ গোনাহ্‌ কবীরা হইবে (পয়সা হারাম হইবে, বরকত চলিয়া যাইবে)।

২। **মাসআলা ঃ** আসল দামের চুক্তিতে অথবা মুনাফা চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইলে ঐ সময় ঐ স্থলেই কেনা দাম বলিয়া দিতে হইবে, নতুবা চলিবে না। যদি এইরূপ বলে যে, আপনি নিয়া যান আমি বিল দেখিয়া দাম ঠিক করিয়া নিব বা বলিয়া পাঠাইব, তবে এইরূপ 'বায়' (ক্রয়-বিক্রয়) জায়েয হইবে না, বায়'য়ে ফাসেদ হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** মুনাফা চুক্তিতে মাল ক্রয়ের পর জানা গেল যে, বিক্রেতা ধোঁকাবাজি করিয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতা এবং খেয়ানত করিয়াছে, খরিদ-দাম বেশী লাগাইয়াছে, অথবা চুক্তির চেয়ে মুনাফা বেশী লাগাইয়াছে। এইরূপ অবস্থা হইলে ক্রেতা নিজ ইচ্ছায় যত দাম বেশী লাগাইয়াছে উহার কম দিতে পারিবে না। অবশ্য ইচ্ছা করিলে জিনিস ফেরত দিতে পারিবে; আর যদি আসল দামে ক্রয়-বিক্রয়ের পর এইরূপ ধরা পড়ে যে, আসল দাম বেশী লাগাইয়াছে, তবে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে যত বেশী লাগাইয়াছে, তাহা কম দিতে পারিবে।

৪। **মাসআলা ঃ** মাল যদি বাকী খরিদ করিয়া থাকে এবং পরে মুনাফা চুক্তিতে বা আসল দামে ঐ মাল বিক্রয় করে, তবে বলিয়া দিতে হইবে যে, ভাই, আমি মাল বাকী খরিদ করিয়াছিলাম, তাতে এত পড়িয়াছিল। বাকী খরিদের উল্লেখ ব্যতিরেকে মুনাফা চুক্তিতে বা আসল দামে বিক্রয় করিলে সে বিক্রয় দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি মুনাফা চুক্তির কোন কথা না থাকে বা আসল দামে বিক্রয়ের কোন কথা না থাকে, তবে বাকী খরিদ বা নগদ খরিদ এইরূপ কিছুই ক্রেতাকে বলার দরকার করে না।

৫। **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি একখানা কাপড় পাঁচ টাকায় কিনিয়া তারপর ধোলাই করিয়াছে বা রং করিয়াছে বা সেলাই করিয়াছে (বা উহাতে বহন খরচ লাগিয়াছে) এখন যদি এই কাপড় মুনাফা চুক্তিতে বা আসল দামে বিক্রয় করে, তবে খরিদ দামের সঙ্গে ধোলাই, রং, সেলাই বা বহনের খরচ যোগ করিতে পারিবে। কিন্তু এইরূপ বলিবে না যে, আমি এততেই কিনিয়াছি; বরং বলিবে যে, আমার এত পড়তা পড়িয়াছে। এইরূপ বলিলে মিথ্যা হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** একটা গাভী একজনের একশত টাকায় কিনিয়াছে এবং এক মাস পর্যন্ত খাওয়ানে দশ টাকা খরচ গিয়াছে। এখন যদি মুনাফা চুক্তিতে বিক্রয় করিতে হয়, তবে ঐ দশ টাকা একশত টাকার সঙ্গে যোগ করিয়া বলিতে পারিবে যে, আমার ১১০ টাকা পড়িয়াছে। কিন্তু যদি গাভীটি ৫ টাকার দুধ দিয়া থাকে, তবে তাহা বাদ দিয়া দিতে হইবে এবং বলিবে যে, ১১০ টাকা পড়িয়াছিল কিন্তু ৫ টাকার দুধ পাইয়াছি, সে জন্য ১০৫ টাকা পড়িয়াছে।

সুদের কারবারের বিবরণ

সুদ বড় পাপ বড়ই ঘৃণিত কাজ এবং উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার তাকীদ কোরআন হাদীসে বর্ণিত আছে। (ঘুষ খাওয়াও পাপ, দেওয়াও পাপ, ঘুষের দরবার করাও পাপ। অবশ্য কোন যালেম অফিসার বা কোন পাপিষ্ঠ কেরানী আপনারই হক আপনাকে দিয়া দেওয়ার তার যে কর্তব্য ছিল সে কর্তব্য পালন না করিয়া আপনাকে ঘুষ দিতে বাধ্য করে নতুবা আপনার হক অন্য কাউকে দিয়া দিবে। ঐমতাবস্থায় কিছু কিছু দিয়া যদি আপনি আপনার হক আদায় করিয়া নেন, তবে আপনি গোনাহ্‌গার হইবেন না বটে, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ কেরানী বা অফিসার গোনাহ্‌গার হইবে। কিন্তু যদি আপনার মনোবৃত্তিই হইয়া থাকে যে, নিয়মতান্ত্রিকতা ব্যতীত ঘুষ দিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া নিবেন, তবে আপনি গোনাহ্‌গার হইবেন। এইরূপে সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া, সুদের

দলীল-পত্র লেখা, সুদের সাক্ষ্য দেওয়া, সুদের পক্ষে বিচার করা, ডিক্রি দেওয়া—সবই অতি বড় গোনাহ্‌' অতি বড় জঘন্য পাপ। কিন্তু একজন না খইয়া মরিতেছে। দেশবাসী জনসাধারণ বা সরকার তাহার সাহায্য করিতেছে না বা বিনা সুদে কর্জ দিতেছে না, এমতাবস্থায় যদি সুদে টাকা আনিয়া সে তাহার বাল-বাচ্চার জীবন রক্ষা করে, তবে এর জন্য সে যতটা গোনাহ্‌গার হইবে তার চেয়ে বেশী গোনাহ্‌গার হইবে দেশবাসী জনসাধারণ এবং দেশের সরকার। (ছহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত আছে—হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ গ্রহণকারী, ঘুষ দাতা এবং ঘুষের দরবার করনেওয়ালা এই তিনজনের উপর লা'নৎ অবতীর্ণ হওয়ার ঘোষণা দিয়াছেন। (এইরূপে) সুদদাতা, সুদ গ্রহীতা উহার মধ্যস্থতাকারী, সুদের সাক্ষ্যদাতা, সুদের দলীল লেখক সকলের উপরই লানৎ পতিত হওয়ার ঘোষণা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, সুদদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই সমান পাপী। —মুসলেম

আমাদের দেশে সাধারণতঃ শুধু টাকা করযের ব্যাপারে যে সুদ হয় উহাকে সুদ মনে করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা ছাড়াও আরো অনেক প্রকারের সুদ আছে, সর্বপ্রকারের সুদ হইতে প্রত্যেক মুসলমানেরই বাঁচিয়া থাকা একান্ত কর্তব্য।)

১। মাসআলা ঃ সাধারণতঃ চারি প্রকারের মাল আছে—(১) সোনা-রূপা বা সোনা-রূপার তৈরী জিনিস-পত্র বা সোনা-রূপার স্থলবর্তী নোট, চেক ইত্যাদি। (২) সোনা-রূপা ব্যতীত অন্যান্য যে সব জিনিস ওজনে বা মাপে ক্রয়-বিক্রয় হয়, লেন-দেন হয় যেমন, ধান, চাউল, গম, আটা, লোহা, পিতল, রূই, তরকারী ইত্যাদি। (৩) যে সব জিনিস গজ দিয়া বা নল দিয়া অথবা শিকল বা ফিতা দিয়া মাপিয়া ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন হয় যেমন, কাপড়, চট, জমি ইত্যাদি। (৪) যে সব জিনিস গণনা করিয়া ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন হয় যেমন, ডিম, আম, আমরূদ, পেয়ারা, কমলা, মাছ, বকরী, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি। সুদ সম্পর্কে এইসব জিনিসের হুকুম ভিন্ন ভিন্নরূপে ভালরূপে বুঝিয়া লউন।

২। মাসআলা ঃ সোনা-রূপা ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি ছুরত আছে। এক ছুরত এই যে, সোনার বিনিময়ে সোনা বা রূপার বিনিময়ে রূপা ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে। যেমন, হয়ত গিনি দিয়া সোনা, সোনার জেওর কিনিতেছে অথবা রূপার টাকা বা নোট দিয়া জেওর কিনিতেছে। যদি এইরূপ ছুরত হয়, তবে দুইটি কাজ ফরয হইবে। একটি এই যে, উভয় দিকে ওজনে সমান হওয়া চাই, একদিকে বেশী বা কম হইলে সুদ হইবে। দ্বিতীয় ফরয কাজ এই হইবে যে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ঐ মজলিসেই একে অন্যের থেকে পৃথক হইবার পূর্বেই উভয় পক্ষের দেনা-পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে, বাকী যেন না থাকে। যদি জেওর নিয়া পরে গিনি দেয় বা গিনি নিয়া জেওর পরে দেয়, অথবা টাকা বা নোট নিয়া গিনি বা রূপা পরে দেয় বা রূপা নিয়া টাকা পরে দেয়, তবে সুদ হইবে।

৩। মাসআলা ঃ দ্বিতীয় ছুরত এই যে, দুই দিকে একই প্রকার জিনিস নয়—একদিকে সোনা, অন্যদিকে রূপা। এই ছুরতে সমান সমান হওয়া ফরয নহে। (কিন্তু ঐ মজলিসেই উভয় পক্ষের আদান-প্রদান হইয়া যাওয়া ফরয। একটা টাকা বা এক তোলা রূপার বিনিময়ে যতখানি ইচ্ছা সোনা ক্রয়-বিক্রয় তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী করিতে পারে। কিন্তু ঐ মজলিসেই উভয়ের আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে। এইরূপে গিনির বিনিময়ে বা এক তোলা সোনার বিনিময়ে যতখানি ইচ্ছা রূপা তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু ঐ মজলিসেই তাহাদের উভয়ের

আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে, আল্লাহ্‌র শরীঅতের পক্ষ হইতে এই বাধ্য-বাধকতা তাহাদের উপর ফরয করা হইয়াছে।

৪। মাসআলা ঃ বাজারে রূপার ভাও খুব চড়া; এক তোলা রূপার মূল্য হয়ত ১ টাকা। এক টাকায় এক তোলা রূপা বাজারে কেউ দেয় না অথবা রূপার জেওর খুব ভাল গড়নের পাওয়া যায়। ওজন ১০ তোলা, কিন্তু ১২ টাকার কমে দেয় না।

উক্ত অবস্থায় সুদ হইতে বাঁচিবার উপায় এই যে, রূপার টাকায় খরিদ করিও না বরং পয়সা দিয়া কিন। যদি বেশী ক্রয় করিত হয়, তবে আশরাফী দ্বারা ক্রয় কর। অর্থাৎ আঠার আনা পয়সার বিনিময়ে এক ভরি রূপা লও। কিংবা এক টাকার কম রেজকী আর কিছু পয়সা দিয়া কিন, তবে গোনাহ্ হইবে না; কিন্তু রূপার এক টাকা ও দুই আনা পয়সা দিবে না। এইরূপ করিলে সুদ হইবে। এইরূপ যদি ৮ ভরি রূপা ৯ টাকায় নিতে চাও, তবে ৭ টাকা এবং দুই টাকার পয়সা দাও। ৭ টাকার বিনিময়ে ৭ ভরি রূপা হইল। বাকী সব রূপা এই পয়সার বিনিময়ে হইবে। আর যদি দুই টাকার পয়সা না দাও, তবে কম পক্ষে আঠার আনা পয়সা দিতে হইবে; অর্থাৎ, ৭ টাকা ও চৌদ্দ আনার রেজকী দিলে রূপার বিনিময়ে ঐ পরিমাণ রূপা হইল। বাকী রূপা পয়সার বিনিময়ে হইল। আর যদি ৮ টাকা এবং এক টাকার পয়সা দাও, তবে গোনাহ্ হইতে বাঁচিতে পারিবে না কারণ ৮ টাকার বিনিময়ে আট ভরি রূপা হওয়া চাই। আবার এই পয়সা কিসের বিনিময়ে? অর্থাৎ এই পয়সা সুদ হইবে। মোটকথা, এতটুকু সর্বদা মনে রাখিবে, যে পরিমাণ রূপা লইবে উহা অপেক্ষা কম রূপা দিবে আর বাকী পয়সা দিবে। যদি পাঁচ ভরি রূপা পাও তবে পুরা ৫ টাকা দিবে না। দশ ভরি রূপা লইলে পুরা দশ টাকা দিবে না কম দিবে। বাকীটা পয়সায় দিয়া দিবে, তবে সুদ হইবে না। আর একথা স্মরণ রাখিবে এরূপে কোন সময়েই ক্রয় করিবে না যে, ৯ টাকায় এত পরিমাণ রূপা দেও, যদি এরূপ বল তবে সুদ হইবে। বরং বল যে, ৭ টাকা এবং দুই টাকার পয়সার বিনিময়ে এই পরিমাণ রূপা দেও। ভালরূপে বুঝিয়া লও।

৫। মাসআলা ঃ অথবা যদি উভয় পক্ষ রাজি হইয়া যেদিকে কম সেদিকে কিছু তামার (দস্তার) পয়সা শামিল করিয়া দেওয়া হয়—যেমন, হয়ত ১০ ভরি রূপার সঙ্গে দুই আনার পয়সা শামিল করিয়া দেওয়া হইল। ক্রেতা ১৪টি টাকা এবং ৮ আনা তামার পয়সা দিল—ইহাও দুরুস্ত হইবে। এস্থলে তামার পরিবর্তে রূপা এবং রূপার পরিবর্তে তামা ধরিয়া লওয়া হইবে এবং সুদের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। আর বিক্রেতা যদি এইরূপ করিতে রাজী না হয় বা তাকে এরূপ করিতে বলাও সম্ভব না হয়, তবে ক্রেতা এইরূপ করিলে রেহাই পাইতে পারিবে যে, নয়টি টাকা রূপার দিবে বা ৯ টাকার নোট দিবে, বাকী ১ ভরি রূপার পরিবর্তে দস্তা তামা বা পিতলের ৫ টাকা ৬ আনার পয়সা দুয়ানী প্রভৃতি দিবে, ১০ ভরি রূপার পরিবর্তে পুরা ১০ টাকা রূপা (বা ১০ টাকার নোট) দিবে না। কারণ, তাহা হইলে সুদ হইতে রেহাইর ছুরত হইবে না। (অজ্ঞ লোকেরা এইরূপ করাকে হিলা, চতুরতা বা খেলা মনে করে। কিন্তু যাহারা বিজ্ঞ লোক তাহারা জানেন যে, ইহা খেলা বা হিলা চতুরতা নয়; বরং ইহা আল্লাহ্‌র আইনের মর্যাদা রক্ষার্থে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।)

৬। মাসআলা ঃ যদি বাজারে রূপা সস্তা হয়। রূপার এক টাকায় দেড় তোলা রূপা পাওয়া যায়। এ অবস্থায় রূপার এক টাকা দিয়া এক ভরি রূপা নিলে নিজের দুনিয়ার লোকসান হয়। আবার এক টাকা দিয়া দেড় ভরি নিলে সুদ হইয়া যায় এবং নিজের দ্বীনের ও ঈমানের লোকসান হয়। এখন বুদ্ধি খাটাইয়া এমন পথ অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে দুনিয়ার লোকসানও না হয়,

আবার সুদ হইয়া দ্বীনের লোকসানও না হয়। সেই পথ এই যে, দামের সংগে কিছু তামা পিতলের বা দস্তার পয়সা মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে—চাই দুই আনার বা এক আনার পয়সা হউক বা এক পয়সাই হউক। যেমন, হয়ত যদি ১০ টাকায় ১৫ তোলা রূপা পাওয়া যায়, তবে নয় টাকা এবং এক টাকার পয়সা দিলে বা সাড়ে নয় টাকা ও আট আনার পয়সা দিলে সুদ হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। এইরূপ ধরা হইবে যে, ৯ টাকার পরিবর্তে ৯ ভরি রূপা এবং এক টাকার তামা, দস্তা প্রভৃতির পয়সার পরিবর্তে ছয় ভরি রূপা। এইরূপ করিলে সুদের গোনাহ্ হইতে মুক্তি পাওয়ার পথ হইবে। দুনিয়া এবং দ্বীন উভয়ই রক্ষা পাইবে। মনে রাখিবে এরূপ বলিবে না যে, ১০ টাকায় ১৫ তোলা রূপা কিনিলাম; বরং এইরূপ বলিবে যে, ৯ টাকা এবং এক টাকার তামার পয়সার পরিবর্তে ১৫ ভরি রূপা কিনিলাম।

৭। **মাসআলা ঃ** কম দরের খারাপ রূপা বা সোনা দিয়া বেশী দরের ভাল রূপা বা সোনা নিতে হইবে অথচ বাজারে সমান সমান কেহই দিবে না। আবার কম বেশী করিলে সুদ হইয়া গোনাহ্গার হইতে হইবে। এখন এই গোনাহ্ হইতে বাঁচার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যে, আগে আপনার কাছে যে খারাপ রূপা বা সোনা আছে তার দাম লাগাইয়া সেই দামে বিক্রয় করিয়া ফেলেন; তারপর ভাল রূপা বা সোনা তার দর দিয়া কিনেন। এখানেও মনে রাখিবেন, বেচা-কেনার সময় সুদ হইতে বাঁচার জন্য উপরে যে দুই-তিনটি উপায় লেখা হইয়াছে তদনুসারে কাজ করিবেন।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি চাঁদির জরিদার কাপড় রূপার টাকায় ক্রয় করিতে হয়, তবে এইখানেও সহজ পন্থা এই যে, উভয় দিকে এক এক পয়সা মিলাইয়া লও।

৯। **মাসআলা ঃ** খাটি সোনা বা খাঁটি রূপার তৈয়ারী কোন জিনিস কিনিতে হইলে যদি সোনার জিনিস রূপার টাকা দিয়া কিনেন, বা রূপার জিনিস সোনার গিনি বা তামার পয়সা দিয়া কিনেন, তবে ওজনে সমান হওয়ার প্রশ্ন এখানে আসিবে না। কিন্তু খবরদার, উভয় পক্ষের আদান-প্রদান যখন তখন হইতে হইবে, কাহারো তরফ কিছু বাকী থাকিতে পারিবে না, নতুবা গোনাহ্গার হইতে হইবে। আর যদি সোনার জিনিস সোনার গিনি দিয়া এবং রূপার জিনিস রূপার টাকা বা নোট দিয়া কিনেন, তবে সমান সমান হইতে হইবে। যদি বাজার দরের কারণে বা অন্য কারণে কম বেশী করিতে হয়, তবে উপরে যে তামার পয়সা মিলাইয়া দেওয়ার উপায়ের কথা বলা হইয়াছে সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচার জন্য তদ্রূপ করিতে হইবে।

১০-১১। **মাসআলা ঃ** সোনা-রূপার জেওর কিনিতে হইবে। জেওরের মধ্যে সাধারণতঃ অন্য কিছু পাথর ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। এরূপ অবস্থায় সোনার জেওর রূপার টাকার পরিবর্তে বা রূপার জেওর গিনির টাকার পরিবর্তে কিনিতে কোন মুশ্কিল নাই। কিন্তু যদি রূপার জেওর টাকার পরিবর্তে বা সোনার জেওর গিনির পরিবর্তে কিনিতে হয়, তবে লক্ষ্য রাখিবে যে, যদি মূল্যের সোনা-রূপা জেওরের সোনা রূপার চেয়ে কম বা সমান হয়, তবে জায়েয হইবে না, সুদ হইবে। কিন্তু যদি মূল্যের সোনা রূপা জেওরের সোনা-রূপার চেয়ে বেশী হয়, তবে জায়েয হইবে, সুদ হইবে না। কেননা এরূপ ছুরত হইলে কেনা-বেচার জন্য ঐ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা উপরে লেখা হইয়াছে অর্থাৎ মূল্যের রূপা জেওরের রূপা হইতে কিছু কম রাখিয়া বা মূল্যের সোনা জেওরের সোনা হইতে কিছু কম রাখিয়া বাকীটি অন্য জিনিস দিয়া (তামা, দস্তার পয়সা ইত্যাদি দিয়া) পুরা করিয়া দিতে হইবে।

১২। মাসআলাঃ আপনার হাতের আংটি দিয়া অন্যের হাতের আংটি আপনি নিতে চান। এখন দেখুন, উভয়ের আংটিতে পাথর (নাগিনা) লাগান আছে কিনা। যদি উভয়ের আংটিতে পাথর লাগান থাকে, তবে (ওজন) কম বেশী হইলে ক্ষতি নাই। আর যদি দোনোটা সাদা (নাগিনা পাথরহীন) হয়, তবে কম বেশী হইতে পারিবে না। আর যদি একটা সাদা এবং অন্যটা পাথর লাগান হয়, তবে যেটা সাদা সেইটার সোনা কিছু বেশী হওয়া চাই, নতুবা সুদ হইবে এবং গোনাহ্ হইবে। তবে এর সব ছুরতেই সংগে সংগে যখন তখন উভয় তরফের আদান-প্রদান হইয়া যাইতে হইবে। যদি একজনে বলে যে, আমাকে অবিশ্বাস করেন না কি? আমার আংটিটা আমি একটু পরে দিব—এরূপ বলা জায়েয হইবে না। এরূপ করিলে সুদের গোনাহ্ হইবে।

১৩। মাসআলাঃ যে-সব মাসআলার মধ্যে বলা হইয়াছে যে, যখন তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়পক্ষের আদান-প্রদান হইতে হইবে, তাহার অর্থ এই যে, ঐ মজলিসে বসা থাকিতে, উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার আগেই উভয়ের আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে। যদি একজন উঠিয়া চলিয়া যায়, তবে আর কেনা-বেচা হইল না। এইরূপ কাজ না করিলে সুদের গোনাহ্ হইবে। মেছাল স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আপনি দশ টাকার রূপা বা সোনা অথবা সোনা-রূপার কোন জিনিস সোনার পোদ্দার হইতে ক্রয় করিয়াছেন, এখন আপনার যখন-তখন ঐখানে থাকিতে থাকিতেই দশটি টাকা দিয়া দিতে হইবে। যদি আপনি টাকা সঙ্গে সঙ্গে না দিয়া থাকেন, তবে ঐ কেনা-বেচা ঠিক রাখিতে হইলে আপনার ঐখানে বসিয়া থাকিয়াই কাহারো দ্বারা টাকা নেওয়াইতে হইবে বা কাহারো নিকট হইতে হাওলাৎ নিয়া টাকা দিতে হইবে (এইরূপে পোদ্দারও যদি জিনিস বাড়ী রাখিয়া আসিয়া থাকে, তবে হয় তাহার ঐখানে আপনার সামনে বসিয়া থাকিয়াই জিনিস অন্য কাহারো দ্বারা আনাইয়া তাহাকে আপনার হাতে দিতে হইবে, নতুবা সে যদি বলে যে, আমি নিজে যাইয়া বাড়ী হইতে আনিয়া দিতেছি, তবে আপনার তার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইবে। যদি আপনাকে বাহিরে রাখিয়া সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া যায় বা অন্য কোথাও চলিয়া যায়, তবে আগের ঐ বেচা-কেনা আর থাকিবে না; নূতন করিয়া বেচা-কেনা করিতে হইবে, দর-দামও নূতন হইতে পারিবে। (শরীঅতের এরূপ কড়াকড়ি করার মধ্যে বড় হেকমত আছে। দুনিয়াতে আমরা দেখি, সোনা-রূপার দাম ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়িতে কমিতে থাকে।)

১৪। মাসআলাঃ (সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ের আইন বড় কড়া।) ইহা কেনা-বেচার কথা হইয়া যাওয়ার পর যদি ক্রেতা বা বিক্রেতা পেশাব করিতে চলিয়া যায় বা দোকানদার দোকানের ভিতরের দিকে চলিয়া যায় এবং একে অপর হইতে পৃথক হইয়া যায়, তবুও আগের বেচা-কিনা না-জায়েয হইবে এবং সুদী কারবার হইয়া যাইবে (অর্থাৎ, তাহার কোন মূল্য থাকিবে না।) পুনরায় নূতন করিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলিতে হইবে।

১৫। মাসআলাঃ যদি সোনা-রূপার কোন জিনিস বাকী কিনিতে হয়, তবে তাহার উপায় এই যে, দোকানদারের নিকট হইতে দামের টাকা আপনি করয নেন। করয দিয়া সেই টাকা দ্বারা দাম পরিশোধ করেন। করযের টাকা আপনার জিম্মায় বাকী থাকুক, পরে শোধ করিবেন। এইরূপ করিলে সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবেন।

১৬। মাসআলাঃ যদি খাঁটি সোনার কামদার দোপাট্টা, টুপি, চাদর বা অন্য কোন জিনিস কিনিতে হয়, তবে উহাতে যে পরিমাণ সোনা আছে উহার মূল্য যখন তখন দিতে হইবে, ঐ পরিমাণ বাকী থাকিতে পারিবে না, অন্যথায় সুদ হইবে। অতিরিক্তটার দাম পরে দিলেও চলিবে।

১৭। মাসআলা ঃ টাকা দিয়া টাকার পয়সা বা দস্তা-পিতলের সিকি দুয়ানী রেজগী নিতে হইলে যখন তখন আদান-প্রদান না হইলেও সুদের গোনাহ্ হইবে না। অবশ্য যদি পয়সার সাথে রূপার রেজগী থাকে, তবে আদান-প্রদান সঙ্গে সঙ্গে হইতে হইবে। শর্ত এই যে, দোকানীর কাছে পয়সা আছে কোন কারণে দিতে পারে না। আর যদি সব পয়সা তখন দোকানাদের কাছে না থাকে অথচ আপনার এখনই কিছু পয়সার প্রয়োজন তবে এই করিতে পারেন যে, যেই পরিমাণ পয়সা তার কাছে আছে সেই পরিমাণ আপনি তখন তার কাছ থেকে করয নেন। আর আপনার টাকা তার কাছে আমানত রাখেন। তারপর যখন তার কাছে পুরা পয়সা আসিবে, তখন সব পয়সা নিয়া আপনি আপনার কাজ মিটাইয়া দিবেন এবং আমানতের টাকা তাকে নিজস্ব করিয়া দেওয়ার এজাযত দিবেন। এইরূপ করিলে সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচিবেন। (ভিড়ের মধ্যে ভুল হইয়া পরে গোলমাল না হয় সেজন্য বারবার বলিয়া বলাইয়া লওয়া উচিত। নতুবা একে অন্যের সামনে দেখাইয়া লিখিয়া লওয়া সবচেয়ে ভাল।)

১৮। মাসআলা ঃ টাকা দিয়া গিনি লওয়া বা গিনি দিয়া টাকা লওয়ার মধ্যে যখন তখন সামনা-সামনি উভয় পক্ষের আদান-প্রদান হইয়া যাওয়া ওয়াজিব।

১৯। মাসআলা ঃ সোনা-রূপার জিনিস টাকা বা গিনি দিয়া কিনিলে এরূপ বলা জায়েয নাই যে, তিন দিন পর্যন্ত আমার নেওয়ার বা না দেওয়ার এখতিয়ার আছে। অর্থাৎ সোনা-রূপার কারবারে খেয়ারে শর্ত নাই।

২০। মাসআলা ঃ সোনা রূপা ব্যতীত অন্যান্য যে সব জিনিস বাটখারা দিয়া বা কাঁটা দিয়া ওজন করিয়া অথবা কাঠা পোয়া দিয়া মাপিয়া ক্রয়-বিক্রয় হয়—যেমন, ধান, চাউল, গম, যব, তামা, পিতল, তেল, তরকারী, নিমক ইত্যাদি—সেই সব জিনিস বদলাই করিতে হইলে যদি প্রকার এক হয়, তবে পরিমাণও এক সমান হইতে হইবে। যেমন যদি কেউ ধানের বদলে ধান নিতে চায় বা গমের বদলে গম নিতে চায়, তবে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব। প্রথমটি এই যে, দোনো দিকে পরিমাণ সমান হইতে হইবে, একটু বেশী-কম লইলে সুদ হইবে। দ্বিতীয় এই যে, দোনো দিকের আদান-প্রদান এক সময় হইতে হইবে। অন্ততঃ পক্ষে এতটুকু হইতে হইবে, দোনো দিকের ধান বা দোনো দিকের গম আলগ করিয়া মাপিয়া রাখিয়া দেখাইয়া বলিতে হইবে যে, এই আপনার ধান; যখন ইচ্ছা আপনি নিয়া যাইবেন। যদি এরূপ না করিয়া একে অন্যের থেকে পৃথক হইয়া যায় তবে সুদের গোনাহ্ হইবে। (এক্ষেত্রে বাকী কেনা-বেচা চলিবে না। যদি বাকী কেনা-বেচা করিতে হয়, তবে টাকা হিসাবে দাম ধরিয়া কেনা-বেচা করিতে হইবে। যেমন, যদি একজনে খাবার ধান দিয়া বীজধান দিতে চায় এবং দুই এক দিন পরে দিতে চায়, তবে এইরূপ করিতে হইবে যে, আপনার নিকট হইতে আমি এক মণ বীজধান ২০·০০ টাকায় কিনিলাম, এই বিশ টাকার আমি এক মণ খাবার ধান অমুক সময় আপনাকে দিব।)

২১। মাসআলা ঃ পরিমাণ করিয়া যেসব জিনিসের কেনা-বেচা হয় সেইসব জিনিসের নাম প্রকার এক হইলে একটার সঙ্গে আর একটার বদলাই করিতে হইলে গুণ বিভিন্ন হওয়ার দরুন পরিমাণে কম-বেশী করা যাইবে না, কম-বেশী করিলে সুদ হইবে। খারাপ ধান দিয়া ভাল ধান নেওয়ার ইচ্ছা, আউস ধান দিয়া বালাম ধান নেওয়ার ইচ্ছা বা খাবার ধান দিয়া বীজধান নেওয়ার ইচ্ছা—কিন্তু সমান সমান কেউ দেয় না। এ অবস্থায় সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচার উপায় এই যে, আগে আপনি আপনার খারাপ ধান টাকার হিসাবে বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তারপর টাকার হিসাবে

আবার ভাল ধান ঐ টাকা দিয়া ঐ লোকের নিকট হইতে কেনেন বা অন্যের নিকট হইতে কেনেন। এইরূপ করিলে দুরুস্ত হইবে; সুদের গোনাহ্ হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে।

২২। মাসআলা ঃ পরিমাণ এবং পরিমাপ করিয়া যে সব জিনিস বিক্রয় হয়, যদি তার নাম প্রকার এক না হয়, তবে পরিমাণ সমান না হইলেও চলিবে। যেমন, যদি ধান দিয়া গম নিতে হয় বা তিল নিতে হয়, তবে পরিমাণ এক সমান হইতে হইবে না। এক মণ ধানের বদলে দুই মণ গম, তিল বা সরিষা নিতে পারিবে ইহাতে সুদ হইবে না, কিন্তু উভয় পক্ষের আদান-প্রদান এক সংগে করা এক্ষেত্রেও ওয়াজিব। —উভয় পক্ষ সামনে থাকিতে থাকিতেই আদান-প্রদান করিতে হইবে। অথবা অন্ততঃ পক্ষে উভয় পক্ষের জিনিস পৃথক করিয়া দিতে হইবে, নতুবা সুদের গোনাহ্ হইবে।

২৩। মাসআলা ঃ এক সের চাউল দিয়া যদি আলু কিনিতে হয়, তবে পরিমাণে সমান হওয়ার প্রয়োজন নাই। এক সের চাউলের পরিবর্তে দুই সের আলুও বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু এক সংগেই চাউল এবং আলুর আদান-প্রদান হইতে হইবে, স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র গেলে সুদের গোনাহ্ হইবে।

২৪। মাসআলা ঃ যে সব জিনিস ওজনে বিক্রয় হয় তাহা যদি টাকা পয়সা দিয়া খরিদ করা হয় কিংবা কাপড় ইত্যাদি যাহা ওজনে বিক্রয় হয় না বরং গজ মাপিয়া কিংবা গণনা করিয়া বিক্রয় হয়; যেমন এক থান কাপড়ের বদলে গম ইত্যাদি দিল কিংবা গম, বুট দিয়া আমরুদ, কমলা ইত্যাদি যাহা গণিয়া বিক্রয় হয়। মোটকথা, এক দিকে এমন জিনিস যাহা ওজনে বিক্রয় হয় আর অপর দিকে গণনা বা গজের মাপে বিক্রয়ের জিনিস, তবে এমতাবস্থায় ঐ দুইটি বিষয়ের কোনটির ওয়াজিব নহে। এক পয়সার যতটুকু ইচ্ছা গম আটা তরকারী খরিদ করিতে পারে। এইরূপে কাপড় দিয়া যত ইচ্ছা শস্য লইতে পারে। গম, বুট ইত্যাদি দিয়া যত ইচ্ছা আমরুদ, কমলা লেবু ইত্যাদি লইতে পারে। স্থানে থাকিতেই আদান-প্রদান হউক কিংবা পৃথক হওয়ার পর হউক, সব রকমেই দুরুস্ত আছে।

২৫। মাসআলা ঃ আটার বদলে গম কোন প্রকারেই দুরুস্ত নাই। এক সের গমের বদলে এক সের আটা কিংবা কম বেশী হওয়া সর্ব অবস্থায়ই নাজায়েয। অবশ্য যদি গম দিয়া গমের আটা না লয় বরং বুট ইত্যাদি অন্য কোন জিনিসের আটা লয়, তবে জায়েয আছে। কিন্তু সামনাসামনি আদান-প্রদান করিতে হইবে।

[**মাসআলা ঃ** সোনা-রূপা ব্যতীত অন্যান্য যে সব জিনিস কাঠা পোয়া দিয়া মাপিয়া বা কাঁটা বাটখারা দিয়া ওজন করিয়া বিক্রয় হয় না গণনা করিয়া বিক্রয় হয় বা গজ-ফুট বা ফিতা দিয়া মাপিয়া বিক্রয় হয়, সে সব জিনিস একে অন্যের সংগে বদলাই করিতে হইলে সংখ্যায় এক সমান হওয়ার প্রয়োজন নাই এবং এক সংগে আদান-প্রদান হওয়ারও প্রয়োজন নাই। ১০টা পেয়ারার পরিবর্তে ৫টা আম বা কমলা বদলাই হইতে পারে এবং যখন-তখন উভয় পক্ষের আদান-প্রদান না হইলেও গোনাহ হইবে না।]

২৬। মাসআলা ঃ এক দিকে বালাম চিকন চাউল অন্য দিকে আউসের মোটা চাউল বদলাই করিতে হইলে বেশকম করা চলিবে না। বদলাই করিতে ইহার দোনো দিক এক সমান হইতেই হইবে, এইরূপ সমান হওয়া ওয়াজিব। যদি এক সমান না দেয়, তবে দাম ধরিয়া টাকা-পয়সায় ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইবে, তবেই সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচা যাইবে, নতুবা নহে। আর যদি চাউল

দিয়া গম বা গমের আটা বদলাই করিতে হয়, তবে বেশকম করা যাইবে, তাতে দোষ হইবে না, কিন্তু এক সংগে আদান প্রদান হইতে হইবে।

২৭। মাসআলা ঃ সরিষার বদলাই সরিষার তেলের সংগে বা তিলের বদলাই তিলের তেলের সংগে জায়েয নাই। অবশ্য তিল বা সরিষার বিনিময়ে যে তেল লওয়া হইতেছে তাহা যদি তিল এবং সরিষার মধ্যে যে তেল আছে তার চেয়ে বেশী হওয়া নিশ্চিত হয়, তবে জায়েয আছে। অবশ্য সামনাসামনি আদান-প্রদান হইতে হইবে আর যদি কম কিংবা সমান হয়, কিংবা যদি সন্দেহ হয় যে, বেশী হইবে না, তবে জায়েয নাই, সুদ হইবে। (অবশ্য গমের বদলাই যবের ছাতুর সংগে বা তিলের বদলাই সরিষার তেলের সংগে এবং সরিষার বদলাই তিলের তেলের সংগে জায়েয আছে। তিলের বদলাই তিলের তেলের সংগে বা সরিষার বদলাই সরিষার তেলের সংগে করিতে হইলে উভয় তরফে পয়সা হিসাবে দাম ধরিয়া ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইবে, নতুবা সুদের গোনাহ্ হইবে।)

২৮। মাসআলা ঃ গরুর গোশ্তের বদলে বকরীর বা খাসীর গোশ্ত নিতে হইলে পরিমাণে এক সমান হইতে হইবে না, বেশ কম জায়েয আছে। কিন্তু এক সংগে আদান-প্রদান হইতে হইবে।

২৯। মাসআলা ঃ তামার লোটা দিয়া তামার ডেগ লইলে বা এলুমিনিয়ামের বদনা দিয়া এলুমিনয়ামের পাতিল লইতে হইলে ওজনে এক সমান হইতে হইবে এবং এক সংগে আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে। আর যদি একদিকে তামা অপর দিকে লোহা বা পিতল হয় তবে ওজনে কম বেশী জায়েয আছে। অবশ্য আদান-প্রদান সামনাসামনি হইতে হইবে।

৩০। মাসআলা ঃ এক সের চাউল একজনে ধার নিতে চায়, কিন্তু তার বদলে ২ সের আলু দিতে চায়। এরূপ করা জায়েয নাই। যদি এরূপ করার দরকার পড়ে, তবে এই করিতে হইবে যে, হয়ত আলু এখনই দিয়া দিতে হইবে, না হয় এখন এক সের চাউল ধার নিয়া যাউক; পরে যখন দেওয়ার সময় হয়, তখন বলিতে হইবে যে, ভাই, আপনার নিকট আমি এক সের চাউল দেনাদার আছি; সেই দেনার পরিবর্তে আমি দুই সের আলু দিতেছি; এরূপ করা জায়েয আছে।

৩১। মাসআলা ঃ মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সব মাসআলার মধ্যে বলা হইয়াছে যে, যখন তখন সংগে সংগে সামনাসামনি উভয় পক্ষের আদান-প্রদান হইতে হইবে—তাহার অর্থ এই যে, সোনা রূপার কারবারের মধ্যে ত যখন তখন উভয় পক্ষের মাল উভয় পক্ষের হস্তগত হইতে হইবে। এ ছাড়া অন্যান্য ছুরতে হস্তগত না হইলেও যদি তৎক্ষণাৎ সংগে সংগে সামনা-সামনি উভয়পক্ষের মাল নির্দিষ্ট হইয়া যায় এবং পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে সুদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। উভয় পক্ষের মাল কমছে-কম নির্দিষ্ট এবং পৃথক করা না হইলে সুদ হইবে।

৩২। মাসআলা ঃ যে সব জিনিস কাঁটা বা বাটখারা দিয়া ওজন করিয়া বা কাঠা পোয়া দিয়া বিক্রয় করা হয় না; গণনার দ্বারা, গজ দ্বারা বা ফিতার দ্বারা মাপিয়া বিক্রয় হয়, সেই সব জিনিসের মাসআলা এই যে, যদি পয়সার দ্বারা বিক্রয় না করিয়া দুইটি জিনিসের বদলাই করে, তবে উভয় জিনিসের নাম-প্রকার এক হইলে—যেমন, যদি পেয়ারার বদলে পেয়ারা নেয়, কাপড়ের বদলে কাপড় নেয় তবে উভয় দিকে সমান হওয়া শর্ত নহে; বেশকম হইতে পারিবে। কিন্তু ঐ একই সময়ে উভয়ের আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে। আর যদি দুই দিকে দুই প্রকার

জিনিস হয়—যেমন, যদি পেয়ারার বদলে কমলা নেয় বা চাউল দিয়া কমলা নেয় বা শাড়ি দিয়া লুঙ্গি নেয়, তবে এক সমান হওয়াও ওয়াজিব নহে এবং এক সংগে আদান-প্রদান হওয়াও ওয়াজিব নহে।

৩৩। মাসআলা ঃ সোনা-রূপার কারবার ছাড়া অন্য জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় মাসআলার সারকথা সহজের জন্য আবার বলিতেছি, ভালো মত বুঝিয়া লউন ঃ টাকা-পয়সার পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয় হইলে ত কথাই নাই। সেখানে দুই শর্তের এক শর্তও নাই। প্রথম শর্ত এই যে, উভয় পক্ষের মাল সমান হওয়া, আর দ্বিতীয় শর্ত এই যে, উভয় পক্ষের আদান-প্রদান এক সংগে যখন তখন সামনাসামনি হওয়া। অবশ্য মালের বদলাই যদি মালের সংগে করিতে হয়, তবে দেখিতে হইবে—যদি উভয় দিকে এক প্রকারের মাল হয় এবং ওজনে মাপে বিক্রয় হয় যেমন, যদি ধানের বদলে ধান, ছোলার বদলে ছোলা নিতে চায়, তবে উপরের দোনো শর্ত পালন করিতে হইবে। আর যদি এমন হয় যে, দোনো দিকে একই প্রকারের জিনিস বটে, কিন্তু ওজনে বিক্রয় হয় না গণনায় বা গজে বিক্রয় হয়—যেমন যদি ডিমের বদলে ডিম, কমলার বদলে কমলা, কাপড়ের বদলে কাপড় নিতে চায়, অথবা দুই প্রকার মাল হয়, কিন্তু ওজনে বিক্রয় হয়—যেমন ধানের বদলে তিল নিতে চায় বা মটরের (ডালের) বদলে সরিষা নিতে চায়, তবে এই দুই ছুরতে এক সমান হওয়ার যে শর্ত সে শর্ত থাকিবে না। কিন্তু এক সংগে যখন তখন আদান-প্রদানের শর্ত ওয়াজিব থাকিবে। আর যেখানে প্রকারে এক নয়, ওজন বা মাপে বিক্রয় হয় না, যেমন যদি ডিমের বদলে কমলা বিক্রয় করে বা কাপড়ের বদলে জমিন বিক্রয় করে, দুই শর্তের এক শর্তও ওয়াজিব থাকিবে না।

৩৪। মাসআলা ঃ চীনা রেকাবীর বদলে যদি চীনা রেকাবী নেওয়া হয় বা এনামেলের মাল নেওয়া হয়, তবে এক সমান হওয়ার শর্ত থাকিবে না। একখানা চীনা রেকাবীর বদলে দুই খানা চীনা রেকাবী অথবা দুইখানা এনামেলের থাল নিলে তাহা জায়েয হইবে। এইরূপে একটি সুঁচের বদলে দুইটি সুঁচ নিল তাহাও জায়েয হইবে। কিন্তু যদি কেছেম ও নাম-প্রকার এক হয়—যেমন, যদি চীনা রেকাবীর বদলে চীনা রেকাবী নেয় অথবা এনামেলের বদলে এনামেল নেয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সামনা সামনি উভয় পক্ষের আদান-প্রদান এক সঙ্গে হইতে হইবে। আর যদি কেছেম ভিন্ন হয়— যেমন, যদি এনামেলের বদলে এলুমিনিয়াম নেয়, তবে এক সংগে আদান-প্রদানের শর্তও ওয়াজিব থাকিবে না।

৩৫। মাসআলা ঃ আপনার বাড়ীতে মেহ্‌মান আসিয়াছে; ঘরে ভাত পাকান নাই; পড়শীর বাড়ী হইতে ভাত করয আনিতে হইবে। যত পরিমাণ চাউলের ভাত তত পরিমাণ চাউলের ভাত দিয়া দিলে এরূপ করয নেওয়া-দেওয়া জায়েয আছে।

৩৬। মাসআলা ঃ (বাড়ীর মেয়েলোকদিগকে এই সব মাসআলা ভালোমত বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। এমন কি) যে চাকর বা মামার দ্বারা সদায়পাতি কেনা হয়, তাহাদিগকেও বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, এইভাবে কিনিলে সুদ হইবে; আর এইভাবে কিনিলে সুদ হইবে না। স্বামী বা মেহমান যাহাকে খাওয়াইবে সকলের গোনাহ্‌ তোমার উপর বর্তিবে।

বায়'য়ে সলমের বিবরণ

১। মাসআলা ঃ ফসল পাকার আগে বা পরে ভাদ্র মাসে বা অগ্রহায়ণ মাসে আপনি একজন ফসলকারকে একশত টাকা দিলেন যে, আমাকে ৫ টাকা মণ দরে ২০ মণ আমন ধান দিতে হইবে এবং ১৫ই মাঘের মধ্যে আমার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে এবং তখন বাজার দর কি হইবে—বেশী হইবে না কম হইবে তাহা দেখা যাইবে না; আমাকে ৫ টাকা মণ দরে দিতে হইবে। এই কথায় স্বীকার করিয়া টাকা গ্রহণ করিলে টাকা গ্রহণকারী নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট মাল পৌঁছাইয়া দিতে শরীঅতের আইন অনুযায়ী বাধ্য থাকিবে। এইরূপ অগ্রিম দাম দিয়া ক্রয়-বিক্রয় করাকে বায়'য়ে সলম বলে। বায়'য়ে সলম শরীঅতে দুরুস্ত আছে। কিন্তু ইহা দুরুস্ত হইবার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। যথা—(১) প্রথম শর্ত এই যে, ধান, পাট বা মটর যে মাল ক্রয় করিবে তার কোয়ালিটি (গুণ) এমন পরিষ্কারভাবে বলিতে হইবে, যাহাতে পরে কোন মত বিরোধ বা ঝগড়া-বিবাদ দেখা না দিতে পারে। আউস ধান, গোড়ালে, না গোড়ালে আগালে মিশান ধান, খুব শুকনা, না আধা শুক্না, আধা ভিজা ধান ইত্যাদি কোয়ালিটি এমন পরিষ্কারভাবে দুইজন সাক্ষীর সামনে লিখিতে বা বলিতে হইবে, যাহাতে আদৌ কোন মতবিরোধ বা ঝগড়া দেখা দিতে না পারে। শুধু যদি এতটুকু বলে যে, আমাকে ১০০ টাকায় ২০ মণ ধান দিতে হইবে, তবে জায়েয হইবে না। (২) দ্বিতীয় শর্ত এই যে, যে সময় এইরূপ বেচা-কেনার কথাবার্তা ঠিক হইবে অর্থাৎ আকদ বাঁধা হইবে, তখনই দর কাটিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে যে, এত টাকা মণ দরে দিতে হইবে। যেমন, হয়ত বলিল, ৫ টাকা দরে দিতে হইবে। আর যদি এইরূপ বলে যে, তখন বাজারে যে দর থাকে সেই দরে দিতে হইবে বা তার চেয়ে মণ প্রতি ২ টাকা কম নিতে হইবে বা বর্তমানে বাজারে যে দর আছে, তার চেয়ে মণ প্রতি ২ টাকা কম বেশী দিতে হইবে, তবে এরূপ বেচা-কেনা শরীঅতে দুরুস্ত এবং জায়েয হইবে না। (৩) তৃতীয় শর্ত এই যে, যত টাকার মাল নিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া ঐ সময়েই বলিতে হইবে। যেমন, হয়ত বলিল যে, আমাকে ১০০ টাকার ধান দিতে হইবে। যদি এইরূপ বলে যে, আমি কিছু টাকার ধান নিব, আপনি আমাকে এত দরে দিবেন, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে না। (৪) চতুর্থ শর্ত এই যে, যে সময় কেনা-বেচার কথা হইবে ঐ সময় টাকা না দিয়া একজন উঠিয়া যায়, তবে যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা সব বাতিল হইয়া যাইবে; পুনরায় নূতন করিয়া আকদ বা কথা-বার্তা ঠিক করিতে হইবে। আর যদি ৫০ টাকা ঐ মজলিসে দিয়া বাকী ৫০ টাকার জন্য দোকানে বা বাড়ী যায়, তবে ঐ মজলিসে যে ৫০ টাকা দিয়াছে তাহার কিনা-বেচা ত দুরুস্ত হইয়াছে; বাকী ৫০ টাকার কথাবার্তা পুনরায় নূতনভাবে বলিতে হইবে, নতুবা নহে। (৫) পঞ্চম শর্ত এই যে, মাল দেওয়ার মুদ্দৎ কমছে কম এক মাস হইতে হইবে। অর্থাৎ, যখন টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং মাল দেওয়ার কথাবার্তা হইয়াছে, তখন হইতে মাল দেওয়ার মুদ্দৎ কমছে কম এক মাসের হওয়া চাই। এক মাসের কম হইলে বায়'য়ে সলম দুরুস্ত হইবে না। বেশী যত হয় তাতে দোষ নাই। কিন্তু দিন তারিখ মাস সব ঠিক করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে যাহাতে পরে ঝগড়া না বাধে। যদি দিন

তারিখ মাস ঠিক না করিয়া শুধু এইরূপ বলে যে, যখন ধান কাটা হইবে তখন দিব, তবে এইরূপ বলা দুরুস্ত হইবে না। (৬) ষষ্ঠ শর্ত এই যে, ইহা উল্লেখ করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া স্পষ্ট ভাষায় ঐ সময়েই বলিয়া দিতে হইবে যে, মাল কোথায় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে এবং মাল পৌঁছানের বারবরদারি কাহার জিম্মায়। যেমন, হয়ত ক্রেতা বিক্রেতাকে বলিল, ধান আমার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে বা দোকানে বা গুদামে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, কুলি খরচ, নৌকা ভাড়া, গাড়ী ভাড়া আপনার জিম্মায় থাকিবে। যদি এইরূপ পরিষ্কার ভাষায় না বলে, তবে কারবার দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি এমন কোন মাল হয় যে, তাতে কোন ভার বোঝাই নাই; যেমন হয়ত মেশ্‌ক ক্রয় করিল অথবা মোতি ক্রয় করিল তবে মাল পৌঁছানের জায়গার কথা উল্লেখ না করিলে ক্ষতি নাই, যেখানে ক্রেতাকে পায় সেইখানেই দিয়া দিবে, যদি এইসব শর্ত পুরা করা হয়, তবে বায়'য়ে সলম দুরুস্ত হইবে, নতুবা নহে।

২। **মাসআলা ঃ** ধান, পাট, মটর, মসূর ছাড়া অন্যান্য জিনিসেরও বায়'য়ে সলম দুরুস্ত আছে, যদি তার কোয়ালিটি ঠিক করা যায় এবং উপরোক্ত শর্তসমূহ পুরা হয় এবং পরে কোন ঝগড়া বিরোধ না হয়। যেমন, যদি বলে যে, আমাকে ৫০০ মুরগীর ডিম দিতে হইবে বা আপনার কারখানায় মাল তৈরী হইলে আমাকে দশ হাজার ইট দিতে হইবে বা দশখানা কাপড় দিতে হইবে। কিন্তু উপরোক্ত ছয়টি শর্ত সব পুরা করিতে হইবে; কোন কথায় গোলমাল না থাকে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে পরে আদৌ কোনরূপ ঝগড়া বিরোধ বা মনোমালিন্য না হইতে পারে। ইটের মাপ (দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে) ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে, কোয়ালিটি বলিতে হইবে। কাপড় কিরূপ হইবে—সূতি, পশমী, মোটা, না মিহিন সব কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে—একটুও যেন গোলমালের অবকাশ না থাকে।

৩। **মাসআলা ঃ** টাকায় পাঁচ বোঝা ঘাস বা পাঁচ বস্তা ভূষি দিতে হইবে, এরূপ বলিলে বায়'য়ে সলম দুরুস্ত হইবে না। কারণ, বোঝার মধ্যে, বস্তার মধ্যে অনেক বেশকম হয়। অবশ্য যদি পরিমাণ ঠিক করার উপায় বাহির করিয়া পরিমাণ ঠিক করিয়া বলিয়া দেওয়া হয়, তবে দুরুস্ত হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** বায়'য়ে সলম দুরুস্ত হওয়ার জন্য আর একটি শর্ত এই যে, ঐ জিনিস ঐ দেশে সব সময় বাজারে পাওয়া যাওয়া চাই। যদি বিদেশ হইতে কষ্ট-ক্লেশ করিয়া আনাইতে হয়, দেশে না পাওয়া যায়, তবে বায়'য়ে সলম বাতেল হইয়া যাইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** বায়'য়ে সলমের আক্‌দ করার সময় যদি এইরকম বলে যে, আমাকে নূতন ধান দিতে হইবে বা আমাকে অমুক ক্ষেতের ধান দিতে হইবে, তবে ইহা জায়েয হইবে না, অতএব, এরূপ শর্ত করা চাই না। দেওয়ার সময় চাই নতুন দেউক চাই পুরান দেউক—দোনো এখ্‌তিয়ার থাকিবে। অবশ্য নতুন ধান কাটা শুরু হইয়া গিয়াছে বা বাজারে নতুন ধান আসা আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় যদি আক্‌দ হয় আর নতুন ধানের শর্ত লাগায়, তবে তাহা নাজায়েয হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** আপনি হয়ত ভাদ্র মাসে ১০০ টাকা দিয়াছিলেন যে, পৌষ মাসে আপনাকে ২০ মণ ধান দিবে, কিন্তু পৌষ গুযারিয়া গেল তবুও সে ধান দিল না—তার কাছে ধান নাই, আছে হয়ত পাট বা মটর এবং সে এখন বলে যে, আপনি সেই একশত টাকার ২০ মণ ধানের বদলে ১০ মণ বা ১৫ মণ পাট নেন বা ২৫ মণ মটর নেন এইরূপ করা জায়েয নাই। অর্থাৎ বায়'য়ে সলম আক্‌দের সময় যে মালের জন্য আক্‌দ করিয়াছেন সেই মালের পরিবর্তে অন্য মাল

নেওয়া জায়েয নাই। অতএব, আপনার কর্তব্য হইবে এই যে, তাহাকে কিছু দিন সময় (মোহ্লত) দিতে হইবে, সে কিছু দিন পরে আপনাকে ধান দিবে, না হয় তার কাছ থেকে আপনার আসল টাকা ফেরত নিতে হইবে। আসল টাকা ফেরত নিয়া তার দ্বারা যে মাল যে দরে ইচ্ছা হয় কিনিতে পারিবেন। কিন্তু বায়'য়ে সলমের বদলে অন্য মাল নিতে পারিবেন না। এইরূপে সময় আসার পূর্বেই যদি বায়'য়ে সলম আপনি ভাঙ্গিয়া দেন যে, আপনি কার্তিক মাসে বলিলেন, ভাই, আমার ধান নেওয়া হইবে না বা হয়ত বাজারে ঐ মাল একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া গেল, তবে আপনি এই বলিতে পারিবেন না যে, আমাকে ধানের বদল পাট দেন বা মটর দেন; এইরূপ করা জায়েয হইবে না। অবশ্য আপনি আপনার আসল টাকা ফেরত নিতে পারিবেন। আসল টাকা ফেরত নিয়া যে মাল যে দরে ইচ্ছা হয় কিনিতে পারিবেন।

করয গ্রহণ করার বিবরণ

(একান্ত ঠেকা ব্যতীত বিনা জরুরতে ঋণ গ্রহণ করা এবং করয গ্রহণ করা অত্যন্ত দূষণীয়। আমাদের হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করয হইতে বাঁচার জন্য আমাদিগকে অনেক তাকীদ করিয়া গিয়াছেন এবং ঠেকা বা জরুরতবশতঃ করয করার পর যখন হাতে হইবে, তখন একটুও দেরী বা টালবাহানা না করিয়া যখন তখন করয পরিশোধ করার জন্য তাকীদ করিয়াছেন। বিনাসুদে অভাবগ্রস্তকে করয দেওয়ার অনেক ফযীলত আছে। হাদীস শরীফে আছেঃ অভাবগ্রস্তকে করয দিয়া সাহায্য করিলে ১৮ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাইবে।)
—অনুবাদক

১। **মাসআলাঃ** যেমনটি নেওয়া যায় তেমনটি দেওয়া যায়' অর্থাৎ ওজনের দ্বারা যে জিনিসের পরিমাণ করা যায়, সেই জিনিসের করয দুরুস্ত হইতে পারে। যেমন, টাকা-পয়সা, ধান-চাউল, গম-আটা ইত্যাদি। এমন কি গণার দ্বারাও যদি সমান সমান দেওয়ার মত হয় অর্থাৎ যে সব জিনিস পরস্পর একটা অন্যটার চেয়ে বেশী বেশ-কম হয় না, প্রায় সমান সমানই হয় সে-সব জিনিসের করয গণনার দ্বারাও দুরুস্ত হইবে। যেমন ডিম, সুপারী, নারিকেল ইত্যাদি। যেসব জিনিসের যেমনটি নেওয়া যায় তেমনটি দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নাই তাহার করয দুরুস্ত হইতে পারে না। যেমন আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বকরী, গরু ইত্যাদি।

২। **মাসআলাঃ** আপনি এক মণ ধান করয নিয়াছেন কিন্তু যে সময় আপনি ধান করয নিয়াছেন সে সময় হয়ত ধানের মণ ছিল ১০ টাকা। যখন করযের ধান পরিশোধ করিতে পারিতেছেন, তখন ধানের মণ হইয়াছে ২০ টাকা। এরূপ অবস্থা হইলে আপনার সেই এক মণ ধানই দিতে হইবে, দাম বাড়িলে সেজন্য আপনি কম দিতে পারিবেন না বা দাম কমিলে সেজন্য করযদাতাও আপনার নিকট হইতে বেশী নিতে পারিবেন না। যেমনটি নিয়াছেন, যে পরিমাণ নিয়াছেন তেমনটি, সেই পরিমাণই আপনার দিতে হইবে এবং করযদাতারও নিতে হইবে।

৩। **মাসআলাঃ** যেমন ধান আপনি করয নিয়াছিলেন, করয পরিশোধের সময় আপনি তার চেয়ে ভাল ধান দিতেছেন। এই ভাল ধান গ্রহণ করা করযদাতার পক্ষে নাজায়েয নহে। কিন্তু করয দেওয়ার সময় এরূপ বলা জায়েয নাই যে, আমাকে এর চেয়ে ভাল ধান দিতে হইবে। (এরূপ বলিলে সুদ হইবে।) আর যদি ওজনে বা মাপে বেশী লওয়া হয়, তাহাও সুদ হইবে।

খুব ঠিক ঠিক ওজন করিয়া দেওয়া নেওয়া দরকার। অশ্য যদি নিজ খুশীতে (বিনা শর্তে) দেওয়ার সময় কিছু ঢলক মাপিয়া কিছু বেশী দেয়, তবে তাহাতে দোষ নাই।

৪। **মাসআলা ঃ** আপনি কাহারও নিকট হইতে কিছু টাকা বা কিছু চাউল করয লইয়াছেন। করয লওয়ার সময় আপনি বলিয়াছেন যে, ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে ইন্‌শাআল্লাহ্ আমি আপনার করয পরিশোধ করিব; করযদাতাও আপনার এই ওয়াদা মঞ্জুর করিয়া লইলেন। এইরূপ ওয়াদা করা উচিত নহে এবং আইনেও এই ওয়াদার কোন মূল্য নাই। কেননা, আপনি করযদার, প্রতি মুহূর্তে আপনার উপর ওয়াজিব যে, যখন পারেন তখনই আপনি করয পরিশোধ করেন। আবার করযদাতারও অধিকার আছে যে, যখন তিনি ইচ্ছা করেন আপনার নিকট করযের টাকার তাগাদা করিতে পারেন এবং তখন আপনার দিয়া দেওয়া উচিত হইবে। এমনকি, না দেওয়ার কারণে যদি তিনি কিছু শক্তও আপনাকে বলেন, তাহাও আপনার নীরবে সহ্য করিয়া নেওয়া উচিত হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** আপনি একজনের কাছ হইতে এক সের চাউল করয আনিয়াছিলেন। যখন করয পরিশোধের সময় আসিল তখন আপনি বলিলেন, ভাই, আপনি এক সের চাউলের পরিবর্তে এক সের চাউলের মূল্য আট আনার পয়সা নিয়া নেন। যদি করযদাতা ইহাতে রাযী হয়, তবে এরূপ মোয়ামালা করা জায়েয আছে, কিন্তু ঐ মজলিসেই মোয়ামালা শেষ করিতে হইবে। যদি ঐ মজলিস বদলিয়া যায়, তবে এই কথাবার্তার কোন মূল্য থাকিবে না; পুনরায় নূতন করিয়া কথাবার্তা বলিতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** আপনি এক টাকার ষোল আনা পয়সা করয গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর পয়সার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে এবং টাকায় পনর আনার পয়সা পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় আপনার ষোল আনার পয়সা দিতে হইবে না। এক টাকা দিলেই চলিবে। করযদাতা একথা বলার অধিকারী হইবে না যে, আমি এক টাকা নিব না, আপনি যে ষোল আনার পয়সা নিয়াছিলেন সেই ষোলআনার পয়সাই দিতে হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** বাড়ী-ঘরে প্রথা আছে, ঠেকা সময়ে অন্য বাড়ী হইতে রুটি গণিয়া বা ভাত মাপিয়া আনা হয়, তারপর আবার যখন নিজের ঘরে পাকান হয়, তখন রুটি গণিয়া বা ভাত মাপিয়া পাঠাইয়া দেয়, এরূপ মোআমালা দুরুস্ত আছে।

কাফিল বা জামিন হওয়ার বিবরণ

১। **মাসআলা ঃ** কোন বিশ্বস্ত লোক যদি কোন ব্যক্তিকে হাজির করিয়া দেওয়ার জামিন হয়, যাহাতে সে ভাগিয়া থাকিতে না পারে বা কাহারো নিকট কাহারো টাকা পাওনা আছে; কোন বিশ্বস্ত লোক যদি দেনাদারের পক্ষ হইতে তাহার জামিন হয় এবং পাওনাদার ইহা স্বীকার এবং মঞ্জুর করিয়া নেয়, তবে শরীঅতে এরূপ আক্‌দ দুরুস্ত আছে এবং কাফিলের উপর ইহাতে দায়িত্বও বর্তাইবে। (কিন্তু এতটুকু কাজের জন্য কাফিলের মজদুরি চাওয়া এবং মজদুরি খাওয়া শরীঅতে দুরুস্ত নাই। কারণ একজন বিপদগ্রস্তের এতটুকু উপকারের প্রতিদান ছওয়াবস্বরূপ আখেরাতের জন্য তুলিয়া রাখা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।)

যে জামিন হয় তাহাকে জাবিন বা কাফিল বা জামিনদার বলে। যার কাছে টাকা পাওনা থাকে তাহাকে দেনদার বা দেনাদার বলে এবং যার টাকা পাওনা থাকে তাহাকে হক্‌দার, পাওনাদার বা পানাদার বলে। পানাদার জামিন স্বীকার করিয়া নেওয়ার পর টাকার তাগাদা জামিনদারের নিকট

করিতে পারিবে এবং দেনাদার যদি টাকা না দেয়, তবে জামিনদারের দিতে হইবে। অবশ্য যদি দেনাদার পানাদারকে টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় অথবা তাহার নিকট হইতে মাফিনামা এবং মুক্তিপত্র লেখাইয়া লয়, অথবা খোদ পানাদারই যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া জামিনদারকে জামিন হইতে মুক্তি দিয়া দেয়, তবে জামিনদারের দিতে হইবে না বা পানাদার জামিনদারের নিকট তাগাদাও করিতে পারিবে না। কিন্তু যে মজলিসে জামিনের কথাবার্তা এবং আক্‌দ হইয়াছিল সেই মজলিসেই জামিনদারের স্বীকারোক্তি যথেষ্ট হইবে না, পানাদারেরও স্বীকারোক্তির প্রয়োজন। যদি পানাদার স্বীকার এবং মঞ্জুর না করিয়া থাকে বরং বলিয়া দিয়া থাকে যে, আপনার জিম্মাদারী এবং জামানাতদারী (অর্থাৎ, জামিন হওয়াকে) আমি বিশ্বাস করি না, তবে জামিনদার পানাদারের জন্য দায়ী হইবে না।

২। **মাসআলা ঃ** আপনি হয়ত কাহারো পক্ষ হইতে টাকার জামিন হইয়াছিলেন, দেনাদার বেচারার কাছে টাকা ছিল না, সে জন্য আপনি নিজেই নিজের পকেট হইতে পানাদারের পাওনা টাকা দিয়াছেন, এখন আপনি এই টাকা দেনাদারের নিকট হইতে পাইবার অধিকারী কি না, সে সম্পর্কে শরীঅতের বিধান এই যে, যদি ঐ দেনাদারের অনুরোধ এবং তার কথায় আপনি জামিন হইয়া টাকা দিয়া থাকেন, তবে তার কাছ থেকে আপনি টাকা নিতে পারিবেন, নেওয়ার অধিকারী আপনি হইবেন। আর যদি এমন হয় যে, দেনাদারের কথায় নহে বরং নিজ খুশীতে আপনি জামিন হইয়াছেন, তবে দেখিতে হইবে যে, আপনার জামিন কে আগে স্বীকার করিয়াছে—দেনাদার আগে স্বীকার করিয়াছে না পাওয়নাদার আগে স্বীকার করিয়াছে? যদি দেনাদার আগে স্বীকার করিয়া থাকে, তবে ইহাই ধরিয়া লওয়া হইবে যে, তার কথায়ই আপনি তার জামিন হইয়াছেন এবং এই অবস্থায় তার কাছে থেকে আপনার টাকা নেওয়ার অধিকারী হইবেন আর যদি পানাদার আগে মঞ্জুর করিয়া থাকে, (দেনাদার কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে বা পরে স্বীকার উক্তি দিয়া থাকে,) তবে এইরূপ ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, আপনি মেহেরবানী করিয়া তার দেনাটা শোধ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য যদি সে নিজে ইচ্ছা করিয়া ঐ টাকা দিয়া দেয়, তবে স্বতন্ত্র কথা।

৩। **মাসআলা ঃ** পানাদার যদি দেনাদারকে কিছু দিনের, যেমন পনর দিন, এক মাস, ছয় মাসের মোহ্‌লত দেয়, তবে সে জামিনদারকেও ঐ সময়ের মধ্যে তাগাদা করিতে পারিবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** জামিনদারের নিকট দেনাদারের কোন জিনিস ছিল বলিয়া সে দেনাদারের জামিন হইয়াছিল এবং একথা পাওয়নাদারও জানিয়াছিল। এখন যদি ঐ জিনিস চুরি হইয়া গিয়া থাকে বা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে পাওয়নাদার আর জামিনদারের নিকট তাগাদা করিতে পারিবে না বা জামিনদার দায়ী থাকিবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** আপনি একখানা টেক্‌সি বা একখানা রিক্‌শা কেরায়া করিলেন; অন্য এক-জনে জামিন হইল যে, সে টেক্‌সি বা রিক্‌শার ব্যবস্থা না করিলে আমি আমার রিক্‌শা বা টেক্‌সি আপনাকে দিব। এইরূপ জিম্মাদারী করা জায়েয আছে; জিম্মাদারী তাহার পুরা করিতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** একজন আপনার উকিল হইয়া আপনার জিনিস বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু ক্রেতার পক্ষে জামিন হইয়া মূল্য আনে নাই, এরূপ করা তাহার পক্ষে দুরুস্ত হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** একজন বলিল যে,—আপনার মুরগী খাঁচার মধ্যে বন্ধ থাকিতে দেন। যদি বিড়ালে খাইয়া ফেলে, তবে আমি দায়ী আছি; বা এইরূপ বলিল যে, আপনার বকরী এখানে থাকিতে দেন, শিয়ালে মারিলে আমি দায়ী হইব,— এরূপ দায়িত্ব দেওয়া কখনো ঠিক নহে।

৮। মাসআলাঃ না-বালেগ ছেলে বা মেয়ে যদি কাহারও জামিন হয়, তবে ঐ জিম্মাদারী ছহীহ্‌ হইবে না।

একের করয অন্যের উপর বরাত দেওয়া

১। মাসআলাঃ আপনি হয়ত রাশেদের টাকার দেনাদার আছেন আবার আপনার হয়ত হামেদের কাছে টাকা পাওনা আছে। যখন রাশেদ আপনার নিকট টাকার তাগাদা করিল, তখন আপনি বলিলেনঃ ভাই রাশেদ, আমার হামেদের নিকট টাকা পাওনা আছে, আপনি মেহেরবানী করিয়া আমার নিকট তাগাদা না করিয়া হামেদের নিকট হইতে তাগাদা করিয়া টাকা নিয়া নেন। যদি রাশেদ এই প্রস্তাব ঐ মজলিসেই স্বীকার করিয়া মঞ্জুর করিয়া নেয় যে, আচ্ছা, আমি হামেদের নিকট হইতেই টাকা নিয়া নিব এবং হামেদও টাকা রাশেদকে দিতে স্বীকার করে, তবে আপনি আর রাশেদের দেনাদার থাকিবেন না। রাশেদ আর টাকার তাগাদা আপনার নিকট করিতে পারে না। রাশেদ হামেদের নিকট টাকার তাগাদা করিতে পারিবে এবং আপনি যত টাকা রাশেদের বাবৎ কাটাইয়া দিয়াছেন হামেদের নিকট তত পরিমাণ টাকার আর তাগাদা করিতে পারিবেন না। অবশ্য হামেদের নিকট যদি অরো বেশী পরিমাণ টাকা আপনার পাওনা থাকিয়া থাকে, তবে বেশী পরিমাণের তাগাদা আপনি হামেদের নিকট করিতে পারিবেন। রাশেদকে যত টাকার বরাত দেওয়া হইয়াছিল হামেদ যদি তত টাকা দিয়া দেয়, তবে ত ভালই। নতুবা যদি সে টাকা না দিয়া মরিয়া যায়, তবে তার যা কিছু ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকিবে তাহা বিক্রয় করিয়া রাশেদকে টাকা দেওয়া হইবে। যদি ত্যাজ্য সম্পত্তি কিছু না থাকে বা জীবিত থাকা অবস্থায়ই হামেদ কছম খাইয়া আপনার করয অস্বীকার করিয়া থাকে এবং আপনিও সাক্ষী-প্রমাণ পেশ না করিতে পারিয়া থাকেন, তবে রাশেদের দেনা হইতে আপনি মুক্তি পাইবেন না। রাশেদের টাকা আপনার দিতে হইবে। আর যদি রাশেদ হামেদের নিকট হইতে টাকা তাগাদা করিয়া নিতে স্বীকার না করে বা হামেদও রাশেদকে দিতে স্বীকার না করে, তবে আপনি রাশেদের দেনা হইতে মুক্তি পাইবেন না, আপনারই রাশেদের টাকা দিতে হইবে। (হামেদ যদি আপনার দেনাদার থাকিয়া থাকে, তবে সে টাকা আপনি তাহার নিকট হইতে তাগাদা করিয়া আদায় করিয়া নিবেন।)

২। মাসআলাঃ হামেদ যদি আপনার দেনাদার নাও থাকে, আর রাশেদের কাছে আপনি যে দেনা আছেন সেই দেনা হামেদ এখনও গছিয়া লয় এবং রাশেদও তার কাছ থেকে নিতে রাযী হয়, তবুও উপরে যেরূপ মাসআলা বয়ান করা হইয়াছে তদ্রূপ করিতে হইবে। হামেদ রাশেদের টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার আগে নয়, পরে আপনার থেকে সেই টাকা নিবার অধিকারী হইবে।

৩। মাসআলাঃ আপনার কিছু টাকা বা অন্য মাল হামেদের নিকট হয়ত আমানত রাখা ছিল সেজন্য হামেদ আপনার নিকট রাশেদের পাওনা টাকার বরাত গ্রহণ করিয়াছিল। এখন আপনার সে মাল হয়ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা হামেদের বাড়ী চুরি হইয়া আপনার আমানতের টাকাও সেই সংগে চুরি হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থা হইলে রাশেদ আর হামেদের নিকট তাগাদা করিবে না, আপনার নিকট হইতে তাগাদা করিয়া তার টাকা আদায় করিয়া নিবে। এখন আর হামেদের নিকট তাগাদা করার অধিকার রাশেদের নাই।

৪। **মাসআলা ঃ** হামেদের উপর বরাত দেওয়া সত্ত্বেও যদি আপনি নিজেই রাশেদের টাকা দিয়া দেন তাও আপনি দিতে পারিবেন এবং রাশেদও নিতে পারিবে, ইহাতে দোষ নাই। রাশেদ বলিতে পারিবে না যে, আপনার নিকট হইতে নিব না, হামেদের নিকট হইতেই নিব।

কাহাকেও উকিল বানাইবার বিবরণ

১। **মাসআলা ঃ** মানুষ যে কাজ নিজে করিবার অধিকারী সে কাজ অন্যের দ্বারা করাইবারও সে অধিকারী। ইহাকেই শরীঅতের ভাষায় উকিল বানান বলে। কোন জিনিস ক্রয় করা, বিক্রয় করা, কেরায়া দেওয়া, বিবাহ করা ইত্যাদি। চাকরের দ্বারা সদায়-পাতি ক্রয় করান (বা হাল চাষ করান) ইহাকেও উকিল, বানান বলা হয়। (কর্মচারীর দ্বারা কাজ করান বা দোকান চালনাও উকিল বানানের অন্তর্ভুক্ত হইবে। উকিলের হাতে যে পয়সা দেওয়া হয় বা যে মাল তার হাতে দেওয়া হয় বা যে মাল তার হাতে আসে, সে পয়সা এবং সে মাল প্রকৃত প্রস্তাবে মালিকের থাকে, উকিলের হাতে আমানত থাকে মাত্র। আমানতের মধ্যে আদৌ কোনরূপ খেয়ানত করা শক্ত হারাম। অবশ্য উকিলকে মেহনতানা যাহা কিছু দেওয়া হইবে, সেটার মালিক সে হইবে। উকিলের কাজ করিয়া মেহনতানা চুকাইয়া নেওয়া শরীঅতে জায়েয আছে।)

২। **মাসআলা ঃ** আপনার কর্মচারী কোন জিনিস বাকী খরিদ করিয়া আনিলে বিক্রেতা সেই টাকার তাগাদা আইনতঃ সেই কর্মচারীর নিকট দাবী করিবার অধিকারী, আপনার নিকট নয়। (অবশ্য আপনি যদি দিয়া দেন, সে স্বতন্ত্র কথা।) এইরূপে আপনার কর্মচারী যদি কোন মাল বিক্রয় করে তবে ক্রেতার নিকট তাগাদা করিবার অধিকারী আপনি নহেন বরং আপনার কর্মচারীর। (আপনার অধিকার আছে আপনার কর্মচারীর নিকট তাগাদা করার।) অবশ্য ক্রেতা নিজে ইচ্ছা করিয়া যদি আপনার নিকট দিয়া দেয়, তবে সে টাকা অপনি নিয়া নিতে পারেন। কিন্তু ক্রেতাকে আপনি জবরদস্তি করিতে পারিবেন না।

৩। **মাসআলা ঃ** কাহারও দ্বারা আপনি মাল কিনাইয়াছেন, যে মাল কিনিয়া আনিয়াছে, যাবৎ আপনি টাকা তাকে না দিবেন, তাবৎ সে মাল আটকাইয়া রাখিবার ন্যায়তঃ অধিকারী; চাই সে মাল নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়া আনিয়া থাকুক বা না দিয়া থাকুক দোনো ছুরতে সে আপনার থেকে টাকা না পাইলে মাল আটাইয়া রাখিবার এবং আপনার থেকে টাকা তাগাদা করিবার অধিকারী। অবশ্য যদি সে দশ দিনের সময় নিয়া আসিয়া থাকে, তবে সেই সময় পার হইবার পূর্বে আপনার নিকট টাকা পাইবার বা তাগাদা করিবার অধিকারী নয়।

৪। **মাসআলা ঃ** আপনি কাহাকেও এক সের গোশ্‌ত আনিতে বলিয়া দিলেন; কিন্তু সে আনিয়াছে দেড় সের। এখন আপনি দেড় সের নিতে আইনত বাধ্য নহেন, এক সের নিতে বাধ্য। বাকী আধ সের তার জিম্মায়। (অবশ্য আপনি যদি ভদ্রতার খাতিরে নিয়া নেন, সে ভিন্ন কথা।)

৫। **মাসআলা ঃ** আপনি কাহাকেও নির্দিষ্ট একটি মাল নির্দিষ্ট একটি মূল্যে ক্রয় করিতে পাঠাইলেন। এখন সেই মাল তার নিজের জন্য ক্রয় করার অধিকার তার নাই। অবশ্য আপনি যদি মূল্য সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া থাকেন যে, এত মূল্যে হইলে আমি রাযী, নতুবা রাযী নহি। এমতাবস্থায় বিক্রেতা যদি সেই নির্দিষ্ট মূল্যে না দেয় এবং আপনার পাঠান লোক যদি বেশী মূল্য দিয়া নিজের জন্য কিনে, তবে সে কিনিতে পারিবে। কিন্তু আপনি যদি বেশী মূল্য সীমাবদ্ধ না

করিয়া দিয়া থাকেন, তবে কিছুতেই সে নিজের জন্য কিনিতে পারিবে না; কিনিলে সে মাল আইনত আপনার হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** তুমি নির্দিষ্ট বকরী খরিদ করিতে বল নাই। শুধু বলিয়াছ যে, একটি বকরীর দরকার, আমাকে কিনিয়া দাও। তখন সে যে বকরী ইচ্ছা নিজের জন্য খরিদ করিতে পারে বা তোমার জন্য খরিদ করিতে পারে। নিজের নিয়তে ক্রয় করিলে নিজের হইবে। আবার যদি তোমার নিয়তে ক্রয় করে, তোমার হইবে। আর যদি তোমার দেওয়া টাকা দিয়া ক্রয় করে, তবে তোমারই হইবে—যে নিয়তেই ক্রয় করুক না কেন।

৭। **মাসআলা ঃ** আপনি একজনকে একটি বকরী কিনিতে পাঠাইয়াছিলেন। সে আপনার জন্য বকরী কিনিয়াছে, কিন্তু এখনো আপনার নিকট পৌঁছাইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে বকরীটা চুরি হইয়া গেল অথবা মরিয়া গেল। এমতাবস্থায় বকরীর দাম আপনারই দিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে আপনি যদি দাবী করেন যে ঐ বকরী সে আপনার জন্য কিনিয়াছিল না, তবে দেখিতে হইবে যে, যদি আপনি তাকে টাকা দিয়া পাঠাইয়া থাকেন, তবে ত আপনারই টাকা যাইবে, তাতে কোন দ্বিমত নাই। যদি এমন হয় যে, টাকা আপনি দেন নাই, কিন্তু কিনিতে বলিয়াছিলেন। সে বলিতেছে, আপনার জন্য কিনিয়াছে আর আপনি বলিতেছেন, সে নিজের জন্য কিনিয়াছে। এমতাবস্থায় আপনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন বা প্রমাণসূত্রে কসম খাইতে পারেন যে, সে নিজের জন্য কিনিয়াছে, তবে ত টাকা তার যাইবে। আর যদি আপনি কসম খাইতে না পারেন, তবে তাহার কথাই আপনার বিশ্বাস করতে হইবে, তাহা ছাড়া উপায় নাই। মিথ্যা কসম করা গোনাহ্‌ কবীরাহ্‌।

৮। **মাসআলা ঃ** আপনি যাকে মাল কিনিতে উকিল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, সে মাল কিনিয়াছে কিন্তু দাম বেশী দিয়া আনিয়াছে, যদি অল্প কিছু বেশী হয়, তবে ত মাল আপনার নিতে হইবে। আর যদি অনেক বেশী হয়—এত বেশী যে, বাজারে কেহই অত দাম লাগাইবে না—তবে অত বেশী দাম দিয়া মাল নিতে আপনি বাধ্য নহেন। আপনি না নিলে তাহাকেই নিতে হইবে। (যদি ভদ্রতার খাতিরে নিয়া নেন, সে ত ভিন্ন কথা। এজন্য আগেই বিশ্বস্ত এবং যোগ্য দেখিয়া লোক নিযুক্ত করা উচিত। তাহা হইলে আর এইরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব হয় না।)

৯। **মাসআলা ঃ** একজনকে আপনি উকিল বানাইলেন আপনার একটি জিনিস বিক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য। এখন ঐ উকিল নিজে ঐ মাল কিনিতে পারিবে না। যদি তার নিবার ইচ্ছা হয়, তবে সোজা আপনাকে বলিতে হইবে যে, আপনার ঐ জিনিসটা আমিই কিনিতে চাই। এইরূপে যদি কাউকে কোন জিনিস কেনার জন্য উকিল বানাইয়া থাকেন, তবে সে নিজের জিনিস আপনাকে আনিয়া দিতে পারিবে না; যদি নিজের জিনিস আপনাকে তার দেওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে তার সোজা আপনাকে বলিতে হইবে যে, অমি উকিল হইব না, আমি বিক্রেতা হইতে চাই, যদি আপনি আমার মাল নেন, তবে কত দিবেন বলেন। (উকিল যদি গোপনে নিজের মাল আনিয়া দেয়, তবে খেয়ানতের গোনাহ্‌ হইবে।)

১০। **মাসআলা ঃ** আপনি কাহাকেও উকিল বানাইয়াছেন বকরীর গোশ্‌ত আনিবার জন্য, কিন্তু সে নিয়া আসিল গরুর গোশ্‌ত। এমতাবস্থায় আপনি গোশ্‌ত নিতে আইনতঃ বাধ্য নহেন। আপনি আলু আনিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সে ঢেঁড়স বা অন্য কিছু আনিয়াছে, তবে আপনি উহা লইতে বাধ্য নন। আপনি অস্বীকার করিলে তাহারই নিতে হইবে।

১১। মাসআলাঃ এইরূপে আপনি যেখানে এক টাকার মাল আনিতে বলিয়াছেন, সেখানে যদি সে দুই টাকার মাল আনিয়া থাকে, তবে দুই টাকার মাল নিতে আপনি আইনতঃ বাধ্য নহেন, এক টাকার মাল নিতে বাধ্য। (অর্থাৎ, উকিল যদি মোয়াক্কেলের কথার খেলাফ করে, সে খেলাফের জন্য মোয়াক্কেল দায়ী নহে, তার জন্য দায়ী হইবে উকিল। কিন্তু এই খেলাফ যদি মোয়াক্কেলের লাভের দিকে হয়, তবে সেইরূপ খেলাফ করিলে তাহা বেআইনী হইবে না। যেমন, হয়ত আপনি বলিয়াছেন বকরীটা ১০ টাকায় বিক্রয় করিতে পার। এখন সে যদি ১০ টাকার স্থলে ১২ টাকায় বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে তাহা আইনতঃ দূষণীয় হইবে না।)

(মনে করুন, আপনি একজনকে উকিল বানাইলেন আপনার একটি মোকদ্দমা চালাইবার জন্য। এক্ষেত্রে আপনিও একথা বলিতে পারিবেন না যে, আমাকে মোকদ্দমায় জিতাইয়া দিতে হইবে এবং উকিলও একথা বলিতে পারিবেন না যে, আমি নিশ্চয়ই মোকদ্দমায় জিতাইয়া দিব। অবশ্য জিতাইবার জন্যই প্রত্যেকের চেষ্টা হইবে একথা সুনিশ্চিত হারিবার জন্য ত আর কেহ মোকদ্দমা করে না। কিন্তু এইরূপ শর্ত করা বা শর্ত লাগান অথবা মোকদ্দমা জিতাইবার বা জিতাইবার জন্য মিথ্যা সাক্ষী বানান বা ঘুষের আশ্রয় গ্রহণ করা হারাম, গোনাহ্ কবীরাহ্। অবশ্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার দ্বারা, মস্তিষ্কের প্রখরতার দ্বারা ও বিদ্যার গভীরতার দ্বারা সত্যের সীমা লঙ্ঘন না করিয়াও অনেক সময় অনেক সূক্ষ্ম পয়েন্ট এমন বাহির করা, যাহা দ্বারা উকিলের কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়, মিথ্যা সাক্ষীও লাগে না। ফলকথা এই যে, সত্যের সীমা, ন্যায়ের সীমা ধর্মের সীমা লঙ্ঘন না করিলে, ওকালতি ব্যবসার দ্বারা পয়সা উপার্জন করা জায়েয আছে। বিনা পয়সায় নিঃসহায়ের সহায়তা করিয়া দিলেও তাহাতে ছওয়াব আছে।) —অনুবাদক

১২। মাসআলাঃ কোন কাজের জন্য দুইজনকে একত্রে উকিল বানাইলে দোনোজনের পরামর্শে দোনোজনের একযোগে সে কাজ হওয়া দরকার। অন্যথায় একজন যদি অন্যজন ছাড়া সে কাজ করে, তবে তাহা আপনার উপর লাযেম হইবে না, আপনার অনুমতি সাপেক্ষ হইবে।

১৩। মাসআলাঃ আপনি একজনকে একটা জিনিস কেনার জন্য উকিল বানাইয়াছেন। তিনি নিজে না কিনিয়া অন্যের দ্বারা কিনাইলেন। এই জিনিস এখন আপনার নেওয়া লাযেম নহে। নেওয়া না নেওয়া আপনার ইচ্ছা। আর সে নিজে কিনিলে আপনার উপর লাযেম হইবে। সেটা অবশ্যই নিতে হইবে।

উকিলকে বরখাস্ত করিয়া দেওয়ার বর্ণনা

১। মাসআলাঃ উকিলকে বরখাস্ত করিয়া দেওয়ার অধিকার এবং এখতিয়ার মোয়াক্কেলের (যে উকিল নিয়োগ করে, তাহার) সব সময় আছে, (কিন্তু অন্য কাহারো হক্ নষ্ট না হয়, সে দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং উকিলের অবগত হওয়া চাই যে, মোয়াক্কেল তাহাকে বরখাস্ত করিল। নিজের মনে মনে বরখাস্ত করিয়া অন্যের হক নষ্ট করা চলিবে না।) যেমন, ধরুন, আপনি কাহাকেও বলিয়াছেন, একটি বকরী কিনিয়া আনিতে। এখন আপনার তাকে মানা করার অধিকার সব সময় আছে এবং আপনার মানা করার পর যদি সে বকরী কিনে, তবে সে বকরীর টাকার জন্য আপনি দায়ী হইবেন না।

২। মাসআলাঃ উকিলকে বরখাস্ত করিবার খবর হয় তাকে আপনি নিজে গিয়া সাক্ষাতে বলিবেন বা তাকে ডাকাইয়া আনিয়া সাক্ষাতে বলিবেন বা আপনার লোক (কাছেদ) মারফৎ তাকে

খবর পৌঁছাইয়া দিবেন বা পত্রের দ্বারা তাকে খবর দিয়া দিবেন। কিন্তু খবর পৌঁছার আগ পর্যন্ত উকিল যে কাজ করিবে, তাহা আপনার দায়িত্বে পড়িবে। আর যদি আপনি নিজে সাক্ষাতেও না বলিয়া থাকেন বা খবর না পাঠাইয়া থাকেন কিন্তু এমনিই জানিয়া থাকে বা কেউ তাহাকে বলিয়া থাকে, তবে যদি দুইজন সাক্ষীর মারফৎ জানিয়া থাকে, তবে ত সে বরখাস্ত হইয়া যাইবে। (এর পর যদি সে জিনিস কিনিয়া থাকে সেটার দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে পড়িবে না।) কিন্তু যদি বিশ্বস্ত উপায়ে খবর না পাইয়া সে জিনিস কিনিয়া থাকে, তবে সেটার দায়িত্ব আপনার উপর পড়িবে।

মোযারাবাত অর্থাৎ বেপার করিতে টাকা দেওয়ার বিবরণ

১। মাসআলাঃ আপনার কাছে কিছু টাকা আছে। কিন্তু আপনি হয়ত কাজ জানেন না বা পরিশ্রম করিতে পারেন না। আর একজন হয়ত এমন আছে যে, সে কাজ জানে, পরিশ্রম করিতে পারে কিন্তু তার পুঁজি নাই এবং সেইজন্য সে কারবার করিতে পারিতেছে না; এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এই ব্যবস্থা রাখিয়াছেন যে, যদি আপনি কাউকে এই বলিয়া টাকা দেন যে, মিঞা, এই টাকা নিয়া কারবার কর। আল্লাহ্ যদি কিছু মুনাফা দেয়, আমরা ভাগ করিয়া নিব, টাকার অংশ হইবে, শ্রমের অংশও হইবে। এইরূপ কারবারকে শরীঅতের ভাষায় মোযারাবাত বলে। এইরূপ কারবার শরীঅতে জায়েয আছে। তবে জায়েয হওয়ার জন্য কতকগুলি শর্ত আছে। শর্তের মোতাবেক হইলে জায়েয হইবে, আর শর্তের খেলাফ হইলে নাজায়েয ও হারাম হইবে। (১) প্রথম শর্ত এই যে, যত টাকা মহাজন বেপারীকে বেপার করার জন্য দিবে, তাহা কারবারের কথার সময় বলিয়া দিতে হইবে এবং সে টাকাটা বেপারীর হাতে দিয়া দিতে হইবে। নিজের হাতে টাকা রাখিলে কারবার হইল না। (২) দ্বিতীয় শর্ত এই যে, মুনাফার মধ্যে কত অংশ কাহার হইবে তাহাও ঐ সময় উভয়ের সামনেই উভয়ের রেযামন্দিতেই ঠিক করিয়া পরিষ্কার করিয়া নিতে হইবে। যদি অপরিষ্কার বা গোলমেলে থাকে বা এইরূপ বলা হয় যে, লাভ হইলে দেখা যাইবে, আপনার আমার মধ্যে কি কোন গোলমাল হইবে?—যে লাভ আল্লাহ্ দিবেন তাহা উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া ভাগ করিয়া নিব, ইহাতে কারবার ফাসেদ হইয়া যাইবে। (৩) তৃতীয় শর্ত এই যে, মুনাফার ভাগ অংশ হিসাবে হওয়া চাই, নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা হিসাবে হইলে মোয়ামালা ফাসেদ হইয়া যাইবে। এরূপ বলা যাইবে না যে, যাহা লাভ হইবে তার থেকে ১০ টাকা আমার, বাকীটা তোমার বা ১০ টাকা তোমার এবং বাকী যাহা থাকে তাহা আমার। এইরূপ বলিলে মোয়ামালা ফাসেদ হইয়া যাইবে—কারবার নষ্ট হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা এতটুকু স্বাধীনতা দান করিয়াছেন যে, নিজেরা ইচ্ছা করিয়া উভয়ে রাযী খুশী হইয়া যত অংশ যার জন্য ঠিক করিবে উভয়ে রাযী হইয়া ঠিক করার পর তাহাই শরীঅতের হুকুমে পরিণত হইয়া যাইবে, তার খেলাফ করা যাইতে পারিবে না। (যেমন, হয়ত উভয়ে মিলিয়া টাকার অংশ ঠিক করিল যে, ঘর-ভাড়া, নৌকা-ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন এসব বাদে শ্রমের অংশ থাকিবে টাকায় চারি আনা এবং টাকার অংশ থাকিবে টাকায় বার আনা অথবা ঐ সকল বাদে ছয় আনা বা দশ আনা বা আট আনা অংশ ঠিক করা হইল। এরূপ হইলে মোয়ামালা ঠিক হইবে।) মোটের উপর কথা এই যে উভয়ে রাযী হইয়া যত অংশ ঠিক করিবে সেইটাই ঠিক হইবে। (এই মোয়ামালায় যখন তখন সাক্ষী সাবুত রাখিয়া লেখাপড়া করিয়া লওয়া ভাল, যাহাতে পরে গোলমাল হইয়া বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্ব বা আত্মীয়তা নষ্ট হইতে না পারে। কারবার শুরু করিয়া যে পর্যন্ত হিসাব বুঝাইয়া দিয়া কারবার ক্ষান্ত না করিবে,

সে পর্যন্ত যদি কোন বারে (ক্ষেত্রে) লাভ, কোন বারে লোকসান হয়, তবে লোকসান লাভের উপর থেকে কাটা যাইবে; বেপারীর উপর ফেলান হইবে না বা মহাজনের উপরও ফেলান হইবে না। অবশ্য হিসাব চুকাইয়া কারবার বন্ধ করার সময় যদি দেখা যায় যে, মোটের উপর লাভ দাঁড়াইয়াছে, তবে লাভের টাকাকে পূর্বের ঠিক করা হার অনুসারে ভাগ করিয়া নিবে,) আর যদি দেখা যায় যে, মোট হিসাবে লাভও হয় নাই এবং লোকসানও হয় নাই; সমান সামান রহিয়াছে, তবে মহাজন আপন আসল টাকা লইয়া যাইবে এবং বেপারীর শ্রম বৃথা যাইবে। সে তার শ্রমের পরিবর্তে মহাজনের নিকট কিছু দাবী করিতে পারিবে না; আর যদি দেখা যায় যে, লাভ ত হয়ই নাই বরং উল্‌টা লোকসান গিয়াছে, তবে এই লোকসান বেপারীর উপর ফেলান যাইবে না। এ লোকসান মহাজনের যাইবে। বেপারীর ত বহু পরিশ্রম বিনা লাভে গেল। যদি এইরূপ শর্ত করে যে, আসল টাকায় লোকসান গেলে সে টাকার অংশ হারাহারি মতে বেপারীর দিতে হইবে বা যদি এইরূপ শর্ত করে যে, বেপারীর শ্রম বৃথা গেলে (যদি কারবারে লাভ না হয় বা লোকসান যায়) তবে শ্রমের মজুরি মহাজনের দিতে হইবে, এই দোনো রকম শর্ত করা ফাসেদ এবং না-জায়েয।

২। **মাসআলা ঃ** মহাজনের অধিকার আছে যে, যে কোন সময় বেপারীকে বরখাস্ত করিতে পারবে। কিন্তু বরখাস্তের খবর বেপারীর নিকট পৌঁছা চাই। খবর পৌঁছার আগে যদি মাল কিনিয়া থাকে, তবে সেই মাল বিক্রয় না করা পর্যন্ত বেপারী বরখাস্ত হইবে না।

৩-৪। **মাসআলা ঃ** মোযারাবাতের মধ্যে যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, মহাজন নিজে বা তাঁহার পক্ষ হইতে কোন লোক মোযারাবাতের কারবারের মধ্যে থাকিবে, তবে ইহা মোযারাবাত থাকিবে না। কেননা, এক্ষেত্রে যদি মহাজন (বা তাহার পক্ষের লোক) আসল কারবারী হয়, তবে বেপারী হইবে তাহার অধীনস্থ কর্মচারী, অথচ অধীনস্থ কর্মচারী কেমন করিয়া টাকার দায়িত্ব নিতে পারে? আর যদি বেপারী হয় আসল কারবারী, তবে তাহার মহাজন (বা মহাজনের পক্ষের লোক) হইবে তাহার অধীস্থ কর্মচারী—ইহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে? কাজেই এই দোনো ছুরতে গোলমাল হইবার আশংকা আছে বলিয়া এইরূপ শর্ত করিলে মোয়ামালা ফাসেদ হইয়া যাইবে। এইরূপে যদি শর্ত করা হয় যে, লাভের মোটের উপর থেকে ১০০ একশত টাকা মহাজনকে দিয়া—তারপর যা থাকিবে তাহা স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী ভাগ হইবে, তবে ইহাতেও মোয়ামালা ফাসেদ হইয়া যাইবে; আর মোয়ামালা ফাসেদ হইলে লাভ হউক বা লোকসান হউক বেপারী তার যোগ্য বেতন পাইবার অধিকারী হইবে। লোকসান হইলে তার শ্রম বৃথা যাইতে পারিবে না। অবশ্য যখন লাভ হইবে, তখন বেতন যদি লাভের অংশের চেয়ে বেশী হয়, তবে সে বেশী পাইবার অধিকারী হইবে না; লাভের অংশে যাহা পড়ে তাহাই পাইবে। মোয়ামালা ফাসেদ হইলে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। আর মোয়ামালা ছহীহ্ ভাবে হইলে যা কিছু লাভ হয়, তাহা স্থিরকৃত অংশ অনুযায়ী ভাগ হইবে। লোকসানের অংশ বেপারীর ঘাড়ে ফেলান হইবে না। (প্রকাশ থাকে যে, মোযারাবাত এমন একটি সুন্দর তরীকা যাহাকে এক প্রকার বিনা সুদের ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে। ইহার দ্বারা ইমাম আবু হানীফা [রহঃ] কোটি টাকার তেজারত এবং ছানাআত করিয়া লাভবান হইয়াছেন এবং তৎকালে জনসাধারণ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছে। হুকুমত এখনো যদি শরীঅত পালনের দিকে, ইসলামী আদর্শের উন্নতির দিকে একটু দৃষ্টি দেয়, তবে মোযারাবাতের এই নিয়ম চালু করিয়া পুঁজিপতি এবং শ্রমিকদের ঝগড়া খতম করিয়া দিতে পারে। সুদের অভিশাপ হইতে

দেশবাসীকে মুক্তি দিতে পারে এবং সমস্ত গরীব জনসাধারণ মিলের এবং ব্যাঙ্কের অংশীদার হইয়া শ্রম এবং পুঁজি উভয়েরই মর্যাদা দান করিতে পারে এবং শরীঅত পালন করিয়া সুখে শান্তিতে দুনিয়ার উন্নতি করিয়া আখেরাতের মুক্তি এবং চিরশান্তি লাভ করিতে পারে।)

আমানত রাখার বিবরণ

[আমানত ঈমানের মূল। হাদীস শরীফে আছেঃ যার আমানতদারী নাই তাহার ঈমান নাই।

আমানত প্রধানতঃ তিন প্রকারঃ (১) টাকা-পয়সা মাল-মালিয়াতের আমানত, (২) কথার আমানত। যেমন, আপনি একজনকে একটি কথা দিলেন অর্থাৎ ওয়াদা করিলেন যে, আপনি তার খেলাফ করিবেন না বা আপনি একজনকে একটি কথা বলিয়া বলিলেন যে, 'ইহা অন্য কাহাকেও বলিবেন না।' (৩) কাজের আমানত যেমন কর্মচারীকে কাজ দেওয়া হইল সে কাজে ত্রুটি করা চাই না। এই তিন প্রকারেরই আমানতের মধ্যে খেয়ানত করা গোনাহ্‌ কবীরাহ্‌। এখানে টাকা-পয়সা, মাল-মালিয়াতের আমানত সম্বন্ধে কয়েকটি মাসআলা লেখা হইবে। যাহার কাছে আমানতের মাল রাখা হইবে, তাহাকে বলা হয় আমানতদার। যাহার মাল আমানত রাখা হয়, তাহাকে বলে আমানতকারী। —অনুবাদক]

১। মাসআলাঃ আপনার নিকট একজনে একটা মাল আমানত রাখিল, আপনিও সেটা গ্রহণ করিয়া নিলেন। ঐ মালের পূর্ণ হেফাযত করা আপনার উপর ওয়াজিব, যদি আপনি হেফাযতে ত্রুটি করেন আর মালটা নষ্ট হইয়া যায়, তবে আপনার ক্ষতিপূরণ (বা ভর্তুকি) দিতে হইবে। অবশ্য যদি নিজের মালের মত পূর্ণ হেফাযত করা সত্ত্বেও মাল চুরি হইয়া যায় বা ঘরে আগুন লাগিয়া মাল জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তবে আমানতকারী ভর্তুক পাইবার অধিকারী থাকে না। এমনকি আমানতদার যদি আমানত রাখিবার সময় স্বীকারও করিয়া নিয়া থাকে যে, মাল নষ্ট হইলে তার জিম্মাদার আমি। কিন্তু পরে পূর্ণ হেফাযত করা সত্ত্বেও বাড়ী চুরি ডাকাতি হইয়া মাল নষ্ট হইয়া গেল বা আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেল। এমতাবস্থায় আইনতঃ আমানতকারী ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবে না। কিন্তু আমানতদার যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া নিজের তরফ হইতে আমানতকারীকে উহার ক্ষতিপূরণ দিয়া দেয়, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা; ইহার জন্য সে ছওয়াব পাইবে।

২। মাসআলাঃ একজন আপনাকে বলিল, 'ভাই আমি একটু কাজে যাইতেছি, আমার এই মালটা রাখুন।' আপনি বলিলেন, 'আচ্ছা রাখুন' অথবা কিছুই বলিলেন না, সে আপনার কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে ঐ মালটি আপনার নিকট আমানত হইয়া গেল এবং উহার হেফাযত করাও আপনার উপর ওয়াজিব হইয়া গেল। (এখন উহার হেফাযত না করিলে আপনি গোনাহ্‌গার হইবেন।) অবশ্য কোন কারণ বা ওযরবশতঃ যদি আপনি উহার হেফাযত করিতে অপারগ হন, তবে যখন সে ব্যক্তি বলিয়াছিল যে, ভাই আমার এই মালটা একটু দেখিবেন, তখনই পরিষ্কার ভাষায় আপনার বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল যে, 'না ভাই আমার কিছু ওযর আছে, আমি রাখিতে বা দেখিতে পারিব না, এবং এ কথা এতটুকু উচ্চৈঃস্বরে এবং পরিষ্কারভাবে বলিতে হইবে, যেন সে শোনে। তারপরও যদি সে রাখিয়া যায়, তবে কোন মতেই আপনি দায়ী নহেন। অবশ্য হাত দিয়া উঠাইয়া রাখিলেই আমানতের দায়িত্ব আপনার উপর আসিয়া পড়িবে এবং হেফাযতের জন্য আপনি দায়ী হইবেন।

৩। **মাসআলাঃ** এক জায়গায় কয়েকজন লোক বসা ছিল। আর একজনে তার একটা মাল সকলের জিম্মায় করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া চলিয়া গেল, এখন ঐ মালের হেফাযত সকলের জিম্মায় ওয়াজিব হইয়া পড়িয়াছে। যদি সকলে উঠিয়া চলিয়া যায়, আর ঐ মালটা খোয়া যায়, তবে সকলেই দায়ী এবং পাপী হইবে। আর যদি সকলে এক সঙ্গে না যাইয়া থাকে ; এক একজন করিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইয়া থাকে, তবে সকলের শেষ যে ছিল তার দায়িত্বে ঐ মালটা আসিয়াছে ; তার জিম্মায় ঐ মালের হেফাযত ওয়াজিব হইয়াছে। সেও যদি চলিয়া যায় আর মালটা খোয়া যায়, তবে সে দায়ীও হইবে, পাপীও হইবে।

৪। **মাসআলাঃ** যাহার নিকট যে মাল আমানত থাকিবে, সে মালের হেফাযত সে নিজেই করিবে ; সে নিজেই তার জন্য দায়ী। অবশ্য পরিবারের মধ্যে স্ত্রীর কাছে, মায়ের কাছে, মেয়ের কাছে বা এরূপ অন্য কারুর কাছে—যাদের উপর তার পূর্ণ আস্থা আছে এবং যাদের কাছে সে নিজের টাকা-পয়সা সচরাচর রাখে, তাদের কাছে এই আমানতের মাল রাখিতে পারিবে। কিন্তু পরিবারস্থ যাহাকে সে আমানতদার বলিয়া মনে করে না, তাদের কাছে উহা হেফাযতের জন্য রাখা যাইবে না। পরিবারস্থ যাহাকে সে পূর্ণ বিশ্বাস করে না, এমন লোকের কাছে রাখিলে যদি মাল খোয়া যায়, তবে ভর্তুক দিতে হইবে। মালের হেফাযতের জন্য আমানতদাতার এতদ্ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয় বা বন্ধুর নিকট মালের মালিকের বিনা অনুমতিতে রাখিতে পারিবে না। যদি রাখে আর খোয়া যায় তবে ভর্তুক দিতে হইবে। অবশ্য যদি এমন কোন বন্ধু বা বিশ্বস্ত আত্মীয় থাকে, যার কাছে সে নিজের টাকাও রাখে, তবে তার কাছে (মালিকের অনুমতি না লইয়াই) রাখিতে পারিবে।

৫। **মাসআলাঃ** কেহ আপনার নিকট কোন মাল আমানত রাখিল। আপনি ভুলে মাল ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, ঐ মাল পরে খোয়া গেল। এ মালের জন্য আপনি দায়ী হইবেন এবং ভর্তুক দিতে হইবে। অথবা ঐ মাল বাক্সে, সিন্দুকে বা আলমারিতে রাখিয়া চাবি না দিয়া চলিয়া গেলেন (অথচ তথায় নানা প্রকারের লোকজন উপস্থিত ছিল।) জিনিসটাও এমন যে, সাধারণতঃ তালা বন্ধ না করিলে হেফাযত হয় না। ফলে ঐ আমানতের মাল খোয়া গেলে ভর্তুক দিতে হইবে।

৬। **মাসআলাঃ** আপনার কাছে কাহারো কোন মাল আমানত ছিল, ঘটনাক্রমে আপনার বাড়ীতে আগুন লাগিয়া গেল, এমতাবস্থায় যদি আমানতের মালটা আপনি বাহির করিতে পারিয়া থাকেন, তবে আপনার পড়শীর বাড়ীতে নিয়া ঐ মালটা আমানত রাখিতে পারেন। কিন্তু ওযর চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই আবার সে মাল আপনার ফিরাইয়া আনিয়া হেফাযত করিতে হইবে। এইরূপে হঠাৎ যদি মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে আপনি কাহাকেও না পাইলে, যাহাকে পান তাহার কাছে রাখিয়া যাইতে পারেন।

৭। **মাসআলাঃ** কেহ কোন টাকা-পয়সা আমানত রাখিলে অবিকল সেই টাকা পয়সাই পৃথকভাবে হেফাযত করিয়া রাখা ওয়াজিব। নিজের টাকার সঙ্গে ঐ টাকা মিশান জায়েয নাই এবং ঐ টাকার থেকে খরচ করাও জায়েয নাই। এইরূপ মনে করিবেন না যে, টাকায় টাকায় ত সমান, খরচ করিয়া ফেলি, পরে যখন চাহিবে, তখন দিয়া দিব। যদি এরূপ করিতে হয় তবে মালিকের নিকট হইতে এজাযত লইতে হইবে। তবে যদি অবিকল সেই পয়সা পৃথকভাবে পোটলা বাঁধিয়া পূর্ণ হেফাযতের সহিত রাখিয়া থাকেন এবং তা সত্ত্বেও চুরি হইয়া যায় বা আগুনে

জ্বলিয়া বা নদীতে ডুবিয়া যাইয়া থাকে, তবে আপনার ভর্তুক দিতে হইবে না। আর যদি এজাযত লইয়া খরচ করিয়া থাকেন বা মিশাইয়া থাকেন, তবে ঐ টাকা আপনার জিম্মায় করয হইয়া যাইবে; ঘর পুড়িয়া বা নদীতে ডুবিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও আপনি দায়ী থাকিবেন; তাহার মাল যাইবে না, যাইবে আপনার মাল। আপনি এমনকি খরচ করার পর যদি পৃথক করিয়া তাহার জন্য টাকা রাখিয়াও থাকেন, তবুও দায়ী থাকিবেন। মালিকের হাতে না পৌঁছান পর্যন্ত আপনিই জিম্মাদার থাকিবেন।

৮। মাসআলা ঃ আপনার নিকট কেহ একশত টাকা আমানত রাখিয়াছে। আপনি মালিকের অনুমতিতে তার মধ্য হইতে ৫০ টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন আর বাকী ৫০ টাকা যেমন ছিল তেমনই পৃথকভাবে হেফাযতে আছে। তারপর আপনার হাতে টাকা আসিয়াছে। (এখন ৫০ টাকা পূর্ণ করিয়া রাখিতে চাহেন) তবে এই ৫০ টাকা আগের ৫০ টাকার সঙ্গে মিশাইবেন না। কারণ, এই ৫০ টাকা করযের এবং আগের ৫০ টাকা আমানতের। যদি মিশাইয়া ফেলেন, তবে সব টাকা করযের হইয়া যাইবে এবং আপনি সব টাকার করযের জিম্মাদার হইবেন।

৯। মাসআলা ঃ আপনি আমানতকারীর এজাযত লইয়া তার ১০০ টাকা আপনার ১০০ টাকার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। এখন ঐ মোট ২০০ টাকা আপনারা দুইজনে সমান সমান শরীকী ভাগে মালিক হইয়াছেন। যদি চুরি হইয়া যায়, তবে দুই জনেরই যাইবে, আর যদি অর্ধেক চুরি হয়, তবে সেই অর্ধেকের অর্ধেক যাইবে তার এবং অর্ধেক যাইবে আপনার। আর যদি তার হয় ১০০ টাকা এবং আপনার হয় ২০০ টাকা, তবে তার যাইবে তিন ভাগের একভাগ এবং আপনার যাইবে তিন ভাগের দুই ভাগ। এজাযত লইয়া মিশাইলে মাসআলা এরূপ হইবে। আর বিনা এজাযতে মিশাইলে কি হইবে সে মাসআলা উপরে বলা হইয়াছে। আমানতের টাকা বিনা অনুমতিতে মিশাইলে করয হইয়া যায়, এখন আর উহা আমানত থাকে না, যাহা খোয়া গেল তোমার গেল, তাহার টাকা তাহাকে দিতেই হইবে।

১০। মাসআলা ঃ যদি কেহ গাই বা বকরী আমানত রাখে, তবে মালিকের বিনা এজাযতে তার দুধ খাওয়া বা বিনা এজাযতে গরুর দ্বারা (হালচাষ করা) আমানতদারের পক্ষে আদৌ জায়েয নাই। মালিকের এজাযত থাকিলে জায়েয হইবে, বিনা এজাযতে দুধ খাইয়া থাকিলে তার দাম মালিককে ফেরত দিতে হইবে।

১১। মাসআলা ঃ যদি কেহ কাহারও নিকট জেওর, কাপড়, হাড়ি-পাতিল বা বাসন-বরতন আমানত রাখে, তবে মালিকের বিনা অনুমতিতে আমানতদারের পক্ষে তাহা ব্যবহার করা জায়েয হইবে না। যদি এরূপ বিনা এজাযতে ব্যবহার করা অবস্থায় ঐ জিনিস চুরি হয় বা নষ্ট হয়, তবে তার জন্য ক্ষতিপূরণ বা ভর্তুক দিতে হইবে। অবশ্য যদি (মাসআলা) জানার পরে, হুশ আসার পরে তওবা করিয়া যেমন ছিল তেমন আলগ করিয়া হেফাযত করিয়া রাখিয়া দেয় এবং তারপরে চুরি হইয়া যায়, তবে ভর্তুক দিতে হইবে না।

১২। মাসআলা ঃ সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া পরের আমানতের কাপড় এইজন্য রাখিয়া দেওয়া হইল যে, সন্ধ্যার সময় ঐ কাপড় পরিয়া বেড়াইতে যাওয়া হইবে। পরে সন্ধ্যার আগেই ঐ কাপড় চুরি হইয়া গেল। এরূপ অবস্থায় আমানতদারকে ভর্তুক দিতে হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ আমানতের গরু কিংবা বকরী রোগাক্রান্ত হইলে আপনি তাহার চিকিৎসার্থে ঔষধ ব্যবহার করাইয়াছেন। সেই ঔষধে ঐ জীব মরিয়া গেল, তবে ভর্তুক দিতে হইবে । আর যদি ঔষধ ব্যবহার না করান, আর ঐ জীব মরিয়া যায়, তবে আপনার ভর্তুক দিতে হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ কেহ আমানতস্বরূপ আপনাকে টাকা দিল, আপনি ব্যাগে কিম্বা পকেটে রাখিয়া দিলেন, কিন্তু রাখিবার সময় সেই টাকা ব্যাগে কিম্বা পকেটে পড়ে নাই; বরং নীচে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আপনি মনে করিয়াছেন যে, ব্যাগে রাখিয়াছি, তবে ভর্তুক দিতে হইবে না।

১৫। মাসআলা ঃ আমানতের মাল যখনই আমানতকারী (মালিক) চাহিবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে। বিনা ওযরে না দেওয়া বা দেরী করা জায়েয নাই। একজন আপনার নিকট কিছু মাল আমানত রাখিয়াছিল। সে আসিয়া চাহিলে আপনি বলিলেন, 'ভাই, এখন অবসর নাই। আগামীকাল আপনি নিবেন।' ইহাতে যদি সে 'বহুত আচ্ছা' বলিয়া রাযী হইয়া যায়, তবে ত ভাল, নতুবা যদি সে নারায হইয়া রাগ করিয়া চলিয়া যায়, তবে ঐ মাল আর আমানত রহিল না, খিয়ানত হইয়া গেল। এখন যদি ঐ মাল চুরি হইয়া যায় বা নষ্ট হইয়া যায়, তবে আপনার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ একজনে আপনার নিকট কোন মাল আমানত রাখিয়াছিল। কিন্তু নেওয়ার সময় আমানতকারী নিজে না আসিয়া, নেওয়ার জন্য অন্য লোক পাঠাইয়াছে। এখন এই অন্য লোকের কাছে দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছা। আপনি তাহাকে না দিয়া ইহাও বলিয়া দিতে পারেন যে, মালিক নিজে না আসিলে আমি অন্য কাহারও কাছে দিব না। কেননা, আপনি যদি বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট দিয়া দেন, আর যদি মালিক অস্বীকার করে যে, সে তাহাকে পাঠায় নাই; তবে মালিক আপনার কাছ থেকে মাল আদায় করিয়া নিতে পারিবে। অবশ্য আপনি যাহাকে মাল দিয়াছেন, তাহাকে পাইলে তাহার নিকট হইতে মাল ফেরত নিতে পারিবেন। আর যদি কেহ আপনাকে ফাঁকি দিয়া থাকে, তবে সে ফাঁকিতে আপনি পড়িলেন; মালিকের মালের ক্ষতিপূরণ আপনাকে অবশ্যই দিতে হইবে।

আরিয়াত নেওয়ার বিবরণ

(একজনের একটা জিনিস থাকে। তার নিকট থেকে সে জিনিস নিয়া পাড়াপ্রতিবেশীও অনেক সময় কাজ চালায় এবং কাজ সারিয়া জিনিস আবার ফেরত দেয়। এইরূপ চাহিয়া নেওয়াকে 'আ'রিয়াত' বলে। আ'রিয়াত দেওয়াতে বড় সওয়াব পাওয়া যায়। আ'রিয়াতের মালের হেফাযত খুব বেশী করিয়া করিতে হয় এবং আ'রিয়াতদাতার এহ্সানও স্বীকার করিতে হয়। এই মালের যথাযথ হেফাযত না করিলে আমানতে খিয়ানতের গোনাহ্ হইবে। বাড়ীর দৈনন্দিন ব্যবহারের সাধারণ জিনিস 'আ'রিয়াত না দেওয়া অত্যন্ত দূষণীয় এবং বড় বখিলীর পরিচায়ক। কোরআন শরীফে এরূপ লোকের বড় নিন্দা করা হইয়াছে। আ'রিয়াত না দিলে বা আ'রিয়াতের মালের হেফাযত না করিলে সমাজে হামদরদী বা সহানুভূতি থাকে না এবং সে সমাজ আল্লাহ্র রহ্মত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। —অনুবাদক)

১। মাসআলা ঃ কেহ হয়ত আপনার কাছ থেকে একটা ছাতি বা একটা বদনা বা একখানা খন্তা বা একটা মই কয়েক দিনের জন্য আ'রিয়াত চাহিয়া নিল যে, কাজ সারিয়া আপনার জিনিস আপনাকে ফেরত দিয়া যাইবে। এইরূপে নেওয়ার পর সেই জিনিসের পূর্ণ হেফাযত করা তাহার

জিম্মায় ওয়াজিব হইয়া যাইবে, ঐ জিনিস তাহার নিকট এখন আমানত হইয়াছে। যদি পূর্ণ হেফাযত না করে, তবে আমানত খিয়ানতের গোনাহ্ হইবে। অবশ্য পূর্ণ হেফাযত সত্ত্বেও যদি জিনিসটি খোয়া যায়, তবে আইনত ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগিবে না। যদি ক্ষতি হইলে ভর্তুক দিবে বলিয়া নেয়, তবুও ক্ষতিপূরণ দেওয়া জায়েয নাই। আর হেফাযতে ত্রুটি করিলে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** আ'রিয়াতের জিনিস মালিক যে কাজে যে ভাবে এস্তেমাল ও ব্যবহার করার অনুমতি দিয়াছে সেই কাজে সেইভাবে এস্তেমাল করা জায়েয হইবে, তাহার কিছুমাত্র খেলাফ করাও জায়েয হইবে না। খেলাফ করিলে যদি জিনিসটা নষ্ট হয়, তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। যেমন, কেহ হয়ত একটা চাদর নিয়াছে গায় দিবার জন্য ; কিন্তু সে ফরাসের কাজ করিল, ইহা জায়েয নহে। কিংবা ফরাসের কাজে ৩ দিন ব্যবহার করার জন্য নিয়াছে; এখন যদি ঐ চাদর অন্য কাজে ৫ দিন ব্যবহার করে—তবে তাহা জায়েয হইবে না। এইরূপ খেলাফ করার ফলে যদি চাদর ছিঁড়িয়া যায়, তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। অথবা কেহ হয়ত একখানা কুরছি (চেয়ার) আ'রিয়াত নিয়াছে। কুরছি সাধারণতঃ একজন বসার জন্য হয়। কিন্তু তাহাতে দুইজন বসিয়াছে এবং তার ফলে কুরছি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে; আর যদি এই নিয়তে 'আ'রিয়াত' লয় যে, ইহা আর ফিরাইয়া দিবে না, তবে যদি ক্ষতি হইয়া যায়, তখন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** এক বা দুই দিনের জন্য কোন জিনিস চাহিয়া আনিল; এখন এক বা দুই দিন পরেই তাহা ফেরত দিতে হইবে। ওয়াদাকৃত সময়ে না দিলে যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** আ'রিয়াতের জিনিস সম্বন্ধে মালিক যদি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিয়া থাকে যে, চাই আপনি নিজে ব্যবহার করেন বা অন্যকে ব্যবহার করিতে দেন আমার এজাযত আছে, তবে ত যে আ'রিয়াত আনিয়াছে সে নিজেও ব্যবহার করিতে পারিবে অথবা অন্য কোন আত্মীয় বা বন্ধুকেও দিতে পারিবে। আর যদি এমন হয় যে, মালিক এরূপ পরিষ্কার ভাষায় এজাযতের কথা বলে নাই, কিন্তু তার সাথে তার এমন বন্ধুত্ব আছে যে, তার একীনী বিশ্বাস আছে যে, মালিক নিশ্চয়ই এজাযত দিবে, তবে এই ছুরতেও ঐ হুকুম যে, নিজেও ব্যবহার করিতে পারিবে এবং অন্যকেও দিতে পারিবে। আর মালিক যদি পরিষ্কার ভাষায় নিষেধ করিয়া দেয় যে, শুধু আপনাকে ব্যবহার করার অনুমতি দিতেছি, অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবেন না, তবে অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেওয়া কিছুতেই দুরুস্ত হইবে না। যে আ'রিয়াত আনিয়াছে, সে যদি এই বলিয়া আনিয়া থাকে যে, সে নিজে ব্যবহার করিবে এবং মালিক পরিষ্কার ভাষায় অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার কথা নিষেধ করে নাই, তবে জিনিসটি কোন্ ধরনের তাহা দেখিতে হইবে। যদি এমন ধরনের জিনিস হয় যে, সকলের ব্যবহার সমান হয়, ব্যবহারে কোন বেশকম হয় না; তবে যে আ'রিয়াত আনিয়াছে, সে নিজেও ব্যবহার করিতে পারিবে এবং অন্যকেও ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে। আর যদি জিনিসটি এমন ধরনের হয় যে, সকলের ব্যবহার সমান হয় না, বরং কেহ ভালভাবে ব্যবহার করে আর কেহ খারাপভাবে ব্যবহার করে, তবে এইরূপ জিনিস যে আ'রিয়াত আনিয়াছে শুধু সে-ই ব্যবহার করিতে পারিবে, অন্যকে ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে না। এইরূপ যদি এই বলিয়া আ'রিয়াত আনা হয় যে, সে এই জিনিস তাহার অমুক আত্মীয় বা বন্ধুকে ব্যবহার

করিতে দিবে, কিন্তু মালিক কিছু না বলিয়াই জিনিসটি দিয়া দিয়াছে, তবে উপরের মাসআলার মত হইবে। অর্থাৎ যদি দেখা যায়, ঐ জিনিসটির ব্যবহার লোকের নিকট বিভিন্ন প্রকার, তবে যাহার নাম করিয়া আ'রিয়াত আনা হইয়াছে, শুধু সে-ই ব্যবহার করিতে পারিবে, এমনকি যে ব্যক্তি আ'রিয়াত আনিয়াছে, সেও ব্যবহার করিতে পারিবে না। আর যদি কহারও নাম না করিয়া, 'আ'রিয়াত আনা হইয়া থাকে আর জিনিসটি যদি এমন হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে, তবে যে-ব্যক্তি প্রথমে ব্যবহার শুরু করিয়াছে শুধু সে-ই ব্যবহার করিতে পারিবে, অন্য আর কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না। আর জিনিসটি যদি এমন হয় যে, উহার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হয় না, তবে নিজেও ব্যবহার করিতে পারিবে এবং অন্য একজনকেও ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে।

৫। মাসআলা ঃ যে জিনিসের মালিক কোন না-বালেগ বাচ্চা, সে জিনিস কেহ আ'রিয়াত দিতেও পারিবে না, কেহ আ'রিয়াত নিতেও পারিবে না (না-বালেগ বাচ্চা এতীম হইলে ত কেহই পারিবে না)। এমনকি, এই বচ্চার মা-বাপ জীবিত থাকিলে তাহারাও দিতে পারিবে না। না-বালেগ বাচ্চা নিজে দিতে চাহিলেও কাহারও পক্ষে তাহা আ'রিয়াত নেওয়া জায়েয হইবে না। (না-জায়েয হওয়া সত্ত্বেও) যদি কেহ তাহার নিকট হইতে আ'রিয়াত নেয়, আর জিনিসটি নষ্ট হয় বা খোয়া যায়, তবে তার ভর্তুক দিতে হইবে।

৬। মাসআলা ঃ কেহ কাহারও নিকট হইতে কোন জিনিস আ'রিয়াত আনিল কিন্তু ফেরত দেওয়ার আগেই মালের মালিক মরিয়া গেল। তাহা হইলে মরিয়া যাওয়ার খবর পাওয়ামাত্রই ঐ জিনিস আর ব্যবহার করা দুরুস্ত হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিয়া আসিতে হইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি আ'রিয়াত আনিয়াছে, সে যদি (মাল ফেরত দেওয়ার আগে) মরিয়া যায়, তবে তার ওয়ারিশরা ঐ জিনিস আর ব্যবহার করিতে পারিবে না। (সঙ্গে সঙ্গে মালিকের কাছে ফেরত পৌঁছাইতে হইবে।)

হেবা করার বর্ণনা

১। মাসআলা ঃ (কাহাকেও কোন জিনিস বিনা মূল্যে দান করার নাম হেবা করা।) আপনি কাহাকেও একটি জিনিস দান করিতে চাহেন। এ জন্য মুখে বলিলেন যে, আমি আপনাকে এই জিনিসটি দান করিলাম, সেও মুখে বলিল, আমি গ্রহণ করিলাম, ইহাতে হেবা পূর্ণ হইবে না। যাহাকে দান করা হইতেছে যাবৎ তাহার কবযা এই জিনিসের উপর না হইবে তাবৎ দান এবং গ্রহণ কিছুই পূর্ণ হইবে না। (দানের জন্য) আপনি আপনার একটি জিনিস একজনের হাতে দিলেন, সেও তাহা গ্রহণ করিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না, এখন সেই জিনিসের মালিক সে হইয়া যাইবে। শরীঅতের ভাষায় ইহা 'হেবা' বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ইহার কয়েকটি শর্ত আছে। একটি হইল তাহাকে দখলে দিয়া দিতে হইবে এবং সেও দখলে নিয়া নিবে। দাতার দান করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতা (অর্থাৎ, যাহাকে দান করা হইতেছে সে) কব্‌যা করিয়া না নিলে হেবা হয় না। শুধু ঐ ভাবে কব্‌যা না করার জন্যই দাতা-গ্রহীতার কথা-বার্তা কোনই কাজে আসিবে না; পরে গ্রহীতা ঐ মাল কব্‌যা করিতে চাহিলে দাতার বিনা অনুমতিতে কব্‌যা করিতে পারিবে না।

২। মাসআলা ঃ দাতা গ্রহীতার সামনে এমনভাবে জিনিসটি রাখিয়া দিল যে, গ্রহীতা ইচ্ছা করিলে হাতে তুলিয়া নিতে পারে এবং বলিল যে, আপনি এই জিনিসটি গ্রহণ করুন ; এই অবস্থায় বুঝা যাইবে এবং ধরিয়া লওয়া হইবে যে, গ্রহীতা কব্‌যা করিয়া নিয়াছে।

৩। মাসআলা ঃ বন্ধ করা সিন্দুকের ভিতরকার কাপড় কাহাকেও দান করা হইল ; সিন্দুক সামনেই আছে, কিন্তু খুলিয়া দেওয়া হইল না বা চাবিও দেওয়া হইল না এইরূপ হইলে কব্‌যা হইল না এবং গ্রহীতা কাপড়ের মালিকও হইল না। চাবি দেওয়া হইলে গ্রহীতা মালিক হইবে।

৪। মাসআলা ঃ আপনি কাহাকেও একটি বোতল দান করিলেন ; কিন্তু বোতলে আপনার তেল রাখা আছে ; তবে তেল আপনি রাখিয়া বোতল না দেওয়া পর্যন্ত আপনার দান করা কার্য পূর্ণ হইবে না, গ্রহীতারও স্বত্বাধিকার প্রমাণিত হইবে না। কিন্তু যদি বোতলে করিয়া তেল দান করেন আর বোতল না দান করেন, তবে দান কার্য পূর্ণ হইয়া যাইবে। গ্রহীতা তেল রাখিয়া বোতল আপনাকে ফেরত দিবে। ঠিক এইরূপে আপনি একটি বাড়ী দান করিলেন, কিন্তু ঐ বাড়ীতে আপনার আসবাবপত্র রাখা আছে, যাবৎ আপনি বাড়ী খালি করিয়া না দিবেন তাবৎ দানকার্য পূর্ণ হইবে না গ্রহীতারও স্বত্বাধিকার প্রমাণিত হইবে না ; যখন খালি করিয়া দখল দিয়া হস্তগত করাইয়া দিবেন তখন গ্রহীতার স্বত্ব প্রমাণিত হইবে।

৫। মাসআলা ঃ কোন জিনিসের অর্ধেক বা কিছু অংশ কাহাকেও দান করিলে দেখিতে হইবে যে, ঐ জিনিস ভাগ করিতে পারা যায় কি না। অর্থাৎ ভাগ হওয়ার পরেও জিনিসটা (আগের মত) কাজের থাকে কি না। যদি ভাগ হওয়ার পরে কাজের থাকে, তবে ভাগ করিয়া দান করিলে দান কার্য পূর্ণ হইয়া যাইবে, নতুবা হইবে না। আর যদি জিনিসটি এমন হয় যে, ভাগ করার পর কাজের থাকে না, তবে (দান করার পরে) ঐ জিনিসটি শরীকী অংশ হিসাবে দুইজনের হইবে। যদি আপনি কাহাকেও বলেন, এই বর্তনের অর্ধেক ঘি আপনাকে দিলাম। সে বলিল, আমি নিলাম। এই দান ছহীহ্‌ হইবে না, যদিও বর্তন দখল করিয়া লয়। কিন্তু ঐ ঘি-এর মালিক আপনিই থাকিবেন। অবশ্য যদি অর্ধেক ঘি পৃথক করিয়া তাহাকে দিয়া দেন, তবে সে উহার মালিক হইবে।

৬। মাসআলা ঃ এক থান কাপড়, এক খণ্ড জমি বা একটি বাগিচা দুই জনে শরীকী অংশ হিসাবে ক্রয় করিয়া একজনের অংশ ভাগ করিয়া না আনিয়া কাহাকেও দান করিলে সে দান কার্য সম্পূর্ণ হইবে না। বণ্টন করিয়া নেওয়ার পর দানকার্য করা উচিত।

(**জ্ঞাতব্য**—জমিনের উপর কব্‌যার নিয়ম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নরূপে দেখা যায়। কোথাও কব্‌যা হয় জমিনের চার আইল দিয়া হাঁটিয়া আসিলে, আবার কোথাও চাষবাস করিলে ইত্যাদি।)
—অনুবাদক

৭। মাসআলা ঃ আট আনা কিংবা বার আনা পয়সা দুইজনকে দিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়েই আধাআধি ভাগ করিয়া নেও। ইহা ছহীহ্‌ নহে বরং ভাগ করিয়া দিতে হইবে। অবশ্য যদি তাহারা ফকীর হয়, তবে ভাগ করার প্রয়োজন নাই। যদি একটি টাকা বা একটি পয়সা দুইজনকে দেওয়া হয়, তবে এই দান ছহীহ্‌ হইবে।

৮। মাসআলা ঃ বকরী বা গাভীর পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় ঐ বাচ্চা দান করা ছহীহ্‌ নহে। বাচ্চা পয়দা হওয়ার পর উহা কব্‌যা করিলেও মালিক হইবে না। বাচ্চা দান করিতে হইলে বাচ্চা পয়দা হওয়ার পর নূতন ভাবে দান করিবে।

৯। মাসআলাঃ বকরী বা গাভীর পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় ঐ বকরী বা গাভী যদি কেহ দান করিয়া দেয় আর বলে যে, উহার পেটে যে বাচ্চা আছে, ঐ বাচ্চা দান করিলাম না—ইহা আমারই থাকিবে, তবে এইরূপ দুরুস্ত হইবে না। (এবং বলায় কোন কাজও হইবে না), বাচ্চাসহ বকরী বা গাভী গ্রহীতার হইয়া যাইবে।

১০। মাসআলাঃ আপনার কোন জিনিস কাহারও নিকট আমানত রাখা আছে বা পাওনা আছে। এখন ঐ জিনিসই তাহাকে দান করিতে হইলে শুধু মুখে বলিয়া দিলে দান কার্য পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ঐ জিনিস তাহার হইয়া যাইবে। তাহাকে নূতন করিয়া কব্যা করাইতে হইবে না।

১১। মাসআলাঃ না-বালেগ ছেলেমেয়ে যদি তাহাদের জিনিস কাহাকেও দান করে, তবে এইরূপ দান করাও দুরুস্ত হইবে না আর নেওয়া ত দুরুস্ত হইবেই না।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—শরীঅতের মাসআলা এই যে, ছেলেমেয়েদেরকে যেরূপ দ্বীন-ঈমান এবং ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেওয়া ফরয, আল্লাহ্ রাসূল সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া ফরয, তদ্রূপ দান-ছাখাওতির শিক্ষা দেওয়াও ফরয। সেই দান-ছাখাওতি এইভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, নিজেদের জিনিস তাহাদের হাতে দিয়া দেওয়াইতে হইবে, যাহাতে তাহাদের দান করার এবং খেদমত করার অভ্যাস হয়। দান-ছাখাওতির অভ্যাস করা ও অভ্যাস করান অত্যন্ত জরুরী।

(বিনামূল্যে) দান কয়েক প্রকারের হয়—

১। গরীবকে ছওয়াবের নিয়তে দান করা। ইহাকে ছদ্কা বলে। ছদ্কা আবার দুই প্রকার, যথা—(১) ওয়াজিব ছদ্কা ও (২) নফল ছদ্কা।

২। স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ বড়র পক্ষ হইতে ছোটকে দান করা। যেমন, স্বামী স্ত্রীকে দান করে, বাপ বেটাকে দান করে। এই প্রকার দানকে সাধারণতঃ হেবা বলে।

৩। ভক্তি ও মহব্বত সহকারে ছোটর পক্ষ হইতে বড়কে দান করা বা ভালবাসার নিদর্শন-স্বরূপ এক দোস্তের পক্ষ হইতে অন্য দোস্তকে দান করা।—যেমন, বেটা মা-বাপকে, শাগরেদ-মুরিদ ওস্তাদ বা পীরকে দান করে। এই প্রকার দানকে সাধারণতঃ হাদিয়া বা তোহ্ফা বলে।

প্রকাশ থাকে যে, হেবার জন্য যে সকল মাসআলা বলা হইয়াছে তাহা এই তিন প্রকার দানের জন্যও প্রয়োজন হইবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) দান-ছাখাওতি করার জন্য অনেক তাকীদ করিয়া গিয়াছেন; গরীবদিগকে ছদ্কা দেওয়ার জন্যও খুব তাকীদ করিয়াছেন। মা-বাপ ওস্তাদ পীরকে এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব একে অন্যকে হাদিয়া-তোহ্ফা দেওয়া-নেওয়ার প্রথা জারি রাখার জন্যও তাকীদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ تَهَادَوْا وَتَحَابُّوْا

"তোমরা একে অন্যকে হাদিয়া তোহ্ফা দান কর এবং এইভাবে পরস্পরের মধ্যে মহব্বত ও ভালবাসা বাড়াও।" —অনুবাদক)

হাদিয়ার মাসআলা (বর্ধিত)

হাদিয়া ও ঘুষ-রেশওয়াতের মধ্যে পার্থক্য

১। মাসআলাঃ হাদিয়া এবং রেশওয়াত দেখিতে প্রায় এক রকম দেখায় এবং সাধারণতঃ যারা ঘুষ দেয়, তাহারা উহাকে তোহ্ফা, নাজরানা, ডালি বা ভালবাসার নিদর্শন বলিয়া প্রকাশ

করিতে চায়। তাহারা এরূপ বলে, পান খাইতে দিলাম, ছেলেকে, মাকে মিঠাই বা নাশ্‌তা খাইবার জন্য দিলাম ইত্যাদি। ইহা দ্বারা হাদিয়া এবং রেশওয়াতের পার্থক্য সাধারণতঃ লোকের বুঝে আসে না। কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে আসমান-জমিনের পার্থাক্য আছে। প্রথম বড় পার্থক্য এই যে, হাদিয়া দেওয়ার নিয়তের মধ্যে এক আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের মহব্বত ছাড়া দুনিয়ার কোন গরয, স্বার্থ বা কোনরূপ কোন সাহায্য পাওয়ার আশা থাকে না। পক্ষান্তরে রেশওয়াত দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে কিছু গরয বা স্বার্থ হাছিল করা এবং কিছু সাহায্য পাওয়া। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, হুকুমত পাবলিকের কাছ থেকে ট্যাক্স বসাইয়া টাকা আদায় করিয়া পাবলিকেরই খেদমত করার জন্য বেতন দিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করে। এইসব বেতনভোগী কর্মচারীদের উপর ওয়াজিব এই যে, পাবলিকের যে কাজের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই কাজ করিয়া দিতে হইবে। পাবলিকের নিকট হইতে সে উপরি কিছু গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে কষ্ট দিতে পারিবে না, তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ খোশামোদ তোষামোদের আশা করিতে পারিবে না। সবাইকেই সমান চোখে দেখিয়া নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষভাবে তাহাদের কাজ করিয়া দিতে হইবে। এই বেতনভোগী কর্মচারীরা যদি তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় পাবলিকের নিকট হইতে পার্টি লয়, পাবলিকের বাড়ীতে দাওয়াত খায়, পাবলিকের নিকট হইতে কোন হাদিয়া তোহ্‌ফা গ্রহণ করে বা তাহাদের ছেলে-মেয়ে বা স্ত্রী মিঠাই খাবার বা নাশ্‌তা খাবার গ্রহণ করে, তবে তাহা সব ঘুষ বা রেশওয়াত হইবে, হারাম হইবে, আমানতে খেয়ানত হইবে, গোনাহ্‌ কবীরা হইবে।

পক্ষান্তরে মা-বাপ, ওস্তাদ-পীর—যাহাদের এহ্‌সান শুমার করা যায় না, যাহারা আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা দেন, যাহারা ওয়ায নছীহত করিয়া আখেরাতের নাজাতের পথ বাতাইয়া থাকেন, যাহারা মসজিদে ইমামতী করিয়া নামায পড়াইয়া আখেরাতের বড় পুঁজি সংগ্রহের কাজে সাহায্য করিয়া থাকেন, যাহারা ফতুয়া দিয়া ও মাসআলা বাতাইয়া ধর্মমতে সমস্যার সমাধান করিয়া দেন, যাহারা ইসলামী শিক্ষা দান করিয়া কোরআন হাদীস পড়াইয়া, কোরআন হাদীসের সত্যকে প্রচার করিয়া ইসলাম ধর্মকে চিরজীবন্ত করিয়া রাখিতেছেন—হুকুমতের পক্ষ হইতে যখন ইহাদের কাহারো জন্য কোন বেতন নাই, তখন তাহাদিগকে দান করিয়া কোন কাজ উদ্ধার করিয়া নেওয়ার আশা নাই; কাজেই তাহাদিগকে হাদিয়া তোহ্‌ফা দান করা রেশওয়াত নহে; বরং অতি বড় পুণ্যের কাজ এবং অতি বেশী ছওয়াবের কাজ। কেননা, তাহাদিগকে যাহাকিছু দান করা হয়, তাহা শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র মহব্বতে দান করা হয়। অন্য কোন উদ্দেশ্যে দান করা হয় না।

২। মাসআলাঃ শাসনকর্তা, বিচারকর্তা, পুলিশ, তহ্‌শীলদার, আমীন, সেরেশ্‌তাদার পেশকার, কেরানী—এরা সবাই হুকুমতের পক্ষ হইতে পাবলিকের কাজ করিয়া দেওয়ার জন্য বেতনভোগী কর্মচারী। কাজেই ইহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং এমন বন্ধু যাহাদের সঙ্গে চাকুরীর আগে হইতেই দেওয়া-নেওয়ার ও খাওয়া-খাওয়াইবার প্রথা ছিল তাহা ছাড়া অন্য কাহারও দাওয়াত গ্রহণ করা, হাদিয়া তোহ্‌ফা গ্রহণ করা, করয লওয়া আ'রিয়াত লওয়া এবং এছাড়া অফিসের চাকরের দ্বারা বা অফিসের জিনিসের দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজ লওয়া সবই রেশওয়াতের মধ্যে শামিল এবং সম্পূর্ণরূপে হারাম। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও পুরাতন বন্ধুও বাদী বা বিবাদী হয়, তবে তাহাদের থেকেও কিছু গ্রহণ করা হারাম। এইরূপে গ্রাম্য যেসব পঞ্চায়েতের হাতে কোন সালিসী বিচার ইত্যাদি থাকে, তাহাদের জন্যও বাদী বা বিবাদী পক্ষের নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা বা দাওয়াত ইত্যাদি খাওয়া সবই ঘুষ এবং রেশওয়াত হইবে।

৩। মাসআলা ঃ মুফতী ছাহেব—যিনি ফতওয়া দেন, তিনি—যদি টাকা পাইয়া বা দাওয়াত লইয়া পক্ষপাতিত্ব করেন, তবে তাঁহার পক্ষেও কিছু গ্রহণ করা রেশওয়াতের অন্তর্গত এবং হারাম। আর যদি মাসআলা বাতানের পারিশ্রমিকস্বরূপ গ্রহণ করেন, তবে তাহাও তাহার পক্ষে হালাল নহে। অবশ্য তিনি যদি হক্ ফতওয়া দেন এবং লোকে এলমের মহব্বতে আল্লাহ্ রাসূলের মহব্বতে তাঁহাকে নায়েবে রাসূল ও দ্বীনের খাদেম মনে করিয়া হাদিয়া তোহ্ফা দেয়, তবে তাহা অতি বড় নেকের কাজ হইবে এবং তাহা গ্রহণ করা আওলা ও আফযাল হইবে।

অবশ্য ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, শরীঅতের মাসআলা মৌখিক বাতানের উজরত হালাল নহে; কিন্তু উহা কাগজে কলমে লিখিয়া দিয়া তাহার উজরত নেওয়া হালাল।

৪। মাসআলা ঃ রমযান মাসে হাফেয ছাহেব তারাবীহ্র খতম পড়েন। যদি তিনি চুক্তি করিয়া খতমের উজরত লন, তবে তাহা তাহার পক্ষে হালাল নহে। কিন্তু জনসাধারণ যদি কোরআনের মহব্বতে আল্লাহ্ রাসূলের মহব্বতে হাফেযে কোরআনের সম্মানার্থে হাদিয়া তোহ্ফা স্বরূপ টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় বা দুধ-ঘি দান করে, তবে তাহারা আল্লাহ্র খাছ রহ্মতের পাত্র হইবে এবং আল্লাহ্র কাছে অনেক বেশী নেকী পাইবে। আর হাফেয ছাহেব যদি দেলে কোন লোভ না আনিয়া দেলকে পবিত্র রাখিয়া দেলের মধ্যে শুধু আল্লাহ্র এবং কোরআনের প্রতি ভক্তি ও মহব্বত রাখিয়া উহা গ্রহণ করেন, তবে তাহার জন্য তাহা হালাল হইবে; কিন্তু দেলের মধ্যে লোভ রাখিলে সে মালে বরকত ও রহ্মত থাকিবে না।

৫। মাসাআলা ঃ পীর মামলা জিতাইয়া দিবে, পীর রোগ ভাল করিয়া দিবে, পীর বিপদ দূর করিয়া দিবে, পীর দোকানে, ক্ষেতে বা চাকুরীতে বরকত দিয়া দিবে—এইরূপ আকীদা রাখা শেরেকী গোনাহ্ এবং এইরূপ আকীদা রাখিয়া যদি কেহ হাদিয়া বা নযরানা দেয়, তবে তাহা (দেওয়া অন্যায় এবং) গ্রহণ করাও গোনাহ্।

(মোকদ্দমায় জিতাইয়া দেওয়া, রোগ ভাল করিয়া দেওয়া, বিপদ দূর করিয়া দেওয়া, দোকানে , ক্ষেতে বা চাকুরীতে বরকত দেওয়া—এগুলি পীরের কাজ নয়, এগুলি আল্লাহ্র হাতের কাজ। মানুষকে আল্লাহ্ নিয়মিতভাবে চেষ্টা করিবার হুকুম দিয়াছেন। নিয়মানুসারে চেষ্টা হইলে চেষ্টার ফল দেওয়া আল্লাহ্র কাজ, চেষ্টার সঙ্গে দো'আও যদি যোগ হয়, বিশেষ করিয়া যদি নেক লোকদের দো'আ যোগ হয়, তবে চেষ্টা আরো বেশী ফলবতী হয়। পীর ছাহেব দো'আ করিতে পারেন বটে, কিন্তু দো'আর জন্য কোন টাকা লাগে না; আর পীরের আসল কাজ ত হইল লোকের নৈতিক চরিত্র ঠিক করিয়া দিয়া লোকদিগকে আল্লাহ্র পেয়ারা করিয়া দেওয়া এবং আল্লাহ্কে চিনাইয়া দিয়া আল্লাহ্কে লোকের কাছে পেয়ারা করিয়া দেওয়া। আল্লাহ্র মহব্বতের কারণে যদি আল্লাহ্র পেয়ারা নেক বান্দাদের সঙ্গে মহব্বত রাখে এবং সেই মহব্বতের কারণে হাদিয়া তোহ্ফা দেয়, তবে তা অতি বড় নেক কাজ। এই নেক কাজ হয় চারি কারণে। যথা—(১) আল্লাহ্র মহব্বতের পরিচয় এবং প্রমাণ পাওয়া যায় দানের দ্বারা। (২) যাহারা আল্লাহ্র মহব্বতের লোক তাহাদের সহিত মহব্বত করার হুকুম আল্লাহ্ তা'আলা করিয়াছেন, সেই মহব্বতের পরিচয় পাওয়া যায় হাদিয়া তোহ্ফার দ্বারা। (৩) আল্লাহ্র দ্বীনকে জারি করার কাজে সহায়তা করা হইবে এই দানের দ্বারা। (৪) এই আশা থাকে যে—

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ ○ لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْزُقُنِىْ صَلَاحًا

"নিজে যখন ভাল হইতে পারি নাই, তখন ভাল লোকদিগকে এই জন্য ভালবাসি যে, আল্লাহ্ তা'আলা (হাদিয়া মারফতে) এই ভালবাসার কারণে আমাকেও ভাল বানাইতে পারেন।"

সমাজে ন্যায় বিচার কায়েম করা, সামজের দুষ্টদের দমন করিয়া শিষ্টদের পালন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা, যাহাতে সমাজের মধ্যে শান্তিভঙ্গ না হয়, সেজন্য শান্তি রক্ষার চেষ্টা করা, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বদমাআশী ইত্যাদি না হইতে দেওয়া, রোগীর চিকিৎসা এবং সেবা করা, পথ-ঘাট, পুল ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া দিয়া লোকের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেওয়া, লোকের স্বাস্থ্য যাহাতে নষ্ট না হয় এবং ভাল থাকে সেজন্য চেষ্টা করা—এগুলি সবই বড় বড় নেক কাজ, যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয় এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেরা মানুষের সেবার নিয়তে করা হয়; প্রকৃত প্রস্তাবে এইসব কাজ এত বড় নেকের কাজ যে, এর কোন উজরত বা বেতন হইতে পারে না। কিন্তু যাহারা এই সমস্ত বিভাগে কাজ করেন, তাঁহারা যেহেতু জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং নিজেদের সমস্ত সময়টুকু উৎসর্গ করিয়া রাখেন, সেইজন্য জনগণের যে টাকা সরকারের নিকট থাকে, সেই টাকা হইতে তাহাদিগকে ভাতা বা বেতন স্বরূপ কিছু দেওয়া হয়। আর যেহেতু বেতন দেওয়া হয়, সেইজন্য জনগণের নিকট হইতে হাদিয়া তোহ্‌ফা গ্রহণ করা তাহাদের জন্য নাজায়েয হইয়া যায়। কিন্তু এইসব নেক কাজের চেয়ে আরো অনেক বড় নেকের কাজ হইতেছে আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলামের শিক্ষাকে চালু রাখা। আল্লাহ্‌র রাসূলের কোরআন হাদীস শিক্ষাকে জারি রাখা। হুকুমতের উচিত এই যে, যাহারা এই কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে ভাতা দেওয়া। কিন্তু যেহেতু হুকুমত তাহার কিছুই করিতেছে না, কাজেই জনগণের উপর ফরয হইতেছে তাহাদিগকে হাদিয়া তোহ্‌ফা স্বরূপ দান করিয়া হউক বা সমিতি কমিটি করিয়া মাসিক ভাতা নির্ধারিত করিয়া হউক তাঁহাদের খেদমত করা এবং এই উছিলায় আল্লাহ্‌র কোরআন ও রাসূলের হাদীস শিক্ষাকে জারি রাখা। —অনুবাদক)

বাচ্চাকে দান করার মাসআলা

১। মাসআলাঃ ছেলে জন্মিলে ছেলেকে দেখিয়া বা ছেলের খত্‌নার সময় আত্মীয়-স্বজনগণ বা শাগরেদ মুরীদগণ ছেলেকে যে টাকা দেয়, সে টাকা সাধারণতঃ ছেলেকে দেওয়া মকছুদ হয় না—ছেলের মা-বাপকেই সন্তুষ্ট করা মকছুদ হয়। সুতরাং এইসব টাকার মালিক ছেলে নহে, বরং মা-বাপ মালিক হইবে। অবশ্য যদি কেহ খাছ করিয়া বাচ্চাকেই দেওয়া মকছুদ বলিয়া উল্লেখ করিয়া দেয় বা বাচ্চার ব্যবহারের জিনিস দেয়, তবে বাচ্চাই তার মালিক হইবে। বাচ্চার যদি দেওয়া নেওয়ার বুঝ-বুদ্ধি হইয়া থাকে, তবে বাচ্চার হাতে দিলেই বাচ্চার কব্‌যা হইয়া যাইবে এবং বাচ্চা মালিক হইয়া যাইবে। আর বাচ্চা যদি অবুঝ হয়, তবে বাচ্চার পক্ষ হইতে বাপ কবযা করিলে বা বাপের অবর্তমানে দাদা কব্‌যা করিলে বা বাপের পক্ষে অছি বা দাদার পক্ষের অছি কব্‌যা করিলে অথবা ইহারা না থাকিলে বাচ্চা যার তত্ত্বাবধানে আছে (চাই সে মা হউক, ভাই হউক, চাচা হউক, বা মামা হউক, বা অন্য কেহ হউক,) সে কব্‌যা করিয়া লইলে বাচ্চা মালিক হইয়া যাইবে। বাপ দাদা বর্তমান থাকিতে মা, নানা, দাদী ইত্যাদি কব্‌যা করিলে ছহীহ্ হইবে না।

২। মাসআলাঃ বাপ-দাদা বা বাচ্চা যাহার তত্ত্বাবধানে আছে, সে নিজেই যদি বাচ্চাকে কিছু দিতে চায়, তবে যদি শুধু এতটুকু বলে যে, 'আমি বাচ্চাকে এই মালটা দিলাম' তাহা হইলে বাচ্চা সেই মালের মালিক হইয়া যাইবে। কব্‌যা করার প্রয়োজন নাই।

৩। **মাসআলা ঃ** বাপ মা (যদি কোন মেয়েকে বা কোন ছেলেকে বেশী ভালবাসে তাহাতে গোনাহ্ নাই, কিন্তু) কোন জিনিস দিতে হইলে সব ছেলেমেয়েকেই সমান দিতে হইবে; বিনা কারণে বেশ-কম করা মাকরূহ্। উপযুক্ত কারণবশতঃ (যেমন, যদি কোন ছেলে দ্বীনের খাদেম, আলেম বা হাফেয হয় বা মা-বাপের বেশী খেদমত করে বা কামাই রোজগারের উপযুক্ত না হয়, তবে এই কারণে) বেশী দিলে কোন গোনাহ্ হইবে না, যদি যাহাকে কম দিয়াছে তাহার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না হয়।

৪। **মাসআলা ঃ** যে জিনিসের মালিক কোন না-বালেগ বাচ্চা, সেই জিনিস শুধু ঐ বাচ্চারই কাজে লাগাইতে হইবে, অন্য কাহারো কাজে সেই জিনিস ব্যবহার করা জায়েয হইবে না। এমন কি, মা-বাপও সে জিনিস নিজেদের কাজে বা এক বাচ্চার জিনিস অন্য বাচ্চার কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** (ফল ফলাদি, মিঠাই বা এই ধরনের) কোন (খাবার) জিনিস যদি কেহ বাচ্চার নাম করিয়া দেয় বা বাচ্চার হাতে দেয়, অথচ নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, আসল মাকছুদ মা-বাপকে দেওয়া কিন্তু সামান্য জিনিস মনে করিয়া বাচ্চার নাম করিয়াছে (তাহা হইলে ঐ জিনিস মা-বাপেও খাইতে পারিবে)। যদি মায়ের পক্ষের আত্মীয়গণ দিয়া থাকেন, তবে মা মালিক হইবে; আর যদি বাপের পক্ষের আত্মীয়গণ বা শাগরেদ মুরীদগণ দিয়া থাকেন, তবে বাপ মলিক হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** মা-বাপ যদি নিজেদের ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য জেওর বা কাপড় বানায়, তবে যাহার নামে সেটা বানাইবে সেটার মালিক সে হইয়া যাইবে; এখন আর অন্য কাহাকেও দেওয়া জায়েয হইবে না। অবশ্য মা বা বাপ যদি স্পষ্টভাবে বলিয়া দেয় যে, জিনিস আমার রহিল, ছেলে বা মেয়েকে শুধু ব্যবহার করার জন্য দিলাম, তবে সে জিনিস অবশ্য বাপ বা মায়ের থাকিবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, অনেকে ছোট ছেলে বা মেয়ের জিনিস নিয়া নিজে ব্যবহার করে বা এক ছেলের জিনিস অন্য ছেলেকে দেয়। এরূপ করা মোটেই দুরুস্ত নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** ছোট ছেলেমেয়ে নিজের জিনিস নিজের হাতে দান করিলে তাহা নেওয়া জায়েয নহে । ইহা মা-বাপেরও অধিকার নাই যে, ছোট ছেলেমেয়ের জিনিস অন্য কাহাকেও দান করিবে বা নিজেরা ব্যবহার করিবে। অবশ্য মা-বাপ যদি এত গরীব হয় যে, তাহাদের আর অন্য উপায় নাই, তবে তাহারা ছোট ছেলেমেয়ের জিনিস ব্যবহার করিতে পারে বটে।

৮। **মাসআলা ঃ** ছোট ছেলেমেয়ের জিনিস কাহাকেও করয দেওয়া জায়েয নাই। খোদ মা-বাপের জন্যও করয নেওয়া ছহীহ্ হইবে না।

দিয়া ফিরাইয়া নেওয়ার বিবরণ

১। **মাসআলা ঃ** একজনকে একটি জিনিস দিয়া আবার ফিরাইয়া নেওয়া ভারী অন্যায়, ভারী লজ্জার কথা এবং বড় গোনাহ্। অবশ্য যদি কেহ ফিরাইয়া নেয় এবং যাহাকে দান করা হইয়াছিল সেও খুশী হইয়া ফিরাইয়া দেয়, তবে সে ঐ জিনিসের মালিক হইয়া যাইবে। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় ফিরাইয়া নেওয়ারই অধিকার থাকে না। যেমন, যদি কেহ একটি বকরী কাহাকেও দিয়া থাকে এবং সে উহাকে খাওয়াইয়া চরাইয়া খুব মোটা তাজা করিয়াছে, এখন আর ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার নাই। যদি কেহ এক টুকরা জমি কাহাকেও দান করে এবং সে সেই জমিনে বাগিচা বানায় বা বাড়ী বানায়, তবে ঐ জমি আর ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকিবে না। যদি

কেহ কাহাকেও কাপড় দান করে এবং সেই কাপড় সেলাই করিয়া জামা বানায় বা সেই কাপড়ে রং দেয়, তবে আর ঐ কাপড় ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকিবে না।

২। মাসআলাঃ কেহ কাহাকেও একটি বকরী দান করিল। তাহার ঐ বকরীর বাচ্চা হওয়ার পর দাতার খেয়াল চাপিল যে, বকরী সে ফেরত নিবে, তবে সে বকরী ফেরত নিতে পারবে; কিন্তু বাচ্চা নিতে পারিবে না (এবং যাবৎ বাচ্চার দুধ খাওয়া না ছুটিবে, তাবৎ বকরীও নিতে পারিবে না।)

৩। মাসআলাঃ দান করার পর দাতা বা গ্রহীতার যে কেহ একজন মরিয়া গেলে দান করা মাল আর ফেরত লওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৪। মাসআলাঃ দানের বদলে প্রতিদান হওয়ার পর দানের মাল ফেরত লওয়ার অধিকার থাকে না। আর যদি প্রতিদান বলিয়া না দেওয়া থাকে, তবে উভয়ে উভয়ের জিনিস ফিরাইয়া লইতে পারিবে।

৫। মাসআলাঃ স্বামী তার স্ত্রীকে কোন জিনিস দান করিলে বা স্ত্রী তার স্বামীকে কোন জিনিস দান করিলে সে জিনিস ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে না। এইরূপ ভাগ্নে-ভাগ্নী, ভাতিজা-ভাতিজী, ভাই-ভগ্নি, মামা-খালা, চাচা-ফুফু ইত্যাদি যী-রাহম, মাহরামকে কোন জিনিস দান করিলে তাহা আর ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে না। আর যদি এরূপ হয় যে, আত্মীয়তা আছে কিন্তু বিবাহ হারাম নহে, যেমন চাচাত বোন, ফুফাত বোন ইত্যাদি; কিংবা বিবাহ হারাম কিন্তু বংশের দিক দিয়া আত্মীয়তা নাই, যেমন দুধ-ভাই, বোন, শ্বশুর, শাশুড়ী, দামাদ ইত্যাদি, তবে ইহাদের নিকট হইতে ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে।

৬। মাসআলাঃ অবশ্য (উপরোক্তরূপ আত্মীয় ছাড়া) অপর কেহ হইলে তাহাকে দান করার পর তাহার নিকট হইতে ফেরত লওয়া গোনাহ্ বটে, কিন্তু ফেরত নিতে চাহিলে যদি সে খুশী হইয়া দিয়া দেয়, তবে সে জিনিসের মালিক হইয়া যাইবে; আর খুশী হইয়া না দিলে এবং জবরদস্তী ফেরত নিলে, সে ঐ জিনিসের মালিক হইবে না। কিন্তু কোর্টের বিচারে ফেরত পাইলে সে ঐ জিনিসের মালিক হইবে।

৭। মাসআলাঃ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আখেরাতের ছওয়াবের নিয়তে কোন গরীবকে বা কোন তালেবে এলমকে কিছু দান করিলে উহা ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে না।

৮। মাসআলাঃ কোন গরীবকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এক পয়সা দান করিতে গিয়া ভুলে যদি আধুলি তার হাতে চলিয়া যায়, তবে সে আধুলি ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার আর তাহার থাকে না।

কেরায়া এবং মজুরীর বিবরণ

(ঘর-বাড়ী গাড়ীঘোড়া প্রভৃতির উজরতকে সাধারণতঃ কেরায়া বা ভাড়া বলে; আর মানুষের উজরতকে সাধারণতঃ মজুরী বা পারিশ্রমিক বলে; আর একটু উপরের হইলে বেতন বলে। জমিনের উজরতের কারবারকে সাধারণতঃ ইজারা বলে। কিন্তু এইগুলির সবই হইতেছে পয়সার পরিবর্তে কোন জিনিসকে বা কাহাকেও খাটাইয়া নেওয়া। আরবী ভাষায় এই ধরনের সমস্ত কারবারকে "ইজারা" বলে।)

১। **মাসআলাঃ** মাসিক কেরায়া ঠিক করিয়া আপনি একখানা ঘর কেরায়া করিলেন; বাড়ীওয়ালাও আপনাকে চাবি বুঝাইয়া দিল। এখন মাস অন্তর ধার্যকৃত কেরায়া দেওয়া আপনার উপর ওয়াজিব হইয়া গেল—চাই আপনি ঐ বাড়ীতে থাকেন বা না থাকেন, (এইরূপে বার্ষিক কেরায়া নগদ টাকা বা ধান বা পাট বা অন্য কোন জিনিস ঠিক করিয়া আপনি এক খন্ড জমি বার্ষিক কেরায়া নিলেন জমিওয়ালাও আপনাকে জমিতে দখল দিয়া দিল; এখন বৎসর অন্তে ধার্যকৃত কেরায়া দিয়া দেওয়া আপনার উপর ওয়াজিব হইয়া গেল—চাই আপনি চাষ করেন আর না করেন, ফসল হউক বা না হউক।)

২। **মাসআলাঃ** আপনার নিকট দর্জি কাপড় সেলাই করিয়া আনিয়াছে, রংরেজ কাপড়ে রং দিয়া আনিয়াছে বা ধোপা কাপড় ধুইয়া আনিয়াছে—এ অবস্থায় তাহাদের পয়সা আগে দিয়া তারপর আপনার জিনিস নেওয়া উচিত; পয়সা না দিয়া জোর করিয়া মাল আপনি নিতে পারেন না; বরং পয়সা না পাওয়া পর্যন্ত তাহারা আপনার মাল আটকাইয়া রাখিতে পারে। এই অধিকার তাহাদের আইনত আছে। কিন্তু কোন মেহনতী মজদুর দ্বারা একটা বোঝা বহন করাইয়া আনিলে মজুরীর জন্য তাহার মাল আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কেননা, তাহাদের কাজের কারণে মালের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয় না। কিন্তু দরজী এবং রংরেজের কাজে পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়াছে। (তাহাদের গায়ের ঘাম শুকাইবার আগে ধার্যকৃত ন্যায্য মজুরী তাহাদিগকে দিয়া দিতে হইবে।)

৩। **মাসআলাঃ** যদি এইসব কাজে মজুরী ঠিক করিবার সময়ে এইরূপ শর্ত করে যে, তুমিই সেলাই করিবে, তুমিই রং করিবে, তোমার নিজেরই এই কাজ করিতে হইবে, তবে অন্যের দ্বারা উহা করান জায়েয হইবে না, নিজেরই করিতে হইবে। আর যদি তদ্রূপ শর্ত না করে, তবে অন্যের দ্বারাও করাইতে পারিবে।

ফাছেদ ইজারার বর্ণনা

১। **মাসআলাঃ** যদি বাড়ীভাড়া নেওয়ার কালে সময় নির্দিষ্ট না করে যে, কত দিনের জন্য এই কেরায়া নিয়াছে কিম্বা ভাড়া নির্ধারিত না করিয়াই লইয়াছে, কিংবা এই শর্ত করিয়াছে যে, যাহাকিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে, উহাও আমি (ভাড়াটিয়া) ঠিক করিয়া লইব, কিংবা এই ওয়াদায় বাড়ীভাড়া নিয়াছে যে, বাড়ী মেরামত করাইয়া নিবে এবং ইহাই বাড়ী ভাড়াস্বরূপ হইবে। এই ধরনের কেরায়া ফাছেদ। আর যদি এরূপ বলে যে, তুমি এই বাড়ীতে থাক এবং বাড়ী মেরামত করিও ভাড়া লাগিবে না, তবে ইহা আ'রিয়াত হইবে এবং জায়েয হইবে।

২। **মাসআলাঃ** কেহ এই বলিয়া ভাড়া লইল যে, দুই টাকা মাসিক ভাড়া দিব, তবে শুধু এক মাসের জন্যই কেরায়া ছহীহ্ হইল। মাসের শেষে বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াকে উঠাইয়া দিতে পারে। আবার যদি দ্বিতীয় মাসে ভাড়াটিয়া রহিয়া গেল, তবে আবার এক মাসের জন্য কেরায়া ছহীহ্ হইয়া গেল, এমনিভাবে প্রত্যেক মাসে নূতন কেরায়া হইতে থাকিবে। অবশ্য যদি ভাড়া লইবার সময় ইহাও বলে যে, চার মাস কিংবা ছয়মাস থাকিব, তবে যত দিনের কথা বলিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত ভাড়া লওয়া ছহীহ্ হইবে। ঐ সময়ের পূর্বে বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াকে উঠাইতে পারিবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** কেহ পিষাইবার জন্য গম দিয়া বলিল, ইহার মধ্যে হইতে এক পোয়া আন্দাজ মজুরী হিসাবে নিবেন। কিংবা ক্ষেতের ফসল কাটাইয়া বলিল, ইহা হইতে এই পরিমাণ ফসল মজুরী হিসাবে নিবেন, এসমস্ত (কেরায়া) ফাছেদ।

৪। **মাসআলা ঃ** ফাছেদ ইজারার হুকুম এই যে, যাহাকিছু নির্ধারিত হইয়াছে তাহা দেওয়া যাইবে না; বরং এতটুকু কাজের জন্য যে পরিমাণ মজুরীর দস্তুর আছে, কিংবা এমন ঘরের ভাড়া যে পরিমাণ দস্তুর আছে, তাহা দেওয়া হইবে। কিন্তু যদি দস্তুর পরিমাণ ভাড়া বা মজুরী বেশী হয় অথচ ঠিক হইয়াছিল কম, তবে দস্তুর পরিমাণ দেওয়া হইবে না; বরং যাহা ঠিক হইয়াছিল তাহাই পাইবে। মোট কথা, যাহা কম হইবে তাহাই পাইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** গান, বাদ্য, নাচ, বানর নাচান ইত্যাদি বেহুদা কাজের ইজারা ছহীহ্ নহে, একেবারেই বাতেল। এজন্য কিছুই দেওয়া যাইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** কোন হাফেযকে মজুর রাখিল যে, এতদিন পর্যন্ত অমুকের কবরে কোরআন পড়িতে থাক এবং ছওয়াব বখশাইতে থাক। ইহা ছহীহ্ নহে, বাতেল। পড়নেওয়ালাও ছওয়াব পাইবে না এবং মৃত ব্যক্তিও পাইবে না এবং সে কোন বেতন পাইবার হকদার হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** পড়ার জন্য কোন কিতাব ভাড়া লইল, ইহাও ছহীহ্ নহে; বরং বাতেল।

৮। **মাসআলা ঃ** ছাগী, গাভী, মহিষ ডাকিলে ষাঁড়, পাঁঠা দেখাইয়া তার মজুরী লওয়া বিলকুল হারাম।

৯। **মাসআলা ঃ** ছাগী, গাভী, মহিষের দুধ পান করিবার জন্য ভাড়া লওয়া দুরুস্ত নাই।

১০। **মাসআলা ঃ** জানোয়ার আধাআধি ভাগে দেওয়া দুরুস্ত নাই, অর্থাৎ এরূপ বলা যে, মুরগী, বকরী লইয়া যাও এবং ভালমত লালন-পালন কর। যত বাচ্ছা হইবে, অর্ধেক তোমার অর্ধেক আমার। ইহা দুরুস্ত নাই।

১১। **মাসআলা ঃ** বাড়ী সাজাইবার জন্য ঝাড় ফানুস ইত্যাদি ভাড়া লওয়া জায়েয নাই। যদি আনে, দাতা ভাড়া পাইবে না; অবশ্য যদি ঝাড় ফানুস আলো জ্বালাইবার জন্য আনে, তবে দুরুস্ত আছে।

১২। **মাসআলা ঃ** কোন ঘোড়া-গাড়ী বা গরুগাড়ী ভাড়া লইল, তবে সাধারণত প্রচলিত প্রথার চেয়ে বেশী বোঝা চাপান দুরুস্ত নাই, এমনিভাবে পাল্কী বহনকারীদের অনুমতি ব্যতীত উহাতে দুই দুইজন বসা দুরুস্ত নাই।

১৩। **মাসআলা ঃ** কাহারও কোন জিনিস হারাইয়া (খোয়া) গেল, সে বলিল, যে হারান জিনিসের সন্ধান বলিয়া দিবে, তাহাকে এক পয়সা দিব। ইহাতে যদি কেহ বলিয়া দেয়, তবুও পয়সা পাইবে না। কেননা এই ইজারা ছহীহ্ হয় নাই। আর যদি কোন নির্দিষ্ট লোককে বলে যে, তুমি যদি বলিতে পার, তবে পয়সা দিব, তবে যদি সে ঐ স্থানে বসিয়াই কিংবা তথায় দাঁড়াইয়া বলিয়া দেয়, তবে কিছু পাইবে না। আর যদি কিছু চলাফেরা করিয়া বলিয়া দেয়, তবে পয়সা আধ পয়সা যাহা ওয়াদা ছিল তাহা পাইবে।

ক্ষতিপূরণ লইবার বর্ণনা

১। **মাসআলা ঃ** পেশাগত রংকার, ধোপা, দর্জি প্রভৃতি দ্বারা কোন কাজ করাইবার জন্য কোন জিনিস দিলে তাহা তাহাদের নিকট আমানত হইবে। যদি চুরি হইয়া যায় বা অনিচ্ছাকৃতভাবে

অন্য কোন রকমে নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহাদের থেকে ভর্তুক লওয়া দুরুস্ত নাই; অবশ্য যদি ধোপার আছাড়ের কারণে কাপড় ফাটিয়া যায় অথবা দামী রেশমী কাপড়কে ভাটী দেওয়ার কারণে উহা খারাপ হইয়া যায়, তবে উহার ভর্তুক লওয়া জায়েয আছে। এমনিভাবে যে কাপড় বদল করিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ লওয়া জায়েয আছে। আর কাপড় খোয়া গেলে যদি বলে, জানি না কিভাবে গেল, কোথায় গেল, তবে উহার ভর্তুক লওয়া জায়েয আছে। আর যদি বলে, আমার বাড়ী চুরি হইয়াছে, উহাতে খোয়া গিয়াছে, তবে ভর্তুক লওয়া দুরুস্ত নাই।

২। **মাসআলাঃ** কোন কুলী মুজুরকে ঘি, তেল ইত্যাদি বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে বলিল। কুলীর কাছ হইতে উহা রাস্তায় পড়িয়া গেল, তবে উহার ভর্তুক লওয়া জায়েয আছে।

৩। **মাসআলাঃ** আর যাহারা পেশাগতভাবে মজুর নহে; বরং নির্দিষ্টভাবে শুধু আপনার কাজের জন্য যেমন বাড়ীর চাকর-বাকর বা ঐ মজুর যাহাকে এক বা দুই-দিনের জন্য রাখিয়াছেন, তাহার হাতে যাহাকিছু ক্ষতি হইবে, উহার ক্ষতিপূরণ লওয়া জায়েয নহে। অবশ্য সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করে, তবে ক্ষতিপূরণ লওয়া জায়েয আছে।

৪। **মাসআলাঃ** যে চাকর শিশুকে খাওয়ানের কাজে নিযুক্ত আছে তাহার বে-খেয়ালিতে শিশুর অলংকার কিংবা অন্য কিছু হারাইয়া গেলে, তাহার ক্ষতিপূরণ লওয়া জায়েয নহে।

ইজারা (কেরায়া) ভাঙ্গিয়া দেওয়ার বর্ণনা

১। **মাসআলাঃ** কোন ব্যক্তি বাড়ী ভাড়া নিয়াছে কিন্তু বেশী রকম পানি পড়ে কিংবা কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে অথবা অন্য কোন ত্রুটি প্রকাশ পাইল যাহার কারণে এখন বসবাস করা মুশকিল, তবে কেরায়া তুড়িয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে। আর যদি একেবারেই পড়িয়া যায়, তবে কেরায়া নিজে নিজেই ভাঙ্গিয়া গেল আপনার তুড়িয়া দেওয়া এবং বাড়িওয়ালার অনুমতি দরকার নাই।

২। **মাসআলাঃ** কেরায়া গ্রহীতা এবং দাতা উভয়ের মধ্যে যদি কেহ মরিয়া যায়, তবে কেরায়া টুটিয়া যাইবে।

৩। **মাসআলাঃ** যদি এমন কোন ওযর সৃষ্টি হয়, যে কারণে কেরায়া তুড়িয়া দেওয়ার আবশ্যক হয়, তবে এই অসুবিধার সময় কেরায়া তুড়িয়া দেওয়া জায়েয আছে। যেমন, কোথাও যাওয়ার জন্য গাড়ী ভাড়া করিল, অতঃপর মত বদলিয়া গেল, যাওয়ার ইচ্ছা রহিল না, তখন কেরায়া তুড়িয়া দেওয়া ছহীহ্ হইবে।

৪। **মাসআলাঃ** কেরায়া ঠিক করিয়া বায়না দেওয়ার যে প্রথা আছে যদি যাওয়া হয় তবে তাহাকে সম্পূর্ণ ভাড়া দেয় এবং ঐ বায়না ভাড়া হইতে কাটিয়া লয়, আর না গেলে ঐ বায়না ফেরত দেয় না, ইহা দুরুস্ত নহে বরং উহা ফেরত দেওয়া চাই।

বিনানুমতিতে পরের জিনিস লওয়া

(বিনা এজাযতে কাহারও কোন জিনিস নেওয়া অন্যায়। অনেকে চাচার বা ভাইর জিনিস আপন লোকের জিনিস বলিয়া বিনা এজাযতে গোপনে বা জোর করিয়া নেয়—ইহা অতি বড় গোনাহ্। যার জিনিস সে যদি খুশী হইয়া না দেয়, তবে সে যতই আপন লোক হউক না কেন, সে জিনিস নেওয়া হারাম হইবে এবং বড় গোনাহ্ হইবে। যতই সামান্য জিনিস হউক না কেন,

মালিকের বিনা খুশীতে গোপনে নিলে চুরির গোনাহ্ হইবে ও প্রকাশ্যে জোরজবরদস্তী করিয়া নিলে যুলুমের গোনাহ্ হইবে। হাদীস শরীফে আছেঃ لَايَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُّسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِہٖ

'কোন মুসলমানের কোন মাল অন্য কাহারও হালাল হইবে না যে পর্যন্ত না সে আন্তরিক খুশীতে এজাযত দিবে।' —মেশ্‌কাত—অনুবাদক)

১। মাসআলাঃ কাহারও কোন জিনিস জবরদস্তী লওয়া, কিম্বা অনুপস্থিতি বিনা অনুমতিতে লওয়া বড় গোনাহ্। কোন কোন স্ত্রীলোক নিজের স্বামী কিম্বা আত্মীয়ের জিনিস বিনানুমতিতে লয়, ইহাও দুরুস্ত নহে। যে জিনিস বিনানুমতিতে লইয়াছে, যদি সেই জিনিস এখনও মওজুদ থাকে, তবে অবিকল সেই বস্তু ফেরত দিয়া দিবে। আর যদি খরচ হইয়া গিয়া থাকে, তবে (তাহার হুকুম এই যে—যদি সে বস্তু এ ধরনের ছিল যে,) বাজারে তাহার অনুরূপ বস্তু পাওয়া গেলে যেমন, ঘি, তেল, টাকা-পয়সা, তবে যে ধরনের বস্তু লইয়াছে—ঐ রকমই আনাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি এমন বস্তু নিয়া নষ্ট করিয়াছে যে) তার নমুনা পাওয়া মুশ্‌কিল হয়। যেমন, মুরগী, বকরী, পেয়ারা, কমলা, নাশপাতি—ইত্যাদি, তবে তার দাম দিতে হইবে।

২। মাসআলাঃ চার পাইয়ার (চৌকির) একটা পায়া ভাঙ্গিয়া গেল, কিম্বা কার্নিশ বা কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেল, কিম্বা অন্য কোন বস্তু নিয়াছিল উহা নষ্ট হইয়া গেল, তবে নষ্ট হওয়াতে যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা দিতে হইবে।

৩। মাসআলাঃ যদি কেহ মালিকের বিনানুমতিতে পরের টাকা দিয়া ব্যবসা করে, তবে আসল টাকা মালিককে ফেরত দিতে হইবে এবং লাভের টাকা গরীব দুঃখীদিগকে খয়রাত করিয়া দিতে হইবে, নিজে নিতে পারিবে না।

৪। মাসআলাঃ কেহ কাহারও একটি চাদর নিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; যদি ছেঁড়া অল্প হয়, তবে ত তৎপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, আর যদি অনেক ছেঁড়া হয় এবং এমন হয় যে, এখন আর চাদররূপে ব্যবহার করা যাইবে না, তবে ঐ ছেঁড়া চাদর তাহাকে দিয়া তাহার নিকট হইতে কাপড়ের সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করিতে হইবে।

৫। মাসআলাঃ যদি কেহ মালিকের বিনানুমতিতে পাথর নিয়া নিজের আংটিতে লাগাইয়া থাকে, তবে পাথরের দাম দিতে হইবে। আংটি ভাংগিয়া পাথর খুলিবার দরকার হইবে না।

৬। মাসআলাঃ যদি কেহ অন্যের কাপড় (মালিকের বিনানুমতিতে) রং করাইয়া থাকে, তবে কাপড় ফেরত লইবার সময় তাহার রঙের দাম দিতে হইবে; অথবা ঐ কাপড় তাহাকে দিয়া তাহার নিকট হইতে সাদা কাপড়ের দাম নিতে হইবে।

৭। মাসআলা ঃ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর যদি আসল জিনিস পাওয়া যায়, তবে দেখিতে হইবে, যদি মালিকের কথা অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব নহে। যদি মালিকের কথার খেলাফ নিজের কথা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিয়া থাকে, তবে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিয়া জিনিসটি তাহাকে দিতে হইবে।

৮। মাসআলাঃ পরের গাই বা বকরী যদি কাহারও বাড়ীতে আসিয়া পড়ে, তবে তার দুধ দোহন করা হারাম। যদি দুধ দুহিয়া বা বেচিয়া থাকে, তবে তার মূল্য দেওয়া ওয়াজিব।

৯। মাসআলাঃ সুই, সূতা, কাপড়ের টুকরা, পান সুপারী, খয়ের তামাক ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসও বিনা অনুমতিতে নিয়া থাকিলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। দুনিয়াতে না দিলে আখেরাতে দিতে হইবে, সুতরাং দুনিয়াতেই তাহা পরিশোধ করিবে বা মাফ চাহিয়া নিবে।

১০। মাসআলা ঃ স্বামী নিজের ব্যবহারের জন্য কোন কাপড় আনিল। কাটিবার সময় স্ত্রী উহা হইতে কিছু বাঁচাইয়া চুরি করিয়া রাখিল, স্বামীকে বলিল না। ইহাও জায়েয নাই। যাহাকিছু নিবে, বলিয়া নিবে। অনুমতি না দিলে লইবে না।

শরীকী কারবার

(শরীকী কারবারের মধ্যে বড় বরকত। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ فَاِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ○

"অর্থাৎ, দুইজনে মিলিয়া শরীক হইয়া যদি কোন শরীকী কারবার করে, তবে আমি নিজে আমার রহ্মত ও বরকত লইয়া তাহাদের সঙ্গে থাকি। যখন তাহারা আমানতে খেয়ানত করে, তখন আমি আমার রহ্মত ও বরকত লইয়া তাহাদের কারবার হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাই।"

দেখা গেল এবং প্রমাণ হইল যে, শরীকী কারবার অর্থাৎ লিমিটেড কোম্পানির কারবার বড়ই বরকতের কারবার—চাই সে কারবার কৃষির মধ্যে হউক বা শিল্পের মধ্যে হউক বা অন্য যে কোন বাণিজ্যের মধ্যে হউক। কিন্তু বরকতের জন্য শর্ত এই যে, কোন শরীকের দ্বারা যেন কোনরূপ খেয়ানত না হয়। খেয়ানত হয় দুই প্রকারে—(১) কাম চুরি করিলে এবং (২) পয়সা চুরি করিলে। অর্থাৎ, শরীকদের মধ্যে যদি একজনেরও নিয়ত, দেল খারাপ হইয়া যায় এবং এইরূপ ভাবে যে, আমি একটু কাজ কম করি ও' খাটিয়া মরুক বা একজনে যদি অন্যের অগোচরে একটি পয়সাও সরাইয়া নেয় বা গোপনে তহ্বীল তছরুফ করে, তবে সে কারবারে আর বরকত এবং আল্লাহ্র খাছ রহ্মত থাকিবে না। —অনুবাদ)

১। মাসআলা ঃ একজন লোক মরিয়া গেল এবং বাড়ী-ঘর কাপড়-চোপড়, লেপ-তোষক, কাঁথা-বালিশ, থাল-বাসন, ঘটি-কলস, টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি ইত্যাদি সম্পত্তি রাখিয়া গেল এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কয়েকজন ছোট-বড়, দুর্বল-সবল ওয়ারিস রাখিয়া গেল। এমন সব মাল সকল শরীকদের শরীকী অংশ হিসাবে হইয়া যাইবে। এখন আর যার যার অংশ পৃথক পৃথক ভাগ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মালের কিছুমাত্র জিনিস সব শরীকদের এজাযত ব্যতিরেকে ব্যবহার করা জায়েয হইবে না। যদি কেহ সকলের বিনা এজাযতে ব্যবহার করে, তবে সে গোনাহ্গার হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** (ত্যাজ্য সম্পত্তির কয়েকজন ওয়ারিস হইলে তাহারা যেমন ভাগ করার আগে একে অন্যের শরীক হয় এবং একজনের বিনা অনুমতিতে অন্যজনে সে জিনিস এস্তেমাল করিতে পারে না। ঐরূপে) দুই তিনজনে মিলিয়া যদি কোন একটা জিনিস খরিদ করে, তবে তাহারাও ঐ জিনিসে একে অন্যের শরীক হয়, কজেই এক শরীকের বিনা অনুমতিতে অন্য শরীক জিনিস এস্তেমাল বা বিক্রয় করিতে পারে না। (এইরূপ শরীক হওয়াকে 'শেরকাতে মিলক' বলে। আর এক রকম শেরকাত আছে, তাহার নাম "শেরকাতে আকদ", এ সম্পর্কে সামনে বলা হইবে।)

৩। মাসআলা ঃ দুইজন লোক এক সঙ্গে শরীক হইয়া আপন পয়সা মিলাইয়া কোন জিনিস কিনিলে সেই জিনিস ভাগ করার সময় উভয়ের সামনে থাকিতে হইবে। একজনে নিজের মতে অন্য জনের অসাক্ষাতে ভাগ করিয়া নিজে নিয়া থাকিলে শক্ত গোনাহ্ হইবে। অবশ্য যদি এমন জিনিস ক্রয় করে, যার মধ্যে ভাল-মন্দ বেশ-কম নাই সবই সমান, তবে সে জিনিস যদি আমানতদারীর সহিত একজনে অন্যজনের অসাক্ষাতে ভাগ করে, তবে তাহা করিতে পারিবে বটে,

কিন্তু ভাগ করার পর তাহাকে দেওয়ার পূর্বে যদি চুরি বা খেয়ানত হয়, তবে এই ক্ষতি উভয়েরই হইবে এবং ভাগ করনেওয়ালার সংগে উভয়ে শরীক হইয়া ভাগ করিয়া নিতে হইবে।

৪। **মাসআলা**ঃ দুইজন লোক ১০০, ১০০ শত টাকা মিলাইয়া মাল কিনিয়া তেজারত (ব্যবসা) করিতে চাহিতেছে এবং পরস্পর চুক্তি করিতেছে যে, আমরা শরীকী কারবার করিব; যাহা কিছু মুনাফা হইবে আমরা সমান ভাগ করিয়া নিব। এরূপ করা শরীঅতে দুরুস্ত আছে এবং এ সম্বন্ধে শরীঅতের কিছু বিধানও আছে। মূলধন সমান হওয়া সত্ত্বেও যদি মুনাফার মধ্যে বেশ-কম ভাগ রাখে, তবে তাহাও জায়েয আছে, এটা তাহাদের এখতিয়ার। আর যদি মূলধন বেশ-কম হওয়া সত্ত্বেও মুনাফার মধ্যে সমান সমান অংশ রাখে, তবে সেটাও তাহাদের দুইজনের এখতিয়ার। (কিন্তু প্রথমেই সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া লইতে হইবে, গোলেমালে কোন কথা বলা যাইবে না।)

৫। **মাসআলা**ঃ শরীক হইয়া কারবার করার চুক্তি ও কথাবার্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে এবং দুই জনের টাকা-পয়সা একত্র করিয়া মিশাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু এখনও কোন মাল কেনা হয় নাই। এমতাবস্থায় হয়ত খোদা নাখাস্তা, সব টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে অথবা টাকা-পয়সা মিশান হয় নাই, এর মধ্যে একজনের টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থা হইলে শরীকী কারবারের যে চুক্তি হইয়াছিল সে চুক্তি শেষ হইয়া যাইবে। পুনরায় শরীকী কারবার করিতে হইলে পুনরায় চুক্তি ও কথাবার্তা ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

৬। **মাসআলা**ঃ দুইজনে শরীকী কারবার করার এইরূপ চুক্তি করিল যে, আমরা দুইজনে সমান সমান মূলধন দিয়া কারবার করিব, আল্লাহ্ কিছু মুনাফা দিলে সমান ভাগ করিয়া নিব (এইরূপ চুক্তি করার পর একজনে তার টাকা দিয়া কিছু মাল খরিদ করিয়াছে, কিন্তু ঘটনাক্রমে অন্যজনের সব টাকা চুরি হইয়া গেল; এমতাবস্থায় যে মাল খরিদ করা হইয়াছে উহাতে দুইজনেই শরীক থাকিবে। যার টাকা দিয়া মাল খরিদ করা হইয়াছে সে অন্যজনের কাছ থেকে মালের অর্ধেক টাকা নিতে পারিবে (এবং মালে লাভ লোকসান হইলে তাহা দুই জনেরই হইবে।)

৭। **মাসআলা**ঃ দুইজনে শরীকী কারবারের চুক্তি করার সময় যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, যাহাকিছু লাভ হইবে তাহা হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা (দশ বিশ, পঞ্চাশ ইত্যাদি) আমার আর বাকী সবই তোমার; এইরূপ শর্ত করিলে তাহা দুরুস্ত হইবে না। (লাভ অংশে অংশে ঠিক করিতে হইবে—তা চাই সমান অংশ হউক বা বেশ-কম হউক। যেমন,অর্ধেক-অর্ধেক, সিকি-বার আনা, দশ আনা-ছয় আনা ইত্যাদি।)

৮। **মাসআলা**ঃ শরীকী কারবারে মাল কেনার পর যদি মাল চুরি হয়, তবে তাহা উভয়েরই যাইবে, একজনের যাইবে না। যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, মুনাফা (লাভ) হইলে দুইজনের, কিন্তু লোকসান হইলে সেটা সবই আমার, এইরূপ শর্ত করা দুরুস্ত নহে।

৯। **মাসআলা**ঃ শরীকী কারবার যদি কোন শর্তের কারণে ফাছেদ বা না-দুরুস্ত সাব্যস্ত হয় তবে মুনাফা (লাভ) ভাগ করার সময় চুক্তির কথাবার্তার (কওল ও করার) প্রতি দেখা যাইবে না; বরং মূলধনের প্রতি দেখিয়া মুনাফা ভাগ করিতে হইবে; যার যে পরিমাণ পুঁজি সে সেই পরিমাণ লাভের অংশ পাইবে। চুক্তির সময়কার' কওল ও করার ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্য হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীকী কারবার ছহীহ্ হইবে, কোন শর্তের কারণে ফাছেদ না হইবে।

১০। মাসআলাঃ যদি দুইজন দর্জি এইরূপ শরীকী কারবারের চুক্তি করে যে, আমরা দুইজনে এক সঙ্গে কারার করিব, যা কিছু সেলাইর কাজ আসিবে দুইজনেই করিব এবং উহার মজুরী দুইজনে ভাগ করিয়া নিব। এরূপ চুক্তিতে শরীকী কারবার দুরুস্ত আছে। (যদি কাজ সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও পয়সা কম-বেশ নেওয়ার চুক্তি করিয়া থাকে বা কাজে কিছু বেশ-কম সত্ত্বেও পয়সা সমান সমান নেওয়ার চুক্তি করিয়া থাকে, তবে সেরূপ চুক্তি করাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু এরূপ চুক্তি করা দুরুস্ত নাই যে, যা কিছু পাওয়া যাইবে তার থেকে পাঁচ টাকা আমার আর বাকী সব তোমার।

১১। মাসআলাঃ শরীকী কারবারের চুক্তিতে যে কয়জন আবদ্ধ হইবে তাহাদের প্রত্যেককেই সকল কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। একজনে কাজ নিলে অন্যজনে বলিতে পারিবে না যে, 'তুমি কাজ নিয়াছ, তুমিই কাজ কর, আমি করিব না, বরং সকলের উপরই ঐ কাজ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে। (সময় মত নিয়ম মত সকলেরই কাজ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে।)

১২। মাসআলাঃ শরীকী কারবারের দোকানে একজনে কাপড় সেলাই করিতে দিল; কাপড়ওয়ালা যখন কাপড় নিতে আসিবে, তখন শরীকদের যেই উপস্থিত থাকুক না কেন, তাহার নিকটই সে কাপড় চাহিতে পারিবে। উপস্থিত ব্যক্তি এরূপ বলিতে পারিবে না যে, 'আমি ত আপনার কাপড় রাখি নাই, যে রাখিয়াছে তাহার কাছে চাহিবেন।' এইরূপ বলা একদম জায়েয হইবে না। শরীকদের মধ্যে যাহার কাছেই চাওয়া হউক সেই দিতে বাধ্য থাকিবে যদিও সে নিজে কাপড় না রাখিয়া থাকে।

১৩। মাসআলাঃ ঐ কাপড়ওয়ালার কাছ থেকে পয়সা গ্রহণ করার অধিকারও শরীকদের মধ্যে সকলেরই আছে এবং ইহাদের যাহার কাছে দিবে কাপড়ওয়ালা দেনামুক্ত হইয়া যাইবে। কাপড়ওয়ালাও ইহা বলিতে পারিবে না যে, যাহাকে কাপড় দিয়াছিলাম, পয়সা তাহাকে দিব। (আর যাহার কাছে কাপড় দেওয়া হইয়াছিল সেও একথা বলিতে পারিবে না যে, পয়সা আমারই কাছে দিতে হইবে, অন্য শরীকদের কাছে দিতে পারিবে না।)

১৪। মাসআলাঃ দুইজনে যদি এইরূপ চুক্তি করে যে, চল, দুইজনে শরীকীভাবে নদী বা বিল হইতে মাছ ধরিয়া আনি অথবা জঙ্গল বা মাঠ হইতে লাকড়ী বা নাড়া (খড়) যোগাড় করিয়া আনি, তবে যেহেতু বিলের বা নদীর মাছ সকলের জন্য মোবাহ, সেই হেতু যে যেইটা ধরিবে সেই সেইটার মালিক হইবে। আর জঙ্গল বা মাঠের লাকড়ী বা নাড়া যে যাহা সংগ্রহ করিবে, সে তাহার মালিক হইবে। এইজন্য এইরূপ মোবাহ জিনিসের মধ্যে শরীকী কারবারের কোন অর্থ হয় না। (কিন্তু যদি চুক্তি করিয়া এইরূপ কাজ করে এবং কাঠ বা লাকড়ী একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখে, তবে যে হিসাবে চুক্তি করিয়াছে সেই হিসাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।)

১৫। মাসআলাঃ একজন অপর জনকে বলিল, আমার ডিমগুলি তোমার মুরগীর নীচে (তাও দিবার জন্য) রাখ, যে পরিমাণ বাচ্চা ফুটিবে আমরা উভয়ে আধাআধি ভাগ করিয়া লইব। ইহা দুরুস্ত নাই।

শরীকী জিনিস ভাগ করিবার বর্ণনা

১। মাসআলাঃ দুইজনে মিলিয়া বাজার হইতে গেঁহু আনাইল। এখন ভাগ করার সময় উভয়ের উপস্থিতি দরকার নাই। দ্বিতীয় অংশীদার উপস্থিত না থাকিলে তবু ঠিক ঠিক মাপিয়া

উহার অংশ পৃথক করিয়া নিজের অংশ লওয়া দুরুস্ত আছে। যখন নিজের অংশ পৃথক করিয়া লইবে তখন খাও পান কর, কাহাকেও দান কর, যা ইচ্ছা কর সব জায়েয। এরূপে ঘি, তৈল, ডিম ইত্যাদিরও এই হুকুম। মোটকথা, যে বস্তু এরূপ যে উহাতে কিছু বেশ-কম হয় না; যেমন ডিম, সব ডিম সমান হয় কিম্বা গেঁহু দুই ভাগ করা হইল এই ভাগ ঐ ভাগ একই রকম, উভয় অংশ সমান। এ সকল বস্তুর শুধু এই হুকুম যে, দ্বিতীয় জন উপস্থিত না থাকিলেও অংশ ভাগ করিয়া লওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু দ্বিতীয় অংশীদার নিজের অংশ গ্রহণ করে নাই, অথচ তাহার অংশ নষ্ট হইয়া গেল, তবে ঐ ক্ষতি উভয়েরেই হইবে, যেমন শরীকী কারবারে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু যেসমস্ত জিনিসে বেশ কম হয়, যেমন পেয়ারা, কমলা ইত্যাদি, তবে উভয় অংশীদার উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অংশ ভাগ করিয়া লওয়া দুরুস্ত নহে।

২। **মাসআলা ঃ** দুই জনে মিলিয়া আম, পেয়ারা ইত্যাদি আনাইল এবং একজন কোথাও চলিয়া গেল এখন আর উহা হইতে খাওয়া দুরুস্ত নাই। যখন সে আসিবে তাহার সম্মুখে নিজের ভাগ পৃথক করিয়া লইবে নচেৎ শক্ত গোনাহ্ হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** দুই জনে মিলিয়া বুট ভাজাইল। এখন শুধু অনুমান করিয়া ভাগ দুরুস্ত নাই; বরং খুব ভাল ভাবে মাপিয়া সমান সমান করিয়া লওয়া চাই; কোন অংশে বেশী হইলে সুদ হইবে।

বন্ধক রাখার বিবরণ

১। **মাসআলা ঃ** তুমি কাহারও নিকট হইতে ১০ টাকা করয লইয়াছ এবং বিশ্বাসের জন্য নিজের কোন জিনিস তাহার কাছে রাখিয়াছ; যখন টাকা দিব, তখন আমার জিনিস লইয়া যাইব। ইহা জায়েয, ইহাকে বন্ধক বা রেহেন বলে। কিন্তু সুদ দেওয়া কোন প্রকারেই দুরুস্ত নাই। যেমন আজকাল মহাজনেরা সুদ লইয়া বন্ধক রাখে ইহা দুরুস্ত নাই। সুদ লওয়া এবং দেওয়া উভয় হারাম।

২। **মাসআলা ঃ** কোন জিনিস বন্ধক দিলে যাবৎ করয পরিশোধ না করিবে তাবৎ সে জিনিস ফিরাইয়া লওয়ার বা দখল লওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** কোন জিনিস বন্ধক রাখিলে সেই জিনিস বন্ধক গ্রহীতা আদৌ কোনরূপ ব্যবহার করিলে তাহা না-জায়েয হইবে। বাগান বন্ধক রাখিলে উহার ফল খাওয়া, জমি বন্ধক রাখিলে তাহার ফসল খাওয়া বা টাকা খাওয়া, ঘর বন্ধক রাখিলে উহাতে বাস করা। (জেওর বন্ধক রাখিলে তাহা ব্যবহার করা, থালা বাটি বন্ধক রাখিলে তাহা ব্যবহার করা)—সবই না-জায়েয (এবং সবই সুদ।)

৪। **মাসআলা ঃ** যদি গরু, ঘোড়া বা বকরী বন্ধক রাখে, তবে (তার খোরাক ইত্যাদির খরচ মালিকের জিম্মায়। রেহেন রাখনেওয়ালা গাই বা বকরীর দুধ খাইতে পারিবে না। বলদ দ্বারা হাল চাষ করিতে পারিবে না, ঘোড়ায় ছওয়ার হইতে পারিবে না।) গাই, বকরীর দুধ, বাছুর সবই তার কাছে আমানত থাকিবে। যখন করযদার করযের টাকা পরিশোধ করিবে, তখন দুধের টাকা ও বাছুর সবই তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। অবশ্য যাহাকিছু খরচ হইয়াছে সে খরচের টাকা কাটিয়া রাখিতে পারিবে। (খোরাকী খরচ ও দুধের দাম যদি সমান হয় এবং ঘোড়ার ঘাস প্রভৃতি খরচ যদি ঘোড়ার কেরায়ার সমান হয় বা বলদের হালের দাম এবং বলদের খোরাকীর খরচ সমান

হয়, তবে অন্যের দ্বারা সালিসী বিচার করাইয়া খোরাকীর খরচ পরিমাণ ঘোড়া বা বলদ খাটাইয়া নিতে পারিবে এবং গাই বকরীর দুধও সেই পরিমাণ নিতে পারিবে।)

৫। মাসআলাঃ করযের কতক টাকা পরিশোধ করার পর বন্ধকী জিনিস ছাড়াইয়া নেওয়ার অধিকার হয় না। করযের টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিয়া দিলে বন্ধকী জিনিস ফেরত পাইবে।

৬। মাসআলাঃ করযের টাকার পরিমাণ এবং বন্ধকী জিনিসের মূল্যের পরিমাণ যদি সমান সমান হয় অথবা বন্ধকী জিনিসের মূল্যের পরিমাণ করযের টাকার চেয়ে বেশী হয় এবং বন্ধকী জিনিস কোন রকমে খোয়া যায়, তবে করযের টাকা শোধ হইয়া যাইবে। করয দেনেওয়ালা আর তার করযের টাকা চাহিতে পারিবে না এবং জিনিসওয়ালাও তার জিনিস চাহিতে পারিবে না। আর যদি বন্ধকী জিনিসের মূল্য করযের টাকার চেয়ে কম হয়, তবে জিনিসের যে মূল্যে ছিল সেই পরিমাণ করয পরিশোধ হইবে এবং বাকী টাকা দিয়া দিতে হইবে।

জমি বর্গা দেওয়া,পত্তন দেওয়া প্রভৃতি

১। মাসআলাঃ অংশ হিসাবে জমি বর্গা দিলে তাহা জায়েয আছে। এখানে ৪টি জিনিস আছেঃ—(১) জমি, (২) লাঙ্গল-গরু, (৩) বীজ এবং (৪) মেহ্নত। জমি একজনের, বাকী তিনটি অন্য জনের বা জমি এবং বীজ একজনের, লাঙ্গল-গরু ও মেহনত অন্য জনের, অথবা জমি, বীজ ও লাঙ্গল-গরু একজনের এবং মেহ্নত অন্য জনের অথবা জমি এবং লাঙ্গল-গরু একজনের, বীজ এবং মেহ্নত অন্য জনের—এই সব রকমেই জমি বর্গা দেওয়া জায়েয। ভাগ কি রকম হইবে সেটা নির্ভর করে দুইজনের স্বাধীন ইচ্ছার উপর; দুইজনে রাজী হইয়া যাহা ধার্য করিবে সেইটাই ওয়াজিব হইবে। কার কত অংশ হইবে সেটা দুইজনে মিলিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে, নতুবা জায়েয হইবে না। এইরূপে অংশ হিসাবে ধার্য না করিয়া যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করে যেমন, এক মণ আমার, বাকী সব তোমার বা জমির এই পার্শ্বে যা কিছু হইবে সেটা আমার আর বাকীটা তোমার—তাহা হইলে ইহা জায়েয হইবে না।

২। মাসআলাঃ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার পরিবর্তে অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ ধানের বা চাউলের পরিবর্তে জমি বাৎসরিক পত্তন দেওয়া অর্থাৎ ইজারা দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু যদি শর্ত করা হয় যে, এই জমিতে যে ধান হইবে, সেই ধানের দুই মণ ধান আমাকে দিতে হইবে, তবে তাহা জায়েয হইবে না।

ছোলেহ করা

১। মাসআলাঃ ছোলেহ করিবার এবং শর্ত করিবার অধিকার মানুষের আছে। যে যাহা ছোলেহ করিবে বা শর্ত করিবে, তার জন্য সেটা পালন করা ওয়াজেব হইবে—যাবৎ ছোলেহ এবং শর্ত শরীঅতের সীমা লংঘন না করিবে।

স্বীকার-উক্তি, দাবী, সাক্ষ্য ও বিচার

মানুষ যাহাকিছু নিজ মুখে নিজের উপর স্বীকার করিবে, সেজন্য সে দায়ী হইবে; তাহার জন্য আর কোন সাক্ষী-সাবুতের দরকার হইবে না। অন্যের উপর যদি দাবী করে, তবে তাহার জন্য অবশ্য সত্য সাক্ষীর দরকার হইবে। সত্য সাক্ষী ব্যতিরেকে অন্যের উপর কিছু প্রমাণ করা যাইবে

না। কাহারও বিরুদ্ধে যদি কেহ কিছু দাবী করে, তবে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, বাদীর ঐ দাবী স্বীকার করে কি না। যদি স্বীকার করে, তবে কোন অসুবিধা রহিল না। আর যদি স্বীকার না করে, তবে বাদী পক্ষ যদি তাহাকে কছম খাওয়াইতে চায়, তবে তাহার কছম খাইতে হইবে।

মিথ্যা দাবী করা, মিথ্যা মোকদ্দমা করা গোনাহ্ কবীরা। মিথ্যা কছম খাওয়া, মিথ্যা হলফ করা গোনাহ্ কবীরা। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া গোনাহ্ কবীরা। অন্যায় বা পক্ষপাতিত্ব করিয়া বিচার করাও গোনাহ্ কবীরা। বিচারকের দায়িত্ব সত্য সাক্ষী তদন্ত করিয়া বাহির করা এবং সত্য সাক্ষীর উপর নির্ভর করিয়া বিচার করা, তদন্ত করা সত্ত্বেও যদি মিথ্যা না ধরিতে পারে, তবে অবশ্য বিচারক দায়ী হইবে না। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকিলে সাক্ষীই দায়ী হইবে।

সাক্ষী

১। **মাসআলা ঃ** সত্য সাক্ষ্য দান করা ফরয, মিথ্যা সাক্ষ্য দান হারাম, গোনাহে কবীরা। যখন কাহারও হক নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, তখন সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। যেনার সাক্ষ্য গোপন করা আফযাল। চারিজনে একত্রে যেনার সাক্ষ্য না দিলে, একজন দুইজন বা তিনজনে সাক্ষ্য দিলে হদ্ লাগানোর উপযুক্ত হইবে না।

২। **মাসআলা ঃ** যেনা প্রমাণ করার জন্য চারিজন চরিত্রবান সত্যবাদী পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন। চুরি, মিথ্যা, তোহ্মাত, মদ্যপান এবং মানুষ খুন প্রমাণ করার জন্য দুইজন চরিত্রবান সত্যবাদী সাক্ষীর প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে দুইজন চরিত্রবান সত্যবাদী পুরুষ বা একজন চরিত্রবান সত্যবাদী পুরুষ এবং দুইজন চরিত্রবতী সত্যবাদিনী স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে। অবশ্য স্ত্রীলোকের এমন বিষয় যাহা পুরুষের জানার কথা নয়—যেমন, প্রসব, কৌমার্য, সহবাসের অনুপযুক্ততা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

৩। **মাসআলা ঃ** সব ক্ষেত্রে সাক্ষী সত্যবাদী হইতে হইবে। মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য কোথাও গ্রহণযোগ্য নহে। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রামাণ হইলে সে শাস্তির উপযুক্ত। হযরত ওমর (রাঃ) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে চল্লিশ কোড়া মারার শাস্তি প্রদান করিয়াছেন।

অন্তিমকালে

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় চিন্তা খাতেমা-বিল-খায়ের অর্থাৎ ঈমানের সহিত মউত। যখন মানুষ ক্ষণস্থায়ী জীবন পার হইয়া পরপারের যাত্রী হয়, তখন তাহার কর্তব্য হয় পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের সরঞ্জাম এইখান হইতেই যোগাড় করিয়া নেওয়া। গোনাহ্-খাতার জন্য তওবা এস্তেগফার করিয়া, কাহারও কোন দেনা থাকিলে তাহা পরিশোধ করিয়া, যাহাদের সঙ্গে উঠা-বসা, চলা-ফেরা করা হইয়াছে তাহাদের কাছে মাফ চাহিয়া নেওয়া—এগুলি তখনকার কর্তব্য—যাহাতে পবিত্র আত্মা নিয়া মনের মধ্যে আল্লাহ্র প্রেম ও ভালবাসা রাখিয়া আল্লাহ্র যেকর কলেমা শরীফ পড়িতে পড়িতে যে মাওলার কাছ হইতে তাহার জান আসিয়াছে, সেই মাওলার কাছেই আবার জানকে সোপর্দ করিয়া দেওয়া যায়। —অনুবাদক

অছিয়ত

১। মাসআলাঃ (মৃত্যুকালে কিছু আদেশ উপদেশ দান করিয়া যাওয়াকে অছিয়ত বলে।) আমার মৃত্যুর পরে এত মাল বা এত টাকা অমুককে বা অমুক সৎকাজে দান করিও—এইরূপ বলার নাম অছিয়ত। এইরূপ কথা যদি জীবিত অবস্থায় সুস্থ শরীরেও বলে তাহাও অছিয়ত হইবে। আর যদি যে রোগে মারা যায়, সেই রোগ-শয্যায় বলে তাহাও অছিয়ত হইবে। আর যদি রুগ্ন অবস্থায় বলে এবং সে রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহাও অছিয়ত হইবে। যদি নিজ হাতে দান করে বা কাহারও করয মাফ করিয়া দেয়, তবে ইহা সুস্থ শরীরে হইলে দান হইবে, সর্বপ্রকারে জায়েয; আর যদি এমন রোগের অবস্থায় বলে, যে রোগ হইতে সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে, তবে তাহাও দুরুস্ত হইবে। আর যদি রুগ্ন অবস্থায় দান করে, কিন্তু সেই রোগেই সে মারা যায়, তবে সেটা (দান হইবে না,) অছিয়ত হইবে। অছিয়ত সম্বন্ধে সামনে মাসআলা বয়ান করা হইবে।

২। মাসআলাঃ যদি কাহারও জিম্মায় কাযা নামায থাকিয়া থাকে, কাযা রোযা থাকিয়া থাকে, যাকাৎ না দিয়া থাকে, (কোরবানী না দিয়া থাকে,) কছমের কাফ্ফারা আদায় না করিয়া থাকে, রোযার কাফ্ফারা আদায় না করিয়া থাকে, কছমের (শর্ত পুরা হওয়া সত্ত্বেও মান্নত আদায় না করিয়া থাকে, বা ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করিয়া থাকে, অথচ) এগুলি আদায় করার মত অর্থ-সংগতি তাহার আছে, তবে মৃত্যুর পূর্বে এইগুলি আদায় করার জন্য অছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। এইরূপে যদি কাহারও দেনা থাকিয়া থাকে অথবা তাহার নিকট অন্য কাহারও মাল আমানত রাখা থাকে, তবে করয আদায় করিয়া দেওয়ার জন্য, আমানতের মাল যারটা তাহাকে দিয়া দেওয়ার জন্য মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব (এইসব অছিয়ত না করিয়া মরিলে ভীষণ গোনাহ্গার হইবে)। এতদ্ব্যতীত যদি কোন আত্মীয় গরীব হয় এবং শরীঅত মতে ওয়ারেস হয় না, অথচ মৃত ব্যক্তির প্রচুর সম্পত্তি আছে, তাহাদিগকে কিছু দেওয়ানের ব্যবস্থা করা বা অছিয়ত করা মোস্তাহাব।[১] এছাড়া অন্যান্যদের জন্য অছিয়ত করা, না করা তাহার ইচ্ছা।

৩। মাসআলাঃ মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে সর্বপ্রথমে তাহার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর যাহাকিছু থাকে, তাহার দ্বারা আগে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। এমন কি, যদি তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও তাহার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, তবে তাহাও করিতে হইবে। ওয়ারিসগণ কিছু না পাইলেও তাহার ঋণ আগে পরি-শোধ করিতে হইবে। ঋণ পরিশোধের অছিয়ত না করিয়া থাকিলেও ঐ ভাবে আগে ঋণ পরিশোধ করিতেই হইবে। (কেননা, এটা হক্কুল এবাদ। ঋণ পরিশোধের পর কিছু বাঁচিলে ওয়ারিসগণ পাইবে, নতুবা পাইবে না) এছাড়া অন্যান্য যত অছিয়ত (এমন কি ফরয যাকাতের অছিয়তও)

টিকা

১ কোন কোন ইমামের নিকট ওয়াজিব, কোন কোন ইমামের নিকট মোস্তাহাব।

তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তির মধ্যে তাহার করিবার এখতিয়ার আছে, তার বেশীর মধ্যে নহে এবং অছিয়ত করিয়া থাকিলে তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি পর্যন্তই অছিয়ত পালনের জন্য খরচ করা ওয়ারিসদিগের উপর ওয়াজিব, তাহার বেশীতে নয়। অবশ্য ওয়ারিসগণ সকলে খুশী হইয়া যদি নিজ নিজ অংশ না নেয় এবং বলে যে, অছিয়ত পুরা কর, তবে তৃতীয়াংশের অধিক অছিয়তে ব্যয় করা জায়েয আছে। কিন্তু এখানে সাবধান, ওয়ারিসগণের মধ্যে কেহ নাবালেগ থাকিলে তাহার অংশ সে অনুমতি দিলেও কাহার খরচ করিবার অধিকার নাই (এবং যাহার অংশ তাহার বিনা অনুমতিতে অন্যের খবচ করিবারও অধিকার নাই।)

৪। মাসআলা ঃ যাহারা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হইবে, তাহাদের কাহারও জন্য অছিয়ত করিলে সে অছিয়ত ছহীহ্ হইবে না। আত্মীয়দের মধ্যে যাহারা ওয়ারিস হইবে না, তাহাদের জন্য অছিয়ত করিতে পারিবে; আত্মীয় ছাড়া অন্যদের জন্যও অছিয়ত করিতে পারিবে। কিন্তু (ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট) মোট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত করিতে পারিবে, তার বেশী নয়। যদি কোন ওয়ারিসের জন্য অছিয়ত করা হয় এবং বাকী ওয়ারিসগণ খুশীর সংগে তাহাতে এজাযত দেয়, তবে তাহা পালন করা যাইবে। এইরূপে যদি সম্পত্তির তিন ভাগের চেয়ে বেশীরও অছিয়ত করে এবং সব ওয়ারিসগণ খুশীর সঙ্গে এজাযত দেয়, তবে তাহাও জারি করা যাইবে; অন্যথায় এক তৃতীয়াংশই পাইবে। কিন্তু ওয়ারিসগণের মধ্যে কেহ কেহ নাবালেগ থাকিলে তাহার এজাযত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫। মাসআলা ঃ যদিও সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ অছিয়ত করার এখতিয়ার আছে কিন্তু পূর্ণ তৃতীয়াংশ অছিয়ত না করিয়া কম অছিয়ত করাই উত্তম; বরং খুব বড় মালদার না হইলে অছিয়ত না করাই উচিত; ওয়ারিসানদের জন্য ছাড়িয়া যাওয়া ভাল, যেন ভালভাবে আরামে জীবন যাপন করিতে পারে। কেননা, নিজের ওয়ারিসানদের স্বচ্ছন্দে আরামে ছাড়িয়া যাওয়াতেও ছওয়াব পাওয়া যায়। অবশ্য যদি দরকারী ও জরুরী অছিয়ত হয়, যেমন, নামায, রোযার ফিদিয়া, তবে উহার অছিয়ত সর্বাবস্থায় করিয়া যাইবে, নচেৎ গোনাহ্‌গার হইবে।

৬। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে বলিয়া গেল যে, আমার মৃত্যুর পর একশত টাকা দান করিয়া দিও। এরূপ অবস্থায় দেখিতে হইবে যে, তাহার কাফন ও ঋণ আদায়ের পর তিনশত টাকা তাহার সম্পত্তিতে আছে কি না। যদি তিনশত টাকা বা তাহারও বেশী থাকিয়া থাকে, তবে পুরা একশত টাকা দান করাই তাহার ওয়ারিসদিগের উপর ওয়াজিব হইবে। আর যদি তিনশত টাকার কম থাকে, তবে যাহা থাকিবে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ যত টাকা হয়, তত টাকা দান করা ওয়াজিব, তাহার বেশী ওয়াজিব হইবে না। আর সমস্ত ওয়ারিস খুশী হইয়া একশত পুরা করিয়া দান করিলে সেটা স্বতন্ত্র কথা (কিন্তু এইরূপ করা ওয়াজিব হইবে না।)

৭। মাসআলা ঃ যাহার আদৌ কোন ওয়ারিস নাই, সে তাহার ষোল আনা সম্পত্তিও দান করিয়া যাইতে পারিবে, তাহাতে আপত্তি নাই। যদি শুধু স্ত্রী থাকে এবং আর কেহ না থাকে, তবে চারি ভাগের তিন ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত করিতে পারিবে। যদি শুধু স্বামী থাকে এবং আর কেহ না থাকে, তবে অর্ধেক সম্পত্তির অছিয়ত করিতে পারিবে।

৮। মাসআলা ঃ না-বালেগের অছিয়ত দুরুস্ত নহে।

৯। মাসআলা ঃ কেহ অছিয়ত করিল, আমার জানাযার নামায অমুক ব্যক্তি পড়িবে, অমুক শহরে, অমুক কবরস্থানে, অমুকের কবরের কাছে আমাকে দাফন করিবে, অমুক কাপড় দ্বারা

আমাকে কাফন দিবে, আমার কবর পাকা করাইবে, কবরে বুরূজ তৈয়ার করিবে, কোন হাফেয ছাহেবকে বসাইয়া দিবে যে, কোরআন পড়িয়া পড়িয়া আমাকে বখশিয়া দিবে, তবে এই সমস্ত অছিয়ত পূর্ণ করা জরুরী নহে, বরং শেষের তিনটি অছিয়ত তো জায়েযই নহে। পুরা করিলে গোনাহ্গার হইবে।

১০। মাসআলাঃ যদি কেহ অছিয়ত করিয়া স্বীয় অছিয়ত হইতে ফিরিয়া যায়, যেমন, বলে যে, এখন আর এই অছিয়তের ইচ্ছা নাই, উহা পছন্দ করি না, আমার এই অছিয়ত এতেবার করিও না ও মানিও না। এমতাবস্থায় ঐ অছিয়ত বাতেল হইয়া গেল।

১১। মাসআলাঃ যেরূপ সম্পত্তির তৃতীয়াংশের বেশী অছিয়ত করা দুরুস্ত নাই, তেমনিভাবে রুগ্নাবস্থায় স্বীয় সম্পত্তির তৃতীয়াংশের অধিক নিজের নিতান্ত আবশ্যকীয় খরচ যেমন, খাওয়া-দাওয়া পথ্য ইত্যাদি ব্যতীত খরচ করাও জায়েয নাই। যদি এক তৃতীয়াংশের বেশী কাহাকেও দিয়া দেয়, তবে ওয়ারিসানদের অনুমতি ব্যতীত এরূপ দেওয়া ছহীহ্ হইবে না। তৃতীয়াংশের চেয়ে যতটুকু বেশী দিয়াছে ওয়ারিসানদের ফেরত লইবার এখতিয়ার আছে, আর না-বালেগ ওয়ারিস যদি এজাযত দেয়, তবুও ধর্তব্য (মো'তাবার) নহে। আর কোন ওয়ারিসের এক তৃতীয়াংশের মধ্য হইতেও দেওয়া অন্যান্য ওয়ারিসানদের অনুমতি ব্যতীত জায়েয নাই। এরূপ হুকুম এই অবস্থায় হইবে, যখন সে জীবদ্দশায় (রুগ্নকালে) দান করে এবং গ্রহীতা দখলও করিয়া লয়। আর যদি এরূপ হয় যে, দান তো করিয়াছে কিন্তু এখনও দখল হয় নাই, তবে মৃত্যুর পরে দেওয়া একেবারেই বাতেল, সে কিছুই পাইবে না। সকল সম্পত্তি ওয়ারিসানদের হক। রুগ্নাবস্থায় আল্লাহ্র রাস্তায় এবং নেক কাজে দান করারও এই হুকুম। মোটকথা, এক তৃতীয়াংশের বেশী কোন প্রকারেই খরচ করা জায়েয নাই।

১২। মাসআলাঃ রুগ্ন ব্যক্তির কাছে খেদমতের জন্য কিছু লোক আসিল, কিছুদিন এখানে কাটিল। এখানেই থাকে, রোগীর সম্পত্তি হইতে খায়। এমতাবস্থায় যদি রোগীর খেদমতের জন্য তাহাদের থাকার আবশ্যক হয়, তবে কোন ক্ষতি নাই। আর যদি প্রয়োজন না হয়, তবে তাহাদেরও খাতিরদারী খাওয়া-দাওয়ায় এক তৃতীয়াংশের বেশী ব্যয় করা জায়েয নহে। আর যদি রোগীর সেবা ও খেদমতের আবশ্যকও না হয় এবং তাহারা ওয়ারিস হয়, তবে তৃতীয়াংশের কমও ব্যয় করা জায়েয নাই। অর্থাৎ, রুগ্ন ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে ওয়ারিস মেহ্মানদের খাওয়া জায়েয নাই। অবশ্য যদি সকল ওয়ারিসগণ খুশী হইয়া অনুমতি দেয়, তবে জায়েয হইবে।

১৩। মাসআলাঃ যে রোগে মরিয়াছে, সেই রোগ-শয্যায় অন্যের নিকট তাহার প্রাপ্য মাফ করার এখতিয়ার তাহার নাই। যদি ওয়ারিসেরা কোন ঋণ মাফ করিয়া দেয়, তাহাও মাফ হইবে না। যদি সকল ওয়ারিস এই মাফ মঞ্জুর করে এবং সকলে বালেগ হয়, তবে মাফ হইবে।

আর যদি ওয়ারিস ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহার দেনা মাফ করিয়া দেয়, তবে সমস্ত সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ মাফ হইবে, তাহার বেশী মাফ হইবে না। স্ত্রী যদি মৃত্যুকালে নিজে মহর মাফ করিয়া দেয়, এই মাফ করা ছহীহ্ হইবে না।

১৪। মাসআলাঃ গর্ভাবস্থায় প্রসব-ব্যথা শুরু হওয়ার পর যদি কাহাকেও কিছু দেয় কিম্বা মহরানা ইত্যাদি মাফ করিয়া দেয়, তবে ইহার হুকুমও মৃত্যু রোগে দান করার হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ, খোদা না খাস্তা যদি ঐ প্রসবাবস্থায় মারা যায়, তবে তো অছিয়তের মধ্যে গণ্য হইবে, অর্থাৎ, ওয়ারিসের জন্য কিছুই জায়েয নাই। আর ওয়ারিস না হইলে এক তৃতীয়াংশের বেশী

দেওয়া কিংবা মাফ করিয়া দেওয়ার এখতিয়ার নাই। অবশ্য যদি নিরাপদে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে এখন ঐ সমস্ত দেওয়া লওয়া এবং মাফ করা ছহীহ্ হইয়া গেল।

১৫। মাসআলা ঃ মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি হইতে দাফন-কাফন করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে সর্বপ্রথম তাহার ঋণ শোধ করা চাই, অছিয়ত করুক বা না করুক। সর্বাবস্থায় সর্বাগ্রে ঋণ শোধ করিতে হইবে। বিবির মহরানাও ঋণের অন্তর্ভুক্ত। যদি কর্জ না থাকে কিম্বা কর্জ শোধ করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকে, তখন দেখিতে হইবে যে, অছিয়ত করিয়াছে কি না, যদি অছিয়ত করিয়া থাকে, তবে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হইতে পরিশোধ করা হইবে। যদি অছিয়ত না করিয়া থাকে, অথবা অছিয়ত পরিশোধ করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা সবই ওয়ারিসগণের হক। কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহার অংশ তাহাকে দেওয়া কর্তব্য। বর্তমানে যে দস্তুর আছে, যে যাহাকিছু হাতে পাইল হস্তগত করিল ইহা সাংঘাতিক গোনাহ্। এখানে না দিলে কিয়ামতের দিন দিতে হইবে। সেখানে টাকার বিনিময়ে নেকী দিতে হইবে। এইরূপে মেয়েদের অংশও তাহাদিগকে দিতে হইবে। শরীঅত অনুযায়ী তাহাদেরও হক আছে।

১৬। মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে লোকদের মেহমানদারী, আগন্তুকদের খাতিরদারী, খাওয়ান-দাওয়ান, ছদকা-খয়রাত ইত্যাদি কিছুই জায়েয নাই। এমনিভাবে মৃত্যুর পর হইতে দাফন কার্য সম্পাদন পর্যন্ত যাহাকিছু চাউল ডাল ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে দান করাও হারাম। ইহাতে মৃত ব্যক্তির জন্য কোন ছওয়াবই পৌঁছিবে না; বরং ছওয়াব মনে করা কঠিন গোনাহ্। কেননা এই সম্পত্তি তো এখন ওয়ারিসদের হইয়া গেল, অন্যের হক নষ্ট করিয়া দান করা, অন্যের মাল চুরি করিয়া দান করার ন্যায়। সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া উচিত। তারপর তাহাদের এখতিয়ারে নিজ নিজ অংশ হইতে ইচ্ছা করিলে শরীঅত সম্মতভাবে কিছু দান-খয়রাত করিতে পারে বা নাও করিতে পারে; বরং ওয়ারিসগণের নিকট হইতে (বন্টনের পূর্বে) খরচ করা বা দান-খয়রাত করার জন্য অনুমতিও লওয়া উচিত নাহে। কেননা, অনুমতি লইতে গেলে বদনামির ভয়ে শুধু মুখে মুখে অনুমতি দেয়, অন্তরে দেয় না এরূপ অনুমতির কোনই মূল্য নাই।

১৭। মাসআলা ঃ এমনিভাবে যে প্রথা আছে, মৃত ব্যক্তির ব্যবহারের কাপড়-চোপড় খয়রাত করিয়া দেয়। ইহাও ওয়ারিসদের বিনানুমতিতে কিছুতেই জায়েয নাই। আর যদি ওয়ারিসানদের কেহ নাবালেগ হয়, তবে এজাযত দিলেও জায়েয হইবে না। আগে ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিবে, অতঃপর বালেগ ওয়ারিসগণ স্বীয় অংশ হইতে যাহা ইচ্ছা দিয়া দিতে পারে। ভাগ করা ব্যতীত কখনও দিবে না।

ফারায়েযের অংশ (মূল কিতাবে নাই)

১। মাসআলা ঃ মানুষ মরিয়া গেলে হুকুমতের কর্তব্য বিশ্বস্ত লোক দ্বারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে যার যা হক আছে তাহা তাহাদের দিয়া দেওয়া। বিশেষতঃ শান্তিপ্রিয় দুর্বলের সাহায্যের জন্যই হুকুমত। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনই হুকুমতের প্রথম ফরয। হুকুমত যদি তাহাদের কর্তব্য পালন নাও করে, তবুও সমাজের জনসাধারণের তাহাদের ফরয আদায় করিতেই হইবে।

২। **মাসআলাঃ** নিম্নে বর্ণিত তিন প্রকার লোক মীরাস পাইবে না—(১) যদি কেহ কাহাকেও কতল করিয়া থাকে, তবে সেই কাতেল মাকতুল ব্যক্তির কোন মীরাস পাইবে না। (২) যদি (নাউযু বিল্লাহ্) দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে বা ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যায়, তবে সে মীরাস পাইবে না। (৩) কেহ যদি বে-দ্বীন কাফির অবস্থায় থাকে, সে মুসলমানদের মীরাস পাইবে না।

৩। **মাসআলাঃ** ওয়ারিস তিন প্রকার হয়—(১) যবিল ফুরূয—অর্থাৎ যাহাদের অংশ কোরআন শরীফে নির্ধারিত আছে। (২) আছাবা—অর্থাৎ যাহাদের অংশ ঐ ভাবে নির্ধারিত নাই বটে, কিন্তু যবিল ফুরূযদের অংশ নেওয়ার পর যাহাকিছু অবশিষ্ট থাকিবে, সবই এই আছাবারা পাইবে। আছাবা হামেশা পুরুষ হইবে; যেমন ছেলে, পোতা, বাপ, দাদা, চাচা, ভাতিজা ইত্যাদি অথবা মেয়েলোক হইলে পুরুষের সঙ্গে বা পুরুষের মাধ্যমে তাহার যোগাযোগ হইবে, যেমন ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতি। যবিল আরহাম—ইহারা হামেশা মেয়েলোক হইবে, আর পুরুষ হইলে কোন মেয়েলোকের মাধ্যমে তাহার যোগাযোগ হইবে, যেমন নানা, নানী ইত্যাদি।

৪। **মাসআলাঃ** কোরআন শরীফে ৮ জন মেয়েলোক এবং ; ৪ জন পুরুষের জন্য অংশ নির্ধারিত আছে। ইহাদের অংশ আগে দিতে হইবে। তারপর অবশিষ্ট থাকিলে তাহা আছাবাদিগকে দিতে হইবে, আছাবাদের নিয়ম এই যে, নিকটবর্তী থাকিলে দূরবর্তী পাইবে না। তারপর দুই সম্পর্কওয়ালা এক সম্পর্কওয়ালা অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে এবং বেটা অগ্রগণ্য হইবে বাপের উপর।

যবিল ফুরূযদের তফছীল

১। **মা**—১/৬ অংশ পাইবে, যদি মাইয়েতের সন্তান থাকে অথবা ভাই-বোনের দুইজন থাকে; ১/৩ অংশ পাইবে, যদি সন্তান না থাকে অথবা ভাই-বোনের দুইজন না থাকে।

২। **বাপ**—১/৬ অংশ পাইবে, যদি মৃতের ছেলে থাকে বা ছেলের ছেলে থাকে। যদি মৃতের ছেলে বা ছেলের ছেলে না থাকে, শুধু মেয়ে থাকে বা পুতী থাকে, তবে বাপ অবশিষ্ট সব পাইবে।

৩। **দাদা**—বাপ থাকিলে দাদা কিছুই পাইবে না, বাপ না থাকিলে দাদা ১/৬ অংশ পাইবে।

৪। **দাদী-নানী**—মা থাকিলে দাদী বা নানী কেহ কিছু পাইবে না। বাপ-মা কেহ যদি না থাকে, আর দাদী, নানী উভয়ে থাকে, তবে ১/৬ অংশ দাদী ও নানী দুইজনে সমান ভাগ করিয়া নিবে। নানা যবিল ফুরূযও নহে আছাবাও নহে। যদি যবিল ফরূযের মধ্যে কেহ না থাকে, আর আছাবার মধ্যেও কেহ না থাকে, তবে যবিল আরহাম হিসাবে হয়ত নানা কিছু পাইতে পারে, নতুবা নহে।

৫। **স্ত্রী**—১/৮ অংশ পাইবে যদি মৃতের এই স্ত্রীর পক্ষের বা অন্য পক্ষের বেটা বা বেটি বা বেটার ঘরের বেটা বা বেটি কোন সন্তান থাকে। আর যদি এরূপ কোন সন্তান না থাকে, তবে স্ত্রী পাইবে ১/৪ অংশ । স্ত্রী যদি একাধিক থাকে, তবে যে কয়জন থাকিবে তাহারা ঐ ১/৮ বা ১/৪ অংশ সমান ভাগ করিয়া নিবে।

৬। **স্বামী**—সন্তান থাকিলে (চাই এ স্বামীর ঔরসে হউক, চাই পূর্বের স্বামীর ঔরসের ছেলে বা মেয়ে হউক) স্বামী পাইবে ১/৪ অংশ, আর সন্তান না থাকিলে স্বামী পাইবে ১/২ অংশ।

৭। **কন্যা**—পুত্র না থাকা অবস্থায় এক কন্যা থাকিলে সে ১/২ অংশ পাইবে, একাধিক কন্যা হইলে যে কয়জন হইবে, সকলে এক সাথে ২/৩ অংশ পাইবে। আর যদি পুত্র থাকে, তবে প্রতি পুত্র প্রতি কন্যার দুই গুণ—এইভাবে ভাগ করিবে।

৮। পুত্নী—বেটা-ছেলে থাকিলে পোতা-পুত্নীরা কেহ কিছু পাইবে না। আর বেটা ছেলে না থাকিলে পোতা পুত্নীরা পাইবে। বেটা ছেলে এবং পোতার কোন অংশ নির্ধারিত নাই। বেটা-ছেলে থাকিলে যবিল ফুরূযদের অংশ দেওয়ার পর যাহাকিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সবই পাইবে। আর বেটা-ছেলে কেহ না থাকিলে পোতা-পুত্নীরা বেটার কায়েম-মোকাম হইবে অর্থাৎ আছাবা হিসাবে পাইবে।

৯। ভগ্নী—ভগ্নী তিন প্রকার—(১) মা-শরীক ভগ্নী, (২) বাপ-শরীক ভগ্নী এবং (৩) মা ও বাপ উভয় শরীক হাকীকী ভগ্নী।

(১) মা-শরীক ভগ্নী বা ভাই একজন থাকিলে ১/৬ অংশ পাইবে আর একাধিক থাকিলে সকলে মিলিয়া ১/৩ অংশ পাইবে। এখানে ভাই ও ভগ্নীর সমান অংশ হইবে। মৃতের সন্তান থাকিলে বা বাপ-দাদা থাকিলে মা-শরীক ভাই-ভগ্নীরা কেহই কিছু পাইবে না।

(২) বাপ-শরীক ভগ্নী—আপন হাকীকী ভগ্নীরই মত। কিন্তু মাইয়েতের আপন হাকীকী ভাই থাকিলে, বাপ-শরীক ভাই-বোনেরা কেহ কিছু পাইবে না।

(৩) মা ও বাপ-শরীক ভগ্নী—মাইয়েতের বেটা ছেলে থাকিলে বা পোতা থাকিলে অথবা বাপ থাকিলে আপন হাকীকী ভগ্নীরা বা ভাইরাও কেহ কিছু পাইবে না। যদি মাত্র এক মেয়ে থাকে, তবে সেই মেয়ে পাইবে ১/২ অংশ আর ভগ্নী পাইবে ১/৬ অংশ। আর যদি দুই বা ততোধিক মেয়ে থাকে আর ভাই-ভগ্নী থাকে, তবে মেয়েরা পাইবে ২/৩ অংশ; ভাই-ভগ্নী বাকী ১/৩ অংশ পাইবে (কিন্তু ভাইকে ভগ্নীর দুইগুণ—এই হিসাবে ভাগ করিতে হইবে)।

(প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আমাদের ইমাম আ'যম ছাহেব ৮৩ হাজার আইন [মাসআলা] কোরআন হাদীস হইতে বাহির করিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩৮ হাজার মাত্র ইবাদত বন্দেগী সম্বন্ধে এবং বাকী ৪৫ হাজার অর্থনীতি এবং রাজনীতি সম্বন্ধে।

এখানে সহজ সরল কতকগুলি মাসআলা বা শরীঅতের আইন অতি সংক্ষেপে শুধু সর্বসাধারণের জন্য লেখা হইয়াছে। অনেক জটিল এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আইন রহিয়াছে, যেগুলি বড় বড় কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যখন যে ঘটনা সামনে পেশ আসে সে সম্পর্কে আপনারা সব সময়ই মাসআলা বা শরীঅতের আইন সম্বন্ধে মোহাক্কেক আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সে অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং সামাজিক জীবন পরিচালিত করিবেন। যার-তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করিবেন না; অবার না জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের মনগড়া মত কাজ করিবেন না। অন্ততঃপক্ষে যে আলেম ছাহেব পূর্ণ জালালাইন শরীফ দুই জিলদ আদ্যোপান্ত, পূর্ণ মিশ্‌কাত শরীফ দুই জিল্‌দ আদ্যোপান্ত এবং পূর্ণ হেদোয়া চারি জিলদ আদ্যোপান্ত আসল আরবী ভাষায় কোন কামেল ওস্তাদের নিকট ইবারতসহ বুঝিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিবেন। উহা অপেক্ষা কম এলেম হইলে তাহাকে আলেম বলা যায় না।)

॥ পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

ষষ্ঠ খণ্ড (উপক্রমণিকা)

সমাজ ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সমাজের প্রচলিত কুপ্রথার সংশোধন

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এমন একটি জাতিরূপে গঠন করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদিগকে এমন একটি ধর্ম-শরীঅত তথা আদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থা দান করিয়া গিয়াছেন যাহা সর্বদিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই জন্যই তিনি সমাজ ব্যবস্থায় অন্য জাতির অনুকরণ (পরানুকরণ) করিতে এবং নিজেদের মধ্যে হীনতা নীচতা (Inferiority Complex) আনিতে আমাদিগকে অতি কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। হাদীস শরীফে আছেঃ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ইহার মর্ম এই যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা একথা উত্তমরূপে জানিয়া রাখ যে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যদি তোমরা অন্য কোন বিজাতির অনুকরণ কর, তবে যে যেই জাতির অনুসরণ করিবে, সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। কোরআন শরীফে আছেঃ وَلَاتَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ইহার মর্মার্থ এই যে, "হে মুসলমানগণ; তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ যে, যাহারা নিজেদের উপর নিজেরা যুলুম করিয়া আল্লাহ্‌কে এবং আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিনিধিকে অস্বীকার করিয়া কাফের হইয়াছে তাহাদের দিকে তোমরা ঝুঁকিও না; অর্থাৎ, তাহাদের অনুকরণ অনুসরণ করিও না বা নিজেদের ধর্মকে এবং আদর্শকে হীন মনে রাখিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বকে মনে স্থান দিও না; যদি তোমরা তদ্রূপ কর, তবে তোমাদের দোযখের আযাব ভোগ করিতে হইবে—একথা ভালরূপে জানিয়া রাখিও।" মানুষ অন্যের অনুসরণ করে না, যাবৎ সে অন্যের সেই আদর্শকে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দরতম মনে না করে। অতএব, যাহারা মুসলিম জাতির মেম্বর এবং মুসলিম সমাজের সভ্য হওয়া সত্ত্বেও অন্য জাতির অনুকরণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নির্ভুল নীতিকে এবং রাসূলের শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম আদর্শের অবমাননা করিয়াছে, কাজেই দুনিয়াতে এবং আখেরাতে তাহাদের আযাব ভোগ করিতে হইবে। এই জন্য যে-সব মুসলমানের অন্য জাতির সঙ্গে মেলা-মেশা ও উঠা-বসার প্রয়োজন হয়, তাহাদের জন্য উভয় জাতির সমাজ ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণের একান্ত প্রয়োজন আর যাহাদের অন্য জাতির সঙ্গে মেলা-মেশা ও উঠা-বসার দরকার না হয় বা সুযোগ না ঘটে, তাহারা যদি শুধু নিজেদের ধর্মের ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা জানিয়া তদ্রূপ জীবন যাপন করে, তবে তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। এই যুগের মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এবাদত-বন্দেগী,

ধর্ম-বিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থার ন্যায় ইসলামের সমাজ ব্যবস্থাও সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য, প্রত্যেক ব্যাপারে নিজেদের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা জানিয়া তদনুযায়ী সমাজ জীবন যাপন করা। পরানুসরণ করা বা নিজেদের সমাজ ব্যবস্থার প্রতি হীনতাবোধ আনয়ন করা কোন মুসলমানের পক্ষে কিছুতেই উচিত নহে। অন্যথায় তাহাদের পতন ও ধ্বংস অনিবার্য। হযরত মাওলানা থানভী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহে তাঁহার যমানায় এবং তাঁহার সময়ের কুসংস্কারগুলির সংশোধন লিখিয়াছেন। আমি তাঁহার কথাগুলির অনুবাদ করি নাই; বরং তাঁহারই অনুকরণে তাঁহারই কথাগুলি অবলম্বনে বর্তমান যুগের কু-সংস্কারগুলির সংশোধন লেখার চেষ্টা করিয়াছি।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আনিয়া আমাদিগকে এমন কতকগুলি সধারণ সূত্র এবং মাপকাঠি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যাহা দ্বারা সেই শিক্ষায় অভিজ্ঞগণ নব প্রচলিত কার্যগুলির কোন্‌টি অনুমোদনযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌টি অননুমোদনীয় ও গ্রহণের অযোগ্য তাহা বাছাই করিয়া দেখিতে পারেন। কাজেই যে সমস্ত প্রথা সে যমানায় ছিল না, পরবর্তী যুগে চালু হইয়াছে, ইহাদিগকে সেই মাপকাঠি দ্বারা মাপিয়া গ্রহণ বা বর্জন করিতে হইবে।

আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র রাসূল যে কার্যকে 'কর' বলিয়া স্পষ্টভাবে আদেশ করিয়াছেন, তাহাকে বলা হয় 'ফরয' এবং 'ওয়াজিব; আর যাহা করিও না বলিয়া স্পষ্টভাবে নিষেধ করিয়াছেন তাহাকে বলা হয় 'হারাম'। আর যাহা করিবার জন্য স্পষ্ট আদেশ করেন নাই, কিন্তু পছন্দ করিয়াছেন, উহাকে বলা হয়, 'মুস্তাহাব'। আর যাহা করিতে স্পষ্ট নিষেধ করেন নাই, কিন্তু না-পছন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে বলা হয়, 'মাক্‌রূহ'। তার মধ্যে আবার দুইটি স্তর আছেঃ যাহাকে বেশী পছন্দ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এবং তাঁহার ছাহাবীগণ সব সময় আমল করিয়াছেন, উহাকে বলা হয় সুন্নৎ। আবার যে সুন্নতের জন্য তাকীদ পাওয়া গিয়াছে উহাকে বলা হয় সুন্নতে মুআক্কাদাহ্; আর যাহা বেশী না-পছন্দ করা হইয়াছে উহাকে সলফে ছালেহীন (প্রাচীন বুযুর্গগণ) সর্বদা বর্জন করিয়াই চলিয়াছেন। উহাকে বলা হয় 'মাক্‌রূহ তাহরীমী'। আর যাহা কম না-পছন্দ করা হইয়াছে উহাকে বলে, মাক্‌রূহ তান্‌যীহী' এবং যেটার বেলায় মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে—করা না করা তাহার ইচ্ছাধীন, সেটাকে বলা হয় 'মুবাহ্'। আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ, পছন্দ অপছন্দ জানার উপায় একমাত্র আল্লাহ্‌র কোরআন এবং আল্লাহ্‌র রাসূল। আর রাসূলের আদেশ-নিষেধ পছন্দ বা অপছন্দ জানিবার উপায় রাসূলের হাদীস এবং তাঁহার ছাহাবীগণের চালচলন বা জীবনযাপন পদ্ধতি।

আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল প্রদত্ত কোরআন ও হাদীসের এই মাপকাঠি দ্বারা যাঁহারা কোরআন ও হাদীসের অভিজ্ঞতা হাছিল করিয়া তদনুযায়ী জীবন গঠন করতঃ উহারই আলোচনা ও গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা দেশ প্রথাগুলিকে মাপিয়া বা যাছাই বাছাই করিয়া কোন্‌টা গ্রহণ করা উচিত এবং কোন্‌টা বর্জন করা উচিত তাহা বাতাইয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র নীতি অনুসারে যে নিখুঁত ও নির্ভুল আদর্শ আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শ ছাড়িয়া অন্য কোন জাতির বা ব্যক্তির আদর্শ গ্রহণ করা যে কিছুতেই উচিত নহে, তাহাও তাঁহারা তুলনামূলক বিশ্লেষণ দ্বারা আমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এখন সেগুলি এক একটি করিয়া আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, সমাজের আচার-ব্যবহার এবং দেশপ্রথা দুই প্রকার। এক প্রকার প্রথা এমন আছে যে, তাহার উপকারিতা অপকারিতা বা উহা খোদা রাসূলের আদেশকৃত বা অনুমোদিত কি না তাহার কিছুই দেখা যায় না শুধু অন্ধানুকরণ বা সমাজের বদ রসম বলা যায়। আর এক প্রকারের প্রথা এমন আছে, যাহা আল্লাহ্র আদেশ বা রাসূলের আদর্শে প্রচার করা হইয়াছে; তাহার প্রত্যেকটির মূলেই তাবলীগ আছে এবং আল্লাহ্ রাসূলের মধ্যে যোগাযোগ আছে। এগুলিকে রসম বলা যায় না, Tradition বা সংস্কারও বলা যায় না। কারণ এগুলির প্রত্যেকটিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেকটিই আধ্যাত্মিকতার সংগে সংশ্লিষ্ট। কাজেই এরূপ প্রথাকে প্রথা না বলিয়া সুন্নত কিম্বা গুরুত্ব বিশেষ ফরয বলা উচিত। কিন্তু মানুষ কোরআন হাদীসের সত্যিকার জ্ঞানের অভাবে অনেক সময় সত্যের সংগে মিথ্যা, কর্তব্যের সংগে অকর্তব্য বা সুন্নতের সংগে বেদআৎ মিশাইয়া ফেলে। সে সময় যাহারা প্রকৃতভাবে কোরআন হাদীসের জ্ঞানের আলোকের মালিক, তাঁহাদের উচিত মানুষের সুপথ দেখান ও কুপথ হইতে ফিরাইয়া রাখা।

শিশু পালন

আল্লাহ্ পাক যখন মানুষকে একটি সন্তান দান করেন, তখন সেই সন্তানের পিতা-মাতার উপর মস্ত বড় দায়িত্বের বোঝা চাপান হয়। সন্তানটি প্রকৃত প্রস্তাবে মা-বাপের কাছে আল্লাহ্র অতি বড় একটি আমনত। সন্তানের দেহকে পালন করা, দেহকে সুস্থ ও তন্দুরুস্ত রাখা যেমন মা-বাপের কর্তব্য এবং ফরয তদ্রূপ সন্তানের দেহ পালনের সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মার প্রতিপালনও মাতা-পিতার প্রতি অতি বড় একটি দায়িত্ব। সন্তানের স্থূল দেহকে এমনভাবে পালন করিতে হইবে, যাহাতে তাহার আত্মা বক্র বা বিকৃত হইয়া না যায়। শিশুর মস্তিষ্ক হইয়াছে ফটো তোলার ক্যামেরার মত। ক্যামেরার সামনে যেমন বাঁকা বা সোজা যাহাকিছু ধরা যায় তাহারই ফটো ঐ ক্যামেরাতে উঠে, তদ্রূপ শিশুর সামনে ভাল-মন্দ যেরূপ আচার-ব্যবহার কথাবার্তা বা আলোচনা করা হয়, যেরূপ সংসর্গ দান করা হয়, উহা সেইরূপই শিশুর মন-মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া যায়। অতএব, খুব সতর্কতা সহকারে শিশুর মন-মস্তিষ্ককে খারাব কথা, খারাব আচার-ব্যবহার খারাব সংসর্গ বা খারাব পরিবেশ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে—বাঁচাইতে হইবে তাহার দেহকে, তাহার চক্ষুকে বেশী ঠাণ্ডা হইতে, বেশী গরম হইতে বেশী পানি বাতাস হইতে বা বেশী তাপ ও রৌদ্র হইতে। প্রসূতি ও শিশু পালনের যে সমস্ত নিয়ম পদ্ধতি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ বলেন, সেই অনুযায়ী শিশুর পালন ও রক্ষণা-বেক্ষণ করা মাতা-পিতার মহান দায়িত্ব। মাতা-পিতার মৃত্যু হইয়া শিশু এতীম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এতীম পালনের দায়িত্ব ফারায়েয শাস্ত্রে বর্ণিত পর্যায় অনুসারে তাহার আছাবা জাতীয় আত্মীয়দের প্রতি বর্তিবে, তদভাবে সে দায়িত্ব যথাক্রমে সমাজের ও রাষ্ট্রে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন কথাবার্তা শিশুর কানে প্রবেশ করার পূর্বেই তাহার কানে আল্লাহ্র নাম প্রবেশ করান উচিত। ধাত্রী প্রসূতিকে সযত্নে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখিয়া, আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ পড়িতে পড়িতে শিশুকে ঈষদুষ্ণ পানি দ্বারা ধোয়াইয়া আঙ্গুল দিয়া আস্তে আস্তে মুখ পরিষ্কার করিয়া জলদি গা মোছাইয়া দিয়া কাঁথার মধ্যে লেপটাইয়া কোলে করিবে। এবং মহল্লায় কোন বুযুর্গ আলেম, ইমাম বা কোন নেক লোকের কোলে দিবে। তিনি স্বল্প আওয়াযে সুমধুর স্বরে শিশুর ডাইন কানের কাছে আযানের লফ্যগুলি বলিবেন এবং বাম কানের কাছে একামতের লফ্যগুলি বলিবেন। এইভাবে আযান একামত বলাকে 'তা'যীন' বলা হয়।

অতঃপর 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' বলিয়া স্বল্প মধু নিজের মুখে দিয়া পরে আঙ্গুল দিয়া শিশুর মুখে দিবেন। এইরূপে মধু দেওয়াকে 'তাহ্‌নীক' বলা হয়। তাহ্‌নীক যে মধুই হইতে হইবে তাহার কোন শর্ত নাই। উহার বদলে খোরমা বা অন্য কোন মিষ্টি জিনিস চিবাইয়া লালার মত করিয়া আঙ্গুল দ্বারা শিশুর মুখের ভিতরে তালুতে লাগাইয়া দেওয়া ভাল। তারপর স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পন্ডিত বা চিকিৎসকগণের নিয়ম নির্দেশ অনুযায়ী শিশুর স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হইবে। কিন্তু চিকিৎসকের এমন হওয়া দরকার যেন তিনি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে বিশেষতঃ প্রসূতি ও শিশু পালন সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—তাঁহার চরিত্রে যেন মিথ্যা বলার, নাপাক থাকার, নামায না পড়ার প্রভৃতি দোষ না থাকে। কারণ দূষিত চরিত্রের লোকের সামান্য সংসর্গেও মানুষের চরিত্র নষ্ট হইয়া থাকে। আজকাল মৌলভী ছাহেবগণ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিখে না, ইহা বড় আফসুসের কথা। আবার যাহারা ডাক্তারী পড়ে তাহাদের অনেকে রোযা নামায ছাড়িয়া দেয়, মিথ্যা কথা বলে, ধোঁকা দেয়, নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, হারাম হালালের ভেদ বিচার করে না। ইহাও সমাজের পক্ষে বড় বিপজ্জনক। সমাজকে এই আয়েব হইতে এবং এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতে হইবে।

জন্মের সময় শিশুর জন্য এত সুন্দর ব্যবস্থা, এত সুন্দর আদর্শ আমাদের ইসলাম ধর্মে আছে যে, অন্য কোন সমাজে এমন সুন্দর আদর্শ পাওয়া যাইবে না। আযান একামতের দ্বারা শিশুর অন্তরকে আল্লাহ্‌র যেকরের সঙ্গে সম্পর্কিত করিতে দেওয়ায় এবং প্রথমে মধু ভক্ষণের দ্বারা শিশুর যে কত উপকার হয় এবং কত বিপদ আপদের হাত হইতে সে রক্ষা পায়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

আকীকাহ

শিশুর বয়স যখন সাত দিন হইবে, তখন পিতার প্রতি কয়েকটি কাজ কর্তব্য হয়। সন্তানের জন্মের সপ্তম দিবসে—(১) তাহার মাথার চুল কামাইয়া দিতে হইবে। (২) চুলের ওজনের স্বর্ণ বা রূপা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের দ্বারা শিশুর জন্য দো'আ করাইতে হইবে। (৩) কোন নেক বুযুর্গ 'আলেমের দ্বারা দো'আ করাইয়া ভাল নাম রাখিতে হইবে। (৪) আকীকা করিতে হইবে। সন্তান বেটা ছেলে হইলে তার জন্য দুইটি বকরী বা খাসী যবাহ্‌ করিয়া আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও গরীব দুঃখীকে খাওয়াইয়া তাহাদের দ্বারা শিশুর জন্য দো'আ করাইতে হইবে, যাহাতে শিশু দীর্ঘজীবী হয়, ভাল স্বাস্থ্য পায় এবং নেক্‌বখ্‌তী (সৌভাগ্য) লাভ করিতে পারে। বকরীর পরিবর্তে গরু যবাহ করিলে তাহাও জায়েয হইবে। সমাজের যাহারা ধনী ও বড়লোক, সমাজের গরীবদের প্রতি সর্বদাই তাহাদের সহানুভূতি থাকিতে হইবে, যাহাতে গরীবগণ ভাত-কাপড় বা খাওয়া-পরার কষ্ট না পায় এবং অভাবে পড়িয়া তাহাদের স্বভাব নষ্ট না হয়। এইজন্য প্রতি ক্ষেত্রেই গরীবদের কথা স্মরণ করিতে হইবে। তাহাদের স্বভাব-চরিত্র যাহাতে ভাল হয়, সেজন্য তাহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু গরীবই ধনীদের টাকার মুখাপেক্ষী নহে, ধনীরাও গরীবদের দো'আর মুখাপেক্ষী; উভয়ে উভয়ের মুখাপেক্ষী, কেহ কাহারো অপেক্ষা বড় বা অমুখাপেক্ষী (বেনিয়ায) নহে। এই সহানুভূতি সমাজের ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীর মধ্যে জাগাইতে হইবে, যাহাতে ধনীদের মধ্যে অহঙ্কার না ঢুকে এবং গরীবদের মধ্যে প্রতিহিংসা এবং মনঃকষ্ট ও হীনতাবোধ না ঢুকে।

বিস্‌মিল্লাহ্ শুরু করা ও মক্তবে পাঠান

যখন শিশুর বয়স প্রায় ৫ বৎসর হইবে, তখন শিশুকে কোন নেক বুযুর্গ আলেমের দ্বারা দো'আ করাইয়া বিস্‌মিল্লাহ্ শুরু করাইয়া মক্তবে পাঠাইতে হইবে। মক্তবের মু'আল্লিমকে নেক, চরিত্রবান এবং শিশু মনস্তত্ত্বের জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ হইতে হইবে। ৮/৯ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলে এবং মেয়ে এক সঙ্গে পড়িতে পারিবে। মক্তবের মু'আল্লিম শিশুদিগকে মিষ্ট ভাষায় মধুর ব্যবহারে এত আদর করিয়া সবক নিবেন ও দিবেন যেন শিশুরা বাড়ীতে থাকার চেয়ে মক্তবে আসিতে বেশী ভালবাসে। আদরে ও মিষ্ট ভাষায় যে কাজ হইবে, কঠোরতায় ও কর্কশ ভাষায় সে কাজ কখনও হইবে না। মক্তবে ওস্তাদ ছাহেব শুধু হরফ এবং হেজ্জে পড়া ও লেখাই শিক্ষা দিবেন না; বরং তাহাদিগকে আস্তে আস্তে আদব-আখলাকও শিক্ষা দিবেন। জরুরী জরুরী দো'আ কালাম শিক্ষা দিবেন এবং হাতে ধরিয়া ওযূ নামায, আদব-কায়দা ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন। শিশুর পিতামাতা মক্তবের ওস্তাদকে অবহেলা করিবেন না; বরং প্রাণের সহিত ভালবাসিবেন এবং ভক্তি করিবেন। কারণ মা-বাপের ভক্তি দেখিয়া ছেলেও ওস্তাদকে-ভক্তি করিবে এবং আদব-কায়দা শিখিবে। ওস্তাদ-ভক্তি ব্যতিরেকে ছেলের 'এলম হয় না এবং ছেলের যেহেন খোলে না।' ওস্তাদ কখনও টাকার লোভী হইবেন না। তিনি বেশীর ভাগ খেয়াল এই দিকে রাখিবেন যাহাতে ছেলেটি মানুষ হইতে পারে। একটি মানব-সন্তানকে 'এবাদত বন্দেগী শিখাইয়া সুন্দর স্বভাব গঠন করিয়া মা-বাপ ও মুরুব্বিয়ানদের প্রতি আদব-তমীয শিক্ষা দিয়া মানুষ বানাইয়া দিতে পারিলে আখেরাতে আল্লাহ্‌র কাছে কত নেকী আর কত বড় দর্জা ও সম্মান পাওয়া যাইবে, ওস্তাদের সেই খেয়াল রাখাই বেশী উচিত।' দুনিয়ার টাকা পয়সার লোভ করা ভাল নহে; টাকা-পয়সার লোভ করিলে আলেমের কদর মর্যাদা থাকে না। মা-বাপ খেয়াল রাখিবে ওস্তাদের প্রতি এবং ওস্তাদ খেয়াল রাখিবে মা-বাপের প্রতি। মা-বাপের সম্মান ও আদব করা এবং তাঁহাদের খেদমত করা শিক্ষা দিবে ওস্তাদ। আর ওস্তাদের আদব করা ও তাঁহার খেদমত করা শিক্ষা দিবে মা-বাপ। এইরূপে মা-বাপ ও ওস্তাদ উভয়ে মিলিয়া শিশুর জীবন গঠন করিতে হইবে। ওস্তাদ দৈনিক শিশুর পিছনের সবক শুনিয়া ভালমত ইয়াদ করাইয়া তারপর সামনের সবক দিবেন; যাহাতে পিছনের পড়া ভুলিয়া না যায় বা ইয়াদ কাঁচা না থাকে, সেদিকে ওস্তাদকে খেয়াল রাখিতে হইবে। তিনি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাও শিক্ষা দিবেন। ছেলে প্রথমে অমিশ্র হরফ লিখিবে, তারপর মিশ্র হরফ লিখিবে। তারপর মানুষের নাম, জায়গার নাম ইত্যাদি লিখিবে, ইহার পর এবারত দেখিয়া লিখিবে, তারপর শুনিয়া লিখিবে। অতঃপর চিঠিপত্র, দলিল, দরখাস্ত প্রভৃতি লিখিবে তারপর তরজমা লিখিবে; ইহার পর রচনা লিখিবে। অতঃপর বিস্তারিতকে সংক্ষেপে এবং সংক্ষিপ্তকে বিস্তারিত করিয়া লিখিবে। সঙ্গে সঙ্গে হিসাব লেখা ও অঙ্ক কষা শিক্ষা করিবে।

শৈশবেই যদি শিশুকে আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে শেষে আর সন্তানের চরিত্র গঠন করা যায় না। কথায় বলে—"কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, শেষে করে ঠাস ঠাস," অর্থাৎ কচি বয়সে শিশুকে ধর্মোপদেশ শিক্ষা দিয়া অভ্যাসগত করাইয়া না দিলে শেষে আর ছেলেকে ভাল বানানো যায় না।

বিস্‌মিল্লাহ্‌ শুরু করাইতে সাধারণতঃ লোকে কিছু মিঠাই খাওয়ানের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। এইরূপে শিশু যখন কোরআন শরীফ শুরু করে বা কোরআন শরীফ খতম করে, তখনও ওস্তাদকে কিছু বখশিশ দেয় বা কিছু মিঠাই খাওয়ায়। এরূপ করা বেদআ'ত নহে; বরং এর দ্বারা কোরআনের তা'যীম করা হয় এবং ইহাতে ছেলের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা দরকার। ওস্তাদের উচিত লোভ না করা, শাগরিদের উচিত প্রাণপণে ওস্তাদের যথাসাধ্য খেদমত করা। ওস্তাদকে মাহিনার কর্মচারী মনে করা উচিত নয়। ওস্তাদকে অবশ্য অবশ্য অত্যন্ত ভক্তির পাত্র মনে করিতে হইবে। অন্যথায় কখনও এল্‌ম হাছিল হইবে না।

নামাযের অভ্যাস

ছেলে বা মেয়ের বয়স যখন ৭ বৎসর হইবে তখন হইতে ছেলেমেয়েদিগকে ভালবাসা দিয়া আদর পেয়ার করিয়া নামাযের অভ্যাস করাইতে হইবে। অত্যন্ত সুকৌশলে আদর-যত্ন করিবে, মহব্বত দেখাইয়া পুরস্কার দিয়া সুপরিবেশে রাখিয়া যেভাবেই হউক দশ বৎসরের মধ্যে ছেলেমেয়েদিগকে নামাযে অভ্যস্ত করাইতেই হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, সবচেয়ে বড় কৌশল এবং বড় হেকমত হইতেছে ছেলেমেয়েদেরকে সুপরিবেশে রাখা।

ছেলেমেয়েদের বয়স যখন ৯/১০ বৎসর হইবে, তখনই তাহাদের বিছানা পৃথক করিয়া দিতে হইবে। এমনকি, তখন নিজেদের ছেলেমেয়েদিগকেও দুইজনকে এক বিছনায় শুইতে দিবে না। এ ছাড়া ৭/৮ বৎসরের হইলে বালক-বালিকাদিগকে একত্রে স্কুলে পড়িতে দিবে না। আর দশ বৎসর বয়সের ভিতর উপরোক্ত কৌশল সত্ত্বেও নামাযের অভ্যাস পাকা না হইয়া থাকিলে কিছু কঠোরতা করিয়া এমনকি প্রহার করিয়া বা শাস্তি দিয়া হইলেও নামাযের অভ্যাস করাইতে হইবে।

খাৎনা

ছেলের বয়স যখন ৭/৮ বা ৯/১০ বৎসর হইবে, তখন তাহার খাৎনা করাইতে হইবে। খাৎনা করা শুধু একটা প্রথা মাত্রই নয়, ইহা ইসলাম ধর্মের বড় একটি সুন্নত। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌ সালামের উপর আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ১০টি সুন্নত পালন করার জন্য ওহী আসিয়াছিল, যথা—

১। খাৎনা করান।
২। পেশাব-পায়খানা করার পর পানি দিয়া ধৌত করা।
৩। কুলি করিয়া মুখ পরিষ্কার করা।
৪। মিস্‌ওয়াক করিয়া দাঁত পরিষ্কার করা।
৫। নাকে পানি দিয়া, নাকের পশম বড় হইতে না দিয়া নাক পরিষ্কার রাখা।
৬। বগলের পশম বড় হইতে না দিয়া বগল পরিষ্কার রাখা।
৭। নাভির নীচে পশম হইলে তাহা মুণ্ডাইয়া (কামাইয়া) ফেলিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
৮। দাড়ি হইলে দাড়ি লম্বা করিয়া রাখা।
৯। মোচ কাটিয়া খাট করিয়া রাখা।
১০। হাত পায়ের নখ কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা।

খাৎনা করার সময় অনেকে অনেক রকম আড়ম্বর করিয়া থাকে ঃ শরীঅতে উহার কোন হুকুম নাই। অনেকে রসম করার টাকা যোগাড় করিতে পারে না বলিয়া ছেলের বয়স অধিক হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও খাৎনা করায় না। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। শরীঅতে যেটাকে জরুরী সাব্যস্ত করিয়াছে, শুধু সেইটাকেই জরুরী মনে করা উচিত। শরীঅতের নির্দেশ ছাড়া অতিরিক্ত রসম পালন করার চাপ দেওয়াও অন্যায় এবং রসমের জন্য যে বয়সের যে কাজ সেই বয়েসে সেই কাজ না করিয়া ছেলের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া অন্যায়। মেয়ের খাৎনা করার প্রচলন আমাদের দেশে নাই বটে, কিন্তু মেয়ের খাৎনা করাও মুস্তাহাব। অবশ্য ছেলের খাৎনা করান সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। ছেলের খাৎনা করান ইসলাম ধর্মের একটি গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ। খৃষ্টান ধর্মে ও হিন্দুদের ধর্মে এই সুন্দর আদর্শ নাই।

১০/১১ বৎসর বয়স হইতেই ছেলেমেয়েদেরকে রমযানের রোযার কিছু কিছু অভ্যাস করান উচিত। এ সময়ে তাহাদিগকে শওক দেলাইতে হইবে এবং তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করিতে হইবে; আদেশ বা কঠোরতা করিতে হইবে না। কঠোরতা তখনই করিতে হইবে, যখন বালেগ হওয়া সত্ত্বেও রোযা না রাখিবে। ৭ বৎসরের আগে যেরূপ নামাযের জন্য বলা চাই না, তদ্রূপ ১২ বৎসরের আগে রোযার জন্যও বলা চাই না। ১২ বৎসর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের পড়ার সময় আদায় করিয়া কিছু সময় (আছরের পরের সময়ে) দৌড়াদৌড়ি করিতে ও খেলিতে দেওয়া উচিত। তাহাদিগকে শুধু পড়ার মধ্যে না লাগাইয়া রাখিয়া কিছু কিছু কাজেরও অভ্যাস করান উচিত, যাহাতে মনে স্ফুর্তি থাকে এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

বালেগ হওয়া

ছেলের যখন স্বপ্নদোষ হয়, তখন সে বালেগ হয়। আর মেয়ের যখন ঋতু আসে, তখন সে বালেগা হয়। আর যদি বয়স ১৫ বৎসর হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও মেয়ের ঋতু না আসে বা ছেলের স্বপ্নদোষ না হয়, তবে চাঁদের হিসাবে জন্মদিবস হইতে যেদিন ১৫ বৎসর পূর্ণ হইয়া যাইবে, তার পরদিন হইতেই ছেলে বা মেয়েকে শরীঅতের হুকুমে বালেগ বলিয়া গণ্য করা হইবে। আর এই সময় হইতেই নামায, রোযা, ওযূ গোসল, রুযী-রোযগার ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্বই তাহাদের ঘাড়ে চাপিবে।

সংযমের অভ্যাস

যৌবনের প্রারম্ভের সময়টা বড়ই বিপজ্জনক। এই সময়ে রীতিমত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, যৌন-ক্ষুধা জাগিয়া অনেক মানুষকে বিপথগামী করিয়া ফেলে। একে ত ছেলেদের থাকে না অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয়তঃ শরমের দরুন তাহাকে উপদেশ দেওয়া বা শিক্ষা দেওয়ারও কেহ থাকে না। আর উপদেশ চাওয়ারও সাহস বা সুযোগও তাহার নিজের হয় না। অথচ যৌবনের যৌন-প্রেরণাকে সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিলে, মানুষের জীবন সবদিক দিয়াই পঙ্গু হইয়া যায়। পাপের বোঝা মাথায় চাপে, স্বভাব নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য খারাব হয়, সম্পদও ধ্বংস হয়। কারণ, শরীরের বীর্যই মানবদেহের রাজা, ইহা হইতেই মানুষ সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক কিছু তৈয়ার করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, যে জিনিসকে সমস্ত বৈজ্ঞানিকগণ মিলিয়াও সৃষ্টি করিতে পারেন না, ঐ

জিনিস যে জিনিস দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয়, তাহা কত মূল্যবান এবং কত দামী এবং সেই জিনিসকে নষ্ট বা অপচয় করা কত বড় মহাপাপ।

হাদীস শরীফে আছেঃ اَلشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْجُنُوْنِ ইহার মর্মার্থ এই যে, যৌবনের ঢেউ উন্মত্ততার ঢেউ সদৃশ। অতএব, এই ঢেউকে সুসংযত করিয়া রাখার জন্য এবং এই ঢেউয়ের মধ্য দিয়া জীবন তরীকে তরাইয়া নেওয়ার জন্য, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। প্রবীণ বয়স্ক কোন মুরব্বীর দ্বারা যৌবনে পদার্পণকারী বালকদিগকে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উপদেশ দেওয়া দরকার যে, এই বয়সে শরীরের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সুন্দর মেয়ে বা সুন্দর বালক দেখিতে ইচ্ছা হয়, বা তাহাদিগকে কাছে রাখিতে বা তাদের কথা শুনিতে মনে চায়। এমন কি নিজের শরীরের বিশিষ্ট অংগকে দেখিতে, স্পর্শ করিতে এবং হাত পা দিয়া ঘর্ষণ করিতে মন চায়—মনের এই চাহিদাগুলি সবই পাপ—বড় পাপ—এমন পাপ যে, তার আর 'তদারক' হইতে পারে না। এই প্রকার পাপের দ্বারা ভবিষ্যতে জীবন এমনভাবে নষ্ট হয় যে, জীবনে তাহার আর প্রতিকার হইতে পারে না। অতএব, মনের এই ধরনের চাহিদার সময় মনকে এবং দেহকে চাপিয়া, জোর জবরদস্তি করিয়া সংযত রাখিতেই হইবে। ইহাকেই বলা হয় সংযম অভ্যাস। যতবারই এইরূপ চাহিদা মনের ভিতরে জাগিবে, ততবারই সংযম অভ্যাসের দ্বারা মন ও দেহকে সংযত করিয়া রাখিবে এবং যথাসম্ভব কুসংসর্গ বর্জন করিবে। সাপের সংসর্গ গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তবুও কুসংসর্গ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ সাপের দ্বারা হয়ত মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবন ধ্বংস হয়। কিন্তু কুসংসর্গের দ্বারা মানুষের চিরস্থায়ী জীবন ধ্বংস হয়। আর মনে রাখিতে হইবে, এই রকম বালকদিগকে এক বিছানায় কিছুতেই শুইতে দেওয়া উচিত নয়। এমন কি নির্জন কামরাতেও তাহাদিগকে একত্রে থাকিতে দেওয়া চাই না। অপরকে নিজের গোপন শরীর দেখিতে বা স্পর্শ করিতে ত দেওয়াই চাই না; এমন কি নিজেও নিজের গুপ্তাঙ্গ বিনা ঠেকায় বা বিনা জরুরতে দেখা বা ছোয়া চাই না। অনেক সময় অনেক বদ লোকে এই ধরনের অশ্লীল কথা আলোচনা করে, অশ্লীল ও উলংগ ছবি রাখে ও দেখে, অশ্লীল প্রেমের নভেল-নাটক পড়ে এবং অশ্লীল ও নগ্ন ছবি প্রচার করে। খবরদার! খবরদার!! এই ধরনের অশ্লীল কাজ হইতে ছেলেমেয়েদিগকে অতি সতর্কতার সহিত দূরে রাখিতে হইবে। যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা ও এক সঙ্গে উঠা-বসা হলাহল বিষের চেয়েও অধিক জীবনহন্তা মনে করিবে। প্রথম প্রথম হয়ত টের পাওয়া যায় না বা ইহাতে কোন খারাব উদ্দেশ্যও থাকে না। কিন্তু অনভিজ্ঞতাবশতঃ একবার জড়াইয়া পড়িলে শেষে আর ছাড়ান যাইবে না, জীবন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

মেয়েদিগকে দশ বৎসরের পর বাড়ীর বাহিরে খেলাইতে বেড়াইতে দিবে না। খবরদার! খবরদার!! হিন্দুদের দেখাদেখি, ইংরেজদের দেখাদেখি, ধর্মহীনদের দেখাদেখি বা দুনিয়ার কোন প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া ঈমান নষ্ট করিবে না, ধর্ম নষ্ট করিবে না এবং ছেলেমেয়েদের জীবন বরবাদ করিবে না।

ছোট বয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া তত ভাল নয়। মেয়ের ১৪ বৎসরে এবং ছেলের ২০/২৫ বৎসরে বিবাহ দেওয়া ভাল কিন্তু ইহার পূর্বেও যদি কোন যৌন জরুরত উপস্থিত হয়, তবে বিবাহ করাইয়া দিবে। ঘটনাক্রমে ছেলে-মেয়ে উভয়ের মধ্যে যদি প্রেমের উদয় হইয়া বসে, তবে তাহাদের দুই জনেরও বিবাহ করাইয়া দেওয়া চাই। বিবাহের মধ্যে কোন কুপ্রথার

অনুসরণ করা চাই না। সরল ও সাদাসিধাভাবে, দায়িত্ব-জ্ঞান, ঈমানী শক্তি ও চরিত্রবান দেখিয়া বিবাহ করান উচিত।

মসজিদ

ইসলাম ধর্ম ব্যক্তিগত ধর্ম নয়, সমাজ ধর্ম। সমাজের সাফল্য নির্ভর করে মানুষের একতার ফলে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, সেই শক্তির উপরে। একটি কঞ্চিকে সকলেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু পঞ্চাশটি কঞ্চির আঁটিকে কেহই ভাঙ্গিতে পারে না। একটি পাটের আঁশকে সকলেই ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু কতকগুলি আঁশ একত্র করিয়া যখন দড়ি পাকান হয়, সে দড়িকে কেহই ছিঁড়িতে পারে না। নির্জীব পদার্থের একতার মধ্যে যখন এত শক্তি, তখন আশ্‌রাফুল মাখলুকাত—সমস্ত জীবের সেরা মানুষের যদি একতা হয়, তবে তাহাদের শক্তি যে কতগুণ বাড়িয়া যায়, তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তখন তাহাদিগকে অবনত করিতে পারে এমন শক্তি কাহারো থাকে না; বিশেষতঃ ঈমানদার লোকের একতাবদ্ধ জমা'আতের যখন সৃষ্টি হয়, তখন তাহাদের প্রতি নাযেল হয় আল্লাহ্‌র রহ্‌মত। এই জন্যই আমাদের ইসলাম ধর্মে মসজিদে একত্র হইয়া শৃঙ্খলার সহিত একতাবদ্ধভাবে একজন ইমামের তাবেদারী করিয়া দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার হুকুম হইয়াছে। এই জন্যই যেখানে মুসলমানদের বসতি থাকিবে, সেইখানেই প্রতি মহল্লায় মহল্লায়—পল্লীতে পল্লীতে মসজিদ থাকিতেই হইবে। মসজিদকে কেন্দ্র করিয়াই হইবে মুসলমান সমাজের সংগঠন। ইহা শুধু Tradition বা সংস্কার নয়; ইহা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রবর্তিত উত্তম আদর্শ। মহল্লার প্রতিটি লোকের যোগাযোগ থাকে মসজিদের সঙ্গে এবং দায়িত্ব থাকে মসজিদের প্রতি। মসজিদের একজন ইমাম থাকেন এবং একজন মুআয্‌যিন থাকেন। ইমাম ও মুআয্‌যিনের খেদমত করা এবং চেরাগ-বাতি বিছানা বা পানির ব্যবস্থা করা মহল্লাবাসীদেরই কর্তব্য। প্রত্যেকেরই কিছু কিছু করিয়া মসজিদের সাহায্য করিতে হইবে।

মক্তব

মসজিদের দ্বারাই মক্তবের কাজ চলে। ইসলামের বুনিয়াদী তা'লীম—প্রাথমিক শিক্ষা মক্তবেই হয়। আল্লাহ্‌কে চেনা, রাসূলকে চেনা এবং কিসে আল্লাহ্ পরকালে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং কিসে অসন্তুষ্ট হইবেন, তাহা জানা প্রত্যেকটি মানুষের উপরই ফরয। এই শিক্ষার প্রাথমিক সূচনা হয় মক্তবে। অতএব, মক্তব মুসলমানদের জন্য কতদূর জরুরী তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

মক্তবের ওস্তাদজীর দায়িত্ব এবং মর্তবা যে কত অধিক, তাহা ইহার দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে যে, মানুষ জীবনভর যাহাকিছু কলেমা, নামায, রোযা প্রভৃতি করিবে, তাহার সবকিছুরই গোড়াপত্তনকারী হইতেছে মক্তবের এই ওস্তাদজী। অতএব, তিনি সকলের সমস্ত এবাদত বন্দেগীর সমপরিমাণ সওয়াব পাইবেন। সুতরাং সকলের ঊর্ধ্বে তাঁহার মর্তবা হইবে। কাজেই সকলের উচিত, মক্তবের ওস্তাদজীর এবং মসজিদের ইমাম ও মুআয্‌যিনের তা'যীম ও সম্মান করা। ইমাম ও মুআয্‌যিনের সম্মান এইজন্য করিতে হইবে যে, মুআয্‌যিন সবাইকে আল্লাহ্‌র দরবারের দিকে ডাকিয়া আনেন এবং ইমাম ছাহেব সকলকে আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছাইয়া তাহাদের আরযী (দরখাস্ত) পেশ করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পবিত্র দরবারের আদব-কায়দা ও নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন।

মাদ্রাসা

আল্লাহ্‌কে চেনা, আল্লাহ্‌র রাসূলকে চেনা, আখেরাতের নেকী-বদীর হিসাবের কথা জানা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিষয়সমূহ জানা প্রত্যেক মানুষের উপরই সর্বপ্রধান ফরয। এইসব বিষয়ের, মূল বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে কোরআন শরীফে এবং হাদীস শরীফে। তথা হইতেই বড় বড় আলেমগণ কিছু কিছু বিভিন্ন ভাষায় লিখিয়া থাকেন বা বর্ণনা করিয়া থাকেন। আজকাল সকলেই নিজ চোখে দেখিতে চায়, অন্যের কথায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে চায় না। কাজেই কোরআন হাদীসের এলম হাছিল করা সকলের উপর ফরয। কোরআন হাদীসের ভাষা আরবী, আল্লাহ্‌র ভাষা আরবী, বেহেশ্‌তবাসীদের ভাষা হইবে আরবী, নামাযের ভাষা আরবী, কাজেই সকলেরই আরবী ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য। আরবী ভাষা না শিখিয়া শুধু অনুবাদ পড়িলে তাহাতে অনুবাদকের কথাই পড়া হয়; আল্লাহ্‌র বাণী পড়া হয় না। অবশ্য অনুবাদক যদি বিশ্বস্ত ও খোদাভীরু হন, তবে তাহার মুখে আল্লাহ্‌র বাণী কিছু বুঝিতে পারিয়া কিছু তৃপ্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরিপূর্ণ তৃপ্তি কখনো হইতে পারে না। আর অনুবাদক যদি খোদাভীরু বা খোদাভক্ত না হয় বা কোরআনের ভাষায় যদি তার পূর্ণ দক্ষতা না থাকে বা ইসলামের প্রতি শত্রুতাবশতঃ যদি সে কোরআন শরীফের অর্থ বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে অথবা টাকার লোভে বা অন্য কোন হীন উদ্দেশ্যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে সে অনুবাদ পড়িয়া কিছুতেই আল্লহ্‌র কথা পাওয়া যাইবে না। এজন্য মুসলমানের আল্লাহ্‌র কোরআনের ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা জন্মাইতেই হইবে। নতুবা জাতি ধর্ম সবকিছুই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

কোরআনের ভাষায় দক্ষতা জন্মাইবার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা মুসলমানদের উপর ফরয এবং মাদ্রাসা পরিচালনার খরচ বহন করাও মুসলমানদের উপর ফরয। হুকুমৎ ইহাতে সহায়তা না করিলেও মুসলমানদের উপর ইহা ফরয থাকিবেই থাকিবে। ফলকথা এই যে, ধর্ম রক্ষার খাতিরে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসার দরকার আছেই আছে। ইহা কোন রসম নয় বা কোন গোঁড়ামিও নয়; বরং ইহা আল্লাহ্‌র কোরআন রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী দ্বীনের খেদমত। যেহেতু ইসলামের শত্রুদের দ্বারা আমাদের সমাজ বহুকাল যাবৎ শাসিত ও পরিচালিত হইয়াছে এবং তাহার প্রভাবে অনেকেই মসজিদের মুআয্‌যিনকে আলেমকে বা তালেবে এলমকে তাঁহাদের যোগ্য মর্যাদা দেয় না; বরং অনেকেই তাঁহাদের নিজেদের দুর্ভাগ্য টানিয়া আনার জন্য তাঁহাদিগকে অনেক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, তাঁহাদিগকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া থাকে। এইসব অত্যন্ত জঘন্য পাপ। এহেন পাপের মধ্য দিয়া একজন আলেম বা তালেবে এলমের মনে আঘাত দিলে হয়ত তাহার কারণে দেশকে-দেশ তাবাহ ও বরবাদ হইয়া ধ্বংসে পতিত হইতে পারে। হযরত মাওলানা থানভী চিশ্‌তী (রঃ) অধিকাংশ সময়ে সমাজের লোকদের ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহাদিগকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে এ বয়াতটি নছীহত স্বরূপ পড়িতেন—

مبیں حقیر گدایان عشق راکیں قوم   شاهان بے کمر و خسروان بے کلاه اند

ইহার মমার্থ এইঃ হে মুসলমানগণ! এই ইমাম মুআয্যিনগণ এই আলেম ও তালেবে এলেমগণ যদিও তাহারা দেখিতে গরীব, কিন্তু হাকীকতে তাহারা আল্লাহ্র আশেক। অতএব, খবরদার! খবরদার! তোমরা তাহাদিগকে কখনও হাকীর (তুচ্ছ) মনে করিও না। কেননা, যদিও তাহাদের কাছে তাজ ও তখত নাই, বিল্ডিং বা ফার্নিচার নাই; কিন্তু যেহেতু তাহারা আল্লাহ্র আশেক, কাজেই তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহ্। অতএব, সাবধান! আল্লাহ্র ব্যথিতদের মনে তোমরা কোনরূপ ব্যথা দিও না; দিলে তোমাদের আর খায়ের নাই; তোমরা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

নেক লোকদিগকে তাহাদের দারিদ্র্যের দরুন তুচ্ছ করার চেয়ে জঘন্য পাপ আর কিছুই হইতে পারে না। আজকাল অনেকেই খেয়াল না করিয়া এইরূপ পাপে ডুবিয়া ধ্বংস হয়, সেই জন্য দেলের দরদে এই কথা কয়টি সমাজের উপকারার্থে লিখিলাম।

দাড়ি রাখা ও মোচ খাট করা

বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীঅতের যাবতীয় দায়িত্ব আসিয়া ঘাড়ে চাপে। এতদিন বাপে খাওয়াইয়াছে, বাপে টাকা দিয়াছে; এখন আর বাপের কাছে চাওয়া উচিত নয়। বাপের কাছে এখন চাহিতেও লজ্জাবোধ করা উচিত। বাপ যদি এখনো দেয়, তবে সে তাহার অনুগ্রহ, তাহার মেহেরবানী। এ অবস্থায় তাহার শোকর আদায় করা উচিত। কিন্তু তাহার নিকট কোনরূপ দাবী চলিবে না; বরং এখন বাপকে কামাই রোজগার করিয়া খাওয়ান উচিত। অবশ্য এই রোজগারের সময়ে যাবতীয় পাপ পথ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

যৌবনের সংগে সংগে মুখে দাড়ি দেখা দিলে, কুসংসর্গের প্রভাবে ও পরানুকরণের দুর্বলতার কারণে, দাড়ি ফেলিয়া দিতে মনে চাহিবে; কিন্তু এ সময় মনে রাখিবে, যে লোক রাসূলের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কুসংসর্গের তাবে'দারী করিবে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মনে ব্যথা দিয়া বিজাতির অনুসরণ করিবে, তাহার স্থান পরকালে কোথায় হইবে, উহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে। ইহা কখনো মনে করিবে না যে, ইহা মোল্লা-মৌলবীদের মনগড়া কথা; বরং ইহা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) -এর অলংঘনীয় আদেশ যে, اوفوا اللحى واحفوا الشوارب অর্থাৎ, (হে মুসলমানগণ! খবরদার! তোমরা দাড়ি লম্বা করিয়া রাখ এবং মোচ খাট করিয়া ফেল।

রাসূলের এই আদেশটি যে কত বড় উপকারী এবং কত প্রয়োজনীয় তাহা আখেরাতে ত বুঝিবেই, আর দুনিয়াতে যখন জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইবে, তখনও বুঝিবে।

অনেকে বিজাতীয় অনুকরণে বগলের পশম লম্বা করিয়া রাখে। নাভির নীচের পশম ছাফ করে না—ইহা অতি জঘন্য রকমের কুঅভ্যাস এবং অতি ঘৃণিত ধরনের পাপ। বিজাতীয় অনুকরণের ন্যায় হীনতা-নীচতা আর নাই। জাতির গৌরববোধ যাহাদের নাই, তাহারা অতি নির্লজ্জ মানুষ। মনুষ্য সমাজে তাহারা স্থান পাওয়ার যোগ্য নহে।

অনেক সময় বিধর্মীদের অনুকরণে পুরুষ লোক মাথার চুল পিছনের দিকে কামাইয়া বা ছোট করিয়া সামনের দিকে লম্বা করিয়া রাখে, মেয়েদের মাথার চুলও কাটিয়া খাট করিয়া রাখে—ইহা একদিকে আখেরাতের বিচারে পাপ, তেমনি দুনিয়ার ইজ্জতের দিক দিয়াও খুবই ঘৃণিত কাজ। কেননা, ইহাতে বিধর্মীরা মনে করিবে যে, এই হতভাগাদের নিজেদের কোন আদর্শ নাই—এরা

আমাদেরই অনুসারী বা তাবেদার, আমাদেরই পদলেহনকারী। ইহা কতখানি ঘৃণার কথা, কত-খানি লজ্জার বিষয়!

লেবাস-পোশাক

লেবাস-পোশাক সম্বন্ধে আমাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটি আদর্শ আছে। মুসলমান পুরুষের আদর্শ পোশাক হইতেছেঃ নিম্ন শরীরের জন্য—প্রাইভেট জীবনে এবং সাধারণ লোকের জন্য লুঙ্গি। আর তাহাদের সামাজিক জীবনে এবং উচ্চস্তরের জন্য পায়জামা (পায়ের গিরা না ঢাকে এইরূপে)। খৃষ্টানদের আদর্শ হইতেছেঃ প্যান্ট, ফুল প্যান্ট বা হাফ প্যান্ট। আর হিন্দুদের আদর্শ হইতেছেঃ ধুতি। ঊর্ধ্ব শরীরের জন্য মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ পোশাক হইতেছেঃ প্রাইভেট জীবনে এবং সাধারণ লোকের জন্য কোর্তা, পিরহান বা পাঞ্জাবী এবং তাহাদের সামাজিক জীবনে ও উচ্চস্তরের জন্য আচ্‌কান শিরওয়ানী এবং আরো উচ্চস্তরের জন্য আবা, চোগা, মেশলাহ প্রভৃতি। ইংরেজ বা খৃষ্টানদের আদর্শ পোশাক, কোট শার্ট। আর হিন্দুদের আদর্শ পোশাক হয়ত নাই বা ধুতির খুট। আর মাথার জন্য—মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ টুপী ও পাগড়ী। (বিনা প্রয়োজনে গলায় কিছু না।) খৃষ্টানদের জাতীয় আদর্শ হ্যাট; আর তাহাদের ধর্মীয় আদর্শ গলায় ধর্মীয় প্রতীক ক্রুশ চিহ্ন স্বরূপ নেকটাই পরা এবং হিন্দুদের আদর্শ খোলা মাথা। মুসলিম মহিলাদের আদর্শ পোশাক—নিম্ন শরীরের জন্য—পায়ের পাতা ঢাকে এরূপ পায়জামা, ঊর্ধ্ব শরীরের জন্য লম্বা আস্তিনের লম্বা ঝুলের কোর্তা এবং বুক উঁচু না দেখায় তার জন্য বুক-বন্ধনী আর মাথার জন্য মুখঢাকা ঘোমটাসহ চাদর। হিন্দু মহিলাদের পোশাক—ধুতি বা শাড়ী, শাড়ীর একপাশ দ্বারা মাথা ঢাকা। খৃষ্টান বা ইংরেজ মহিলাদের—মাথা খোলা, বুক খোলা, মুখ খোলা ও হাঁটুর নীচে খোলা গাউন। (নীচে কি তাহা আমি জানি না, তবে সম্ভবতঃ আণ্ডার-ওয়ার জাতীয় কিছু।)

ইসলাম ধর্ম যেহেতু আল্লাহ্ মনোনীত ধর্ম মানুষের কোন মনগড়া ধর্ম নয়, সেইজন্য ইহাতে যেমন খোদার বন্দেগীর ব্যবস্থা আছে, যেমনি ইহাতে সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিধি ব্যবস্থা, লেবাস-পোশাকের ব্যবস্থা, খাদ্য খোরাকের ব্যবস্থা, বাসস্থানের ব্যবস্থা, এক কথায়—সব ব্যবস্থাই আছে। সুতরাং যেক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বাধীন একটি ব্যবস্থা আছে, সেক্ষেত্রে যদি কেহ নিজের জাতীয় আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন বিজাতীয় আদর্শ গ্রহণ করে, তবে তাহাকে যে জাতিচ্যুত বলা যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বাহ্লেই আমাদিগকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, من تشبه بقوم فهو منهم ইহার মর্ম এই যে, যদি কেহ অন্য কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিয়া তাহাদের লেবাস-পোশাক এবং ছুরত-সীরত অবলম্বন করে, তবে তাহাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সেই সম্প্র-দায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। উপরের হাদীসটি কোরআনের এই আয়াতেরই প্রতিধ্বনি করিতেছেঃ

وَلَاتَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ○

ইহার মর্মার্থ এই যে, হে মুসলমানগণ! যাহারা যালেম, কাফের, আল্লাহ্‌কে চিনে না, রাসূলকে মানে না, তাহাদের দিকে তোমরা ঝুঁকিও না। অর্থাৎ, যাবতীয় লেবাস-পোশাক ছুরত-সীরতের ব্যাপারে খাদ্য-খোরাক বা বিলাস-ব্যাসনের ব্যাপারে তোমরা তাহাদের অনুকরণ করিও না। যদি

তোমরা তদ্রূপ কর, তবে তোমাদিগকে দুনিয়া এবং আখেরাতে আগুন স্পর্শ করিবে; অর্থাৎ আখেরাতে দোযখের আযাব ও দুনিয়ায় লাঞ্ছনার আযাব ভোগ করিতে হইবে। কোরআন শরীফে আরও আছেঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○ سورة النساء

ইহার মর্মার্থ এই যে, রাসূলের তরীকা, রাসূলের হেদায়ত এবং রাসূলের আদর্শ পরিষ্কার প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও যাহারা উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে এবং মু'মিন মুসলিমগণের জীবনধারাকে ছাড়িয়া অন্যরূপ জীবনধারা গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে (দুনিয়ার জীবনে) আমি তাহা করিতে দিব। জোর করিয়া বলপূর্বক ফিরাইয়া রাখিব না। কিন্তু পরিণামে পরকালে আমি তাহাদিগকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে স্থান দান করিব,—জানিয়া রাখিও জাহান্নাম অত্যন্ত খারাব স্থান। সুতরাং কোন মুসলিম নর-নারীর বা বালক-বালিকার লেবাসে-পোশাকে, ছুরতে-সীরতে খাদ্য-খাদকে কখনও বিজাতীয় অনুকরণ করা চাই না। কারণ, মানব জাতি যাবৎ তাহাদের জাতীয় গৌরব বোধকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া মানবতার স্তর হইতে ইতর প্রাণীর স্তরে নামিয়া না যায়, তাবৎ তাহারা নিজেদের জাতীয় আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য জাতির আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে না।
—সূরা-নেছা, রুকূ ৭

পরানুকরণ দূষণীয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নীত যদি অন্য কোন জাতি করে, তবে সে উন্নতির পথ আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না। এ সম্পর্কে হযতর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেনঃ

كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا ـ

'জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা মুমিনদের জন্য হারানিধি স্বরূপ। অতএব, জ্ঞানের কথা যেখানেই পাওয়া যাউক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা মুমিনেরই হক এবং মুমিনেরই হারান ধন।'

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন, প্রতি ক্ষেত্রেই দেখিবেনঃ মুসলিম জাতির পোশাক মানুষের ভিতরে গাম্ভীর্য, চিন্তাশীলতা ও আত্মসম্মান বোধের চেতনা জাগ্রত করে, পক্ষান্তরে অন্যান্য খাট, অর্ধ বা উলঙ্গ পোশাক মানুষকে উলঙ্গই রাখে, এমন পোশাক মানুষের মধ্যে ছেলেমী, বাচালতা ইত্যাদি ভাব আনয়ন করে।

হাফপ্যান্ট

হাফপ্যান্ট পরার মধ্যে পরানুকরণ ছাড়া আরও খারাবী এই যে, হাফপ্যান্ট পরা আমাদের দেশের গামছা পররা মত। হাফপ্যান্ট পরিলে ফরয তরক হইয়া যায়। কারণ, ছতর ঢাকা ফরয। পুরুষের ছতর হইতেছে নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত। অতএব, যদি কাজের সময়ের জন্য হাঁটু ঢাকার মত ছোট পায়জামা তৈয়ার করিয়া পরা হয়, তবে গামছা পরা ও হাফপ্যান্ট পরার ফরয তরকের পাপ হইতে বাঁচা যায়।

নেক্‌টাই

নেক্‌টাই-এর মধ্যে পরানুকরণ ছাড়া আরও খারাবী এই যে, নেক্‌টাই-এর গিরা বাঁধাটা খৃষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক। তাহারা বলে যে, যীশুখৃষ্টকে শূলীতে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। যেহেতু তাহাদের মিথ্যা মতে তিনি জগতের সব পাপ হরণ করিয়া নিজের জীবনকে শূলীবিদ্ধ করিয়া, কোরবান করিয়া সমস্ত মানুষের পাপ দূর করিয়া গিয়াছেন, কাজেই খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী যে কেহই হইবে, তাহার সেই শূলীকাষ্ঠের চিহ্ন সর্বদা গলায় ধারণ করিতে হইবে। এইজন্য খৃষ্টানরা শূলীকাষ্ঠের চিহ্নস্বরূপ নেকটাই ব্যবহার করিয়া থাকে। সুরাং নেকটাই ধারণ করা কোন মুসলমানের কিছুতেই উচিত নহে। কারণ, মুসলমানের দৈনিক পাঁচবার আল্লাহ্‌কে সজ্‌দা করিতে হয়—মিথ্যার প্রতীক গলায় ঝুলাইয়া সত্য খোদার দরবারে যাওয়া সাজে কি? যাহারা পরানুকরণের ন্যায় নীচাশয়তা ভিতরে রাখে, তাহাদের দ্বারা জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা যায় কি?

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ইহুদী এবং খৃষ্টান, এই দুইট জাতিই ছিল তৎকালীন প্রধান জাতি। কিন্তু এই উভয় জাতিই সাংসারিক ব্যাপারে নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়; বরং স্বর্গীয় ধর্মীয় ব্যাপারে দারুণ মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। ইহুদীরা সত্যকে মিথ্যা করিয়া রাখিয়াছিল। হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র অতি মর্যাদাশালী সত্য পয়গম্বর। কিন্তু ইহুদী পাপিষ্ঠরা এহেন সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করিয়া হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলিত, হারামের পয়দায়েশ। (নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক।) কোরআন এহেন মিথ্যাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য বারবার ঘোষণা দিয়াছেঃ 'ঈসা পবিত্র, ঈসার জন্ম পবিত্র, ঈসার মৃত্যু পবিত্র।' দ্বিতীয় দিকে খৃষ্টানরা অতি ভক্তিতে মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা শুধু যে, ধর্মের ব্যাপারে এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল তাহাই নহে, অধিকন্তু তাহারা সারা দুনিয়াতে পাপের ও যুল্‌মের তাণ্ডবলীলা চালাইবার জন্য জঘন্যতম মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিল যে, 'ঈসা খোদার বেটা। খোদার বেটা শূলীকাষ্ঠে ঝুলিয়া নিজের জীবন কোরবান দিয়া সমস্ত দুনিয়াবাসীদের পাপ মোচন করিয়া গিয়াছেন। কাজেই এখন লোকে যতই পাপ, যতই যুল্‌ম করুক না কেন, তাহাতে তাহার কোনই ক্ষতি হইবে না। এই দুইটি মিথ্যা এত বড় মিথ্যা যে, এক দিকে ইহাতে আল্লাহ্‌র তাওহীদ (একত্ববাদ) নষ্ট হইতেছে, অন্য দিকে দুনিয়াতে পাপ এবং অনাচারের তাণ্ডবলীলা চালাইবার সুযোগ হইয়াছে। খৃষ্টানদের এই রকম জঘন্য মিথ্যার প্রতীক হইতেছে 'ক্রুশ-টাই' অর্থাৎ 'নেক্‌টাই'। সেন্টপলের এই সৃজিত জঘন্য ইতিহাসকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বারবার ঘোষণা দিয়াছেঃ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ الاية "তাহারা (ইহুদীরা) তাঁহাকে (ঈসাকে) বধও করিতে পারে নাই, শূলীতেও চড়াইতে পারে নাই।"

—সূরা নেছা, রুকূ-৩

সুতরাং যাহারা নেকটাই পরে, তাহারা যেন কোরআনকে মিথ্যা বলিতেছে এবং জঘন্য মিথ্যা ইতিহাসকে সত্য বলিতেছে। (নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক।)

ফুলপ্যান্ট

ফুলপ্যান্টের মধ্যে পরানুকরণ ভিন্ন আরও খারাবী এই যে, ইহাতে সাধারণতঃ পায়ের গোড়ালীর গিরা ঢাকিয়া যায়। অথচ এই গিরা ঢাকিয়া পুরুষের কোন কাপড় পরা হারাম। এতদ্ব্যতীত মুসলমানদের দৈনিক পাঁচবার নামায পড়িতে হয়; কিন্তু ফুলপ্যান্ট পরিয়া নামায পড়ার বিশেষ অসুবিধার কারণে এবং নামাযে উঠা-বসায় উহার ভাঁজ ভাংগিয়া যায় বলিয়া অনেকে নামাযী হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে নামায পড়ে না; পরে ক্বাযা করিয়া লয়। ইহা কত বড় দুঃখের বিষয়! উপরন্তু পায়জামা পরিয়া যেমন আরাম পাওয়া যায়, ফুলপ্যান্টে সেরূপ আরাম পাওয়া যায় না।

নারীর মাথার চুল কাটা

দোররোল মোখ্‌তার কিতাবে আছেঃ قَطَعَتْ شَعْرَ رَاْسِهَا اَثِمَتْ وَلُعِنَتْ ○

অর্থাৎ, "কোন নারী যদি তাহার মাথার চুল কাটে, তবে সে পাপিনী হইবে এবং অভি-শপ্তা হইবে।"

ফতওয়া বাযযাযিয়া কিতাবে আছেঃ

وَاِنْ بِاِذْنِ الزَّوْجِ لِاَنَّهٗ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَلِذَا يُحْرَمُ قَطْعُ لِحْيَتِهٖ ـ

ইহার মর্মার্থ এই যে, নারী যদি তাহার স্বামীর অনুমতি বা আদেশক্রমেও মাথার চুল কাটে, তথাপি সে পাপিনী ও অভিশপ্তা হইবে। কেননা, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করিয়া কোন মানুষের (চাই সে স্বামীই হউক বা রাষ্ট্রনায়ক হউক) আদেশ, অনুমতি পালন করা যাইতে পারে না। এই জন্যই স্বয়ং স্বামীর পক্ষেও তাহার দাড়ি কাটা হারাম।

নারীর মাথার চুল কাটার মধ্যে দুইটি পাপ রহিয়াছে। প্রথমটি হইতেছে নারীর জন্য নরের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম। হাদীস শরীফে এই সাদৃশ্য অবলম্বনের জন্য অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ـ

(ترمذی ابو داؤد ابن ماجة و مسند امام احمد)

অর্থাৎ 'যে নারী লেবাস-পোশাকের দ্বারা বা চুল দাড়ি দ্বারা নরের রূপ আকৃতি ধারণ করিবে, তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ পতিত হইবে; এবং যে পুরুষ লেবাস-পোশাকের দ্বারা বা চুল দ্বারা নারীর রূপ আকৃতি ধারণ করিবে তাহাদের উপরও আল্লাহ্‌র অভিশাপ পতিত হইবে।'

আর দ্বিতীয় পাপ হইতেছে বিজাতীয় সাদৃশ্যতা গ্রহণ করা। নরনারী নির্বিশেষে যে কোন মুসলমানের পক্ষেই বিজাতীয় অনুকরণ করা হারাম। এ সম্বন্ধে হাদীস এবং কোরআন শরীফের আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

'সাদৃশ্যতা' শব্দের মূল আরবী হইতেছে 'তাশাব্বুহ' (تشبه) [সাদৃশ্যতা শব্দটি আমি ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু এই শব্দটি সম্পূর্ণরূপে আমার মনঃপুত হইতেছে না। কেননা, শব্দটি সাধারণভাবে প্রচলিত হইলেও ব্যাকরণ অনুসারে ইহা ভুল। দ্বিতীয়তঃ এই শব্দের দ্বারা মূল تشبه শব্দের পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশ পায় না। এজন্য تشبه শব্দের পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়া পরে আমি 'সাদৃশ্যের' পরিবর্তে تشبه শব্দই ব্যবহার করিব] হাদীসে تشبه-ই আছে, تشابه নহে। تشبه-এর অর্থ অনুরূপ হওয়া (চাই অনিচ্ছাকৃতভাবেই হউক)। আর تشبه অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ দৃশ্য গ্রহণ করা। ইহার অর্থ—"অনুকরণ করা" ও করা যায় না। কারণ যে সব জিনিস দৃশ্য নয় যেমন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি, তাহাতে অনুকরণ হারাম নহে। শুধু যেটা দেখা যায় দৃশ্য হয়, যেমন বাহিরের পোশাক, চুল, দাড়ি, উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা প্রভৃতির নিয়মপদ্ধতি এই জাতীয় সমস্তের উপরই تشابه শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। যেটা দেখা যায় না, সেটার উপর প্রয়োগ হইতে পারে না।

কেহ যদি তাশাব্বুহ করার এরাদা না করিয়া শুধু নিজের আরামের জন্য, নিজের নফ্‌সের খাহেশের জন্য করিয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে, তাহার এইরূপ খাহেশ কেন হইতেছে? —অন্যের দেখাদেখিই ত হইতেছে? কাজেই গুপ্ত অনুকরণেচ্ছা নিশ্চয়ই আছে। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অনুকরণেচ্ছাকে রদ করিয়া দিয়া শুধু নিজের আরাম বা দরকারবশতঃ করে, তবুও দেখিতে হইবে যে, ঈমানের মূল ভিত্তি হইতেছে আল্লাহ্ ও রাসূলের অর্থাৎ কোরআন হাদীস, ফরয-ওয়াজিব, সুন্নত, মাদ্রাসা-মসজিদ প্রভৃতির মহব্বতের উপর। আর মহব্বত কাহারও প্রতি প্রমাণিতই হইতে পারে না—যে পর্যন্ত মহব্বতের বিপরীত বস্তু (অর্থাৎ, শত্রুতা) তাহার শত্রুর সঙ্গে প্রমাণিত না হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি, কোরআন হাদীসের প্রতি, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতের প্রতি বা মাদ্রাসা-মসজিদের প্রতি যাহারা ঘৃণা, বিরক্তি বা শত্রুতা পোষণ করে, তাহাদের প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতার ভাব পোষণ না করিলে, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি মহব্বতের দাবীর কোন অর্থই হয় না। সুতরাং দরকারবশতঃ বা আরামের জন্য যদিও কোন জিনিস তাহাদের অনুরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তবুও হয় জিনিসকে কিছু অন্যরূপ করিয়া লইতে হইবে, না হয় বিরক্তি বা অনিচ্ছার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা ঈমানের হানি হইবে।

পুরুষের দাড়ি কাটা

আজকাল নব্য যুবকদের মধ্যে প্রথা হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও দাড়ি রাখে না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য প্রথা এবং সাংঘাতিক পাপ। দাড়ি না রাখার মধ্যে নিম্নরূপ অনেকগুলি পাপ একত্র হয় ;—(১) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া যত নবী বা যত ওলী অতীত হইয়াছেন, সকলেই দাড়ি রাখিয়াছেন। দাড়ি না রাখিলে সেই আদি সুন্নত (নবীদের আদর্শ) তরক হইয়া যায়। (২) স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আদর্শঃ

اوفوا اللحى واحفوا الشوارب

"তোমাদের দাড়ি লম্বা করিয়া রাখ এবং মোচকে খাট কর।"

যে প্রাণপ্রিয় রাসূলের 'শাফাআত' ছাড়া কাহারও বেহেশ্‌তে যাওয়ার সাধ্য নাই, তাঁহার আদর্শের উপর ছুরি, কাঁচি চালাইলে তাঁহার মনে ব্যথা লাগে না কি? এইরূপ নবীর মনে ব্যথা দিয়া আমরা তাঁহার শাফাআতের আশা করিতে পারি কি? চিন্তা করুন, আমাদের নবী আমাদিগকে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে গঠন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই আদর্শ ছাড়িয়া হীনমন্যতার

পরিচয় দিয়া অন্য জাতির আদর্শ গ্রহণ করিলে আমাদের ইহ-পরকাল ভাল হওয়ার আশা করা যাইবে কি? মনে রাখিবেন, একদিন তাঁহার দরবারে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

পুরুষের মাথা খোলা রাখা

পুরুষের মাথায় টুপি রাখা এবং আরও একটু উন্নত পর্যায়ের হইলে টুপির সঙ্গে রুমাল বা পাগড়ী রাখা ইসলামী তরীকাহ।

হিন্দুদের প্রথা ছিল মজলিসে খোলা মাথা থাকা আর ইংরেজদের প্রথা ছিল হ্যাট মাথায় দেওয়া; কিন্তু আজকাল প্রায় সকলেই মাথা খোলা রাখে। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা কোন সভ্যতা নয়; বরং একটা বড় রকমের অসভ্যতা। অতএব, বিজাতির অনুকরণ না করিয়া মুসলমান ছেলে-দের পক্ষে নিজেদের জাতীয় আদর্শ পালন করাই দরকার। টুপি মাথায় রাখা একান্ত অপরিহার্য।

নারীদের মাথা খোলা রাখা

নারীদের মাথা চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখা ইসলামের নির্দেশ। তাহাদের মাথা খোলা রাখা জঘন্য রকমের পাপ। কারণ, তাহাদের মাথার চুল খোলা দেখিলে, যুবকদের মনে যৌন উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নারীর মাথার চুলও ছতরের মধ্যে গণ্য। ছতর খোলা রাখিলে যে পাপ হয়, চুল খোলা রাখিলেও তদনুরূপ পাপ হইবে।

শাড়ী

শাড়ী পরা নারীদের জন্য সুন্নতের বরখেলাফ। কারণ, হযরত নবী আলাইহিস্‌সালামের বিবিগণ এবং কন্যাগণ—যেমন আমাদের মা ফাতেমা, মা আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ কখনও শাড়ী পরেন নাই। তাঁহাদের লেবাস ছিল মাথায় উড়নী, গায়ে লম্বা আস্তিনের ও লম্বা ঝুলের জামা বা কোর্তা আর পরনে পায়ের পাতা ঢাকা পায়জামা বা ছায়া। এতদ্ভিন্ন হযতর নবী আলাইহিস্‌সালাম আদেশ করিয়াছেনঃ خَالِفُوا الْمَجُوْسَ وَالْمُشْرِكِيْنَ (হে মুসলমানগণ! তোমরা অগ্নিপূজকদের এবং মূর্তিপূজকদের অনুরূপ লেবাস পরিধান করিও না এবং শরীরের দৃশ্যকে তদ্রূপ বানাইও না—বরং তাহাদের বিপরীত করিও।'

গাউন পরিলেও মেয়েদের পায়ের নিম্নদিক খোলা থাকে। অথচ মেয়েদের পায়ের নীচের দিকেও খোলা রাখা জায়েয নহে। মেয়েদের বুক যাহাতে খোলা না থাকে বা উঁচু না দেখা যায়, সেজন্যও চাদর দিয়া বুক, গলা, ঘাড় ভালমত ঢাকিয়া লওয়া দরকার। ঠেকা জরুরতবশতঃ মেয়েদের যদি কোন সময় বাড়ীর বাহির হইয়া পথে হাঁটিতে হয় তবে ময়লা-কাপড় পরিয়া, ময়লা চাদর গায় দিয়া, ময়লা-বোরকা মুড়ি দিয়া বাহির হওয়া শ্রেয়ঃ—যাহাতে মেয়েলোকদের রূপ-সৌন্দর্য কোন বেগানা পুরুষের নজরে না পড়ে, ইহাই ইসলামের বিধান।

সিনেমা

সিনেমার মধ্যে পাঁচ রকমের পাপ রহিয়াছেঃ ১। সময় নষ্ট, ২। সম্পদ নষ্ট, ৩। স্বভাব নষ্ট, ৪। স্বাস্থ্য নষ্ট ও ৫। ঈমান নষ্ট।

এই পাপগুলির কারণে আমাদের শুধু স্রোতে ভাসিয়া না যাইয়া হিতাহিত চিন্তা করা দরকার।

যদি নারী-চিত্র বাদ দিয়া শিক্ষামূলক ফিল্ম কেহ তৈয়ার করে, তবে তাহার মধ্যে অতগুলি পাপ থাকিবে না; শুধু জীবের ছবি তোলার পাপ থাকিবে। জীবের ছবিও বাদ দিয়া যদি শিক্ষামূলক ফিল্ম করা যায়, তবে তাহাতে পাপ নাই।

কুসংসর্গ বর্জন

ছেলেমেয়ে হইতেছে পিতামাতার হাতে আমানতস্বরূপ। তাহারা বে-গোনাহ্। পিতামাতারও কর্তব্য হইতেছে তাহাদিগকে কুসংসর্গ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহাদের জন্য সুশিক্ষার এবং সৎ সংসর্গের ব্যবহার করা। যাহারা নামায পড়ে না, পাক-নাপাক, হালাল-হারাম বাছে না, যাহারা ইসলাম বিরোধী এবং ধর্মের বা অন্য মতবাদের প্রচারক প্রচারিকা, তাহাদের সংসর্গে বে-গোনাহ্ সন্তানদিগকে দেওয়া অতি বড় খেয়ানত। এতবড় খেয়ানতের মহাপাপের কথা কল্পনা করাও অসম্ভাব।

নাচ

আজকাল নাচকে একটা চারু শিল্প (fine art) বলিয়া মনে করা হয়। মানুষ যখন একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, নিজের সৃষ্টিকে ভুলিয়া যায়, মৃত্যুকে ভুলিয়া যায়, আখেরাতকে ভুলিয়া যায় এবং আল্লাহ্ ও রাসূলকে ভুলিয়া গিয়া একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, তখনই মানুষ নাচ-শিল্পে মত্ত হয়। মানুষের ধ্বংস তখন অতি নিকটে আসিয়া যায়। যত জাতি দুনিয়ার দর্শন-বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি করা সত্বেও ধ্বংস হইয়াছে, তাহাদের সকলেই নাচ ও রংয়ের মধ্যে, মদ ও স্ত্রীলোকের নেশার মধ্যে পড়িয়াই ধ্বংস হইয়াছে। এই সেই দিনকার কথা—মোঘল সাম্রাজ্যও ধ্বংস হওয়ার বড় কারণ ছিল ইহাই। তাহারা আল্লাহ্-রাসূলকে ভুলিয়া নফ্‌সের খাহেশের পূজার মধ্যে এবং মদ ও নারীর নেশায় পড়িয়াই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। নারীর নেশা মদের নেশার চেয়ে কোন অংশে কম নেশা নয়। এ নেশা মানুষের শিরায় শিরায় এমনভাবে ঢোকে যে, শেষ পর্যন্ত মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে; পাপ-পুণ্যের কোন জ্ঞান থাকে না, মন-মগজ একেবারে বিকৃত হইয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে ত একটু দেরীতে হয়, কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহা শীঘ্রই হয়।

অতএব, এই শিল্পকে উন্নত করার অর্থই হইতেছে জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া। কাজেই আল্লাহ্ যাহাদিগকে বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দান করিয়াছেন, তাহারা জাতিকে এই পাপ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করুন। যুবকদের অবস্থা ত এই যে, যাবৎ তাহাদের যৌবনের প্রবাহ আছে, তাবৎ তাহাদের গায়ে একবার এই বিষবাষ্প লাগিয়া গেলে তাহারা চিন্তা করার শক্তিই হারাইয়া ফেলে। যুবতীরাও তথৈবচঃ; কারণ, নারী জাতির মধ্যে ভাবপ্রবণতা এবং আশু আনন্দপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশী; স্থির বুদ্ধিতা এবং পরিণাম চিন্তা খুবই কম। এই ত গেল জাতি ধ্বংসের কথা, জাতির চরিত্র নষ্ট হওয়ার কথা।

ব্যক্তিগতভাবেও যাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ঘৃণা-লজ্জা, পুরুষত্ব বোধ বা গায়রাতের নাম-নিশানা আছে, তাহার নিজের স্ত্রী-কন্যাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে বা সামনে নাচিতে অথবা নিজের স্ত্রী-কন্যাকে অন্য পুরুষকে দেখিতে দিতে পারে না। বেগানা আওরতকে চোখ দিয়া দেখা চোখের যেনা, কান দিয়া তাহার কণ্ঠস্বর শোনা কানের যেনা, মন দিয়া তাহার কল্পনা করা মনের যেনা,

হাত দিয়া আগ্রহ সহকারে তাহার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করা ও গায়ে হাত লাগান হাতের যেনা, পা দিয়া বেগানা আওরতকে দেখিবার খাহেশে হাঁটিয়া যাওয়া পায়ের যেনা। এইসব ছোট ছোট যেনার পরেই আসে বড় যেনা করিয়া মহা পাতকী হওয়ার পালা। হে মানুষ! তুমি চিন্তা করিয়া দেখ; তোমার এই অংগগুলি তুমি নিজে সৃষ্টি কর নাই। যিনি তোমাকে এই অংগগুলি দান করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ পাপ কাজে ও এইরূপ অপকর্মে এই অংগগুলিকে ব্যবহার করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার নাফরমানী করার সময় তিনি ইচ্ছা করিলে এই অংগগুলিকে ছিনাইয়া নিয়া তোমাকে বিকলাংগ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি মহা ধৈর্যশীল। দুনিয়ার জীবনে তিনি এইগুলি ছিনাইয়া নিবেন না—যথেষ্ট মোহ্লৎ (সময়) দিবেন। কিন্তু পরকালে তাঁহার ভীষণ আযাবের কথা এবং সীমাহীন গযব ও গোস্বার কথা তোমাদের মনে রাখা উচিত এবং পাপ কাজে আল্লাহ্র এই দানসমূহকে ব্যবহার করা হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত। দুনিয়াতেও পাপের শাস্তি যে একেবারে হয় না তাহা নহে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা সব সময় উহা দেখান না। কখনও কখনও শুধু নজীর দেখাইয়া থাকেন। কারণ, প্রশ্ন আউট হইয়া গেলে ত আর পরীক্ষা হয় না। আর এ দুনিয়া ত শুধু পরীক্ষারই জায়গা। হাদীস শরীফে আছেঃ

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ حَتّٰى يُعْلِنُوْابِهَا اِلَّا فَشَافِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْاَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ مَّضَتْ
فِىْ اَسْلَافِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا ـ (ترغيب ترهيب)

অর্থাৎ, যে জাতির মধ্যে যেনা-ব্যভিচার এবং বেহায়ায়ী (নির্লজ্জতা) খুব বেশী হইবে, এমন কি শেষে আর লজ্জাবোধ বলিতে কিছু থাকিবে না, প্রকাশ্য হইয়া পড়িবে, তখন তাহাদের মধ্যে মড়ক, মহামারী দেখা দিবে এবং এমন এমন বিরাট রোগ দেখা দিবে, যাহা তাহাদের পূর্ব-পরুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল না।

যে ব্যক্তি নাচ বা রং-তামাশার অনুষ্ঠান করিবে বা মাহ্ফিল করিবে, তাহার পাপ হইবে সকলের চেয়ে বেশী।

কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়া গিয়াছেনঃ

مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَّايَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا
لَايَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ـ (ترمذى شريف)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্-রাসূলের সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে কোন নূতন পাপের পন্থা সৃষ্টি করিবে—যতলোক তদনুযায়ী আমল করিবে সকলের সমষ্টির সমান পাপের ভাগী সে একা হইবে; অথচ তাহাতে তাহাদের পাপ কম হইবে না।

অনেক সময় এমন হয় যে, পরস্ত্রীর সুর, রং এবং নাচ দেখার কারণে নিজের স্ত্রী হইতে মন ফিরিয়া যায়। এইরূপ হইলে মানুষের সংসারও মাটি হইয়া যায়। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য—আল্লাহ্, রাসূল যে জিনিসকে ঘৃণা করেন সে জিনিসকে তাহারও ঐরূপ ঘৃণা করা উচিত, যেরূপ সে তাহার নিজের মনের ঘৃণিত জিনিসকে ঘৃণা করে।

গান-বাদ্য

মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, কিন্তু সে স্বাধীনতা নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে। মানুষ যত রকমেরই শিল্পের উন্নতি করুক না কেন, তাহার সবেরই মূল সম্পদ আল্লাহ্রই সৃষ্ট এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত। কাজেই আল্লাহ্র দান করা সম্পদের দ্বারা শিল্পের উন্নতির বেলায় আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার ভিতরেই মানুষের থাকা উচিত। মানুষ চায় আনন্দ, নিরানন্দ জীবন তাহার পক্ষে হইয়া পড়ে দুর্বিষহ। কিন্তু সে আনন্দের সীমা নির্ধারিত আছে। সীমাহীনভাবে আনন্দ ভোগ করার জন্য মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। নাচ-শিল্প, বাদ্য শিল্প, সুর-শিল্প—এক কথায় যাবতীয় শিল্পের মূল সম্পদ আল্লাহ্ প্রদত্ত। নাচ-শিল্পের জন্য দরকার হয় একটি দেহের, সেই দেহটি আল্লাহ্ প্রদত্ত ; বাদ্য শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয় হাতের, মুখের, যন্ত্রের মস্তিষ্কের এবং শক্তির, ইহার সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত ; আর সুর-শিল্পের মূল সম্পদ গলার আওয়াজ, কিন্তু গলার আওয়াজ কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্র সৃষ্ট পদার্থের ভিতর আল্লাহ্র দেওয়া মাথা খাটাইয়া, আল্লাহ্র দেওয়া শক্তি খাটাইয়া সৌন্দর্য বাড়ানোর নামই শিল্পের উন্নতি।

আল্লাহ্ তা'আলা আনন্দ উপভোগের জন্য যে সীমা নির্ধারিত করিয়াছেন তাহাতে নাচ শিল্পের আদৌ অনুমতি নাই। এইরূপে নারীর সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধান অথবা উহার প্রদর্শনী করার আদৌ স্বাধীনতা নাই। নারীর দেহের মালিক স্বয়ং নারী নয়, তাহার দেহের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এই জন্যই সে যদি তাহার নিজের গলা কাটিয়া ফেলিতে চায় বা তার নিজের বুকে সে নিজে পিস্তলের গুলী করিতে চায়, এমন স্বাধীনতা তাহাকে দেওয়া হয় নাই। এইরূপে নারীকে এ স্বাধীনতাও দেওয়া হয় নাই যে, সে তাহার দেহের সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়া উহা পরপুরুষকে দেখাইবে বা সে তাহার দেহের অংগগুলি দ্বারা নাচ করিয়া অন্য পুরুষকে দেখাইবে। —অবশ্য সে তাহার নিজের স্বামীকে দেখাইতে পারে। এইরূপে পুরুষেরও স্বাধীনতা নাই পরস্ত্রীকে দেখার। শুধু নাচের বেলায় এবং সৌন্দর্য প্রদর্শনীর বেলায়ই নয়, নারীর সৌন্দর্য একমাত্র স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের পক্ষে কোন রকমেই দেখার স্বাধীনতা নাই।

সাধারণতঃ গান এবং বাদ্য একই সংগে হয় এবং বাদ্যের সংগে যে গান হয় তাহা সাধারণতঃ স্ফুর্তি এবং আনন্দ উপভোগের জন্যই হইয়া থাকে। এইজন্য গান-বাদ্যকে সাধারণভাবে হারাম করা হইয়াছে। গান অর্থাৎ সুর-শিল্প সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ط أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

ইহার মর্মার্থ এই যে, অনেক লোক এমন আছে, তাহারা গ্রহণ করে, ক্রয় করে কথার খেলা, কথার শিল্প, আল্লাহ্র দ্বীন থেকে লোকদিগকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার জন্য, আল্লাহ্র দ্বীনকে লোকের নিকট ঠাট্টার বস্তু করার জন্য। (অর্থাৎ, তাহারা কথায় কথায় খেলা খেলায়। কথা-শিল্পের এবং সুর-শিল্পের তাহারা উৎকর্ষ সাধন করিয়া আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে মানুষের যে আধ্যাত্মিক

উন্নতির বস্তু আছে, তাহা হইতে মানুষকে গাফেল করিয়া হাসি-ঠাট্টা, মিথ্যা আনন্দ উপভোগ এবং খেল-তামাশায় তাহাদিগকে মগ্ন করিয়া দেয়।) যাহারা এই ধরনের লোক তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে এমন শাস্তি এবং এমন আযাব, যাহার কারণে তাহাদের ভীষণভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

বাদ্য-শিল্প সম্বন্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

اِنَّ اللهَ بَعَثَنِىْ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ وَاَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ وَالْاَوْثَانِ وَ الصَّلِيْبِ وَاَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ـ (مسند احمد)

অর্থাৎ, বিশ্বমানবকে সত্য পথ বাতাইয়া দিয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্র অনুগ্রহের পাত্র বানাইবার জন্যই আল্লাহ্ আমাকে এই দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন। সর্বশক্তিমান মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করিয়াছেন হাতের বাদ্য এবং মুখের বাদ্য উভয় প্রকার বাদ্যের অবৈধতা ঘোষণা করার জন্য এবং উভয় প্রকার বাদ্যকে, মূর্তিপূজাকে, ক্রুশকে এবং আল্লাহ্র প্রেরিত ইসলামী আদর্শ বিরোধী অন্যান্য যত প্রকার জাহেলিয়াতের কুসংস্কার আছে সবগুলিকে দুনিয়া হইতে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত করিয়া দেওয়ার জন্য।

অবশ্য লোকদিগকে বিপদ হইতে সতর্ক করিবার জন্য বা কোন খবর ঘোষণা করিবার জন্য বা যোদ্ধাদের মধ্যে বীরত্বের জোশ পয়দা করিবার জন্য যদি বাদ্য হয় তবে তাহা শরীঅতে জায়েয আছে—যেমন গাড়ী ছাড়িবার সময় বাঁশী বাজান হয়, ইফ্তারের, নামাযের, সেহ্রীর বা রোযার খবর ঘোষণা করার জন্য নাকারা বাজান হয় বা যুদ্ধক্ষেত্রে রণবাদ্য বাজান হয়, এগুলি জায়েয আছে। কিন্তু সারাঙ্গী, বেহালা, হারমোনিয়াম, বাঁশী, করতাল, দোতার, সেতার, ঢোল, তবলা ইত্যাদি বাদ্য জায়েয নাই। এই সকল বাদ্য হয় সাধারণতঃ সময় নষ্ট করার জন্য, আনন্দ উপভোগের জন্য এবং মানুষকে পরকালের চিন্তা হইতে বিরত রাখিয়া ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য।

বাদ্যসহ ত কোন গানই জায়েয নাই। বাদ্য ছাড়া গান যদি নারী বা বালক-প্রেমের কথা সংক্রান্ত না হয়, পরনিন্দা বা ব্যক্তিগত কোন সীমাহীন প্রশংসা তাহাতে না হয়; বরং আল্লাহ্র প্রশংসা, রাসূলের প্রশংসা, ইসলাম ধর্মের প্রতি এবং ইসলামী আদর্শের প্রতি যদি তাহাতে প্রেরণা থাকে, দেশপ্রেমের কথা যদি তাহাতে থাকে, তবে তাহা নারীর গলায় না হইয়া যদি পুরুষের কণ্ঠে সুন্দর আওয়াজে গাওয়া হয়, তবে তাহা না-জায়েয হইবে না। এই ধরনের গানকে বাংলার মুসলমান সমাজে গান বা সঙ্গীত বলা হয় না, বলা হয় গযল। নাম যাহাই হউক না কেন, আসল বস্তু চিনিয়া লওয়া দরকার।

আজকাল দুইদল লোক গান-বাদ্যের প্রতি খুব ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একদল হইতেছে এইরূপ যে, ধর্মের প্রতি তাহাদের আদৌ কোন মতিগতি নাই। তাঁহাদের জন্য শুধু আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি— যাহাতে তাহারা সত্য জিনিসটা বুঝিয়া ধর্মের দিকে ফিরিয়া আসে। আর একদল লোক এমন আছে, যাহারা ধর্মের নামে, মারে'ফাৎ বা তাছাওউফের নামে বা চিশ্তিয়া তরীকার নামে গান বাদ্যের দিকে ঝোঁকে। তাহাদের একটু চিন্তা করিয়া ও খোঁজ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি যে, নবীর তরীকার বিরুদ্ধে কোন পীরের তরীকা হইতে পারে কি ? আর কোন নামধারী পীর নবীর তরীকার বিরুদ্ধে কোন তালীম করিলে যদি তাহা নবীর তরীকার বিরুদ্ধে যায়, তাহা হইলে সে নাজাত পাইতে পারে কি ?—কস্মিনকালেও না। এইভাবে যে নবীর তরীকার বিরুদ্ধে যাইবে, সে

আল্লাহ্‌কে পাইতে পারিবে কি? কখনও না। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি কি নবীর তরীকার বিরুদ্ধে কোন কাজ নিজে কখনও করিয়াছেন? বা কোন তরীকতপন্থীকে তিনি ঐরূপ করিতে এজাযৎ দিয়াছেন? কখনো দেন নাই। বিশ্ববিখ্যাত পীরে-কামেল হযরত শায়খ সা'দী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید   که هرگز بمنزل نخواهد رسید

"অর্থাৎ, নবীর তরীকার খেলাফ কোন তরীকা ধরিয়া কেহ কস্মিনকালেও খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না।" খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতীকে অনর্থক তোহ্‌মত বা অপবাদ দেওয়া ভয়ানক গোনাহের কাজ। তিনি কখনও গান-বাদ্য করিয়া যান নাই। অবশ্য সুন্দর আওয়াজে আল্লাহ্‌র কালাম বা ছন্দবদ্ধ কবিতায় আল্লাহ্, রাসূলের প্রেমের কথা বা কোন আশেকে রাসূল, আশেকে খোদা বুযুর্গের রচিত এশকে রাসূল বা এশকে খোদার কবিতা কোন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দ্বারা বিনা বাদ্যযন্ত্রে খাছ মজলিসে পড়াইয়া শুনিয়াছেন, তাহাও কোন নফসানী আনন্দ উপভোগের জন্য নহে ব্যবসা বা পেশা আকারে নহে; বরং নিজের ভিতরে আল্লাহ্‌র ও রাসূলের এশকের আগুন বাড়াইবার জন্য। হাদীস শরীফে এইরূপ আসিয়াছে যে, হুযূরের নিকট দুইজন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা দফ বাজাইয়াছিল ও তাহারা সুর দিয়া কবিতা পাঠ করিয়াছিল বা গান গাহিয়াছিল, তাহা আমাদের নবী করীম (দঃ) আদৌ নিষেধ করেন নাই; বরং তিনি তাহা নীরবে শুনয়াছিলেন। এই হাদীসের দ্বারা যাহারা গান-বাদ্য জায়েয হওয়ার দলীল গ্রহণ করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে নবীর তরীকা গ্রহণ করে না; বরং তাহারা নফ্‌সের খাহেশের কারণে হিন্দুর তরীকা ও প্রচলিত প্রথাকে গ্রহণ করিয়াছে; আর এখন শুধু জিদ বা হঠকারিতার কারণেই হাদীসের বাহানা করে। কারণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু পরিমাণ পবিত্র আমোদ-প্রমোদ স্ফুর্তি বা খেলাধুলা জায়েয রাখা হইয়াছে। ইহাও সেই পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ দফ্—বন্ধ ঢোল বা তবলাকে বলে না। দফ্ বলে সেই ঢোলকে যার পিছনের দিক বন্ধ নয়— একেবারেই খোলা। যেমন আমাদের ছেলেমেয়েরা বক্‌রা ঈদের সময় গরুর ঝিল্লিপর্দাকে ভাংগা কলসী বা ঘড়ার মুখে লাগাইয়া বাজাইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ঢোল বাজান, করতাল বাজান, বাঁশী বাজান, দোতার, সেতার, সারাঙ্গ, বেহালা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাজান কিছুতেই প্রমাণিত হইতে পারে না। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের এতটুকু গান-বাদ্যও যখন মাত্রায় কিছু বেশী হইয়া গেল এবং হযরত ওমর যখন ঐ মজলিসে আসিলেন, তখন মেয়েরা সব গান-বাদ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম তখন বলিলেন, "হে ওমর!" আপনাকে দেখিয়া শয়তান পলায়। আপনি যে গলি দিয়া হাঁটেন, শয়তান সে গলিতে যাইতেও ভয় পায়।' যদি গান বাদ্য পছন্দনীয় কাজ হইত, তবে এই কাজকে নবী আলাইহিস্‌সালাম শয়তানী কাজ বলিলেন কেন? প্রিয় পাঠক! নফ্‌সের খাহেশের পায়রবী ছাড়িয়া চিন্তা করিয়া নবীর তরীকা ধরিয়া চলুন; অন্য মানুষের অন্ধ অনুকরণ ছাড়ুন। নিম্নে উক্ত পূর্ণ হাদীসটি উদ্ধৃত করা গেল।

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ كُنْتُ نَذَرْتُ اِنْ رَدَّكَ اللهُ صَالِحًا اَنْ اَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَاَتَغَنّٰى فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِىْ وَاِلَّا فَلَافَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ اَبُوْبَكْرٍ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهِىَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِىٌّ رَضِىَ الله عَنْهُ وَهِىَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ (رضى) وَهِىَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ (رضى) فَاَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اِسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَاعُمَرُ اِنِّىْ كُنْتُ جَالِسًا وَّ هِىَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ اَبُوْبَكْرٍ وَهِىَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِىٌّ وَهِىَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِىَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلْتَ اَنْتَ يَاعُمَرُ اَلْقَتِ الدُّفَّ ـ

(رواه الترمذى)

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْضًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَالَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ ـ (متفق عليه)

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَنْظُرُ شَيَاطِيْنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ قَدْفَرُّوْا مِنْ عُمَرَ ـ (رواه ترمذى)

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ دَخَلَ اَبُوْبَكْرٍ وَّ عِنْدِىْ جَارِيَتَانِ (وَالْجَارِيَةُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَّمْ تَبْلُغِ الْحُلُمَ) مِنْ جَوَارِى الْاَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ اَمَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ فِىْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذٰلِكَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَبَابَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَّهٰذَا عِيْدُنَا ـ (بخارى شريف) صفحه ١٣٠ ـ ج ١

এই হাদীসের মর্মার্থ—একবার হযরত নবী (আঃ) জেহাদে গিয়াছিলেন। জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার নিকট একটি অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা আসিয়া বলিল; হুযূর! আমি মান্নত মানিয়াছিলাম, আল্লাহ্ যদি আপনাকে ছহীহ্ সালামতে ফিরাইয়া আনেন, তবে আমি খুশীতে আপনার সামনে দফ্ বাজাইয়া এবং গীতগাহিয়া আনন্দ প্রকাশ করিব। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন; আচ্ছা যদি তুমি মান্নত মানিয়াই থাক, তবে তুমি দফ্ বাজাও। যদি মান্নত না মানিয়া থাক, তবে বাজাইও না। বালিকাটি দফ্ বাজাইতে লাগিল। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিলেন—তখনও সে দফ্ বাজাইতেছিল। তারপর হযরত আলী (রাঃ) আসিলেন, তখনও সে দফ্ বাজাইতেছিল। তারপর হযরত ওসমান (রাঃ) আসিলেন, তখনও সে দফ্ বাজাইতেছিল। তারপর যখন হযরত ওমর (রাঃ) আসিলেন, তখন ঐ বালিকাটি ভয়ে দফ্ বাজান ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি দফ্টি লুকাইবার জন্য উহা তাহার পাছার তলে রাখিয়া উহার উপর বসিয়া পড়িল। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন; 'হে ওমর! শয়তান আপনাকে বড়ই ভয় করে। আমি বসিয়াছিলাম, তখনও সে বালিকাটি দফ্ বাজাইতেছিল; তারপর আবু বকর আসিলেন তখনও সে দফ্ বাজাইতেছিল; তারপর আলী আসিলেন, তখনও সে উহা বাজাইতেছিল; তারপর ওসমান (গণী) আসিলেন, তখনও সে দফ্ বাজাইতেছিল। কিন্তু যখন আপনি আসিলেন, হে ওমর! তখন সে আর দফ্ বাজাইতে সাহস করে নাই। তখন সে দফ্ ফেলিয়া দিয়াছে। —তিরমিযী শরীফ। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত ওমর সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন; হে ইবনে খাত্তাব! আমি খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, শয়তান আপনাকে এত ভয় করে যে, আপনাকে যদি সে একটা রাস্তা দিয়া যাইতে দেখে, তবে সে ঐ রাস্তায় আসিতেও সাহস পায় না! সে অন্য

রাস্তার দিকে চলিয়া যায়। (বোখারী ও মুসলিম।) হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন; 'হে ওমর! আমি দেখি যে, মানুষ শয়তান এবং জ্বিন শয়তান উভয়ে আপনাকে দেখিলে ভাগিয়া পালায়'। এই হাদীসের দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের দফ্ বাজান এবং গীত গাওয়া যদিও হারাম নহে, কিন্তু কাজটা শয়তানী কাজ। অন্য হাদীসে আছে; আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক দিন আমি আমার বাড়ীতে ছিলাম; আমার আব্বা হযরত আবুবকর আসিয়া দেখিলেন, দুইটি বালিকা গীত গাহিতেছে। তাহারা অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা ছিল এবং গায়িকাও ছিল না। বিনা শিক্ষায় বিনা সুরশিল্প চর্চায় স্বাভাবিকভাবে তাহারা গীত গাহিতেছিল। আমি তাহাদিগকে মানা করিতেছিলাম না এবং হযরত রাসলুল্লাহ্ (দঃ)-ও তাহাদিগকে মানা করিতেছিলেন না। কিন্তু আমার আব্বা হযরত আবুবকর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ঘরে গীত গাহিতে দেখিয়া খুব রাগান্বিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌র ঘর আর শয়তানের গীত! বালিকাদ্বয়ের গীতের বিষয়বস্তু কি ছিল? আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সর্বনাশা বুআস নামক যুদ্ধের দিন আনছারগণ যেসব বীরত্ব ব্যঞ্জক কবিতা গাহিয়া স্ব স্ব দলের যুদ্ধোন্মাদনা বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহাদের গীতের বিষয়বস্তু ছিল তাহাই। গীতের সময়টা ছিল ঈদের দিন। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে আবুবকর! প্রত্যেক জাতির একটা খুশীর দিন থাকে। এটা আমাদের ঈদের খুশীর দিন। তাই এইরূপ খুশীর দিনে, ঈদ বা বিবাহের দিনে ছোট বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের কিছু খুশী করিতে দেওয়া উচিত। এই হাদীস দুইটি খুবই প্রণিধানযোগ্য।

কোন কোন তথাকথিত ছুফী নামধারী লোক এই দুইটি হাদীসের দ্বারা তাহাদের নফসানী খাহেশে গান-বাদ্য নর্তন-কুর্দন ইত্যাদি জায়েয প্রমাণ করিতে চাহেন। অধিকন্তু তাঁহারা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ইহাও বলিয়া থাকেন যে, চিশতিয়া তরীকায় গান-বাদ্য জায়েয আছে। এইরূপ উক্তি করা তাঁহাদের শুধু মূর্খতাই নহে, অধিকন্তু ইহা তাঁহাদের নির্লজ্জতা এবং ধৃষ্টতারও পরিচায়ক। কারণ, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের কাজ বয়স্কদের জন্য কোন দলিল হইতে পারে কি? অধিকন্তু যে কাজকে রাসূলুল্লাহর সামনে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) দুই প্রধান ও প্রথম খলীফাদ্বয় শয়তানী কাজ বলিলেন, অথচ হযরত রাসূললুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহাদের কথা রদ করিলেন না; সেই কাজ কোন ছুফী দরবেশের কাজ হইতে পারে কি? হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ) নিজে শওক করিয়া কাহারও দ্বারা গান গাওয়াইয়া বা বাদ্য বাজাইয়া সারা জীবনে কখনও শুনিয়াছেন কি? খোলাফায়ে রাশেদীন কখনও গীত বা বাদ্য শুনিয়াছেন কি? তরীকতের পীরগণ—যেমন, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) কখনও গান গাওয়াইয়া বা বাদ্য বাজাইয়া শুনিয়াছেন কি? কেহ ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে কি? কস্মিনকালেও নয়। অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রথম হাদীসে উল্লিখিত ঘটনায় বালিকাটিকে দফ্ বাজাইতে এজাযত দেওয়া হইল কেন এবং দ্বিতীয় হাদীসেই বা নিষেধ করেন নাই কেন? আবার শেষ ভাগে তিনি একথা বলিলেন কেন যে, এইটা আমাদের ঈদের দিন, খুশীর দিন? একথার তাৎপর্য এখন শুনুনঃ—দুনিয়াতে যত কাজ আছে, তাহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে;—(১) অবশ্য করণীয়—যেমন নামায, রোযা, যাকাত, সতীত্বরক্ষণ, চরিত্রসংরক্ষণ, দুর্নীতি দূরীকরণ, লোকসেবা, পরোপকার ইত্যাদি। ইহাকে ফরয বা ওয়াজিব বলা হয়। এই প্রকারের কাজ ব্যক্তিগতভাবেও করিতে হইবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে পক্ষ হইতেও জারি করার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে। (২) দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে পছন্দনীয় কাজ, ইহাকে মুস্তাহাব বলে। এই ধরনের কাজ ব্যক্তিগতভাবে এইরূপে করিতে হইবে, যাহাতে

অন্য কোন ফরয কাজ তরক না হয়। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কোন বাধ্যবাধকতা অরোপ করা যাইবে না, যেমন নফল এবাদত-বন্দেগী। (৩) তৃতীয় প্রকারের কাজ যাহা অবশ্য বর্জনীয় হারাম। এই ধরনের কাজ ব্যক্তিগতভাবেও বর্জন করিতে হইবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ হইতেও বর্জন করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেমন, সুদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, মানুষ খুন, যুবক-যুবতীদের অবাধ সহ-মিলন, সতীত্ব হরণ, যুল্‌ম অত্যাচার ইত্যাদি। (৪) চতুর্থ প্রকারের কাজ, যাহা বর্জন করার জন্য স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নাই বটে, কিন্তু কোরআন হাদীসের ইশারা ইংগিতে বুঝা যায় যে, উহা বর্জন করাই আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট অধিক পছন্দনীয়; ইহাকে মকরূহ বলে। (৫) পঞ্চম প্রকারের কাজ, যাহা মানুষের মনের মধ্যে আপনাআপনি স্বভাবগত ভাবেই উৎপন্ন হয়। এরূপ কাজ এক সীমা পর্যন্ত সহনীয় হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে তাহাও বর্জনীয় এবং উহাকে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালক-বালিকাদের খুব ভালবাসিতেন। তাহাদের কোমল মনে তিনি কখনও ব্যথা দিতে চাহিতেন না। এই জন্যই তিনি প্রথম অবস্থায় অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদিগকে বীরত্বব্যঞ্জক গীত গাহিতে বা দফ্ বাজাইতে নিষেধ করেন নাই। বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ছহীহ্ সালামতে ফিরিয়া আসিবার জন্য যে বালিকাটি মান্নত মানিয়াছিল, তাহার মনে আবেগ কতদূর প্রবল ছিল! এত প্রবল আবেগকে বাধা দেওয়া যাইতে পারে শুধু তখন যখন কোন পরিষ্কার হারাম বা বর্জনীয় কাজ করিতে চাওয়া হয়, নতুবা সহনীয় কাজের বেলায় এত প্রবল আবেগকে বাধা দেওয়া সমীচীন হয় না। ঠিক এরূপে ঈদের খুশীর দিনেও শাদীর খুশীর দিনেও সীমার ভিতরকার সহনীয় কাজে বালক-বালিকাদিগকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। অবশ্য ইহা শুধু অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালক-বালিকাদের জন্য, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ লোকদের জন্য বা স্ত্রীলোকদের জন্য নহে। এইরূপে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদিগকে যে বাদ্য-যন্ত্রের এজাযত দেওয়া হইবে,তাহাও শুধুমাত্র দফের জন্য দেওয়া যাইবে; অন্য কোন বাদ্য-যন্ত্রের এজাযত কিছুতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না এবং গীতের বিষয়বস্তুও বীরত্বমূলক বা ঈমান, ইসলাম ও নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক হইতে হইবে—ফাসেকী, অবৈধ-প্রেমমূলক, পরনিন্দামূলক বা শিরক্‌মূলক হইলে তাহার এজাযত কিছুতেই দেওয়া হইবে না।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সহনীয় বিষয়গুলি শিল্প হিসাবে চর্চা বা ইহার জন্য সময় ও সম্পদ নষ্ট করা কিছুতেই সহনীয় হইবে না। ষ্টেটের বায়তুল মালের পয়সাও ইহার জন্য খরচ করার এজাযত হইবে না। অবশ্য আপনাআপনি ছেলেপিলেরা তাহাদের মনের স্ফুর্তির জন্য বা শরীরের কসরতে জন্য কিছু সময় পরিমাণ কিছু চর্চা করিলে তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত হইবে না।; তবে সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে বাধা দিতে হইবে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন শরীফ পড়াইয়া শুনিয়াছেন, ভাল কবিতা পুরুষ লোকের দ্বারা পড়াইয়া শুনিয়াছেন। হাতিয়ার লইয়া যুদ্ধ চর্চা বা দৌড়াইয়া পরিমিত পরিমাণ শরীর চর্চা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কাজের ভিতর দিয়া শরীর চর্চা করিয়াছেন। ছাহাবায়ে কেরামগণও তদ্রূপ করিয়াছেন। এতটুকু ছাড়া কস্মিনকালেও তাঁহারা শওক করিয়া গান-বাদ্য শুনেন নাই বা খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুকে অযথা সময় বা সম্পদ নষ্ট করেন নাই। অতএব, যাহারা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে বা যাহারা ছুফী দরবেশ, তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা এবং ছাহাবাগণের তরীকার সীমা ছাড়াইয়া যাওয়া কিছুতেই উচিত হইবে না।

কুকুর পালা এবং ছবি রাখা

খৃষ্টান ধর্মে বা হিন্দু ধর্মে কুকুর পালায় বা ছবি (মূর্তি ও ফটো) রাখায় কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। খৃষ্টানদের প্রভাবে যাহারা প্রভাবিত হইয়াছে তাহারা খৃষ্টানদের অনুকরণ করিয়া কুকুর পালা এবং ছবি রাখা শুরু করিয়াছেন। সেই দেখাদেখি ধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ কিছুসংখ্যক মুসলমানও ছবি রাখা এবং কুকুর পালা শুরু করিয়াছেন। অথচ আমাদের প্রাণপ্রিয় পয়গম্বর আলাইহিসসালাম অত্যন্ত তাকীদের সহিত কুকুর পালিতে এবং ছবি রাখিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যাহারা মুসলমান নাম ধারণ করা সত্ত্বেও নবীর আদেশ পালন না করিয়া অন্য মিথ্যা ও ভুল ধর্মের অনুকরণ করে, তাহাদের চেয়ে হতভাগা ইহ-পরকালে আর নাই। হযরত নবী (আঃ) বলিয়াছেন, যে বাড়ীতে বা যে ঘরে কুকুর থাকিবে অথবা ছবি থাকিবে, সে ঘর এবং সে বাড়ী হইতে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের খাছ ফেরেশ্‌তা চলিয়া যাইবে। বোখারী শরীফে হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম আরও বলিয়াছেন। সবচেয়ে বেশী আযাব তাহাদের হইবে, যাহারা ছবি (মূর্তি বা ফটো) বানাইবে।

নবী আলাইহিস্‌সালাম বলিয়াছেনঃ (১) শিকার ধরিবার উদ্দেশ্যে, (২) বকরী পাহারার উদ্দেশ্যে, (৩) আখ ইত্যাদি কৃষিক্ষেত্রে পাহারার উদ্দেশ্যে, এই তিনটি উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে যে কেহ কুকুর পালিবে, দৈনিক তাহার নেকী হইতে এক এক কীরাত কম হইতে থাকিবে (বোখারী শরীফ)। অন্য হাদীসে আছে, এক কীরাত ওহুদ পাহাড়ের সমান।

এইসব হাদীসের দ্বারা ছবি রাখা এবং কুকুর পালা হারাম প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব, শিশুদের খেলনারূপেও রবারের মূর্তি অথবা মাটি, পাথর বা কাঠের পুতুল ব্যবহার করা ও ঘরে রাখা না-জায়েয। কোন কোন ছেলের কুকুরের বাচ্চা পালার শওক হয়। কিন্তু কিছুতেই মুরব্বিদের এই শওক পুরা করা চাই না।

ছবি ফটো চার প্রকার হইয়া থাকেঃ—(১) প্রথম প্রকার যাহাকে ভক্তি করা হয়। যেমন, কোন দেব-দেবীর ছবি বা কোন পীর-পয়গম্বরের ছবি, কোন মন্দিরের ছবি বা কোন ক্রুশ কাঠের ছবি; ইহা সবচাইতে বড় গোনাহ্‌। (২) দ্বিতীয়—কোন সুন্দরী নারীর ছবি, যাহা দেখিলে পুরুষের উত্তেজনা বাড়ে, ইহাতে দ্বিগুণ গোনাহ্‌। (৩) তৃতীয়—সাধারণ ছবি যাহাতে কোন উত্তেজনা নাই, ইহাতে এক গোনাহ্‌। (৪) চতুর্থ—নির্জীব পদার্থের ছবি। কোন মিথ্যা ধর্মের ধর্মীয় চিহ্ন না হইলে, সেরূপ নির্জীব পাদার্থের ছবি আঁকাতে বা রাখাতে কোন গোনাহ্‌ নাই। কুকুর এতই অপবিত্র জিনিস যে, কুকুর যদি পাত্রে মুখ দেয়, তবে সে পাত্রকে সাতবার পানি দিয়া ও একবার মাটি দিয়া ধৌত করার হুকুম হাদীস শরীফে আসিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—ধর্মজ্ঞান না থাকার কারণে অনেকে এহেন না-পাক জিনিসকে ঘরে স্থান দেয়।

মানুষের শরীরের ১০টি সুন্নাতে আম্বিয়া

মানুষের শরীরের মধ্যে ১০টি প্রধান ইসলামী সুন্নত (আদর্শ) আছে। এই সুন্নতগুলি হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালাম হইতে শুরু করিয়া সমস্ত নবীরই সুন্নত। কিন্তু যখন ইঞ্জিল-তৌরাতকে

দুষ্ট লোকেরা বিকৃত করিয়াছে, তখন হইতে এই সুন্নতগুলিকেও তাহারা বাদ দিয়াছে। দুঃখের বিষয়, খৃষ্টানী প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া কিছুসংখ্যক মুসলিম নামধারী অজ্ঞ যুবকও (নেহাত অল্প বুদ্ধিবশতঃ) খৃষ্টানী সভ্যতা বনাম বর্বরতার অন্ধ অনুকরণ করিয়া, দুনিয়াতে নিজেদের দুর্বলতার পরিচয় দিতেছে। এবং আখেরাত বরবাদ করিতেছে। উক্ত ১০টি সুন্নত, যথা—'খাৎনা' অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের শরীঅতে মোহাম্মদীয়াতে এই ১০টি আদর্শত আছেই, তদুপরি আরো দুইটি ফরয আদর্শ বর্ধিত করা হইয়াছে। তাহার প্রথমটি হইতেছে, শরীর হইতে পেশাব-পায়খানা, রক্ত পুঁজ-পিত্ত, উল্‌টা বাতাস ইত্যাদি বাহির হইলে অথবা শরীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলে তখন ওযূ করিয়া পবিত্রতা হাছিল করিতে হইবে। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন বা স্বপ্নদোষ হইলে অথবা স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব শেষ হইলে ফরয গোসল করিয়া পবিত্রতা হাছিল করিতে হইবে।

খৃষ্টান প্রভাবে প্রভাবিত বা কোন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইসলামী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত লোক এই আদর্শগুলিকে ধর্মের অংগ মনে করে না। ইহা তাহাদের অজ্ঞতা বা পরানুকরণের হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে যেহেতু এই কাজগুলির প্রত্যেকটি কাজই নবী কর্তৃক ওহী দ্বারা শুধু যে প্রেরিত তাহাই নহে; বরং ইহা করার জন্য আদেশও করা হইয়াছে। সুতরাং উহাদের প্রত্যেকটি কাজই ধর্মের ফরয অংগ এবং রূহানিয়াত বা আত্মিক শক্তির পরিবর্ধক।

সংযম অভ্যাসের দ্বিতীয় স্তর

সংযম অভ্যাসের দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়; নতুবা মানুষ যদি সংযম অভ্যাস না করে, তবে মানুষ ইতর প্রাণী হইতেও অধম হইয়া যায়। বাল্যকালে লোভ রিপু প্রবল থাকে যাহা খাইতে মনে চায় তার সবকিছুই খাইতে দেওয়া হয় না। হারাম জিনিস হইতে মনকে ফিরাইয়া রাখিতে হয়, ক্রোধ রিপু বাল্যকালেও কিছু থাকে; যৌবনকালে উহা আরও বাড়ে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই গালি দেওয়া বা মারপিট করা যায় না; বরং উহা না করার জন্য মনকে চাপিয়া বাধ্য করিতে হইবে। যৌবনের প্রারম্ভে আর একটি সর্বনাশা রিপু—অর্থাৎ কাম রিপু দেখা দেয়। তাহা হইতে কিভাবে সংযমের অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা আমরা পূর্বে 'সংযম অভ্যাস' পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছে। এরপর দেখা দেয়, মানুষের মধ্যে অহঙ্কার, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা রিপু। মহত্ত্ব হাছিল করিতে হইলে মানুষের এই রিপুগুলিকে অবশ্য জয় করিতে হইবে এবং তারপর মোহ রিপুকে অর্থাৎ, খোদা ও আখেরাতকে ভুলিয়া দুনিয়ার মোহে মত্ত হইয়া থাকার ভাবকেও জয় করিতে হইবে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল পাশ্চত্য শিক্ষার মধ্যে জড় বিজ্ঞানের শিক্ষা ত প্রচুর পরিমাণেই আছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব শিক্ষা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা মোটেই নাই, এবং এজন্যই বিজ্ঞানের উন্নতিও টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। অবস্থা দৃষ্টে ইহাই মনে হইতেছে যে, হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি হইয়া একদিন বিজ্ঞানও হয়ত শেষ হইয়া যাইবে। অথচ জড় বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাও যদি দেওয়া হইত, তবে মানুষ ইহকাল এবং পরকাল উভয় কালেরই উন্নতি করিতে পারিত এবং সে উন্নতি স্থায়ীও হইত।

আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে যদিও আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, কিন্তু এখনও আমরা স্বাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা ষোলআনা চালু করিতে পারি নাই। এখনও পাশ্চাত্যের অন্ধ

অনুকরণের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। এখনো আমরা জড় বিজ্ঞানের এবং আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধন করার এবং কোরআন ও সুন্নার আলোকে বিজ্ঞানের রিসার্চ করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারি নাই।

তাস-পাশা ইত্যাদি খেলা

প্রত্যেক পাপই মানুষের মধ্যে ছোট আকারে প্রবেশ করে, তারপর ক্রমশঃ উহা বড় হয়। ছোট বেলায় ছেলেরা হয়ত সামান্য বরই বা কুল চুরি করে; কিন্তু মা-বাপ মুরুব্বিয়ান তখনই যদি শক্তভাবে বাধা না দেয়, তবে শেষে হয়ত এই ছেলেরা একদিন সিঁদকাটা চোরে (বা ডাকাতে) পরিণত হইবে। এইরূপ আমাদের দেশে তাস-পাশা, কেরামবোর্ড, ফ্লাস, লটারী, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি খেলার প্রথা চালু হইয়াছে। এইসব খেলার ভিতর যদি বাজী রাখা হয়, তবে ত তাহা একেবারেই হারাম হইবে। আর যদি সেরূপ নাও হয়, তবুও মকরূহ তাহরীমা হইবে। কেননা, এইরূপ খেলার মধ্যে এত নেশা হয় যে, সময় কোথা দিয়া কত নষ্ট হইয়া যায় তাহার পাত্তাও থাকে না; এমন কি অনেক সময় নামাযেরও খেয়াল থাকে না। ঘুড়ি উড়ানের বাতিকও এই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, উপরোক্ত সর্ববিধ ক্ষতি ইহাতেও বিদ্যমান। বিশেষতঃ ঘুড়ি উড়ানের মগ্নাবস্থায় অনেক ছেলেকে ছাদ হইতে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেও দেখা যায়। অতএব, যাহারা সমাজের মুরব্বি তাহাদের এই ধরনের খেলা যাহাতে চালু না হইতে পারে, সেজন্য চেষ্টা করা দরকার। মানুষের জীবনের সময় অতি মূল্যবান সম্পদ, খেলা-ধুলায় এই সম্পদ নষ্ট করা নিতান্ত অন্যায়।

ফুটবল খেলা

ফুটবল খেলা বা ক্রিকেট খেলা আসল খেলা নয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে ভাল জিনিসও মন্দ হইয়া যায়। যদি অতিরিক্ত সময় নষ্ট, পয়সা নষ্ট বা কাজ নষ্ট হয়, যদি নামায কাযা না হয়, সতর না খোলে, কুসংসর্গে মেশা না হয়, তবে ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা শরীঅত অনুযায়ী মোবাহ থাকিবে। অতএব, যদি কেহ উপরোক্ত দোষগুলি এড়াইয়া শরীরের ব্যায়ামের উদ্দেশ্য উহা খেলে, তবে তাহা না-জায়েয হইবে না। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, খানার মধ্যে যেমন লবণ খুবই ভাল এবং প্রয়োজনীয় জিনিস, কিন্তু উহা অতিরিক্ত হইয়া গেলে খানা অখাদ্য হইয়া যায়। তেমনি মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যায়াম নেমকের তুল্য। অতএব, ২৪ ঘন্টার মধ্যে এক দেড় ঘন্টার অতিরিক্ত ব্যায়াম হওয়া উচিত নহে। ব্যায়ামও যদি এমন খেলার ভিতর দিয়া হাছিল করা যায় যদ্দারা বীরত্ব বা সাহস বাড়ে অথবা তদুপায়ে কিছু কিছু রোযগারের উপায়ও হয়, তবে সেইটা আরও ভাল। ন্যায়ের কাজ বা ধর্মের কাজে লিপ্ত না হইয়া, খেলার মধ্যে বৃথা সময় নষ্ট করা অতীব অন্যায়—কাজেই উহা বড় পাপ।

আতশবাজি

আতশবাজির কুপ্রথা সম্ভবতঃ হিন্দুদের অনুকরণেই মুসলমান সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ শবে-বরাতে বা শাদী-বিবাহের সময় আতশবাজি ফুটান হইয়া থাকে। ইহার অপকারিতা

এই যে, ইহাতে অনর্থক পয়সা অপব্যয় হয়। অথচ অযথা পয়সা অপব্যয়কারীদিগকে আল্লাহ্ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে শয়তানের ভাই বলিয়া অখ্যায়িত করিয়াছেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলিয়াছেনঃ অযথা পয়সা অপব্যয়কারীদের আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন না। এতদ্ব্যতীত অনেক সময় আতশবাজি বা উহার আগুন নিয়া খেলা করাতে ছেলেমেয়েদের কাপড়-চোপড় বা গায়ে আগুন ধরিয়া যায়; এমন কি অনেক সময় বাড়িতেও আগুন লাগিয়া যায়। ইহাতে মানুষও অনেক মারা যায়। অতএব, এরূপ অপকারী কুপ্রথাকে বর্জন করা দরকার। ছেলেমেয়েদিগকেও এসমস্ত খারাপ কাজে পয়সা অপব্যয় করিতে দেওয়া শরীঅত বিরুদ্ধ।

মাথায় টিকি রাখা ও মাথার সামনের চুল লম্বা রাখা

মাথায় টিকি রাখা হিন্দুদের প্রথা! টিকি রাখা ত অত্যন্ত জঘন্য কাজ। কিছুদিন হইল খৃষ্টান ইংরেজদের দেখাদেখি অনেকে মাথার পিছনের দিকের চুল খুব খাট করিয়া সামনের দিকের চুল অনেক লম্বা করিয়া রাখে। এই প্রথাও যেহেতু বিধর্মীদের অনুকরণে আমাদের সমাজে ঢুকিয়াছে কাজেই ইহা ঘৃণ্য এবং বর্জনীয়। ছোট বালকদের মাথার চুল ত মুণ্ডাইয়া ফেলাই ভালো। এ ছাড়া পুরুষদের মাথার চুলও মুণ্ডাইয়া ফেলা জায়েয আছে। আগে পাছে সমান করিয়া ছাটিয়া রাখাও জায়েয আছে। আর যদি কেহ কান পর্যন্ত বা কাঁধ পর্যন্ত লম্বা করিয়া রাখে, তবে তাহাও জায়েয আছে; বরং ইহাতে যদি ফখর বা রিয়াকারী না থাকিয়া সুন্নত পালনের নিয়ত থাকে, তবে সুন্নতের সওয়াবও পাইতে পারে। স্ত্রীলোকের মাথার চুল কাটিয়া খাট করিয়া রাখা খৃষ্টানদের অনুকরণ। আর ঐ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিজাতীয় অনুকরণের পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক। অতএব, এই জঘন্য প্রথা হইতে বাঁচিয়া থাকা একান্ত আবশ্যক।

স্ত্রীলোকদের মাথার চুল লম্বা করিয়া রাখা উচিত। স্ত্রীলোকদের মাথার চুল অন্য পুরুষদের দেখাও হারাম। এই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে।

বিবাহ সম্পর্কে

অন্যান্য জাতি বা অন্যান্য ধর্মের মধ্যে অনেক পুরাতন প্রথাই উহার পুরাতনত্বের দরুন ঐ জাতির সভ্যতার বা ঐ ধর্মের অংগে পরিণত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে আধুনিক যুগে কোন প্রথার আধুনিকতাকেই সেই প্রথাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট বলিয়া ধরা হইতেছে। আবার আর একদল যুক্তিবাদীদের নিকট কোন প্রথার যৌক্তিকতাই উহাদের ধর্মের অংগ হওয়ার জন্য যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এত মজবুত যে, এখানে পুরাতনত্বের কোন দোহাইও চলে না, আধুনিকতার কোন যুক্তিও চলে না, আর নিছক যৌক্তিকতার কোন বুলিও গৃহীত হইতে পারে না। ইসলাম চায় কি? এবাদত বন্দেগীর অনুষ্ঠানই হউক, সভ্যতার কোন বিষয় হউক, কিংবা হালাল-হারাম, পাক-নাপাকের কোন মাসআলাই হউক, চাই চরিত্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোন বিষয়ই হউক—সর্বক্ষেত্রেই যতক্ষণ না কোরআন হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহ্-রাসূলের সাক্ষ্যের সনদ পাওয়া যাইবে, সে পর্যন্ত উহাকে কিছুতেই ইসলামের অঙ্গীভূত বলিয়া মানা যায় নাই এবং কস্মিনকালে যাইবেও না। কারণ, ইসলাম ধর্ম মানুষের মনগড়া ধর্ম নহে। ইহা নিছক আল্লাহ্র প্রেরিত ও রাসূলের প্রবর্তিত ধর্ম। ইহাতে রাজা-বাদশাহ বা মাওলানা-মৌলবীদের আদৌ কোন দখল নাই। মৌলবী-মাওলানাদের কৃতিত্ব শুধু এতটুকু যে, তাহারা

দুনিয়ার আয়েশ-আরামকে বিসর্জন দিয়া, জানমাল কোরবান করিয়া আসল আরবী ভাষায় কোরআন-হাদীসের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার জন্য হাজার কষ্ট সহ্য করিয়া নিজেদের জীবনকে তদনুযায়ী গঠন করিতে এবং সমাজকে তদনুযায়ী হেদায়ত করিতে ত্রুটি করেন না।

যুক্তি দুমুখো জিনিস। ইহা এদিকও চলিতে পারে ওদিকও চলিতে পারে। বহু পুরাতন প্রথাও এমন থাকিতে পারে যাহা আল্লাহ্‌র নিকট কিছুতেই পছন্দনীয় হইতে পারে না। আর আধুনিকতা বা যুগের চাহিদার ত কোন অর্থই হইতে পারে না। কারণ যুগের কোন চাহিদাই নাই—চাহিদা হয় মানুষের মনের। আর মানুষের মনকে সর্বদাই রাখিতে হইবে আল্লাহ্‌র তাবেদার করিয়া। নতুবা মনকে যদি স্বেচ্ছাচারী করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে মানুষের মুক্তি বা মানুষের উন্নতি সুদূর পরাহত।

পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি ইতর প্রাণীর মধ্যে বিবাহ্ বন্ধনের প্রথা নাই। কিন্তু মানব জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা মর্যাদা দান করিয়াছেন। কিন্তু মানব জাতির মধ্যে (সে যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউক না কেন) বিবাহ বন্ধনের প্রথা আদিকাল হইতেই প্রচলিত আছে। শুধু পুরাতন প্রথা বলিয়াই ইহা ইসলাম ধর্মে স্থান পায় নাই; বরং স্থান পাওয়ার কারণ এই যে, ইহার পিছনে কোরআন-হাদীসের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এবং প্রত্যেক যুগের নবীগণের সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

নারীর সতীত্ব রক্ষা করা যেমন আদি ফরয, নারী-পুরুষের মিলনের জন্য বিবাহ বন্ধনও তেমনি ফরয।

বিবাহ ইসলামী সভ্যতার একটি প্রধান অংগ। ইহা একটি সুসভ্য পবিত্র ধর্মীয় চুক্তি। এই পবিত্র চুক্তির জন্য বর-কনে উভয় পক্ষের (তরফাইনের) শপথ ও স্বীকারোক্তি প্রয়োজন এবং তাহাদের স্বীকারোক্তি বা ইজাব-কবূল সর্বসমক্ষে বা অন্ততঃপক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষীর সাক্ষাতে হওয়া চাই। এই পবিত্র চুক্তির বিষয়-বস্তুসমূহ ইসলামী সভ্যতার প্রাধান্যের যুগে সকলেরই জানা ছিল। এইজন্য সে জমানার যে মাসআলাগুলির উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় নাই—সেগুলি এই খৃষ্টানী সভ্যতার, তথা পাশ্চাত্য বর্বরতার প্রাধান্যের যুগে ইসলামী শিক্ষার অভাব হেতু, ইসলামের অন্যান্য মাসআলার ন্যায় বিবাহের চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কেও জনসাধারণ অজ্ঞ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা ধর্মকে বাদ দিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সভ্যতার অনুসারী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই মনে ইসলামী-সভ্যতা সম্পর্কে এমনকি পাপ-পুণ্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হইয়া পড়িয়াছে। একদল লোক ত মানব সভ্যতার কোন সনদ না পাইয়া পশুত্বের দিকে দ্রুত গতিতে ধাবিত হইতেছে। এইজন্য আমি বিবাহ-চুক্তির বিষয়বস্তুগুলিকে কোরআন-হাদীস হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিতেছি যাহাতে কেহ পদস্খলিত না হইতে পারে।

বিবাহ চুক্তি হয় একটি যুবক এবং একটি যুবতীর মধ্যে। কিন্তু যেহেতু যুবক ও যুবতীর মধ্যে উভয়ই বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন এবং ভাবাবেগে মত্ত থাকে, সেজন্য যদিও শেষ পর্যন্ত পাত্র-পাত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ হইতে পারে না, তবুও তাহাদের মুরুব্বিয়ানদের মধ্যে যাহাদের দাম্পত্য জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, যাহাদের মধ্যে এতদুভয়ের হিতকামনা প্রেরণাও পুরাপুরি বর্তমান আছে, এমন মুরুব্বিয়ানদের দ্বারাই পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত হইয়া থাকে। ইহা শুধু প্রথাই নহে; বরং সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসংগত এবং কোরআন-হাদীস দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত, বিশেষ করিয়া পাত্রীর পক্ষে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খৃষ্টানী সভ্যতার এবং পাশ্চাত্য বর্বরতার অন্ধ

অনুকরণকারীরা courtship প্রথা অর্থাৎ, বিবাহের পূর্বে অবাধ ও স্বাধীনভাবে মেলামেশার দ্বারা পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের জানা-শোনা ও পছন্দ করার প্রথাকে এদেশে চালু করিতে চাহিতেছে। আবার কেহ বা ইহাকে যুগের চাহিদা সাব্যস্ত করিয়া আমলও শুরু করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা যুগের চাহিদা নহে; বরং ইহা হীনমন্যতা ও বিবেক-বিচারহীন প্রবৃত্তির চাহিদা। যখন পতন আসে তখন মানুষ এমনি করিয়াই বিবেক বুদ্ধিহীন হইয়া থাকে। ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করিয়া মানুষ কখনও মনুষ্যত্বের উন্নতি করিতে পার না, পারে একমাত্র পশুত্বের বিকাশ সাধন করিতে। এই জন্য কোরআন মজীদে আল্লাহ্ পাক সমগ্র জগৎবাসীকে বজ্রগম্ভীর স্বরে জানাইয়া দিয়াছেন— وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ ইহার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ মানুষের ভিতর দুইটি জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন; একটি বিবেক (قلب) আর একটি প্রবৃত্তি (هوى نفس)। তারপর তিনি জানাইয়া দিতেছেন যে, "যাহারা প্রবৃত্তির বশবর্তী হইবে তাহারা নিশ্চয়ই বিপথগামী হইবে।"

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

আমাদের নবী করীম (দঃ) বলিয়া গিয়াছেন, সাধারণতঃ লোকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনকালে কুলীন বংশ, চামড়ার চাকচিক্য ও রূপ-সৌন্দর্য এবং মেয়ের পিতার অর্থ সম্পত্তি তালাশ করিয়া থাকে; কিন্তু তোমরা যারা আমার উম্মত তোমাদিগকে আমি বলিতেছি, খবরদার! খবরদার!! সর্বাগ্রে তোমরা লক্ষ্য করিবে—দ্বীনদারী ও পরহেযগারীর দিকে ঈমান ঠিক আছে কি না, নামায রোযার পাবন্দী আছে কি না, পর্দা পুশিদা ও সতীত্ব আছে কি না? আদব তমীয, মুরব্বি মান্যতা, পতিভক্তি, ছবর বরদাশত ও অল্পে তুষ্টির গুণ আছে কি না? সারকথা এই যে, রূপের চেয়ে বংশের চেয়ে এবং সম্পত্তির চেয়ে চরিত্রগুণের মূল্য অনেক বেশী। কাজেই সর্বাগ্রে তাহাই হইতে হইবে লক্ষণীয় বিষয়। সাবধান থাকিতে হইবে যে, আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়—কোন কোন আধুনিক নব্যশিক্ষিত যুবক-যুবতীর মধ্যে ঈমানদারী নাই, রোযা নামায নাই, পর্দা ও সতীত্বের কোন পরোয়া নাই। ইসলাম ধর্মের প্রতি কোন আস্থা নাই। কাজেই খবরদার! পাত্র-পাত্রীর দ্বীনদারী ও পরহেযগারীর অবস্থা অবশ্য বিশেষভাবে তাহকীক করিয়া পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন করিবে।

স্বামী-স্ত্রীর শপথ গ্রহণ

বিবাহ চুক্তিতে স্বামীর পক্ষের শপথ নিম্নরূপ হইবেঃ আমি স্ত্রীর (১) খোরাক (২) পোশাক ও (৩) থাকার ঘরের দায়িত্ব ভার এবং (৪) স্ত্রীর ইজ্জত-আবরু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতেছি। আর আমি (৫) স্ত্রীর সংগে যাবজ্জীবন সদ্ব্যবহারের অংগীকারও করিতেছি।

স্ত্রীর পক্ষের শপথ নিম্নরূপ হইবেঃ দুইটি মানুষের দ্বারা একটি সংসার গঠিত হইবে। দুইটি মানুষ দুই দিকে গেলে, সে সংসারে উন্নতি সুদূর পরাহত। কজেই একজনের নিশ্চয়ই অনুগমন-কারী বা অনুসরণকারী হইতে হইবে। দুইটি মানুষ পৃথক পৃথকভাবে একেবারে অসম্পূর্ণ। দুইটি মানুষ মিলিয়াই একটি পূর্ণ মানুষ হইতে পারে। সুতরাং অংগীকার করিতেছি যে, (১) আমি আমার অস্তিত্বকে অদ্য হইতে আমার স্বামীর অস্তিত্বের সঙ্গে মিশাইয়া দিলাম। আমি স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিলাম। পতিই সতীর গতি—পতি-ভক্তিই সতী নারীর সর্বাপেক্ষা বড় পুণ্য—একথা আমি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া নিলাম। স্বামীর গার্হস্থ্য বিষয়াদি আমারই গার্হস্থ্য বিষয়।

স্বামীর সন্তান আমার সন্তান। স্বামীর মান-ইজ্জত আমারই মান-ইজ্জত। কাজেই (২) স্বামীর গৃহ ও গার্হস্থ্য বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণ আমারই দায়িত্ব, (৩) স্বামীর সন্তান পালন আমারই দায়িত্ব, (৪) স্বামীর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমারই দায়িত্ব এবং (৫) স্বামীর মান-ইজ্জত রক্ষা করাও আমারই দায়িত্ব।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের শপথ নিম্নরূপঃ আমাদের গুপ্ত অঙ্গের কোনরূপ ব্যবহার একমাত্র স্বামীর সহমিলন ব্যতিরেকে আমরা কুত্রাপি অন্য কোথাও করিব না; ইহা কঠোরভাবে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করি। অতএব, আমরা একে অন্যের গোপন ভেদ রক্ষণের এবং নিজ নিজ সততা ও সতীত্ব রক্ষণের অংগীকারে আবদ্ধ হইতেছি।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমনই মধুর প্রেমময় সম্পর্ক যে, এ ক্ষেত্রে আইন অপেক্ষা প্রেমই কার্যকরী করিতে হয় বেশী। যদিও আইনগতভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রক্ষাণাবেক্ষণ স্বামীর জিম্মায়, যদিও হাট-বাজার, মাঠ-ঘাঠ, কাচারী, দরবার প্রভৃতি স্বামীই করে, কিন্তু সে তাহার স্ত্রীর হাতেই খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করে। স্ত্রী স্বামীর ঘর সুসজ্জিত করিয়া রাখে। স্ত্রীই স্বামীর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করিয়া রাখে, স্ত্রীর কারণেই দরবারে স্বামীর সম্মান বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীর দরবারের কাজ স্বামীই করিয়া দেন। কাজেই ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করিলে পুরুষ জাতির পৃথক পৃথক শ্রেণী যুদ্ধ লাগানোর আদৌ কোন প্রশ্ন দেখা যায় না। কারণ, ইসলামের আইনগুলি পুরুষের গড়া নয়। স্বয়ং তিনি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সৃষ্টিকর্তা, তাঁহারই গড়ান।

খৃষ্টান পাদ্রীগণ বা হিন্দুসন্ন্যাসীরা বিবাহকে ধর্ম-বিরোধী মনে করিয়াছে। কিন্তু ইসলাম বিবাহকে ধর্মের একটি বিশেষ অংগ বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছে। কিন্তু বিবাহ্ ক্রিয়া কোন ব্যক্তির জন্য ধর্মের অংগ তখনই হইবে, যখন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বিবাহকারীই আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত শরীঅতের বিধান ও উপদেশানুসারে বিবাহ সম্পর্কিত কর্তব্যসমূহ সমাধা করিবে।

বৈবাহিক জীবন-যাপনই আমাদের নবীর আদর্শ। এখানে দুইটি কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন মনে হইতেছে। একটি কথা এই যে, বৈবাহিক জীবনের বিপরীত দিক কি এবং উহা কেমন? বৈবাহিক জীবনের বিপরীত দিক দুইটি। একটি এই যে, বিবাহ্ না করিয়া সংযম অভ্যাস করত পবিত্র আল্লাহ্‌র যেক্‌র-ফেকর এবং আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগীর ভিতর দিয়া জীবন-যাপন করা। এই কথাটি আপাত-মধুর এবং স্থূল দৃষ্টিতে খুবই উচ্চ ধরনের বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে ইহার কোনই মূল্য নাই, ইহা একেবারেই অবান্তর। দ্বিতীয় দিকটি এই যে, দায়িত্বের বোঝা বহনের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া পশুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করা। এই দিকটা যে পশুত্বের শামিল সে কথাটা এখনো দুনিয়ার অধিকাংশ লোক কার্যতঃ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে এমনও দিন আসিতে পারে, যেদিন উচ্ছৃঙ্খল মানুষেরা ইহাকে পশুত্ব মনে না করিয়া পরম মনুষ্যত্ব মনে করিবে। কিন্তু শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন মানুষ অস্বীকার করিলেও যেটা সত্য সেটা চিরকালই সত্য। আমাদের নবী (আঃ) বলিয়াছেনঃ

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ○

অর্থাৎ, বৈবাহিক জীবন যাপন করা আমার আদর্শ। যে আমার আদর্শকে অবজ্ঞা করিবে, তাহার সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নাই।

দ্বিতীয় কথাটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রথম কথাটির পরিপূরকও বটে। উহা এই যে, আমাদের আদর্শ এবং অন্যান্য জাতির আদর্শের মধ্যে পার্থক্য আছে। অন্যান্য জাতির আদর্শ মানুষের

রচিত—যাহা ভুল প্রমাদ হইতে মোটেই মুক্ত নয়, আর ভুল ধরা পড়িলে উহা পরিবর্তিত হইতেও বাধ্য। পক্ষান্তরে ইসলামের আদর্শগুলির একটিও মানুষের রচিত নহে। সম্পূর্ণ আল্লাহ্র প্রেরিত নবী কর্তৃক প্রমাণিত। কাজেই ইহা ভুল—প্রমাদের ঊর্ধ্বে এবং অপরিবর্তনীয়। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ইসলামের সব আদর্শই অপরিবর্তনীয় হইলে কালের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলা যাইবে কি করিয়া ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইসলামের বিধানগুলি যেহেতু মানুষের রচিত নহে; বরং সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী ও অন্তর্যামী খোদার রচিত, কাজেই যে যে বিষয়ে মানুষের উন্নতির জন্য পরিবর্তন পরিবর্ধন আবশ্যক, সে সে বিষয়ে মূল নীতিসমূহের পরিবর্তন ব্যতিরেকেই শাখানীতি রচনার যথেষ্ট অবকাশ রাখা হইয়াছে। এবং যে যে বিষয়ে পরিবর্তনের কোন আবশ্যকতা নাই, সে সে বিষয়কে সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় রাখা হইয়াছে। এই বিষয়টিই নবী আলাইহিস্সালাম এইভাবে বুঝাইয়াছেন— أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ইহার মর্মার্থ এই যে, আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন ব্যাপক শরীঅত দান করিয়াছে, ভাষাও তদ্রূপ ব্যাপকভাবে দান করিয়াছেন।

ইসলামের বিধানগুলিকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারেঃ

(১) ঈমানিয়াত—অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালাৎ ও আখেরাত। ইহা সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত একইরূপ রহিয়াছে এবং একইরূপ থাকিবে। হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পূর্বে নবী ও রাসূলের পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার পরে রাসূল ও নবী আসার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(২) রূহানিয়াত—অর্থাৎ কলেমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। এসমুদয়ও অপরিবর্তনীয়। মানবতার উন্নতির জন্য পরিবর্তনের কোনই আবশ্যকতা নাই।

(৩) আখলাকিয়াত—অর্থাৎ সত্য, সততা, সতীত্ব, সহানুভূতি, সহৃদয়তা, সেবা ও সুবিচার ইত্যাদি। এসব চির অপরিবর্তনীয়।

(৪) সমাজ-ব্যবস্থা (سماجيات - تهذيب و ثقافت) অর্থাৎ, ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার, পানাহার, চাল-চলন ইত্যাদি। ইসলামী তাহ্যীবকে পরিবর্তন করিয়া বা বাদ দিয়া খৃষ্টানী বা হিন্দুয়ানী তাহ্যীব গ্রহণ করার কোনই প্রয়োজন নাই। মানবতার উন্নতির জন্য ধুতি পরার, ফুলপ্যান্ট, হ্যাট-নেকটাই পরার, নিজ স্ত্রী দ্বারা পরপুরুষের খেদমত করানের, হ্যাণ্ডশেক্ করার, ড্যান্স করার, মাথা খুলিয়া বুক ফুলাইয়া হাটে-বাজারে চলাফেরা করার, পর্দাহীন বাড়ি তৈরী করার, কুকুর পালার, ছবি রাখার, খাড়া হইয়া খাওয়ার, খাড়া হইয়া পেশাব করার, পেশাব-পায়খানা করিয়া পাক না হওয়ার, স্ত্রী-সহবাস করিয়া গোসল না করার, দাড়ি মুণ্ডানের, বগলের পশম বাড়ানের, একাধিক বিবাহ বন্ধ করার, সন্তানের জন্মরোধ করার, আওরতের হাতে তালাকের ক্ষমতা দেওয়ার, জাতীয়তার সংজ্ঞা পরিবর্তনের, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় দৌড়ানের, ছবি-খেলনা আমদানী করার, শূকর বা শরাব খাওয়ার, 'আস্সালামু আলাইকুম' বলাকে এবং উহার জাবাব দেওয়াকে অপমান মনে করা ইত্যাদির আদৌ কোন আবশ্যক করে না। এই সকল কাজ শুধু ঐ সকল মুসলমানই নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে করিতে পারে যাহারা জাতীয় গৌরব ভুলিয়া পরানুকরণ ও জঘন্য নীচাশয়তার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ এইরূপ দুর্ভাগারাই মুসলিম জাতিকে কলঙ্কের টিকা পরাইয়া দিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে শরীঅতে মোকাদ্দাসার অর্থাৎ পবিত্র ও সনাতন ইসলাম ধর্মের ব্যবস্থা এতই সুন্দর যে, তাহাতে কাহারো মনমরাও হইতে হয় না। তাহার মধ্যে পরানুকরণের রোগও ঢুকিতে পারে না বা বিলাসিতা বা

অকর্মন্যতার রোগেও আক্রমণ করিতে পারে না। শরীঅতে মোকাদ্দাসা কতকগুলি সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে। নূতনত্বের পথও বন্ধ করে নাই, আর উন্নতির পথও রুদ্ধ করে নাই।

(৫) অর্থ-ব্যবস্থা,

(৬) (ক) রাষ্ট্র-ব্যবস্থা,

(খ) সমর-ব্যবস্থা,

(গ) আন্তর্জাতিক চুক্তি,

(ঘ) বিজ্ঞান চর্চা,

(ঙ) সাহিত্য ও ভাষা চর্চা,

(চ) যোগাযোগ ব্যবস্থা।

অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে শরীঅতে মোকাদ্দাসা আমাদিগকে কতকগুলি অপরিবর্তনীয় মূলনীতি দান করিয়াছেঃ—যেমন, সুদ হারাম, জুয়া হারাম, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা হারাম, ঘুষ হারাম, চুরি হারাম, আমানতে খেয়ানত হারাম, জোর দখল হারাম ইত্যাদি। এই মূলনীতিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যত ইচ্ছা উন্নতি করা যাইতে পারে। এখানে শরীঅতে মোকাদ্দাসা প্রয়োগ-পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ করে নাই; বরং সীমাহীন উন্নতির পথ করিয়া দিয়াছে।

পাশ্চাত্যের হুমকির ভয়ে ভীত হইলে চলিবে না। নিজেদের মস্তিস্ক (Brain) খাটাইতে হইবে। অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন পথের সন্ধান করিতে হইবে। জনসংখ্যা বন্ধ করিবার অধিকার কাহারও নাই। জনসেবার জন্যই হুকুমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য নয়। পাশ্চাত্য পীর ছাহেবগণ বলিয়াছেন, সুদ ছাড়া ব্যাঙ্ক চলে না, জুয়া ছাড়া কারবার চলে না। সে সব পীর ছাহেবদের অন্ধ অনুকরণ করা যাইবে না। সুদ ছাড়া ব্যাঙ্ক করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। জুয়া ছাড়া কারবারের উন্নতি করিয়া আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে। 'জোর দখল' অর্থাৎ, 'জোর যার মুল্লুক তার' দুর্নীতি দ্বারা যথেচ্ছা হুকুম বা যথেচ্ছা ট্যাক্‌স বৃদ্ধি করা চলিবে না। শরীঅতের জ্ঞান অর্জন করিয়া শরীঅতের সীমার ভিতরে থাকিতে হইবে।

রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্যও শরীঅতে মোকাদ্দাসা কোনরূপ উন্নতির পথ বন্ধ করে নাই। যুগের সাথে তাল মিলাইয়া চলা তথা যুগের দাসত্ব করার হীন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। যুগের স্রষ্টা হইতে হইবে;—যুগের চালক ও নায়ক হইতে হইবে। খোদা রাসূলের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া কোরআন হাদীসের অধীন হইয়াই আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। কোরআন ও সুন্নার বিরুদ্ধে কোন আইনই প্রণয়ন করা যাইবে না। যে কোন আইনই হউক কোরআন হাদীসের কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া লওয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই থাকিবে।

সমর ব্যবস্থার পদ্ধতি ও উহার হাতিয়ার সম্বন্ধে শরীঅতে মোকাদ্দাসা কোথাও উন্নতির পথ বন্ধ করে নাই। তবে এখানেও কতকগুলি মূলনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। খোদাকে এবং মানবতাকে বাদ দিয়া নিষ্ঠুর ও নির্মম আঞ্চলিকতাবাদ বা ভৌগলিক জাতীয়তাবাদকে কিছুতেই গ্রহণ করা যাইবে না। নিজেদের স্বার্থে অন্যের উপর যুলুম চালান যাইবে না।

আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে চুক্তি করা যাইবে। যে কোন মুহূর্তে উহা শেষ করার ঘোষণাও দেওয়া যাইবে। কিন্তু চুক্তি বহাল রাখা অবস্থায় উহার খেলাফ বা বিরোধিতা করা যাইবে না। তবে অন্যে যাহাতে ধোঁকা দিতে না পারে, সেদিকে সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক পন্থায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় যাবতীয় উন্নতি করা যাইতে পারিবে, ইহাতে বাধা নাই।

বিজ্ঞান চর্চার উন্নতি করিতে শরীঅতে-ইসলাম কোথাও বাধা দেয় নাই। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার বিষয়বস্তুতে যদি খোদাকে, খোদার রাসূলকে, খোদার ওহীকে, আখেরাতের জিন্দেগী বা অদৃশ্য জগতকে অস্বীকার করা হয়, তবে উহা বিজ্ঞান চর্চাকারীর জন্য সম্পূর্ণরূপেই অনধিকার চর্চা হইবে। কারণ, বিজ্ঞান মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বাহিরে অন্য কিছুর অস্তিত্বই নাই, এরূপ উক্তি করা বৈজ্ঞানিকের জন্য চরম অবৈজ্ঞানিকতা বটে এবং সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক ও হাস্যকর।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় শরীঅতের সীমা লংঘন করিয়া হালাল-হারামের কোনরূপ পরওয়া না করিয়া উন্নতি কল্পনা করার অধিকার মানুষের নাই। শরীঅত প্রদত্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে।

ভাষা বা সাহিত্যের চর্চা করিতে শরীঅতের কোথাও বাধা দেওয়া হয় নাই। তবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। পরানুকরণ প্রবণতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে। বিজাতীয় নোংরা প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া নিজের জাতীয় গৌরবকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আপাতঃ মধুর চাকচিক্য দেখিয়া তাহাদের পদলেহন করিলেও চলিবে না; বরং নিজেদের জাতীয় নির্ভুল আদর্শকে এবং নিখুঁত তাহ্যীবকে সর্বোপরি স্থান দিতে হইবে। নিজেদের সংহতিকে দৃঢ় করিয়া ক্রমান্বয়ে যাহাতে একটি কেন্দ্রীয় ভাষায় এবং একটি কেন্দ্রীয় তাহ্যীবে আমরা একতাবদ্ধ হইতে পারি, সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। শত্রু আমাদের আছে, তাহারা অতি চালাক। তাই শত্রু ও চোরদের প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের কচি-কাঁচার দলকে গায়ের ইসলামী তাহ্যীবের পরিবেশ হইতে অর্থাৎ তাহাদের কুসংসর্গ হইতে সর্বক্ষণ দূরে রাখিতে হইবে। পরাধীন যুগের পরানুকরণের প্রভাবের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজেদের জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। গোড়ার গলদ দূর করিতে হইবে। গোড়ার গলদ কী? আমাদের প্রাণপ্রিয় পয়গম্বর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেনঃ জীবনে যত কাজ কর, প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে নিয়ত ঠিক করিয়া লও; অর্থাৎ, দেলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া লও। তোমার মঞ্জিলে কমসূদ—তোমার গন্তব্যস্থানকে ঠিক করিয়া লও। এই লক্ষ্য স্থির করিয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়, নতুবা তোমার সময় বৃথা যাইবে, জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে।

প্রত্যেকটি কাজের ভিতর দিয়াই তোমাকে আল্লাহ্-রাসূলের দিকে ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে হইবে। অতএব, প্রথমেই তোমার চিন্তা করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে, এই কাজের দ্বারা আমি আল্লাহ্-রাসূলের নিকটবর্তী হইতে পারিব কি? বিবাহ-শাদীই হউক, শিক্ষা লাভই হউক, চাকুরী লাভই হউক বা ব্যবসা-বাণিজ্যই হউক, প্রত্যেকটি কাজের ভিতরেই আমাদের এরূপ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পরিতাপের বিষয়, শত্রুরা আমাদিগকে মূল লক্ষ্য বিন্দু হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। আমাদের শিক্ষারও চরম লক্ষ্য হওয়া চাই—আল্লাহ্ ও রাসূলের সান্নিধ্য লাভ করা। বিবাহ্-শাদীরও চরম লক্ষ্য হওয়া চাই—আল্লাহ্ রাসূলের প্রতি অগ্রসর হওয়া। লক্ষ্য ঠিক থাকিলে আমাদের সমগ্র জীবনই সঠিক পথে চালিত হইবে।

বিবাহ সম্পর্কে আরো কথা

বিবাহের মধ্যে ইসলামী বিধান অনুসারে চারিটি আদর্শ কর্তব্য আছে। যথা—(১) নিয়ত দুরুস্ত করা অর্থাৎ লক্ষ্য ঠিক করা। বিবাহের উদ্দেশ্য হইবে পশু-প্রবৃত্তিকে পূর্ণ করা নয় বা শুধুমাত্র সাংসারিক জীবনের একজন সাথী তালাশ করাই নয়, বরং মূল উদ্দেশ্য এই হইবে যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে ও রাসূলের আদর্শ (সুন্নত তরীকা) অনুসারে দুইজন মানুষ (স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের জীবন-সাথী হইয়া দুনিয়াতে আপন আপন দায়িত্ব পালন করিয়া দুনিয়া ও আখেরাতের কাজে একে অন্যের সহায়তা করিয়া আল্লাহ্র মর্জি মোতাবেক আল্লাহ্র সংসারকে আবাদ করিবে। আল্লাহ্র বান্দা ও নবীর উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে এবং পরে সকলে একসংগে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করিবে।

(২) স্বামী-স্ত্রীর প্রথম যখন নির্জনে মোলাকাত হইবে, তখন স্বামী তাহার দুই হাত দিয়া স্ত্রীর মাথা ধরিয়া মুখে চুম্বন করিবে এবং আল্লাহ্র কাছে দো'আ করিবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ○

"হে খোদা! এই দুনিয়ার সব কিছুর মধ্যে ভাল-মন্দ দুই-ই আছে। তুমি যে আমাকে এই (স্ত্রীরূপ) নেয়ামত দান করিয়াছ তাহার ভালায়ী (মঙ্গল) আমি তোমার কাছে চাই এবং ইহার বুরায়ী (মন্দ) হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিও।"

[বুরায়ী এই যে, স্ত্রীর কারণে দুনিয়ার ও দ্বীনের কোন নোক্সান হইয়া যাওয়া এবং ভালায়ী হইতেছে স্ত্রীর কারণে দুনিয়ার ও দ্বীনের উপকার লাভ হওয়া]

(৩) স্বামী স্ত্রী যখন প্রথম নির্জনে মোলাকাত করিবে, তখন তাহারা যৌবনের উন্মাদনায় সাধারণতঃ ভাবপ্রবণতায় অধীর থাকে। কিন্তু যে হইবে মুসলমান—সে যুবকই হউক বা বৃদ্ধই হউক—তাহাকে সর্ব অবস্থাতেই আল্লাহ্ প্রেমের ভাব প্রবণতাকেই তাহার দৈহিক ভাব-প্রবণতার উপর স্থান দিতে হইবে। স্বামী-স্ত্রীর মিলন-মুহূর্তেও আল্লাহ্কে স্মরণ রাখিতে হইবে। নিজেদের স্বার্থেও আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ আমাদের পরম শত্রু শয়তান যেমন আমাদের গাফ্লতির সুযোগ অনুসন্ধান করে, আমাদেরও তেমনি তার সুযোগ পণ্ড করিয়া দেওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। মিলন পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করিবেঃ

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا ○

অর্থাৎ, হে খোদা! এই অবস্থায়ও আমরা তোমাকে ভুলি নাই, আমরা তোমার নাম স্মরণ করিতেছি। তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে খোদা! আমাদিগকে শয়তানের প্রভাব হইতে বাঁচাইয়া রাখ এবং আমাদিগকে তুমি যে আওলাদ দান করিবে, তাহাকে শয়তানের প্রভাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিও।

(৪) স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন ঋতু অবস্থায় মিলন না হয়, মলদ্বারে সঙ্গম না হয়। কারণ, ঋতু অবস্থায় বা মলদ্বারে সঙ্গম করা মহাপাপ, সাংঘাতিক হারাম। তাহাদের

মিলন এমন নির্জন স্থানে হওয়া চাই যেন অন্য কেহ না থাকে বা অন্য কেহ দেখিতে না পায়। স্বামী-স্ত্রীর গোপন ব্যবহার বা আলাপ-আলোচনা অন্য কাহারও জন্য উঁকি মারিয়া দেখা বা কান লাগাইয়া শুনা সম্পূর্ণরূপে হারাম। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক গোপন আচার-ব্যবহার অন্য কাহারও কাছে বলা বা প্রকাশ করাও হারাম। মিলনান্তে, ফজরের নামায কাযা না হয় এমনভাবে সকালে উঠিয়া উভয়কেই গোসল করিতে হইবে। মিলনের পরে উভয়ের উপরই গোসল ফরয হইয়া যায়। এজন্য পানির ব্যবস্থা আগে হইতেই করিয়া রাখা দরকার।

সন্তান জন্মিলে

১। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছেলেই হউক আর মেয়েই হউক, সর্বপ্রথম যে আওয়ায তাহার কানে পড়িবে, তাহা হওয়া চাই আল্লাহ্‌র নাম এবং আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের গুণগান। ২। সন্তান জন্মিলে সর্ব-প্রথম তাহার পেটে যাহা প্রবেশ করিবে তাহা হওয়া চাই কোন নেককার বুযুর্গ লোকের দ্বারা আল্লাহ্‌র যেকেরের সঙ্গে সঙ্গে কোন মিষ্টি জিনিস—মধু, খোরমা বা অন্য কোন মিষ্ট খাদ্য চিবাইয়া লালার মত করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা শিশুর মুখে তালুতে লাগাইয়া দেওয়া। ৩। সপ্তম দিবসে কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা বুযুর্গ লোকের দ্বারা দো'আ করাইয়া ভাল দেখিয়া নাম রাখা, মাথা মুণ্ডইয়া ফেলা এবং আকীকাহ্ করা। ৪। সন্তানের দেহ পালন ও স্বাস্থ্য গঠনের সুবন্দোবস্ত করা। শুধু তাহাই নহে—সন্তানকে স্বাস্থ্যবান করার নিমিত্ত যেমন নিয়মিতভাবে সুখাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়, তৎসঙ্গে শৈশব হইতেই তাহার আত্মার প্রতিপালনের প্রতিও তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রদান করা আবশ্যক। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, শিশুর আত্মার প্রতিপালন সে আবার কেমন কথা? মনে রাখা আবশ্যক, শিশুর মস্তিষ্ক ফটো তোলা ক্যামেরার তুল্য। সে যাহাকিছু দেখে ও শুনে, তাহাই তাহার মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া যায়। অতএব, লক্ষ্য রাখিতে হইবে—যেন তাহার চোখের সম্মুখে কোন খারাপ ব্যবাহার বা কার্য করা না হয়। কোন অশ্লীল বা খারাপ শব্দ যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে না পারে। যাহাতে তাহার সামনে ভাল কাজ করা হয়, তাহার কানের কাছে ভাল আলাপ-আলোচনা, কোরআন তেলাওয়াত এবং আল্লাহ্‌র গুণগান করা হয়, তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন নেওয়া আবশ্যক।

শিশুর জন্য মায়ের দুধই সর্বপেক্ষা উত্তম খাদ্য। কিন্তু স্বাস্থ্যের অভাবে মায়ের দুধ দূষিত হইলে, শিশুর পক্ষে সে মায়ের দুধের চেয়ে খারাব খাদ্য আর কিছুই নাই। স্বাস্থ্যহীনা মাতার স্তন-দুগ্ধ পান করিয়া অনেক শিশুর মাতৃকায় দোষ দেখা দেয়। লোকে উহাকে জ্বিনের আছর মনে করে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে জ্বিনের আছর হয় না। রোগের তাছিরও হয়। শিশুকে তীব্র আলোকে নিলে শিশুর চোখের জ্যোতি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শিশুর যখন প্রথম কথা ফুটিবে তখন সর্বপ্রথম তাহাকে আল্লাহ্‌র নাম, বিস্‌মিল্লাহ্‌, কলেমা ইত্যাদি শিখাইবে। বাপের নাম, দাদার নাম, বাসস্থানের নাম-ঠিকানা ডাইন-বাম ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে শিক্ষা দিবে।

শিশুর বয়স ৫/৬ বৎসরের কাছাকাছি হইলে কোন নেক্‌কার বুযুর্গ আলেম দ্বারা দো'আ করাইয়া তাহাকে আল্লাহ্‌র কালামও শিক্ষা দেওয়ার সূচনা করিবে। অর্থাৎ, বিস্‌মিল্লাহ্ শুরু করাইবে। এই উদ্দেশ্যে শিশুকে কোন নেক্‌কার আদর্শবান ওস্তাদের মক্তবে পাঠাইবে। মনে

রাখিবে প্রাথমিক শিক্ষার উপরই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত বিষয়গুলি ইতিপূর্বেও সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

মক্‌তব ও মাদ্রাসা সম্বন্ধে আরো কথা

মক্তবে ছেলেমেয়েদেরকে কায়দা, ছিপারা ও কোরআন শরীফ ত শুদ্ধ করিয়া পড়ান চাই-ই, তার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম, চারি কলেমা, ঈমানে মুজ্‌মাল, ঈমানে মুফাচ্ছাল প্রভৃতি অর্থসহ পড়ান চাই। এ ছাড়া মোটামুটি ইসলামী আক্বায়েদ, নামায, রোযা, পাক-নাপাক, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয প্রভৃতি মাসআলা মাসায়েল, ইসলামী আদব-কায়দা ও চরিত্র গঠন প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। নবী করীম (দঃ)-এর জীবনী এবং চারি খলিফার জীবনী দেশীয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে। তারপর হালালভাবে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কোন একটি হাতের কাজ—মেয়েদিগকে হস্তশিল্প, গৃহস্থালী রক্ষণাবেক্ষণ (বা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান), সেলাই, রন্ধন, সন্তান পালন, পতি-ভক্তি, পতি-সেবা প্রভৃতি খুব ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে পারিবারিক চিকিৎসা-বিদ্যা, ধাত্রী-বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া উচিত। অবশ্য সতর্ক থাকিতে হইবে যে, এসকল ক্ষেত্রে ধর্ম রক্ষা করিয়া চলা ফরয।

আজকাল হিতাহিত চিন্তা না করিয়া ইংরেজী শিক্ষার বড় হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। একথা সত্য যে, ভাষা শিক্ষা করিতে দোষ নাই। কিন্তু ভাবিবার বিষয় এই যে, মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ, তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ, অথচ বিষয় সীমাহীন। কাজের শক্তি ও সময়ের সীমার ভিতরে থাকিয়া আখেরাতের দৃষ্টিতে যাহা সবচাইতে বেশী আবশ্যকীয় তাহাই সর্বপ্রথমে শিখিতে হইবে। তারপর তার চেয়ে কম আবশ্যকীয়, তারপর যাহা তাহার চেয়েও কম আবশ্যকীয়। আমরা মুসলমান। আমাদের সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় বিষয় হইতেছে আমাদের ধর্ম-ভাষা শিক্ষা করা, তারপর আবশ্যক হইতেছে আমাদের দেশীয় রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করা। (বিভিন্ন জ্ঞান অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষা করাতেও কোন দোষ নাই।) ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। কাজেই উচ্চস্তরের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু এজন্য সকলকেই শিশুকাল থেকে ইংরেজী ভাষা, ইংরেজী চালচলন ও ইংরেজী ফ্যাশান শিক্ষা দেওয়ার কোনই আবশ্যক নাই। কিছুসংখ্যক মেধাবী, পরিপক্ক, ধার্মিক ও দৃঢ় আদর্শবাদী ছাত্রকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিয়া বিদেশে পাঠান দরকার; কিংবা বিদেশ হইতে কিছুসংখ্যক পারদর্শী অধ্যাপক আনাইয়াও উহা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এছাড়া বিজ্ঞানের বিষয়গুলি যথাশীঘ্র নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করার দরকার, যাহাতে আমাদের নিজেদের মাতৃভাষায়ই রিসার্চ বা গবেষণা করিতে পারে।

বিদেশে ছেলেদের যখন পাঠান হইবে, তখন এমন পরিপক্ক আদর্শসম্পন্ন ছেলেদিগকে পাঠাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা বিদেশী চালচলন ও সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হইতে না পারে; বরং তাহারা সেই বিদেশে গিয়াও যেন ইসলামী তাহ্‌যীব ও ইসলামী আদর্শের প্রাধান্য স্থাপন করিতে এবং তাহা প্রচার করিতে পারে। ইহা সর্বক্ষণই মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, কোন অবস্থাতেই ইহার প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না।

একদল লোক ধর্মবিদ্যায় পারদর্শী এবং পূর্ণ জ্ঞানী হইতে হইবে। সমাজে তাহাদিগকে স্থান দিতে হইবে সবচাইতে উন্নত স্তরে। এর জন্য উন্নত ধরনের মাদ্রাসা তথা আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপন করিতে হইবে এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষার সংগে সংগে কোরআন হাদীসের যাবতীয় আহকাম যেন আমলেও পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, এইসব কারণেই ইসলামী শিক্ষাগার অর্থাৎ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে বড় নেকের ও বেশী সওয়াবের কাজ আর নাই।

বিবাহ সম্পর্কে আরো জ্ঞাতব্য বিষয়

ছেলে যখন এলেম শিখিয়া রোযগার করার উপযুক্ত হয় এবং মেয়ে যখন গৃহস্থালী বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত হয়, তখন বাপের কর্তব্য (বাপ না থাকিলে যিনি অভিভাবক ও অলী হইবেন তাঁহার কর্তব্য) ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দেওয়া।

যে জিনিস যত অধিক জরুরী সেই জিনিসকে আল্লাহ্ ততই সহজলভ্য করিয়া দিয়াছেন। বিবাহ যেহেতু ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র সকল মানুষের জন্যই অত্যন্ত জরুরী, এই জন্য ইহা অতি সহজে এবং নিতান্ত অনাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া যাওয়াকেই আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন। তাই শরী'অতে বিবাহ ব্যাপারে ব্যয়বাহুল্য ও অতিরিক্ত আড়ম্বর নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন সমাজে কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া এই সহজসাধ্য কাজকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া ফেলিয়াছে। বিবাহকে কঠিন করিয়া তোলা অন্যায়, তবে যথাসম্ভব মর্যাদা রক্ষিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বিবাহে স্ত্রীর জন্য যথোপযোগী জেওর ও মহর হওয়ার দরকার। কারণ, পুরুষের মর্যাদা এই যে, সে যে একটি পরিবারের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত, সে কথার সক্রিয় প্রমাণ তাহাকে পেশ করিতে হইবে। ভবিষ্যতে সে যে তাহার স্ত্রীকে দাসীরূপে না দেখিয়া প্রেমপাত্রী, মাহবুবা ও মা'শুকারূপে দেখিবে, তার প্রমাণস্বরূপ তাহাকে মহর-জেওর দিতে হইবে। কিন্তু মহর কোন ক্রমেই পাত্রের বহনশক্তির অতিরিক্ত হওয়া চাই না। এইরূপে মেয়ের পিতার কাছে মেয়ে জামাই যে স্নেহের পাত্র ও অত্যন্ত আদরণীয় তাহার প্রমাণস্বরূপ মেয়ে-জামাইকে কিছু জেহিয বা যৌতুক দিতে হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে। মহর-জেওর এবং জেহিযের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মহর ত দাবী করিয়া লওয়া যাইবে, কিন্তু জেহিয দাবী করিয়া লওয়া যায় না। আজকাল পাত্রী পক্ষের নিকট খরচের ও নানাবিধ যৌতুকের দাবী করার একটি কু-প্রথা আমাদের শিক্ষিত সমাজে চালু হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত জঘন্য ও ঘৃণা প্রথা। পাত্রী পক্ষকে কোন টাকার চাপ দেওয়ার অর্থ হইতেছে শরীঅতকে উল্টাইয়া দেওয়া। কেননা আল্লাহ্ পাত্র পক্ষের উপর মহর, জেওর ফরয করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পাত্রীপক্ষের উপর খরচ দেওয়া আদৌ ফরয করেন নাই। পাত্রীর পিতা ১৪/১৫ বৎসর যাবৎ বহু অর্থ ব্যয় ও অতি আদর যত্নে লালন-পালন করিয়া তাহার কলিজার টুকরাকে পরের হাতে জীবনের তরে সোপর্দ করিতেছে, ইহাই ত অনেক বেশী। ইহারই ত শোকরিয়া আদায় করিয়া শেষ করা যায় না। এর পরেও তাহার উপর কিছু দাবী করা বা চাপ দেওয়া যুল্‌ম ছাড়া আর কি হইতে পারে? অবশ্য পাত্রপক্ষের বিনা দাবীতে, বিনা চাপে মহব্বতের আলামতস্বরূপ পাত্রীর মাতাপিতা যদি তাহাদের সংগতি অনুসারে কন্যাজামাতাকে কিছু দান করেন, তবে তাহাও শোকরিয়ার কাবেল হইবে। ধনীরা বিবাহের মধ্যে অনেক আড়ম্বর করে ও তাহাদের দেখাদেখি গরীবরাও ঐরূপ করিতে চায়; ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাহারা ঋণও গ্রহণ করিয়া বসে। এইজন্য কাহারও পক্ষেই বেশী আড়ম্বর করা সংগত নহে।

আমাদের হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম দোনো জাহানের বাদশাহ্ হওয়া সত্ত্বেও নিতান্ত সাদাসিধাভাবেই নিজের মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন। প্রথমে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হুযূরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। তারপর ওমর ফারূক (রাঃ) দরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু হুযূর দোনো ক্ষেত্রেই মেয়ের বয়স কম বলিয়া ওযর করিয়াছেন। তারপর ছিদ্দীক ও ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ে মিলিয়া হযরত আলী (রাঃ)-কে দরখাস্ত করিতে বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ) লজ্জাবনত অবস্থায় যখন হুযূরের নিকট দরখাস্ত করিলেন, তৎক্ষণাৎ জিব্‌রায়ীল মারফৎ হুযূরের নিকট আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ওহী আসিল। হুযূর (দঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া নিলেন। ঐ সময় হযরত আলী (রাঃ)-এর ছিল ২১ বৎসর এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বয়স ছিল পনর কি সাড়ে পনর বৎসর।

এই হাদীস দ্বারা আমরা কতকগুলি উপদেশ পাই—(১) ছেলে এবং মেয়ের বিবাহের উপযুক্ত বয়স জানা গেল। (২) পাত্রের বয়স পাত্রীর চেয়ে কিছু বেশী হওয়া ভাল। (৩) পাত্র এবং পাত্রীর বয়স মানানসই হওয়া উচিত। পাত্রের বয়স অনেক বেশী হইলে, পাত্রীর বাপ বিবাহ দিতে না চাহিলে তাহাকে দোষী করা যাইবে না। (৪) পাত্র যদি পাত্রীর জন্য দরখাস্ত করে, তবে তাহাতে কোন দোষ নাই।

অতএব হুযূর (দঃ) ঘনিষ্ঠ ছাহাবাগণকে ডাকাইয়া তৎক্ষণাৎ নিজেই খোৎবা পড়িয়া নিজেই বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। হুযূর মহর ধার্য করিলেন ৪০০ মেস্‌কাল (আমাদের দেশের হিসাবে আনুমানিক ১৫০ টাকা)। হুযূর এক খাঞ্চা খোরমা আনাইয়া বিবাহ মজলিসে উপস্থিত সকলের মধ্যে তাকসীম' করিয়া (বাঁটিয়া) দিলেন এবং উম্মে আয়মানকে সংগে দিয়া পায়ে হাঁটাইয়া দোনো জাহানের শাহ্‌জাদী মা ফাতেমাকে হযরত আলীর সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

এই হাদীস দ্বারা আমরা নিম্ন উপদেশগুলি পাইঃ

(১) বিবাহ গোপনে হওয়া চাই না ; বরং খাছ ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের মজলিসে হওয়া চাই।

(২) মহর অনেক বেশী হওয়া চাই না। কারণ, হুযূর (দঃ) দোনো জাহানের বাদশাহ্ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নিজের মেয়ের মহর অনেক বেশী করেন নাই।

(৩) বিবাহের মজলিসে কিছু মিষ্টিমুখ করা সুন্নত। (কিন্তু সামর্থ্যের অতিরিক্ত কখনো করা চাই না)।

(৪) দুলহা-দুলহানকে পায়ে হাঁটাইয়া পাঠানে কোন দোষ নাই। অবশ্য আবশ্যকবোধে সওয়ারী ব্যবহার করাতেও দোষ নাই। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পাল্কীর ব্যবস্থাকে অত্যন্ত জরুরী বলিয়া মনে করাটা ভুল।

(৫) মেয়ের সঙ্গে—যেহেতু নূতন বাড়ী, নূতন ঘর—একজন বে-তাকাল্লুফ সঙ্গিনী—যাহার সহিত সে মন খোলাভাবে কথা বলিতে পারে—পাঠান সুন্নত।

অতঃপর সন্ধ্যাবেলায় হুযূর (দঃ) নিজে হযরত আলীর বাড়ীতে গেলেন। মা ফাতেমাকে আদেশ করিলেন, কিছু পানি আন। মা ফাতেমা নিজেই পানি আনিলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, নূতন বৌর নিজ হাতে কাজ করাতে কোনই দোষ নাই। দোজাহানের শাহজাদী যদি নূতন বৌ অবস্থায় নিজ হাতে কাজ করিতে পারেন, তবে অপরের সম্বন্ধে কোন কথাই আসিতে পারে না। তারপর হুযূর (দঃ) সূরা-ফালাক এবং সূরা-নাস পড়িয়া নিজের লোয়াব মোবারক পানির মধ্যে দিয়া মা ফাতেমার মাথায়, বুকে ও মুখে কিছু পানি নিজ হাতে ছিটাইয়া দিলেন, এবং এইরূপ

দো'আ করিলেন—"হে খোদা! ফাতেমাকে এবং তাহার সন্তানকে শয়তান থেকে রক্ষা করিও।" তৎপর মা ফাতেমার পিঠের দিকেও কিছু পানি ছিটাইয়া দিলেন এবং উপরোক্তরূপ দো'আ করিলেন। তারপর তাঁহাকে কিছু পানি পান করিতে এবং ঐ পানির দ্বারা ওযূ করিতেও বলিলেন। ইহার পর হযরত আলীকেও পানি পান করিতে বলিলেন। সেই পানিতেও তিনি উপরি-উক্তরূপ দো'আ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহারও বুকে, মুখে ও পিঠের দিকে পানি ছিটাইয়া দিয়া দো'আ করিলেন এবং তাঁহাকে ঐ পানি দ্বারা ওযূ করিতে ও উহা পান করিতে বলিলেন; এরপর বলিলেনঃ যাও, বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া আরাম কর।

সম্ভবপর হইলে মেয়ে-জামাইর জন্য এরূপ আমল করা সুন্নত।

এই বিবাহে নবী (দঃ) জেহিয দিলেন—(১) দুইটি চাদর, (২) দুইটি তোষক, বিছানা, (৩) ৪টি বিভিন্ন রকমের বালিশ, (৪) দুইটি বাজুবন্দ জেওর, (৫) ১টি কম্বল, (৬) ১টি পেয়ালা, (৭) এক জোড়া আটা পিষার যাঁতা বা চাক্কি, (৮) ১টি পানি আনার মশক, (৯) ২টি পানি রাখার কলসি এবং (১০) একখানা পালঙ্ক। মোট এই কয় পদের জিনিস হযরত নবী (দঃ) জেহিয স্বরূপ দিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা একটি নূতন পরিবার গঠন করার সাময়িক কাজ চলিতে পারে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি জেরা ছিল, তিনি উহা বিক্রয় করিয়া মহরের টাকা পরিশোধ করিলেন। মহর জেওর মেয়েদের মর্যাদার সম্পদ। কাজেই উহা পরিশোধ করা একান্ত দরকার। উহার দ্বারা বুঝা গেল যে, মেয়ে-জামাইকে জেহিয দেওয়া সুন্নত। কিন্তু অবস্থা বা সঙ্গতির অতিরিক্ত আড়ম্বর করা, অথবা ঋণ করা বা ভিক্ষা করিয়া আড়ম্বর বা ধুমধাম করা শরীঅত-বিরুদ্ধ।

তারপর হুযূর (দঃ) মেয়ে-জামাইর বাড়ীর কাজ ভাগ করিয়া দিলেন। বাড়ীর বাহিরের সব কাজ হযরত আলীর জিম্মায় এবং বাড়ীর ভিতরকার যাবতীয় কাজ মা ফাতেমার জিম্মায় দিলেন।

হাদীস শরীফে আছেঃ মা ফাতেমা নিজ হাতে যাঁতায় আটা পিষিতেন, নিজ হাতে রুটি পাকাইতেন, নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। নিজে কূয়া হইতে পানি তুলিয়া মশকে করিয়া পানি আনিতেন এবং নিজ হাতে কাপড় কাচিতেন।

আজকাল আশরাফ-আতরাফের একটি কু-প্রথা আমাদের দেশে চলিতেছে। আশরাফযাদিরা বাড়ীর ভিতরকার কাজও করিতে চায় না; কাজ করাকেই তাহারা অপমান মনে করে। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কাজ করিতে কোনই অপমান নাই। যিনি সমস্ত আশরাফদের বড় আশরাফ তিনিও নিজ হাতে কাজ করিয়াছেন, নিজ হাতে আটা পিষিয়াছেন। আরব দেশের আটা পিষা আমাদের ধান ভানিয়া চাউল করারই সমান। কোন কোন অঞ্চলে ধান ভানাকে শরাফতের খেলাফ বা অপমান মনে করে, ইহা ভুল ধারণা।

কাজ করাতে হাত-পা শক্ত হইয়া যায়, কাপড় ময়লা হইয়া যায়—এজন্য হযরত আলীর অনুরোধে মা ফাতেমা হুযূরের কাছে কাজের সাহায্যের জন্য দাসী চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হুযূর (দঃ) নিজের কলিজার টুকরার জন্য নিজ হাতে কাজ না করা পছন্দ করেন নাই; আর দাসী-বাঁদীও মঞ্জুর করেন নাই; বরং নিজ হাতে সারাদিন কাজ করার পর ৩৩ বার سبحان الله ৩৩ বার الحمد لله এবং ৩৪ বার الله اكبر বলিয়া আল্লাহ্‌র শোকর গোজারী করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মা ফাতেমা এবং হযরত আলী (রাঃ) এই উপদেশ অনুযায়ী জীবনভর চলিয়াছেন।

'শবে-যোফাফে'র পর (বিবাহের পর প্রথম মিলনের রাত্রিকে 'শবে যোফাফ' বলে।) হযরত আলী ওলিমা করিয়াছেন। শাদীর পর ওলিমা করা সুন্নত, তবে ওলিমার ব্যাপারেও অবস্থা হিসাবে

ব্যবস্থা হওয়া চাই। অবস্থার অতিরিক্ত অযথা ধুমধাম, অতিরিক্ত অপব্যয় বা ফখরের জন্য কোনরূপ খানা-পিনা হওয়া চাই না বা ঋণ গ্রহণ করিয়াও কোন আড়ম্বর করা চাই না। চাপ দিয়া বা জোর যুলুম করিয়াও কোন দাওয়াত আদায় করা চাই না। বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে সীমার মধ্যে থাকিয়া অবস্থা অনুযায়ী কিছু পরিমাণ শরীঅত সম্মত আমোদ-উৎসব করাতে দোষ নাই; বরং সুন্নত।

বাদ্য-বাজনা, নৃত্য-গীত (গান) বা বায়স্কোপ-সিনেমা কোনক্রমেই হওয়া দুরুস্ত নহে। আর যে কাজ ফরয, ওয়াজিব নহে, তাহা যদি ছুটিয়া যায়, তবে সেজন্য আত্মীয়-এগানার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়া উচিত নহে। সবচেয়ে বড় জিনিস হইল মুসলমানের মনের মিল, একতা ও সৌহার্দ্য। খবরদার! কাহাকে দাওয়াত না করিলে বা কাহারও বাড়ীর হাদিয়া তোহ্‌ফা পাঠাইতে ত্রুটি হইয়া গেলে, সেজন্য মনোমালিন্যের সৃষ্টি যেন না হয়। মুসলমানের দিল হওয়া চাই— স্বচ্ছ পরিষ্কার নির্মল ও উদার।

একাধিক বিবাহ

সর্বজ্ঞানী মহা অন্তর্যামী আল্লাহ্‌ তা'আলা একজন পুরুষকে অধিকার দিয়াছেন—এক সঙ্গেই চারিজন স্ত্রী রাখিবার। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এই শর্তহীন অধিকারকে খর্ব বা নিষিদ্ধ করার বা ইহার উপর কোন শর্ত আরোপ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এক বিবাহ করিলে যেমন সেই স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ফরয হয় এবং সে উহা পালন করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু যদি কেহ সেই ফরয পালনে ক্রুটি করে, তবে সে কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। তাহার বিবাহকে নিষিদ্ধ বা শর্তাধীন করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে একাধিক বিবাহ করিলেও বিবিদের মধ্যে সকল বিষয়ে সমতা রক্ষা করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করা স্বামীর উপর ফরয হয় এবং সে ফরয পালন করিতেও স্বামী বাধ্য হয়। কিন্তু যদি কেহ উক্ত ফরয প্রতিপালনে ক্রুটি করে, সে ক্রুটির কারণেও তাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। অথচ সে কারণে তাহার বিবাহকে নিষিদ্ধ বা শর্তাধীন করা যাইতে পারে না। বহু পয়গম্বর (আঃ) বহু ছাহাবী (রাঃ) এবং বহু ওলীয়ে কামেল (রাঃ) একাধিক বিবাহ করিয়াছেন—দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র বান্দার ও নবীর উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং বিবিগণের মধ্যে যথাবিহিত সমতা রক্ষা করিয়াছেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, আজকাল একদল দুর্বলচেতা হীনমন্য লোক ইউরোপ আমেরিকার লজ্জাকর কুপ্রথার ভক্ত সাজিয়া, একাধিক বিবাহ্‌কে দূষণীয় মনে করে। কিন্তু নির্লজ্জ লম্পটের মত গণ্ডায় গণ্ডায় উপপত্নী বা গার্লস-ফ্রেণ্ড রাখিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইহারাই নিজেদের লজ্জা ও নোংরামী ঢাকিবার জন্য আমাদের দুর্বলচেতা, ধর্মে অনভিজ্ঞ যুবকদিগকে এই বলিয়া উপহাস করিতে চেষ্টা করে যে, তোমাদের মধ্যে একাধিক বিবাহের মধ্যযুগীয় কুপ্রথা এখনো চালু আছে। বস্তুতঃ ইহারা অন্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহা বুঝিবার তাহাদের শক্তিই নাই। ইহা মধ্যযুগীয় কুপ্রথা নহে।, ইহা আল্লাহ্‌র দেওয়া, মানুষের জন্য চিরমঙ্গলময় নীতি। ইহা কোরআনে বিবৃত হইয়াছে এবং নবীগণ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, অধুনা উপরি-উক্ত ইউরোপীয় নির্লজ্জ নীতির একদল অন্ধ পূজারী আমাদের মুসলমান সমাজে দেখা দিয়াছে। তাহারা একাধিক বিবাহকে আইন বিরুদ্ধ বা শর্তসাপেক্ষ বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চাহিতেছে। ইহা খৃষ্টানী প্রভাব এবং তাহাদের অন্ধ অনুকরণ বৈ আর কিছুই নহে।

বাল্য বিবাহ

বাল্য বিবাহ নিরুৎসাহিত করিবার জিনিস, বে-আইনী সাব্যস্ত করিবার জিনিস নহে। কারণ, বাল্য বিবাহের দুইটি দিক আছে—একটি উপকারিতার, অপরটি অপকারিতার। উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শরী'অতে মোকাদ্দাসা ইহাকে হারাম বা বে-আইনী সাব্যস্ত করে নাই; বরং একান্ত জরুরতবশতঃ যে করা যাইতে পারে, তাহারই আমলী নমুনা দেখানের জন্য স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাল্য বিবাহ করিয়াছেন। বাল্যকালে বিবাহ না করা হইলে বাস্তবিকই অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। সেই সব ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়াই বাল্য বিবাহ করাইতে হয়।

আর একটি কথা এই যে, দেশে ইচ্ছাকৃত যেনা ব্যভিচার দূরীকরণের জন্য কোন আইন বা শাস্তি নাই। যে দেশে যুবক-যুবতীদের একত্রে উঠা-বসা বা মেলামেশা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নাই, যে দেশে ১৩/১৪ বৎসরের মেয়েরা প্রায়ই যৌবন প্রাপ্ত হয়, সে দেশে যদি ২৬ বৎসরের কম বয়সে বিবাহ দেওয়া বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়, সে দেশের সতীত্বরত্ন যে কিভাবে লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইবে তাহা চিন্তা করিতেও চিন্তাবিদগণের শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের একদল দুর্বলচেতা যুবক পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মোহে মত্ত হইয়া বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে নাক সিটকাইতেছে। কিন্তু যাঁহারা চিন্তাশীল এবং ধার্মিক, তাঁহারা চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

তালাক

বিবাহ হয় আজীবন মিলন এবং আজীবন বন্ধুত্বের জন্য। বিচ্ছেদের জন্য কখনো বিবাহ হয় না। গোপন অঙ্গকে বার বার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খোলা যায় না। এই জন্যই শরী'অতে মোকাদ্দাসা তালাককে— اَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ "মুবাহ্ কাজসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষো নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা যত জিনিসকে আইন অনুমোদিত করিয়াছেন, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট এবং অধিক ঘৃণ্য ও কদর্য জিনিস তালাক। হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে, তালাক শব্দ উচ্চারণে আল্লাহ্র আরশ কাঁপিয়া উঠে। অবশ্য এতদসত্ত্বেও মানবীয় জরুরতের কারণে তালাকের আইনগত অনুমোদন দান করা হইয়াছে। কাজেই একান্ত ঠেকা জরুরত ব্যতিরেকে রাগের বশীভূত হইয়া বা হঠাৎ কোন ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হইয়া তালাক দেওয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য। একান্ত জরুরতবশতঃ তালাক দিতে হইলেও এক সঙ্গে একবারে একাধিক তালাক দেওয়া শরীঅত বিরুদ্ধ। হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়াও অন্যায়। যে তোহরের (দুই হায়েযের মধ্যবর্তীকালে পাক থাকা অবস্থার) মধ্যে স্ত্রী-সহবাস করা হইয়াছে, সে তোহরের মধ্যেও তালাক দেওয়া উচিত নহে। এতগুলি শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তারপর তালাক দেওয়া সমীচীন—যদি তালাক দেওয়ার একান্তই আবশ্যক হয়। এইসব কড়া শর্ত লংঘন করিয়া যাহারা তালাক দেয়, বাস্তবিক তাহারাই ঐ রকম পাপী যে রকম পাপী সেই অত্যাচারী ব্যক্তি, যে একজন

দুর্বল অধীনস্থ মানুষকে কামরার মধ্যে নিঃসহায় অবস্থায় পাইয়া গুলী করিয়া মারে। কিন্তু এ ব্যক্তি পাপী হওয়া সত্ত্বেও তাহার গুলীতে যেমন লোকটি মরিয়াই যায়, মৃত্যু ঠেকান যায় না, ঠিক সেইরূপে যদি কোন নির্বোধ পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এক সঙ্গে তিন তালাক বা দুই তালাক কিংবা উপরোক্ত নিষিদ্ধ অবস্থাসমূহে তালাক দেয়, তবে সে তালাক পড়িবেই পড়িবে, স্ত্রী বিচ্ছেদ হইবেই হইবে। অতএব, সমাজের লোকদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। তালাক যেন কোনক্রমেই দেওয়া না হয়। তালাক শব্দ মুখে আনাই মানবতার দিক হইতে ভীষণ অন্যায় । আর যদি একান্তই দিতে হয়, তবে একাধিক তালাক কিছুতেই দেওয়া চাই না। একদল লোক ব্যক্তিগত বা দলগত প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তিন তালাক দেওয়া সত্ত্বেও সেই যালেম স্বামীকে কোনরূপ শাস্তি না দিয়া এবং শরী'অতের ব্যবস্থার দিকে না যাইয়া তাহাকেই ঐ স্ত্রী পুনরায় রাখার ব্যবস্থা দিতে চহিতেছে। ইহা তাহাদের বুদ্ধির ভুল এবং ধর্মকে বাদ দিয়া ভুল বুদ্ধির অনুবর্তিতা ও ইসলাম বিরোধী কোন এক সংখ্যালঘু দলের পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শরী'অতে মোকাদ্দাসা তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীকে দান করিয়াছে, স্ত্রীকে দান করে নাই।

হিলা-শরা

আমাদের দেশে শরী'অত সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে আর একটি কু-প্রথা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। একে ত অনেকেই রাগের বশীভূত হইয়া, ঝগড়া কলহ করিয়া তিন তালাক এক সঙ্গে দেয়। এছাড়া মূর্খতা এত চরমে পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, রেজিষ্টারী অফিসেও তালাক লেখাইতে হইলে এক সংগে তিন তালাক লেখায়; অথচ এক তালাক লেখাইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায় এবং তিন তালাক এক সঙ্গে দেওয়ার গোনাহ্ হইতেও বাঁচিয়া যাইতে পারে। এক দিকে এই মূর্খতা, তারপর যখন রাগ থামিয়া যায়, আর ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করে, তখন চৈতন্য হয় এবং চেষ্টা করে যে, কোন রকমে ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা যায় কি না। তখন কোন নিম-মোল্লা হয়ত এই জঘন্য পরামর্শ দিয়া দেয় যে, "মিঞা, 'হিলা-শরা করিয়া লও । হিলা-শরা ছাড়া তুমি ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পার না।" "হিলা-শরা কাহাকে বলে?"—প্রশ্ন করিলে নিম-মোল্লা তখন বলিয়া দেয় যে, এমন কাহাকেও ঠিক করা, যে তোমার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া এক রাত্রি রাখিয়া (সহবাসও করিবে) তারপর ছাড়িয়া দিবে, তখন তুমি বিবাহ করিবে। কি দারুণ মূর্খতা! একে ত হিলা শব্দের অর্থই খারাব—যাহাকে আমাদের সোজা বাংলায় বলা যাইতে পারে, বজ্জাতি, চালাকি বা দুষ্টামী। এখন খারাব শব্দকে আবার নেছবত করা হয় শরার সাথে। এহেন জঘন্য প্রথাকে সর্বতোভাবে বর্জন করা দরকার—ইহা বড়ই লজ্জার কথা। বর্জনের উপায় এই নহে যে, তিন তালাক এক সঙ্গে দিলে মাত্র এক তালাক পড়িবে। (কেননা, ইহাতে তিন তালাক দেওয়ার সংখ্যা ত আরো বাড়িয়া যাইবে। তাহা ছাড়া শরী'অতের বরখেলাফ ত হইবেই।) বর্জনের উপায় এই যে, প্রথমতঃ, যে কেহ এক সঙ্গে তিন তালাক দিবে, তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে। (অবশ্য ঐ তালাকের ফলে তাহার বিবি ত হারাম বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে।) দ্বিতীয়তঃ যে পাপী হিলা-বাহানার পরামর্শ দিবে, যাহারা ইহাতে সংশ্লিষ্ট থাকিবে এবং যে এইরূপ বিবাহ করিবে, তাহাদের সকলকেই কঠোর শাস্তি দিতে হইবে। হাদীস শরীফে এক সঙ্গে তিন তালাকদাতাকে কতলের পর্যন্ত ধমকি দেওয়া হইয়াছে। এছাড়া তাহাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের সঙ্গে উপহাসকারীও বলা হইয়াছে। আর হিলা বাহানায় যে কেহ চুক্তি করিয়া বিবাহ করিবে অথবা

করাইবে, উভয়ের উপরই আল্লাহ্‌র লা'নত (অভিশাপ) বর্ষিত হইবে বলিয়া হাদীসে উল্লেখ আছে। কাজেই আইনত এদের শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। আল্লাহ্ পাক কোরআন শরীফে তিন তালাকের জঘন্যতা এবং কঠোরতা বর্ণনার জন্য এই বলিয়াছেন যে, স্ত্রী পুনরায় গ্রহণ করার জন্য তালাক হয় মাত্র দুইটি। তারপর হয় স্ত্রীকে শরী'অত মোতাবেক রাখিতে হইবে, নতুবা সদ্ব্যবহারের সঙ্গে পরিষ্কার ছাড়িয়া দিতে হইবে। পরিষ্কার ছাড়াটা হইবে তৃতীয় তালাক। যদি কেহ অবাঞ্ছিত এবং নিন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় তালাক দিয়া ফেলে অথবা যদি কেহ জঘন্য হওয়া সত্ত্বেও এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়া ফেলে—যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, যদি তিন তালাক দিয়া ফেলে, তবে সেই স্ত্রী আর তাহার জন্য কস্মিনকালেও হালাল হইবে না—যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী এই স্বামী ছাড়া অন্য স্বামীকে বিবাহ না করিবে; তারপর যদি দ্বিতীয় স্বামী (কোন দিন) স্বেচ্ছায় ঐ স্ত্রীকে তালাক দিয়া বসে এবং তারপর যদি পূর্ব স্বামীও এই স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ করে, তবে তাহতে তাহাদের গোনাহ্ হইবে না—যদি তাহারা আল্লাহ্‌র সীমা ঠিক রাখে; আর যাহারা আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করিবে তাহারা হইবে যালেম।

আইনের উদ্দেশ্যকে সফল হইতে না দিয়া যাহারা শুধু আইনের ফাঁক তালাশ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের জন্যই বলা হইয়াছে—যাহারা আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করিবে, তাহারা যালেম সাব্যস্ত হইবে।

এই আয়াতের দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, তিন তালাক হইয়া গেলে সেই স্ত্রী আর পুনরায় গ্রহণ করা যাইবে না। অবশ্য ইদ্দত পার হওয়ার পর, বিনা চুক্তি বা বিনা কথাবার্তায় এমনিই ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করিলে সেই স্বামী যদি কোন দিন তাহাকে তালাক দিয়া দেয় বা সে মরিয়া যায়, তাহা হইলে সেখানের ইদ্দত পার হওয়ার পর পুনরায় পূর্ব-স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের সম্মতিতে পুনর্বিবাহ হইলে তাহাতে অবশ্য তাহারা গোনাহ্‌গার হইবে না।

পর্দা রক্ষা করা ফরয

স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং পুরুষের চরিত্র রক্ষা করা এত বড় ফরয যে, এই ফরয সর্বপ্রথম পয়গম্বর হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম হইতে আরম্ভ করিয়া আখেরী পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল শরী'অতেই ফরয রহিয়াছে। আমাদের নবী যেহেতু শেষ পয়গম্বর, যেহেতু তাঁহার শরী'অতই সর্বশেষ এবং সর্বব্যাপী শরী'অত, যেহেতু মেয়েলোকের সতীত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যবান এবং অধিক লোভনীয় রত্ন—দুর্বলের নিকট গচ্ছিত; এইজন্য লোকেরা যেমন তাহাদের মূল্যবান রত্নকে সাত পাল্লা লোহার সিন্দুকে হেফাযত করিয়া রাখে তদ্রূপ কোন মানুষে নয়, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি রাসূল মেয়েলোকের সতীত্বের হেফাযতের জন্য, সাত পাল্লা লোহার সিন্দুকের ব্যবস্থা বাতাইয়া দিয়াছেন। যাহারা এই মূল্যবান রত্নকে হেফাযত করিতে চায়, তাহারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে; আর যাহারা গ্রহণ করিবে না, তাহারা নিশ্চয়ই ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

প্রথমতঃ সর্বদা ছতর ঢাকিয়া রাখার হুকুম করা হইতেছে। পুরুষের ছতর নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত; মেয়েলোকদের ছতর মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি এবং পায়ের পাতা ছাড়া বাকী সর্ব-শরীর। কাহারো ছতর ছোঁয়া ত দূরের কথা, দূর থেকে দেখাও হারাম এবং দেখানও হারাম।

দ্বিতীয়তঃ, মেয়েলোকের শরীরের সৌন্দর্য, **তৃতীয়তঃ,** মেয়েলোকের জেওরের সৌন্দর্য, **চতুর্থতঃ,** মেয়েলোকের কাপড়ের সৌন্দর্য—এমনভাবে খোলা রাখাকে হারাম করা হইয়াছে, যাহাতে উহা অন্য পুরুষে দেখিতে পায়। **পঞ্চমতঃ,** মিষ্ট সুরে গান গাহিয়া পরপুরুষকে শুনান ত দূরের কথা, নরম ও কোমল স্বরে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে পর্যন্ত মেয়েদিগকে শরী'অতে নিষেধ করা হইয়াছে। **ষষ্ঠতঃ,** বিশেষ জরুরতবশতঃ বাড়ীর চার দেওয়ালের বাইরে যাইতে হইলে, পথ চলার সময় পায়ের জেওরের আওয়ায যাহাতে পরপুরুষে শুনিতে না পারে, চেহারা যাহাতে পরপুরুষের দৃষ্টিগোচর না হয়, তজ্জন্য পা জোরে ফেলিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং বোরকা পরিয়া অথবা বড় চাদরের ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকিয়া লইতে এবং উড়নীর দ্বারা গর্দান ঢাকিয়া লইতে আদেশ করা হইয়াছে। **সপ্তমতঃ,** মেয়েদের কর্মক্ষেত্র বাড়ীর ভিতরে সাব্যস্ত করিয়া দিয়া পুরুষদিগকে এইরূপ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বাড়ীর ভিতরকার মেয়েলোকদের নিকট কোন জিনিস চাহিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে তাহারা যেন পর্দার বাহিরে বা আড়ালে থাকিয়া উহা চাহে। এই সাতটি বিধান পরিষ্কার ভাষায় কোরআন এবং হাদীসে বর্ণিত আছে। ইহার একটি কথাও কোন মানুষের গড়ান নয়। অতএব, এগুলি প্রথা নয়, অপরিহার্য ফরয এবং ওয়াজিব।

হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামের শরী'অত, হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর শরী'অতে উপরি-উক্তরূপ কড়া ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা ছিল না। কাজেই কোরআন-হাদীসের বিধান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, খৃষ্টান ইংরেজদের প্রভাবে যাহারা প্রভাবিত হইয়াছে, তাহারাই খৃষ্টান মিশনারীদের প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত হইয়া ইসলামের চির সুন্দর ব্যবস্থার প্রতি 'খাঁচায় আট্‌কাইয়া রাখা, সিন্দুকে ভরিয়া রাখা, পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগ করা, ইত্যাদি ব্যঙ্গোক্তি করিয়া আমাদের ধর্মে অনভিজ্ঞ, মনস্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতীদের প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র ফরয-কৃত পর্দাকে লঙ্ঘন করাইয়া পরিশেষে সতীত্ব হরণেরও বিরাট সুযোগ করিয়া লইয়াছে। কাজেই এখনো সনির্বন্ধ অনুরোধ করি, হে মুসলমান ভাই-ভগ্নিগণ! এখনো ধর্মে ফিরিয়া আসুন। আর ইতর প্রাণীর ন্যায় উচ্ছৃংখল জীবনের দিকে যাইবেন না; ভ্রমরের মত এ-ফুলের সৌরভ লুটিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন না।

ভোরে গাত্রোত্থান

পূর্বকাশে রাত্রিশেষে সূর্যের আগমনবার্তা বহন করিয়া যখন প্রথম সাদা ভাব দেখা দেয়, তখনকার সময়টা বড়ই পবিত্র সময়। এই সময়কার হাওয়া বড় পবিত্র হাওয়া। এই হাওয়া গায়ে লাগাইলে মনে স্ফূর্তি ও ভাল স্বাস্থ্য লাভ হয়। এই পবিত্র ও মহোপকারী মুহূর্তে কাহারো বিছানায় ঘুমাইয়া থাকা উচিত নহে। সকাল সকাল ঘুম হইতে উঠিয়া আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিয়া 'আউযুবিল্লাহ্‌' 'বিসমিল্লা' কলেমা এবং দো'আ পড়িয়া পেশাব-পায়খানা প্রভৃতি হইতে সারিয়া মসজিদে গিয়া জমা'আতে ফজরের নামায পড়া এবং খোদার কাছে সারাদিনের কামিয়াবীর জন্য দো'আ চাওয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য।

দুঃখের বিষয়, আজকাল বিধর্মীদের কু-সংসর্গে পড়িয়া অনেক মুসলমান ছেলেদের মধ্যেও এইরূপ রোগ ঢুকিয়াছে যে, তাহারা সকালে গাত্রোত্থান করে না; বরং সূর্যোদয়েরও অনেক পরে বেলা ৮/৯ টায় ঘুম হইতে উঠে। ইহা অত্যন্ত খারাব অভ্যাস। যাহার মধ্যে এই কু-অভ্যাসের

বিষবাষ্প ঢুকিয়াছে, অতি যত্ন ও চেষ্টা সহকারে যথাশীঘ্র সম্ভব তাহার এহেন গর্হিত কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করা দরকার।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত

প্রত্যেক মুসলমানেরই—চাই সে ইউরোপে থাকুক বা আমেরিকায় থাকুক—স্বদেশে বা বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন—সকালে উঠিয়া ফজরের নামায পড়িয়া আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোরআন শরীফ হাতে লইয়া চুমা দিয়া চোখে মুখে লাগাইয়া কিছুক্ষণ অতি মনোযোগের সহিত অতীব ভক্তি সহকারে কোরআন তেলাওয়াত করা দরকার। যদি অর্থ বুঝিয়া তরজমা দেখিয়া তেলাওয়াত করা যায়, তবে ত খুবই ভালো; নতুবা অন্ততঃপক্ষে আল্লাহ্‌র দিকে দেল রুজু করিয়া ভক্তির সঙ্গে কোরআন শরীফের শব্দগুলি পড়িলেও অনেক আধ্যাত্মিক (রূহানী) উন্নতি সাধিত হয়। অর্থ না বুঝিলেও এতটুকু কথা সকলেরই বুঝে আসে যে, আমি আল্লাহ্‌কে ভক্তি করিয়া আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করিতেছি। প্রাথমিক অবস্থায় এই মৌলিক ভক্তির বড় অর্থ, তারপর ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত অর্থ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করা দরকার। অর্থ না বুঝিয়া পড়িলেও কোরআন পাকের প্রতিটি হরফে এই ভক্তির কারণে আল্লাহ্ পাক দশ-দশটি নেকী পুরস্কার দিবেন। আর অর্থ বুঝিয়া ভক্তি, চিন্তার সঙ্গে পড়িলে আরো অনেক বেশী নেকী দিবেন। আর মানব জীবনে নেকীই পরম কাম্য, পরম সম্পদ—আখেরাতের সওদা কিনিবার জন্য ইহাই একমাত্র মুদ্রা।

মেয়েদের কয়েকটি কুপ্রথা

আজকাল এইরূপ একটি কুপ্রথা চালু হইয়াছে যে, হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমান মেয়েদের কপালেও সিন্দুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। ইহা অতি জঘন্য কুপ্রথা—বিজাতীয় অনুকরণ। ইহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। মুসলমান মেয়েদের বিশিষ্ট লেবাস কোর্তা,পায়জামা, উড়নী, চাদর বোরকা প্রভৃতি হওয়া দরকার—যাহাতে মুসলমান বলিয়াই চেনা যায়। অন্য জাতির কোন আলামত মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বা পুরুষদের মধ্যে কোনক্রমেই হওয়া চাই না।

আজকাল আর একটি ঘৃণ্য প্রথা চালু হইয়াছে যে, যে-সব মেয়েরা হায়া-লজ্জাকে ত্যাগ করিয়া একেবারে ইতর পশু সাজিতেছে, তাহারা বুক উঁচু করিয়া রাখে। ইহা অত্যন্ত জঘন্য প্রথা। শ্লীলতা, ভদ্রতা ও মানবতার অনুভূতি যার মধ্যে বিন্দুমাত্রও আছে, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান বিদ্যমান আছে, সেই নারী এরূপ কিছুতেই করিতে পারে না। বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যাইতে হইলে এমন অবস্থায় বাহির হইবে যাহাতে পুরুষদের মধ্যে যৌন প্রেরণা বা উত্তেজনার সৃষ্টি না করে।

আমাদের শরীঅতে মোকাদ্দাসার মহান পবিত্র বিধান অনুসারে হায়া-শরম মানবীয় মহৎ গুণাবলীর মধ্যে একটি প্রধান গুণ। ইহা ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই গুণকে অর্জন করা দরকার। অন্যান্য ধর্মের লোকদের অনুকরণে বা ধর্মহীনদের দেখাদেখি নির্লজ্জতা এবং বেহায়ায়ীমূলক আচরণ, চলাচলও কোনক্রমেই উচিত হইবে না। মানুষের মধ্যে ও হায়ওয়ানের মধ্যে বড় পার্থক্য এই যে, হায়ওয়ানের মধ্যে শরম নাই। আর হায়া-শরম মানুষের বিশিষ্ট অলঙ্কার। ইহা কোন প্রকারের সংস্কার বা লৌকিক প্রথা নহে। ইহা পরম সত্য, নবী-বাণী খোদার ওহী দ্বারা প্রমাণিত সত্য।

বগলের ও নাভির নীচের পশম

যে নচ্ছার জাতির ওস্তাদ শাগরেদরা এক জায়গায় উলংগ হইয়া গোসল করিতে লজ্জাবোধ করে না, যাহারা স্কুল-কলেজের বারান্দায়, অলিগলিতে বা রাস্তায় পার্কে পাশবিক ব্যভিচার করিতে লজ্জাবোধ করে না, সেই সকল সভ্যতার নিশানধারী অসভ্যদের অনুকরণে আমাদের মধ্যেরও একদল বগলের পশম লম্বা করিয়া রাখাকে সভ্যতা ও ভদ্রতা (?) বলিয়া মনে করে। ধিক! শত ধিক! এমন নোংরা সভ্যতাকে! আমাদের মহান শরী'অতের হুকুম হইতেছে এই যে, বগলের পশম উপড়াইয়া বা মুণ্ডাইয়া বগল পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে; এইরূপে নাভির নীচের পশমও মুণ্ডাইয়া বা লোমনাশক লাগাইয়া স্ত্রী-পুরুষের উভয়েরই পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে—যেন এক ধান পরিমাণ অপেক্ষাও লম্বা হইতে না পারে।

কুঅভ্যাস শুরু হইতেই বর্জন করা উচিত

কোন পাপীই একদিনে বা প্রথমেই বড় পাপী হয় না। উত্তরকালে যে বড় চোর হইয়াছে, সে হয়ত প্রথমে লোভের বশবর্তী হইয়া সামান্য একটা বরই বা একটা আম চুরি করিয়াছিল। পরে এইভাবে চুরি করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে বড় চোর হইয়াছে, ফলে ইসলামী হুকুমতের অধীন হইয়া থাকিলে সে জেলে গিয়াছে বা তাহার হাত কাটা গিয়াছে। এইরূপে বড় অত্যাচারী প্রথমেই আর বড় অত্যাচারী থাকে না, বড় ব্যভিচারী থাকে না, তবে দুনিয়াতে এমন কতক লোক আছে, যাহারা ভাল হইতেই চায় না; তাহাদিগকে কেহ ভাল করিতে পারিবে না, যাহারা ভাল হইতে চায়, তাহাদের জন্যই বলেতেছি যে, আগে থেকেই হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। ছেলেপিলেদের প্রতি তাহাদের মা-বাপ ও মুরব্বিবয়ানদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে—যাহাতে ছেলেপিলেদের ভিতর কোনরূপ কুঅভ্যাস না ঢুকিতে পারে। চুরির অভ্যাস, অত্যাচারের অভ্যাস, মিথ্যার বা পরনিন্দার অভ্যাস যাহাতে তাহাদের মধ্যে না ঢুকিতে পারে সেজন্য সর্বক্ষণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, কুসংসর্গের কারণেই কু-অভ্যাস ঢুকে। কাজেই এই কুসংসর্গ হইতে ছেলেপিলেদিগকে দূরে রাখার জন্যে সর্বদাই কড়া নজর এবং চেষ্টা রাখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া ছেলেমেয়েরা যখন যৌবনের কাছাকাছি পৌঁছে তখন ত ২৪ ঘন্টাই কড়া দৃষ্টি রাখা দরকার, যাহাতে যৌন উচ্ছৃংখলার লেশমাত্রও ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনক্রমে প্রবেশ করিতে না পারে। কারণ একদিকে যৌন উচ্ছৃংখলতার মত খারাব জিনিসও যেমন নাই, তেমনি অপর দিকে ইহার মত মজার জিনিসও আর নাই, কাজেই খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

অনেক ভাল লোকও অনেক সময় আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে কুসংসর্গে জড়িত হইয়া দুনিয়া আখেরাত বরবাদ করিয়া বসে। কোন ওস্তাদ হয়ত কোন মেধাবী বালক বা বালিকাকে প্রথমতঃ ভাল নিয়তে ভালবাসে। কিন্তু পরে কাম-রিপুর উত্তেজনাকে দমন করিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে খারাব কাজে জড়িত হইয়া পড়ে। ভাবী প্রথমতঃ হয়ত ভাল নিয়তেই ছোট দেওরকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে ও ভালবাসে। কিন্তু পরিশেষে খারাব কাজে জড়িত হইয়া পড়ে।

ভগ্নিপতি হয়ত প্রথম প্রথম ভাল নিয়তেই ছোট শালীকে ভালবাসে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে অবৈধ কাজে জড়িত হইয়া পড়ে। মামী হয়ত ছোট ভাগিনাকে ভাল নিয়তেই ভালবাসে; কিন্তু পরে অন্যায় কাজে জড়িত হইয়া পড়ে। এই ধরনের কথা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি, এবং সকল ভাইকে হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি যে, সকলেরই আগে হইতে হুঁশিয়ার হইয়া সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এই জন্যই শরীঅতের বিধান আছে যে, বালিকা ত দূরের কথা, শালী দেওর ত অনেক বড় কথা, দাড়িহীন বালক দ্বারাও কোনরূপ শারীরিক খেদমত লওয়া উচিত হইবে না; তাহাকে একাধিকবার নির্জন কামরার কাছে আসিতে দেওয়া বা তাহার দিকে নজর করাও কঠোর হারাম।

সহশিক্ষা

খৃষ্টান বর্বরতা বনাম সভ্যতার প্রভাবে আমাদের দেশে স্কুল কলেজে সহশিক্ষা প্রথা (বালক-বালিকা ও নারী-পুরুষের এক সঙ্গে পড়া) চালু হইয়া পড়িয়াছে। একদল পরানুকরণপ্রিয় লোক ইহাকে পছন্দ ও চালু করিতেছে। ইহা অতি জঘন্য প্রথা, ইহার বিষ-ফল অতি ভয়াবহ। প্রত্যেক মুসলমানেরই কঠোরভাবে ইহার বিরোধিতা করা একান্ত দরকার।

বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকার জুয়া

সহশিক্ষার ন্যায় খৃষ্টানী প্রভাবের কারণে পরানুকরণ প্রিয়তার দোষে এবং ধর্মশিক্ষার অভাবের সুযোগ লইয়া আমাদের দেশে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকারের জুয়া এবং সুদ ছড়ান হইতেছে; যাহাতে তিল তিল করিয়া ইসলামী সভ্যতাকে পরাভূত করা যায়।

গেট-এ-ওয়ার্ড (Get-e-word) নামে, হর্সরেস্ নামে, জীবন বীমা বা লাইফ ইন্স্যুরেন্স নামে প্রভৃতি জুয়া ছড়ান হইতেছে। তাহারা বলে, সুদ ছাড়া ব্যাংক চালান যায় না এবং ব্যাংক ছাড়া কারবার তথা গোটা দেশ রাষ্ট্র চালানই অসম্ভব। কিন্তু তাহাদের এ দাবী সম্পূর্ণ অমূলক ও মিথ্যা। তাহারা নিজেদের সৃজনী শক্তি না খাটাইয়া পরের দেখাদেখিই এইভাবে দেশে সুদ ছড়াইতেছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলিতেছেন, সুদ ছাড়া ব্যাংক চালান যায়। কিন্তু সে দিকে তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। অতএব, যাঁহাদের দিলে ইসলামী দরদ আছে, ইসলামী সভ্যতাকে ইসলামী বিধি-বিধানকে জিন্দা রাখার ফরযিয়াতের অনুভূতি এখনো যাঁহাদের নির্জীব হইয়া পড়ে নাই, তাঁহাদের এই ধরনের খৃষ্টানী বর্বরতার বিরোধিতা করা একান্ত দরকার।

কু-চিকিৎসা

এইরূপে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নামেও আমাদের ছেলেদিগকে ইউরোপ আমেরিকার এজেন্টগিরি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং তাহাদিগকে ডাক্তার নামে অভিহিত করিয়া তাহাদের দ্বারা জনসাধারণের শুধু যে, পয়সা লুটিয়া নিয়া তাহাদিগকে নিঃস্বই করা হইতেছে তাহা নহে; বরং তাহাদের দৈহিক স্বাস্থ্যও নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। তাহাদের মনের বল ও জ্ঞানের বল উভয়ই কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। দরিদ্র ও সরল জনসাধারণ ঔষধের অতিরিক্ত ব্যয়বহুলতার কারণে এবং ডাক্তারদের দুর্ব্যবহারের কারণে বাধ্য হইয়াই সূতা পড়া, পানি পড়া বা তাবীয তুমারের উপর নির্ভর করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে।

আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমাদের দেশীয় গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ শিক্ষা দেওয়া উচিত। হেকিমী ও কবিরাজী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত ছিল। এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এব্যাপারে তাহাদের দায়িত্বজ্ঞান যত তাড়াতাড়ি উদয় হইবে, ততই জাতির পক্ষে অধিক মঙ্গলকর হইবে।

আমাদের শরী'অতে মোকাদ্দাসার বিধান অনুযায়ী চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করা ফরযে-কেফায়া এবং রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করা সুন্নতে মোআক্কাদাহ্। কিন্তু সু-চিকিৎসা কিছুতেই হইতে পারে না, যে পর্যন্ত না চিকিৎসক যেমন একদিকে হইবেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ও শাস্ত্রে পারদর্শী, তেমনি অপর দিকে হইবেন খোদাভীরু, ধার্মিক ও সত্যবাদী, দায়িত্বজ্ঞানশীল—অন্য কথায় মানুষের সেবাই হইবে তাঁহার জীবনের ব্রত ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং তাঁহার মা'বুদ একমাত্র খোদা; অর্থের জন্য তাঁহার লালসা হইবে না বিন্দুমাত্রও।

ওয়াযের মাহ্‌ফিল

ইসলামী আদর্শ, ইসলামী আহ্‌কাম, কোরআনের আদেশ-নিষেধ ও রাসূলের সুন্নত তরীকা সাধারণভাবে প্রচার করার জন্য, সমস্ত অধঃপতন ও দুর্নীতির মূল কারণ যে আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া থাকা, আখেরাতকে ভুলিয়া থাকা ও দুনিয়ার মোহে মত্ত হইয়া যাওয়া, সেই মূল কারণকে দূর করিয়া আল্লাহ্‌র মহব্বত পয়দা করার জন্য, আখেরাতের বিচার ও হিসাবকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য এবং দুনিয়ার মায়া-মহব্বত মোহমত্ততা কমানের জন্য মাঝে মাঝে ওয়াযের মাহ্‌ফিল করার দরকার—একান্ত দরকার।

কিন্তু শুধু সুমধুর স্বর, সুন্দর ভাষা ও মার্জিত বর্ণনা পদ্ধতি হইলেই চলিবে না; বরং যিনি ওয়ায করিবেন তাঁহার নিম্নলিখিত গুণগুলির অধিকারী হইতে হইবে—(১) আঞ্চলিক ভাষার উপর আধিপত্য এবং বর্ণনা ভঙ্গীর মাধুর্য, কোরআন হাদীসে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। কোরআন হাদীসের পারদর্শী ইমামগণ কোরআন হাদীস হইতে ইজতেহাদ করিয়া যে সব মাসআলা মাসায়েল (সূত্র, ধারা উপধারা এবং তত্ত্বজ্ঞান) বাহির করিয়া ফেকাহ্, তাসাওওফ ও আক্কায়েদের কিতাব লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানে মোটামুটি অধিকারী হইতে হইবে। (২) আবার শুধু জ্ঞানের অধিকারী হইলেও চলিবে না; বরং তদনুযায়ী নিজ নিজ আক্কায়েদ-আ'মাল ও আখ্‌লাককেও গঠন করিতে হইবে; কথায় ও কাজে মিল থাকিতে হইবে। কুফর, শিরক ও বেদ'আত হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। নামায রোযার পূর্ণ পাবন্দ হইতে হইবে, লেবাসে ও ছুরতে-সীরাতে সুন্নতের পাবন্দ হইতে হইবে। লেনদেন পরিষ্কার রাখিতে হইবে। চালচলন আচার-ব্যবহার সুন্দর হইতে হইবে; গরীবদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না। টাকা-পয়সার প্রতি আদৌ লোভ থাকিতে পারিবে না। দ্বীনের খাতিরে বা দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য জানের, মালের বা নিজের সম্মানের ক্ষতিরও পরওয়া করা চলিবে না। দুনিয়ার জিন্দেগীর চাইতে আখেরাতের জিন্দেগীকেই সবচেয়ে বড় মনে করিতে হইবে। আল্লাহ্‌র মহব্বত, আল্লাহ্‌র ভয় এবং নম্র স্বভাব এখ্‌তিয়ার করিতে হইবে। এইরূপ আলেমের ওয়াযই ইংরেজী শিক্ষিত, আরবী শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেই শুনিবে। সকল রকম বক্তৃতার পিছনেই দৌড়ান ঠিক নহে।

ওয়াযের দ্বারা ধর্মের সাধারণ জ্ঞান লাভ হইবে এবং সাধারণভাবে দ্বীনদারী, পরহেযগারী ও ঈমানের মজবুতীও হাছিল হইবে। কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানেরই দরকার আছে, খাছভাবে একজন

খাঁটি যোগ্য নায়েবে রাসূল তালাশ করিয়া বাহির করিয়া তাঁহার কাজে নিজের ভিতরকার সব দুর্বলতার কথা গোপনে প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার ছোহ্‌বতে থাকিয়া তাঁহার আদর্শ চরিত্র, আদর্শ জয্‌বা ও আদর্শ ঈমান মোতাবেক নিজের জীবনকেও তদ্রূপ গঠন করা। আল্লাহ্‌র সঙ্গে মযবুত তা'আল্লোক আপনাআপনি পয়দা হয় না। শুধু কিতাব পড়িলেও হয় না বা শুধু ওয়ায শুনিলেও হয় না; বরং যোগ্য কামেল নায়েবে রাসূলের নিকট বার বার যাতায়াত করিয়া, তাঁহার কাছে থাকিয়া, বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজের ভিতরকার অবস্থাদি জানাইয়া, কিছু শয়তানের সঙ্গেও মুজাহাদা করিয়া তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী আমল করিয়াই আল্লাহ্‌র সঙ্গে তা'আল্লোক পয়দা করিতে হয় এবং জীবনভর গুণগুলিকেই বেশী মর্যাদা দিতে হয়। আজকাল এক রকম তা'বীযের ব্যবসায়ী পীর এবং ব্যবসায়ী ওয়ায়েয বাহির হইয়াছে, যাহারা বংশানুক্রমে আয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইহারা সুন্নতের কোন পায়রবী করে না, শরী'অতেরও কোন পরওয়া করে না। এই প্রকার ব্যবসায়ী পীরদের কাছেও যাওয়া চাই না; বরং সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকিলে ধর্মের নামে এই ধরনের ধোঁকাবাজিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই ধরনের জাল নোটই দুনিয়াতে খুব বেশী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আসল নোটের সন্ধান না করিলে, তার মর্যাদা না করিলে, সেটা হইবে ঘোর অন্যায় এবং ঘোর বোকামি। যিনি খাঁটি নায়েবে রাসূল, খাঁটি পীর হইবেন, তাঁহারও এক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ হইতে হইবে, যাহারা দ্বীনের উন্নতি চায়, নফ্‌সের এছলাহ্‌ করিতে চায়, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তা'আল্লোক মযবুত করিতে চায়, দুনিয়ার মহব্বত কমাইয়া আখেরাতের কাজ কিছু করিতে চায়, আখলাকের উন্নতি ও চরিত্র গঠন করিতে চায়, ধৈর্য সহকারে তাহাদের জন্যও কিছু সময় দান করিতে হইবে। ইহা কোনরূপ নিছক দয়া নহে; বেকারের নামমাত্র কাজও নহে; বরং ইহা রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সুন্নত—অতি বড় সুন্নত। ইহা না থাকিলে লোকের তালীম তরবিয়াত হইবে কেমন করিয়া? ইসলামের সেই উন্নতির যুগে বাদশাহ্‌-উযির, শাসক-বিচারক, শান্তি-রক্ষক পুলিশ, বণিক, কৃষক সকলেই নিজে আলেম হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ কামেল নায়েবে রাসূলের নিকট হইতে তরবিয়াত গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের বা অন্যান্য কাজ চালাইতেন। ঐ শ্রেণীর আলেমগণ নিজেরা রাষ্ট্রীয় কাজে থাকিতেন না; বরং জনগণেরই খেদমত করিতেন।

বস্তুতঃ ইহাই নেযামে খানকাহীর, পীর-মুরীদীর বা তাসাওওফের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু পরে ধোঁকাবাজ ও দুনিয়া লোভীরা সব কিছুই বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যেহেতু দ্বীন ইসলামের হেফাযতের ভার নিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং যেহেতু নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেনঃ

لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِىْ قَوَّامَةً عَلٰى اَمْرِ اللهِ لَايَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا (ابن ماجة)

[ইহার সারমর্ম এই যে, আমার উম্মতবৃন্দ হইতে ছোট হইলেও একটি দল নিশ্চয়ই হকের উপর কায়েম থাকিবে; ধোঁকাবাজদের ধোঁকাবাজিতে, দুষ্টদের টিটকারীতে বা সাহায্য বন্ধকারীদের সাহায্য বন্ধ করাতেও তাহাদের টলাইতে বা বিগ্‌ড়াইতে পারিবে না।] এইজন্য কিছু লোক হকের উপর নিশ্চয়ই আছে, কাজেই তালাশ করিয়া তাহাদিগকে বাহির করিতে হইবে ও তাহাদের দ্বারা কাজ নিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সত্যিকার মহৎলোক যখন সর্বদাই ছিল, যখন খাঁটি ইসলামী খেলাফত ছিল বা সমাজ ব্যবস্থা মোটামুটি ইসলামী ছিল, তখন এই সকল লোকদের মহান মর্যাদা দান করা হইত। বস্তুতঃ এই মর্যাদা দেখিয়াই পরবর্তী যুগে একদল ধোঁকাবাজ জন্মিয়াছে। ফলে

ধোঁকাবাজদের হাতে ধোঁকা খাইয়া জনসাধারণ এখন খাঁটি অখাঁটির তারতম্য না করিয়া সকলেরই অমর্যাদা করিতে শিখিয়াছে; তবে জনসাধারণ তারতম্য করিতে শিখিলে, এই ধরনের ধোঁকাবাজদের রুযি-রোযগার বা খাওয়া পরা চলিবে কি করিয়া?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, শঠতা, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা দিয়া যাহারা সরল প্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে, তাহারা গোটা জাতির তথা ইসলামের—অন্য কথায় আল্লাহ্‌র শত্রু। তাহাদের রুযি-রোযগারের চিন্তায় ব্যাপৃত হওয়া কোন মুসলমানের জন্যই জায়েয হইতে পারে না। 'আবার এই ধোঁকার ভয়ে সত্য অসত্য বা খাঁটি অখাঁটি বাছাই না করিয়া কাহারো নিকট না গেলে, যাঁহারা খাঁটি আছেন তাঁহাদের রুযির অবস্থাই বা কি হইবে? এমন প্রশ্নও হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, যাঁহারা খাঁটি তাঁহারা রুযির জন্য কোন বান্দার উপর কখনও নির্ভর করেন না! দ্বিতীয়তঃ, মুসলমনেরা কখনো এতদূর বোকা হইতে পারে না যে, ধোঁকার ভয়ে তাহারা সত্যকে এবং খাঁটিকেও বাছাই করা এবং তাহার দ্বারা উপকৃত হওয়াকে ত্যাগ করিবে। অখাঁটিকে বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে এবং যাঁহারা খাঁটি তাঁহাদের যথোচিত মর্যাদা দিতে হইবে।

ধর্ম রক্ষার জন্য কয়েক প্রকার ব্যবস্থা রহিয়াছেঃ (১) মক্তব, (২) মাদ্রাসা, (৩) মা'হাদ, (معهد) (৪) খানকাহী তরবিয়াত, (৫) জামে'আহ্, (৬) ওয়ায-নছীহতের মজলিস, (৭) তাবলীগ, (৮) তা'লীফ-তাছনীফ, (৯) তানযীম, (১০) তফসীরের মজলিস, (১১) সীরাতুন্নবীর মজলিস, (১২) দারুল-ইফ্‌তা, (১৩) দারুল-হাদীস, (১৪) রদ্দে-নাছারা, রদ্দে-কাদিয়ানী, রদ্দে-কুফর ও শেরক ও রদ্দে-কমিউনিষ্ট, (১৫) মসজিদ ইত্যাদি।

(১) মক্তব—যেখানে কায়দা, ছিপারা ও কোরআন শরীফ শুদ্ধ করিয়া পড়ান হয় এবং ধর্মের প্রাথমিক শিক্ষা বেহেশ্‌তী জেওর পর্যন্ত অর্থাৎ কলেমা, নামায, রোযা, ওযূ-গোসল, জুমু'আর খুৎবা, জানাযার তরীকা, বিবাহের খুৎবা, মোটামুটি হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, জায়েয-নাজায়েয ও বেহেশ্‌ত-দোযখের বয়ান ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) মাদ্রাসা—যেখানে কোরআন, তফ্‌সীর, হাদীস, ফেক্‌হ্, তাছাওওফ, আক্বা'য়েদ ইত্যাদি আরবী ভাষায় ব্যাকরণ ও মোহাবারাসহ শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৩) মা'হাদ—যেখানে তাহ্‌কীকাত (Research—গবেষণা) শিক্ষা দেওয়া হয় এবং শিক্ষক ও মোবাল্লেগদের তরবিয়াত (Training) দেওয়া হয়।

(৪) জামে'আ—যাহার অধীনে আরো অনেক মাদ্রাসা থাকে।

(৫) খানকাহ—যেখানে কোরআন হাদীসের শিক্ষাকে আমলে পরিণত করা হয় এবং তদনুযায়ী চরিত্র গঠন করা হয়।

(৬) মসজিদ—যেখানে এবাদত-বন্দেগী করা হয় এবং ইসলামী বিষয়সমূহের পরামর্শ সভা করা হয়। এই সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয। আর হুকুমত (বা সরকার) ইসলামী হইলে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারই এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যেহেতু আমাদের হুকুমত ইসলামী নয়; সেজন্য এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার কাজে মুসলমানদের যাকাত, খয়রাত ও দানের পয়সা খরচ হওয়াই সবচেয়ে বেশী জরুরী এবং সবচেয়ে অধিক নেকীর কাজ।

জায়গীর

দীর্ঘ দুইশত বৎসর যাবৎ ইসলামের পরম দুশমন ইংরেজগণ আমাদের দেশ শাসন করিয়া যে বিষফলের বীজ বপন করিয়া গিয়াছে তার মধ্যে সবচাইতে অধিক মারাত্মক ও ধ্বংসকর বিষফল হইতেছে এই যে, তাহারা ধর্মহীন কুশিক্ষার ধারা চালু করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ফলে যে মুসলমানগণ একদিন ধর্মের জন্য আখেরাতের সওয়াবের জন্য জীবনের অনেক কাজ করিতে অভ্যস্ত ছিল, সেই সওয়াবের কাজ করা এখন ভুলিয়া গিয়াছে। এখন তাহারা সর্বকাজেই দুনিয়ার হীন স্বার্থকেই খুব বড় করিয়া দেখে। তাহারা এখন বিদ্যা শিখে চাকুরীর জন্য বা পয়সা উপার্জনের জন্য। ডাক্তার গরীব রোগীকে ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দেয়, উকীল গরীব মযলুমকে পরামর্শ দেয়, শিক্ষক ছাত্রকে পড়ায়—এসব তাহারা শুধু টাকার জন্যই করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের এমন দিন ছিল, যেদিন মুসলমানেরা এইসব শুধু গরীবের উপকারের জন্য তথা আখেরাতের সওয়াবের জন্য করিতে অভ্যস্ত ছিল।

শুনিয়াছি, লণ্ডনের মহাসভ্য ব্যক্তিরা ছাত্রদিগকে বাড়ীতে জায়গীর রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা লয়, ব্যবসা করে এবং তাহাদের বলা হয় Paid guest বা টাকার অতিথি। সৌভাগ্য-বশতঃ আমাদের দেশে এখনও মেহ্‌মানদের কাছ থেকে বা জায়গীর ছাত্রদের কাছ থেকে, টাকা লওয়ার প্রথা চালু হয় নাই। অবশ্য যাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য বর্বরতা বনাম সভ্যতা বেশী ঢুকিয়াছে তাহারা দ্বীনি-এল্‌মের সাহায্যার্থে মাদ্রাসার ছাত্র জায়গীর রাখা ছাড়িয়া দিয়াছে। এই প্রথা ইসলামের আদি হইতেই চলিয়া আসিতেছে যে, কতক লোক আল্লাহ্‌র দ্বীনের উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য বাড়ী-ঘর ত্যাগ করিয়া বিদেশে বাহির হইয়াছে এবং সেখানে মুসলমানগণ রাসূলের এই মেহ্‌মানদিগকে আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশ্যে থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আজও যেসব মুসলমান খৃষ্টান সভ্যতার (!) দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, তাঁহারা তালেবে এল্‌ম ছাড়া ভাত খাওয়াকে আল্লাহ্‌র রহমত উঠিয়া যাওয়া মনে করে। কোরআন হাদীসের এল্‌ম তথা এল্‌মে দ্বীনের শিক্ষার্থী তালেবে এল্‌মদিগকে রাসূলের খাছ মেহ্‌মান মনে করিয়া শুধু সওয়াবের নিয়তেই বাড়ীতে স্থান দেওয়া, দুনিয়ার কোন স্বার্থে নহে; বরং শুধু আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশ্যেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াকে বলা হয় জায়গীর। ইহা একটি সুন্দর ব্যবস্থা, কারণ তালেবে এল্‌মদের থাকা-খাওয়ার মোট তিন প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে। যথা— (১) বাড়ীতে থাকিয়া খাওয়া ও পড়া, (২) বোর্ডিংয়ে থাকিয়া খাওয়া-পড়া ও (৩) জায়গীরে থাকিয়া খাইয়া পড়া। এই তিন প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে—সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে জায়গীর ব্যবস্থা। কেননা, বাড়ীতে থাকিয়া পড়িতে গেলে পড়ার মধ্যে অনেক বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়। আর বোর্ডিংয়ে থাকিতে গেলে খরচ অনেক বেশী, যাহা অনেকের পক্ষে অনেক সময় বহন করাই সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে জায়গীর থাকিলে একদিকে (১) জায়গীরওয়ালার বাড়ী দ্বীনি-এল্‌মের চর্চায় আলোকিত হয়। (২) জায়গীরওয়ালা দ্বীনের খেদমত করিয়া ছদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাছিল করে; অথচ যে পরিবারে ৪/৫ জন লোক আছে সেই পরিবারে একজন তালেবে এল্‌মের খোরাকের জন্য

পৃথক কোন ব্যয় করিতে হয় না। (৩) গরীবদের ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা শুধু এই জায়গীরের ব্যবস্থাদ্বারাই সম্ভবপর। (৪) যে তালেবে এল্‌ম জায়গীরে থাকে, তাহার এল্‌ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সেবারও অভিজ্ঞতা জন্মে এবং অনেক নৈতিক চরিত্র সে আয়ত্ত করিতে পারে।

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের বাড়ীতেই অবশ্য অবশ্য একজন তালেবে এল্‌ম রাখা একান্ত দরকার এবং নিয়ত খালেছ করিয়া একমাত্র আখেরাতের সওয়াবের নিয়তেই রাখা আবশ্যক। আজকাল ইসলামী শিক্ষা বাদ দিয়া, ইসলামী শিক্ষা লাভের ফরয তরক করিয়া যাহারা ধর্মহীন শিক্ষা লাভ করে, তাহারাও অনেকে জায়গীর খোঁজে। কিন্তু মুসলমানদের জানিয়া রাখা দরকার যে, জায়গীর রাখার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে সওয়াব হাছিল করা। আর সওয়াব হাছিল হইবে ধর্মবিদ্যা শিক্ষার্থী তালেবে এল্‌মদের সাহায্য করিলে। কিন্তু যাহারা ধর্মহীন শিক্ষা লাভ করে তাহারা টাকার জন্যই পড়ে। এই টাকার লালসা তাহাদের এত স্পষ্ট যে, ওকালতি ডাক্তারী প্রভৃতি করিবার সময় তাহারা টাকা ছাড়া কাজ করে না এবং তাহারা বলেও যে, আমরা টাকার জন্যই পড়িয়াছি এবং টাকা খরচ করিয়াই পড়িয়াছি, অতএব, আমরা টাকা ছাড়া কাজ করিতে পারিব না। এই ধরনের শিক্ষার্থীদিগকে সাহায্য করিয়া আখেরাতের সওয়াব পাওয়ার আশা করা একেবারেই বৃথা।

আজকাল ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত শিক্ষার প্রভাবে এবং তৎসঙ্গে খৃষ্টানী বর্বরতামূলক, তথাকথিত সভ্যতার তাসীরে অনেক নব্যশিক্ষিত যুবক ইসলাম ধর্মের সত্য সনাতনতা অস্বীকারপূর্বক উহা ত্যাগ করিয়া বসিতেছে এবং ইসলাম বিরোধী নাচ, গান, বাদ্য, বাজনা, থিয়েটার, সিনেমা, বেহায়ানা, বেপর্দা পভৃতি চরিত্রহীনতামূলক অনেক কাজ করিতেছে। এ সমস্ত ইসলাম বিরোধী কাজ হইতে মুসলমানদের নিজেরও বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদিগকেও বাঁচাইয়া রাখা দরকার। শুধু তাহা নহে, নিজ নিজ সমাজকেও এ সময় চরিত্রনাশক কার্য হইতে পবিত্র রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। মুসলমানদের দুনিয়াবী উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সব সময় খেয়াল রাখা দরকার, যেন তাহাদের ধর্ম নষ্ট না হয় এবং আখেরাতের মঙ্গলজনক কার্য নষ্ট না হয়।

সমাজ বন্ধন

লোকে সাধারণতঃ ভাল বা মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকে তিন কারণে—(১) খোদার ভয়ে, (২) সমাজের চাপে, (৩) আইনের ভয়ে।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার ছাহাবায় কেরাম (রাঃ) এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা দুনিয়াতে চালু করিয়াছেন, যাহাতে পরস্পর সমবেদনা, সহানুভূতি ও হামদর্দি বিদ্যমান ছিল। একজনকে মন্দ কাজ করিতে দেখিলে সকলে তাহাকে নিষেধ এবং বারণ করিত। ভাল কাজ হইতে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিলে সকলেই তাহাকে উক্ত ভাল কাজ করিবার জন্য আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিত। কেহ বিপদে পতিত হইলে সকলেই তাহার প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিত ও তাহার বিপদ মোচনে সাহায্য করিত। কেহ সম্পদশালী হইলে সকলেই তাহাতে খুশী হইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বৃটিশ শাসনের বিষফলস্বরূপ এখন আর আমাদের সমাজে সেই সুন্দর সমাজ বন্ধন নাই। ইসলাম ধর্মের প্রধান একটি ফরয এবং বড় একটি শিক্ষা হইতেছে 'আম্‌র বিল-মারূফ' ও 'নেহী আ'নিল মুন্‌কার'

অর্থাৎ, সৎকাজের আদেশ ও উৎসাহ প্রদান এবং মন্দকার্য হইতে নিবৃত্তকরণ। অথচ ইংরেজদের স্বভাব হইতেছে 'Oil your own machine' "নিজের চরকায় তেল দাও"।

সীরাতে পাক

আল্লাহ্ তা'আলা শেষ যুগে মানুষের হেদায়তের জন্য শুধু একখানি কিতাব 'আল-কোরআনুল করীম' পাঠাইয়া ক্ষান্ত হন নাই; বরং সঙ্গে সঙ্গে একজন অনুপম পূতচরিত্র মহামানবকে রাসূল বানাইয়া তাঁহার দ্বারা কোরআনের নির্দেশগুলিকে সুষ্ঠুভাবে প্রচার করার এবং উহার উদ্দেশ্যগত অর্থসমূহ পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, অন্যথায় কোরআনের ব্যাপকার্থক ভাষায় বিরূপ অর্থ করিয়া লোকে বিপথগামীও হইতে পারিত। এই কারণেই নিষ্পাপ ও পূতচরিত্র রাসূলের দ্বারা কোরআনের নির্ভুল অর্থ করাইয়া নিখুঁত আদর্শ কায়েম করিয়াছেন।

অতএব, রাসূল (দঃ)-এর জীবন চরিত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করা, শ্রবণ করা, আলোচনা করা এবং গবেষণা করা প্রত্যেকটি মানুষেরই একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ্‌কে ভালবাসিতে এবং তাঁহার ভালবাসা লাভ করিতে সকলেই চায়। আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার একমাত্র উপায় তাঁহার রাসূলকে ভালবাসা এবং প্রমাণস্বরূপ রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইহধামে জীবন যাপন করা। এই কথা কোরআন শরীফেও আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিয়াছেনঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ○

"হে রাসূল! আপনি মানুষকে বলিয়া দিন—'যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ভালবাসা কামনা কর, তবে আমাকে ভালবাসিয়া আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চল, ইহাতেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।"

এসম্বন্ধে হাদীস শরীফেও আছেঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

"হে মানবজাতি! তোমরা কেহই ঈমানদার বলিয়া গণ্য হইবে না, যাবৎ না তোমরা নিজেদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পুত্র, রাজা-বাদশাহ্, আমীর-ওমারা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী প্রভৃতি সমস্ত মানবজাতি অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক ভালবাসা দেখাইতে না পারিবে।" কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত, কার্যাবলী, গুণাবলী, ঈমানের দৃঢ়তা, এবাদত বন্দেগীতে খোদা-প্রেমের অনুপম ভাবাবেগ, লেন-দেন ও কাজ-কারবারের মধ্যে অতুলনীয় আমানতদারী, ওয়াদা প্রতিপালন, আচার-ব্যবহারে ভিতর এবং বাহির উভয় দিকেই নির্মলতা, স্বভাবের নম্রতা, ভদ্রতা ও উদারতা, প্রাণঘাতী শত্রুর বেলায়ও ইন্‌ছাফ এবং ন্যায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন সম্বন্ধে শুধু তাঁহার কথার উপদেশগুলিই নয়; বরং তাঁহার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তিনি যে সমস্ত কার্যকরী আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যে পর্যন্ত তৎসম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞানলাভ করা না যাইবে—সে পর্যন্ত তাঁহার প্রতি ভালবাসা এবং তাহার প্রকৃত অনুসরণ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং রাসূল (দঃ)-এর জীবনী আলোচনা করা একান্ত দরবার। রাসূলের জীবনী আলোচনার

মজলিসকে কেহ “সীরাতে পাকের মজলিস” বলে, কেহ মৌলুদ শরীফ বয়ানের মাহ্‌ফিল বলে, কেহ বা মাহ্‌ফিলে মিলাদ বলে, আসল উদ্দেশ্য একই—ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। ইহা অত্যন্ত জরুরী।

মুসলমানদের ঘরে ঘরে এবং দোকানে দোকানে শুধু বৎসরে এক আধবার নয়, শুধু রবিউল আউয়ালের চাঁদে নয়, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে এই পবিত্র মাহ্‌ফিলে মিলাদের অনুষ্ঠান হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সমাজের অজ্ঞতা এবং মূর্খতা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। মাহ্‌ফিলে মিলাদ সম্বন্ধে বড় বাড়াবাড়ি এবং ঝগড়া বিতর্ক হইতেছে। ঝগড়া ফাসাদের বিতর্কের বাড়াবাড়ি ত্যাগপূর্বক, এই পবিত্র মাহ্‌ফিলের অনুষ্ঠান সর্বত্র হওয়া দরকার। সংক্ষেপের চেয়েও সংক্ষেপেও এই মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হইতে পারে। হয়ত হুযূরের কর্মময় জীবন ধারা সম্পর্কীয় একখানা হাদীস পড়িয়া বুঝাইয়া দিয়া এবং দুরূদ ও সালাম পাঠ করিয়া মাহ্‌ফিল শেষ করা যাইতে পারে। সমগ্র হাদীস গ্রন্থগুলিই রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর জীবন চরিত, সে অনেক লম্বা। যেখানে সদাসর্বদা হাদীস পাঠ ও শ্রবণ অনুষ্ঠিত হইতেছে সদা-সর্বদা হুযূরের প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করা হইতেছে, সেখানে খাছ মিলাদের মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠানের কোন দরকার নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, যেখানে কোরআনের ও আল্লাহ্‌-রাসূলের আলোচনা হওয়ার সুযোগ মোটেই হয় না, সেখানে খাছ সীরাতে পাকের মজলিস বা মাহ্‌ফিলে মিলাদ নাম দিয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহা বেদ'আত হইবে—কখনও নহে। আবার কেহ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ মনে করেন, আগর বাতি জ্বালাইয়া সাজসজ্জা ও আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠান করিয়া খাড়া হইয়া দুরূদ ও সালাম না পড়িলে সেটা মৌলুদ শরীফের বয়ান হইল না—এটাও ভুল ধারণা।

প্রিয় মুসলিম ভাইগণ! আমার উপর খারাব ধারণা করিবেন না। আমি বেদআতিও নই, ওয়াহাবীও নই। আমি একজন গুনাহ্‌গার, আপনাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নগণ্য খাদেম—মুসলমান। আমি নিতান্ত ব্যথা ভরা অন্তর নিয়া আপনাদের খেদমতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি—আপনারা এই “ওয়াহাবী বেদ'আতির” ঝগড়া ও মারামারি ছাড়ুন। খবরদার! খবরদার!! উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করিবেন না। সকলেই আমরা মুসলমান। সকলেই নিজ নিজ দোষ-ত্রুটি সংশোধন কাজে ব্যাপৃত থাকুন এবং সকলে একতাবদ্ধ হইয়া ইসলামের খেদমতের কাজে এবং ইসলামের দুশ্‌মনদের প্রতিরোধ কার্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে মনোনিবেশ করুন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, ছাহাবায়ে কেরামের জীবনী, পূর্ব যুগের আম্বিয়া কেরামের, আউলিয়াগণের জীবনী অতি মাত্রায় আলোচনা করুন। তাহাই হইবে প্রকৃত মিলাদ মাহ্‌ফিল। কিন্তু অনেকে মিলাদ মাহ্‌ফিলে বিনা তহ্‌কীকে বাজে ও মিথ্যা 'মাউযূ' রেওয়ায়ত পাঠ বা আলোচনা করিয়া বাক চাতুর্য দেখাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হইতে বাহ্‌বা আদায় করিয়া থাকে। মনে রাখিবেন, শয়তান চির-সজাগ, ইসলামের শত্রু দুনিয়াতে আবহমানকাল হইতে আছে ও থাকিবে। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন, আপনাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণপূর্বক শয়তান শত্রুদল ঈমানের সর্বনাশ না ঘটায়। মাউযূ রেওয়ায়তগুলি শয়তানের প্ররোচনায় ইসলামের শত্রুদের কর্তৃক রচিত—হাদীসের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আসল দামী জিনিসের নকল খুব বেশী হইয়া থাকে। কাজেই শত্রু হইতে এবং নকল জিনিস হইতে সদা সতর্ক থাকা দরকার।

মাদ্রাসার জন্য চাঁদা গ্রহণ

মাদ্রাসা এমন একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান—যেখানে কোরআন-হাদীস শিক্ষা দেওয়া হয়। ইসলাম ধর্মের ভিত্তি যেহেতু অন্যান্য ধর্মের মত শুধু পুরাতন প্রথার উপর নয়, বরং আল্লাহ্‌র প্রেরিত সত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার কোরআন-হাদীসের উপর এবং এই কোরআন ধারাবাহিক শিক্ষা ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে না; কাজেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান কায়েম রাখা সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয। একটি ফরয কাজে দায়িত্ব পালন ছাড়াও একটি নফল কাজ অপেক্ষা ৭০ গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের জন্য চাঁদা দিয়া সাহায্য করা সমস্ত মুসলমানের উপর একান্ত কর্তব্য।

যাবৎ ইসলামী হুকুমত কায়েম ছিল, হুকুমতের 'বায়তুল মাল' হইতে মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ বহন করা হইয়াছে। শুধু ঘর দরজা ও আসবাব-পত্রের খরচ নয়, শুধু মুদাররেসগণের খরচ নয়, শুধু কিতাব-পত্রের খরচ নয়, তালেবে এলেমদের যাবতীয় ব্যয়ভার বায়তুল মাল হইতেই বহন করা হইয়াছে। তারপর যখন খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ধূর্তামির সামনে এবং তাহাদের স্নায়ুযুদ্ধের সামনে মুসলমানগণ টিকিয়া থাকিতে না পারায় মোঘল সাম্রাজ্যের পতন হইল, তখনও মুসলমানগণ ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ওয়াক্‌ফ, যাকাত, ছদকা খয়রাতের মাল জমা করিয়া মাদ্রাসা ফান্ড গঠনপূর্বক মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ধরনের মাদ্রাসাগুলি কওমী মাদ্রাসা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই কওমী মাদ্রাসাগুলির বিশেষত্ব এই যে, এই ধরনের মাদ্রাসায় যাহারা শিক্ষা লাভ করিবে তাহাদের (১) চাকুরীর মনোবৃত্তি গঠিত হইবে না। (২) সমাজ সেবার ও ধর্ম-প্রচারের মনোভাবই উৎপন্ন হইবে। তাহারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নেকী ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে আজীবন কওমের ও ধর্মের সেবা ও খেদমত করিয়া যাইবে। (৩) তাহারা ইসলামের বিধানাবলী পূর্ণরূপে শিক্ষা লাভ করিবে। নিমমোল্লা বা নামে মাত্র পাগড়ীধারী আলেম হইবে না, পূর্ণ আলেম হইবে। (৪) তাহারা চরিত্রহীন হইবে না। তাহারা পাশ্চাত্য খৃষ্টানী প্রভাবে প্রভাবিত হইবে না। তাহারা ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান হইবে। তাহারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে এবং ইসলামী তাহ্‌যীব, তমদ্দুন ও সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

অতএব, এহেন মহান কাজের জন্য যাঁহারা চাঁদা দান করিবেন, তাঁহারা ছদকায়ে জারিয়া কায়েম করিয়া অফুরন্ত পুণ্যের অধিকারী হইবেন। আর যাহারা এ সমস্ত কওমী মাদ্রাসাগুলির জন্য খালেছ দ্বীনী-এলমের উন্নতির নিয়তে চাঁদা আদায়ের কাজ করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দাতাগণের সমপরিমাণ ছদকায়ে জারিয়া কায়েম করত মহাপুণ্যের কাজ করিবেন। ইসলামের ও দ্বীনী-এল্‌মের শত্রুরা এহেন মহৎ কাজকেও যিল্লতির কাজ, আরবী শিক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষা, আরবী মাদ্রাসার জন্য চাঁদা আদায় করা ভিক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নহে ইত্যাদি নানারূপ প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা সমাজের সরলপ্রাণ মুসলমানদের ভিতর বিরূপ আছর ঢুকাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ নিজের জন্য ভিক্ষা করা অবশ্যই যিল্লতির কাজ। কিন্তু কওমের জন্য এবং ধর্মের জন্য চাঁদা আদায় করা

যিল্লতির কাজ নহে। অবশ্য চাঁদা আদায়কারীর নিয়ত, আমল-আখলাক এবং কার্যপদ্ধতি নির্মল ও খাঁটি থাকা আবশ্যক।

দানের ফযীলত

১। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ দান কর, হে মানব সন্তান! আমিও তোমাকে দান করিব। —বোখারী ও মোছলেম

২। হযরত আয়েশার ভগ্নী হযরত আছমা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে বলিয়াছেনঃ দান করিবে, মালের হিসাব-নিকাশ করিবে না, তাহা হইলে আল্লাহ্ও তোমাকে দিতে হিসাব-নিকাশ করিবেন না। ধরিয়া রাখিবে না, তাহা হইলে আল্লাহ্ও তোমার ব্যাপারে ধরিয়া রাখিবেন না। নিজের শক্তি অনুযায়ী দান করিবে। সামান্যই হউক না কেন।

—বোখারী, মোছলেম

৩। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, যুলম-অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা, উহা কিয়ামতের দিন অন্ধকারস্বরূপ হইয়া তোমাকে গ্রাস করিবে। আর কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা, তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদিগকে কৃপণতা ধ্বংস করিয়াছে। উহা তাহাদিগকে পরস্পরের রক্ত বহাইতে এবং হারামকে হালাল করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। —মোছলেম

৪। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ দানে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়? হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যখন তুমি সুস্থ থাক, মালকে ভালবাস, দারিদ্র্যকে ভয় কর এবং তওয়াংগরীর আশা রাখ, তখনকার দানে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়; দানে বিলম্ব করিও না তাবৎ, যাবৎ তোমার প্রাণ হলকুমে পৌঁছে, আর তুমি বলিতে থাকঃ অমুককে এটা দিবে, অমুককে ওটা দিবে। অথচ এই মাল তখন অন্যের হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইবার পূর্বেই দান করিবে, যখন তুমি মালের প্রতি মোহ্তাজ থাকিবে। ইহাতে অধিক সওয়াব রহিয়াছে।

—বোখারী ও মোছলেম

৫। হযরত আবুযর গেফারী (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম, তখন তিনি খানায়ে কা'বার ছায়ার বসা ছিলেন। তখন আমাকে দেখিয়া বলিলেনঃ তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত—আমি রব্বে কা'বার কছম করিয়া বলিতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ হুযূর আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবান যাক্ঃ তাহারা কাহারা? হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যাহাদের মাল বেশী আছে তাহারা। অবশ্য যে ব্যক্তি আগে-পিছে ও ডানে-বামে দান করিবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত নহে। কিন্তু এইরূপ লোক কমই।

—বোখারী ও মোছলেম

৬। হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্রও নিকটে, বেহেশ্তেরও নিকটে এবং মানুষেরও নিকটে; আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ হইতেও দূরে, বেহেশ্ত হইতেও দূরে, মানুষ হইতেও দূরে, অথচ দোযখের নিকটে। একজন মূর্খ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট একজন এবাদতকারী কৃপণ দরবেশ হইতে নিশ্চয়ই অধিক প্রিয়। —তিরমিযী

৭। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি মউতের বিছানায় শুইয়া দান করে বা গোলাম আযাদ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজে পেট ভরিয়া খাওয়ার পর অতিরিক্ত খাদ্য অন্যকে দান করে। —নাছায়ী, দারেমী ও তিরমিযী

৮। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি হালাল রুযী হইতে একটি খেজুর পরিমাণ মালও দান করে, আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে নিজের ডান হাতে কবূল করেন এবং উহাকে তাহার জন্য বাড়াইতে থাকেন, যেভাবে কোন ব্যক্তি আপন ঘোড়ার বাচ্চাকে পরওয়ারিশ করিয়া বাড়াইতে থাকে। এমনকি তাহার সেই সামান্য দান পাহাড় পরিমাণ হইয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা হালাল ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না। —বোখারী ও মোছলেম

৯। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ দান কাহারো মালকে কমায় না। ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ্ কাহারো সম্মানকে বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস করেন না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে নিজকে ছোট মনে করে, আল্লাহ্ তাহাকে বড় করেন। —মোছলেম

১০। হযরত ফাতেমা বিন্তে কাইস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, যাকাত ব্যতীতও মালে মানুষের হক রহিয়াছে। —তিরমিযী

ওস্তাদ-ভক্তি ও ওস্তাদের খেদমত

ওস্তাদকে ভক্তি করা, ওস্তাদের সন্নিধানে থাকিয়া সর্বদা তাঁহার খেদমত করা, পিতা-মাতা প্রভৃতি মুরুব্বীয়ানকে ভক্তি করা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা, বয়ঃকনিষ্ঠ ও নিজের ছেলেমেয়েদিগকে স্নেহের চোখে দেখা এবং নম্র ব্যবহার করা ইসলামের আদর্শ। ইসলামী আদর্শ ছিল—ওস্তাদগণ শাগরিদগণ হইতে কোন বেতন বা পারিশ্রমিক না নিয়া, শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে সওয়াব লাভের নিয়তে এবং দ্বীনের ও কওমের খেদমতের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা প্রদান করিতেন। আর শাগরিদগণও ওস্তাদগণকে প্রাণের সহিত ভক্তি করিত। আজীবন নিজদিগকে ওস্তাদের কাছে ঋণী মনে করিত। যে কোন সুযোগে কায়িক বা আর্থিকভাবে ওস্তাদের কিছু খেদমত করিতে পারিলে নিজেকে মহাসৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত, ওস্তাদের খেদমতে কায়িক পরিশ্রম করাকে কোনরূপ হীনতা বা যিল্লতী মনে না করিয়া পরম গৌরবের কাজ মনে করিত। আর্থিক খেদমত করাকে ভিক্ষা বা হীনতার কাজ বলিয়া মনে স্থান দিত না, বরং শাগরিদগণ ইহাতে মনে করিত, যাহার কাছ হইতে আল্লাহ্ ও রাসূলের পরিচয় লাভ করিয়াছি, তাঁহাকে কিছু অর্থ প্রদান করা বাস্তবিকপক্ষে অর্থের সর্বাপেক্ষা অধিক সদ্ব্যবহার। ইহা শুধু প্রাচ্যদেশের পৌরাণিক প্রথা নহে, ইহাই হইতেছে ইসলামের চিরন্তন আদর্শ।

সহপাঠীদের সহিতও বয়স এবং মর্যাদানুসারে সদ্ব্যবহার এবং সহানুভূতি প্রকাশ করা ইসলামের আদর্শ। সহপাঠীদের সহিত খাঁটি ভ্রাতৃত্বভাব বজায় রাখাই ইসলামের নীতি। কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও নীতির প্রভাবে সেই পবিত্র নিঃস্বার্থ সম্পর্ক লোপ পাইয়াছে। ওস্তাদগণও বিনা বেতনে পড়ান না, ছাত্রগণ শিক্ষককে বেতনভোগী কর্মচারী বলিয়া মনে করে। সহপাঠীদের ভ্রাতৃত্বভাব, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতির পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ, রেষারেষি ভাব উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সেই ওস্তাদ ভক্তিও এখন আর নাই। ওস্তাদের খেদমত করাকে হীনতা ও যিল্লতির কাজ বলিয়া মনে করা হয়। ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব। ইহাকে বর্জন না করিলে ওস্তাদ শাগরিদের সেই চির মধুর সম্পর্ক আর ফিরিয়া আসিবে না।

ওস্তাদকে হাদিয়া ও বিনিময় প্রদান

বর্তমান যুগে টাকার কর্মচারীদের মধ্যে কিছুটা সময়ানুবর্তিতা, নিয়ামানুবর্তিতা এবং কর্তব্য জ্ঞান দেখা যায়। কিন্তু যাঁহারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা, নিয়ামানুবর্তিতা,কর্তব্যপরায়ণতা শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহা ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামী আদর্শ এই যে, দুনিয়ার চেয়ে যেমন আখেরাত বড়, দুনিয়ার টাকার চেয়ে তেমনই আখেরাতের সওয়াব অনেক বড়। সবচেয়ে বড় হইল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কাজ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই বটে। কোটি কোটি টাকার চেয়ে বিন্দুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির মূল্য অনেক বেশী। টাকার কর্মচারীরা পার্থিব তুচ্ছ টাকা-পয়সা লাভের জন্য নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যপরায়ণতার সহিত কাজ করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিরূপ অমূল্য ও অনুপম রত্ন লাভের জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের কাজে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক নিয়মানুবর্তী ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত নহে কি?

উজরত বা বেতন লইয়া শিক্ষা প্রদান করা এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান সহকারে শিক্ষা প্রদান করার মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য। বেতন লইয়া শিক্ষা প্রদানের কাজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজ এবং উজরত না লইয়া দ্বীনি-এলমের খেদমতের নিয়তে শিক্ষা প্রদান নিঃস্বার্থ ত্যাগের একটি উজ্জ্বল আদর্শ।

কিন্তু একজন ওস্তাদ দায়িত্ব ও নিয়মানুবর্তিতা সহকারে বিনা বেতনে কেবল আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একজনের ছেলেকে এল্‌ম ও আদব শিক্ষা দিলেন, আর যদি ছেলের পিতাও ওস্তাদকে হাদিয়া-স্বরূপ বেতনের চেয়েও বেশী টাকা দিলেন কিংবা একজন গ্রন্থকার আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একখানা ধর্ম-পুস্তক লিখিয়া কওমের খেদ্‌মতের জন্য স্বত্বত্যাগপূর্বক একজন পাব্লিশারকে দিলেন। পাব্লিশার দ্বীনী খেদমতের নিয়তে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া কিছু লাভবানও হইলেন। অতঃপর দ্বীনী খেদমতের নিয়তেই গ্রন্থকারকে হাদিয়াস্বরূপ শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিছু টাকা দিলেন। এতদুভয়াবস্থাতেই বৈজ্ঞানিক স্থূল দৃষ্টিতে এবং যুক্তির মাপকাঠিতে বিনিময় বা উজরত প্রদান ও আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হাদিয়াপ্রদানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। কেননা, একজনের উদ্দেশ্য হইতেছে তুচ্ছ পার্থিব টাকা পয়সা লাভ, আর অপরজনের নিয়ত হইতেছে কওমের খেদমত, দ্বীনি-এলমের প্রচার এবং মহান আল্লাহ্‌র তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। কিন্তু এই নিয়ত সম্পূর্ণ নির্মল ও খাঁটি হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই শ্রেণীর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের কাজে খাঁটি নিয়তের পরিচয় তখনই পাওয়া যাইবে, যখন কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কোন প্রকার ত্রুটি করিবে না এবং কোন অবস্থাতেই এই খেদমত পরিত্যাগ করিবে না। কিছু দিন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কাজ করিয়া কাজের হক আদায়ের ত্রুটি করা বা কিছুদিন কাজ করার পর কওমের মধ্যে কদরদানী নাই বলিয়া কাজ ছাড়িয়া দিলে প্রমাণ হইয়া গেল যে, নিয়ত খাঁটি ছিল না। নিয়ত খাঁটি থাকিলে সকল অবস্থাতে

নির্ভর থাকিবে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর থাকিলে সেকাজ কেহ ত্যাগ করিতে পারে না।

আমি একথা বলিতেছি না যে, শাগরিদ পড়াইয়া বা এলম শিক্ষা দিয়া বেতন লওয়া না-জায়েয বা ধর্মগ্রন্থ লিখিয়া বইয়ের কপি বিক্রি করা না-জায়েয। জায়েয থাকা ভিন্ন কথা, আর উচ্চ মর্যাদা লাভ করা ভিন্ন কথা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই যথাযোগ্য অকৃত্রিমতা, খালেছ নিয়ত, যথাবিহিত দায়িত্ববোধ থাকা আবশ্যক; অন্যথায় উভয়বিধ অবস্থারই পরিণাম খারাপ হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষতঃ যাহারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের নামে কাজ আরম্ভ করিয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ত্রুটি করিবে এবং আমানতে খেয়ানত করিবে, তাহারা হইবে বেশী 'মুজরিম' অর্থাৎ বড় রকমের অপরাধী। কেননা, তাহারা আল্লাহ্‌র নামে ধোঁকাবাজি করিয়াছে। দুনিয়ার নামে লেন-দেনের কাজে ধোঁকাবাজি করাও পাপ। কিন্তু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের কাজে ধর্মের নামে ধোঁকাবাজি করার পাপ ইহা অপেক্ষা হাজার হাজার গুণ বড় ও বেশী।

খাদ্য সম্বন্ধীয়

শূকর খাওয়া, শরাব খাওয়া, কচ্ছপ খাওয়া ইসলাম ধর্মের বিধান মতে গুরুতর পাপ। যেমন, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, জুয়া খেলার অর্জিত পয়সা খাওয়া, চুরি, ডাকাতি বা জোর-যুলুমপূর্বক ছিনাইয়া খাওয়া বড় পাপ। হিন্দুরা কচ্ছপ খায়, খৃষ্টানরা শূকর খায়। শরাব খাওয়া তাহাদের ধর্মে বোধহয় নিষিদ্ধও নহে। কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্মে শূকর, শরাব, কচ্ছপ ও কুকুর শুধু হারামই নহে, অপবিত্রও বটে। অনুরূপ ভাবে সুদ, জুয়া, জোর-যুলুম, চুরি ডাকাতি ও মূর্তিপূজা অপবিত্র এবং হারাম। এসমস্ত হারাম দ্রব্য ভক্ষণে অন্তর এত কলুষিত, নাপাক ও অপবিত্র হইয়া পড়ে যে, পরে শত চেষ্টা করিয়াও উহাকে পবিত্র করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অন্তরের পবিত্রতা রক্ষাই মুসলমানের প্রধান কর্তব্য।

খানার মজলিস

অনেকে হিন্দুয়ানী প্রভাবে খানার মজলিসকে "ভোজসভা" বলে। কিন্তু শব্দটি ভাষার দিক হইতে শুদ্ধ বলিয়া ধরা গেলেও ইসলামী রুচি বিরুদ্ধ। দস্তরখান বিছাইয়া বিছানায় বসিয়া একত্রে খাওয়াই ইসলামী আদর্শ। খাইবার সময় খোশ আলাপ করা ইসলামী আদর্শ বিরোধী নহে। অবশ্য ঘৃণ্য বিষয়ে আলোচনা কিম্বা গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক বিষয়ের আলোচনা করা খানার মজলিসের আদবের খেলাফ। খাইবার সময় কোন খাদ্যবস্তু হাত হইতে ছুটিয়া বা নড়াচড়ার দরুন বরতন হইতে দস্তরখানে পড়িয়া গেলে উহাকে তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া খাওয়া এবং খাওয়ার শেষে বরতন পরিষ্কার করিয়া হাত চাটিয়া খাওয়া ইসলামী আদর্শ। খাদ্যদ্রব্যেরও একটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ্‌র দানের যে অমর্যাদা করে, সে অহঙ্কারী এবং অর্থ-গর্বে গর্বিত। অহঙ্কারী ও গর্বকারী আল্লাহ্‌র প্রধান শত্রু। দুঃখের বিষয়, আজকাল বরতনে কিছু খাদ্য এবং চায়ের পেয়ালায় কিছু চা অবশিষ্ট রাখিয়া দেওয়াকে ভদ্রতা বলিয়া গণ্য করা হয়। মুসলমান, সাবধান! সাবধান! আল্লাহ্‌র নেয়ামতের অপচয় করিও না।

ডাইন হাত

ডাইন হাত দিয়া খাওয়া, কেহ কোন জিনিস দিলে ডাইন হাতে লওয়া, আবার কাহাকেও কিছু দিতে হইলে ডাইন হাতে দেওয়া, যে কাজের দুইটি দিক আছে, সে কাজ শুরু করিতে ডাইন দিক হইতে শুরু করা—যেমন জুতা, খড়ম ও পায়জামা পরিতে আগে ডাইন পায়ে পরা, সাইকেল, মোটর বা যে কোন প্রকার যানবাহনে উঠিতে আগে ডাইন পা উঠান ইত্যাদি ইসলামের বিধান ও আদর্শ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ আগে বামদিক হইতে শুরু করা বিজাতীয় আদর্শ। যাহারা বিজাতীয় আদর্শের অনুকরণ করে, স্বধর্মের প্রতি আস্থা দুর্বল হওয়ার কারণেই তাহারা ইহা করে। তাহারা এজন্য আখেরাতের শাস্তি ত ভোগ করিবেই, অধিকন্তু ইহালোকেও তাহারা ইহা দ্বারা নিজেদের নীচমন্যতা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পরিচয় দিয়া থাকে। এরূপ ধর্মাভাবে দুর্বলতা ও হীনতা পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক।

দাঁড়াইয়া পেশাব করা

দাঁড়াইয়া পেশাব করার প্রথা প্রাক্-ইসলামিক যুগে আরব দেশে প্রচলিত ছিল। এখনকার তথাকথিত প্রগতির ধ্বজাবাহী অর্বাচীন যুবকগণ সেই বর্বর যুগের প্রথাকেই প্রগতি মনে করিয়া পরের অনুকরণে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শকে ত্যাগ পূর্বক দাঁড়াইয়া পেশাব করা আরম্ভ করিয়াছে। এই অন্ধ অনুকরণ ঘোর অন্যায় এবং ভীষণ পাপ। আমাদের ইসলামের সনাতন আদর্শ এই যে, বসিয়া পেশাব করিতে হইবে। কা'বা শরীফের দিকে মুখ বা পিঠ করিয়া বসিতে পারিবে না। পেশাবের পর মাটির ঢেলা কুলুখ এবং পানি দ্বারা পবিত্রতা হাছিল করিতে হইবে। যাহার শরীর ও কাপড় পবিত্র নয় তাহার মনও পবিত্র নয়।

বিভিন্ন প্রকারের জুয়া

খৃষ্টানী প্রভাবে আমাদের দেশে নানা প্রকারের জুয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শব্দগঠন প্রতিযোগিতা, ঘোড়দৌড়, লটারী, ফটকাবাজারী, জীবন-বীমা ইত্যাদি ইসলাম ধর্মীয় আদর্শের বিরোধী। বিভিন্ন রকমের জুয়া খৃষ্টান ধর্মীয় অর্থলোভীগণ আমাদের দেশে ছড়াইয়া দিয়া আমাদের অর্বাচীন যুবকদের দ্বারা হারাম কাজ করাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম হইতে দূরে সরাইয়া লইতেছে এবং দুনিয়া ও আখেরাত দোনো জাহানে তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এ সমস্ত জুয়াড়ী দল ক্রমশঃ শ্রম-বিমুখ হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে ওদিকে আখেরাতের ব্যাপারে ধর্ম বিমুখতা তথা ধর্মদ্রোহিতা ইহাদের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে; সুতরাং দুই জাহানের পক্ষেই জুয়ার পরিণাম অতীব ভয়াবহ। অতএব, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের এই সর্বনাশা জুয়ার প্রচলন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

জাতীয়তা

আমাদের ইসলামী আদর্শ অনুসারে জাতীয়তার ভিত্তি খোদা প্রেরিত ধর্মের উপর। ধর্ম বলিতে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস বা শুধু এবাদত বন্দেগী বুঝায় না। ধর্ম কথাটি শুধু এতদুভয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; বরং ধর্মবিশ্বাস ও এবাদত বন্দেগী হইতে আরম্ভ করিয়া ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ইসলামী সমর ব্যবস্থা, এমনকি আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থা পর্যন্ত যাহাকিছু আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তৎসমুদয় মিলিয়া ইসলাম ধর্ম, এবং এই ইসলাম ধর্মের পূর্ণ অনুসরণকারীগণ সমষ্টিগতভাবে মুসলিম জাতি। আঞ্চলিক রাষ্ট্রের বাউণ্ডারী, ভাষা, বর্ণ বা বংশ আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি নহে। বিশ্বব্যাপী এক মুসলিম জাতিকে ধূর্ত ও কুচক্রী খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের অর্বাচীন যুবকদের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাদিগকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অতি সত্বর এই পাশ্চাত্য বর্বরতার অন্ধ অনুকরণ প্রবণতার জোঁয়াল আমাদের কাঁধ হইতে দূরে নিক্ষেপ করা দরকার। অন্যথায় জাতির ভবিষ্যৎ অচিরেই আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ভয়াবহ পরিণাম ডাকিয়া আনিবে।

অছিয়ত

মানুষ যখন মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়, তখন প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর আশঙ্কা তাহার মনে প্রবল হইয়া থাকে। মৃত্যু এক নির্দিষ্ট সময়েই আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু সেই নির্দিষ্টকাল সম্বন্ধে মানুষের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। শৈশবেও মৃত্যু ঘটে, যৌবনকালেও মৃত্যু আসে, বৃদ্ধ বয়সে ত প্রতি মুহূর্তেই মত্যুর সম্ভাবনা মনে করিয়া কাতর হইয়া পড়ে। ফলকথা, মানুষ যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়, যখন মানুষ নিজকে পরপারের যাত্রী বলিয়া আল্লাহ্র কাছে খাঁটি দিলে তওবা করিয়া নিজের অতীত ও বর্তমান গুনাহ্র মা'ফী দৃঢ়রূপে কামনা করে, তখন তাহার সমস্ত হকূকুল এবাদ এবং হকূকুল্লাহ্ পরিষ্কার করিয়া মা'ফী চাওয়া দরকার এবং পরের দেনা, অন্যের আমানত কাহারও সঙ্গে কোন ওয়াদা করিয়া থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিয়া নির্দায় হওয়া একান্ত আবশ্যক। যদি ছেলে মরিয়া থাকে এবং অপর ছেলে জীবিত থাকার কারণে এই মৃত ছেলের পরিত্যক্ত সন্তানেরা দাদার সম্পত্তি লাভে মাহ্রূম ও বঞ্চিত হইয়া একেবারে নিঃস্ব হওয়ার বন্দোবস্ত হয় এবং এই দাদার সম্পত্তি যদি ০০০০০০ থাকে, তবে পৌত্র পৌত্রীদের জন্য ওছিয়ত করা অর্থাৎ তাহাদের জন্য সম্পত্তির এক উত্তম অংশ দান করা দাদার কর্তব্য। কোরআন শরীফে নির্দেশ আছেঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ○

অর্থাৎ, হে মুসলিমগণ! তোমাদের কাহারও দ্বারে মৃত্যু উপস্থিত হইলে, যদি তাহার সম্পত্তি থাকে, তবে তখন তাহার পিতামাতা এবং নিকট-আত্মীয়দের জন্য ওছিয়ত করা তাহার উপর ফরয করা হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, মীরাস বা ফরায়েযের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে এই ওছিয়তের বিধান নাযিল হইয়াছে। নির্দিষ্ট ওয়ারিসের জন্য নির্ধারিত ফরায়েযের বিধান নাযিল হওয়ার পর এই ওছিয়তের হুকুম মানসূখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে-সমস্ত নিকট-আত্মীয় ওয়ারিস শ্রেণীভুক্ত হইবে না, তাহাদের জন্য ওছিয়ত করা এখনও ফরয রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মৃত্যুর নিকটবর্তী লোকটির আরও যদি কোন ধর্মীয় সৎকাজের ইচ্ছা থাকিয়া থাকে, (থাকাই বাঞ্ছনীয়) তবে সেই জন্যও ওছিয়ত করিয়া যাওয়া উচিত। যদি রোযা-নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, কিংবা হজ্জ, যাকাত, মান্নৎ, কাফ্‌ফারা প্রভৃতি বাকী থাকিয়া থাকে, তবে সেগুলি আদায়ের জন্যও ওছিয়ত করিয়া যাওয়া দরকার। মসজিদ-মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় কওমী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও সম্পত্তি থাকিলে ১/৩ অংশের মধ্যে ওছিয়ত করিয়া যাওয়া উচিত।

মানুষ যখন মরিয়া যাইবে

মানুষ যখন মরিয়া যাইবে, (প্রকৃতপক্ষে মানুষ মরে না, মানুষের আত্মা অমর, শুধু কর্মফল ভোগ করার নশ্বর দেহের পরিবর্তন হয় মাত্র। সৎকর্মী-আত্মা সুফল ভোগ করিবে।) তখন তাহার বেটা-পুত্র প্রভৃতি নিকটবর্তী ওয়ারিসদের প্রতি প্রথম কর্তব্য হইবে—মৃত ব্যক্তিকে সম্মানের সহিত গোসল দেওয়া, সুগন্ধিযুক্ত কাফন পরান, সকলে মিলিয়া যথাসম্ভব তাহার হকূকুল এবাদ তথা তাহার কৃত যাবতীয় ভুল-চুক খাতা-কছুর প্রভৃতি মাফ করাইয়া লইয়া তাহার জন্য জানাযার নামাযের মধ্যে আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ ও সুপারিশ করা এবং সম্মান ও তা'যীমের সহিত গভীর মাটির নীচে দাফন করিয়া রাখা। অতঃপর দ্বিতীয় কর্তব্য—তাহার কোন ঋণ থাকিলে তাহা পরিশোধ করা। তৃতীয় কর্তব্য—সম্পত্তির ১/৩ অংশ হইতে মৃত ব্যক্তির কৃত ওছিয়তগুলি পূর্ণ করা। মোট সম্পত্তির ১/৩ অংশের চেয়ে বেশী ওছিয়ত করিয়া থাকিলে তাহা নির্ভর করিবে ওয়ারিসগণের সম্পত্তি ও অনুমতির উপর। চতুর্থ কর্তব্য ওছিয়ত পূর্ণ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিসগণের মধ্যে ফরায়েযের কোরআনী আইন অনুসারে বন্টন করিয়া দেওয়া। মৃত ব্যক্তি ওছিয়ত না করিয়া থাকিলেও তাহার সুপুত্র সাবালেগ থাকিলে সাবালেগ ওয়ারিসগণ একত্রিত হইয়া, অথবা একাকী একজন নিজ অংশ হইতে মৃত মুরুব্বির জন্য কিছু ছওয়াবরেসানী করা অতি উত্তম। মৃত্যুর পর কিছু ক্বোরআন শরীফ পড়িয়া ফাতেহা, কুলহু-আল্লাহ্‌ প্রভৃতি মোবারক সূরা ও আয়াত পাঠ করিয়া বা তালেবে এলম ও গরীব মিস্‌কীনদেরে খাওয়াইয়া ও দান খয়রাত করিয়া উহার সওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহের প্রতি পৌঁছাইবার জন্য আল্লাহ্‌র তা'আলার দরবারে যে দো'আ ও প্রার্থনা করা হয়, ইহাকেই বলে—ছওয়াবরেসানী বা ফাতেহা। ফাতেহার মধ্যে কোন বেদ'আত কাজ বা কোন দুনিয়াদারীর আড়ম্বর করা বিশেষ গোনাহ্‌র কাজ। যেহেতু মৃত ব্যক্তি তাহার জমি-জমা ও অস্থাবর সম্পত্তি সবকিছু ত্যাগ করিয়া একেবারে খালি হাতে পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। অতএব, তাহাকে কিছু সাহায্য দান করা তাহার প্রত্যেক জীবিত ওয়ারিসদের উচিত। খালেছ নিয়তে নেক কাজ না হইলে আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হইবে না। আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল না হইলে, মৃত ব্যক্তি যে দেশে চলিয়া গিয়াছে, সে দেশে ছওয়াব পৌঁছাইবার শক্তি অন্য কাহারও নাই। শুধু আল্লাহ্‌ পাক কবূল করিলে তিনিই মেহেরবানী করিয়া উহার ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করিতে পারেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—"সাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন নিকটে একখানা ভাসমান তৃণখণ্ড পাইলেও উহার আশ্রয় অবলম্বন করিতে চায়, তদ্রূপ মৃত ব্যক্তিও কেহ সামান্য

কিছু ছওয়াব পৌঁছাইলে তাহাও পাইতে চায়। হাদীস শরীফে আরও আসিয়াছে যে, মানুষ যখন মরিয়া যায়, তখন তাহার ছওয়াব লাভের এবং আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের সমস্ত পথ বন্ধ হইয়া যায়। কেবলমাত্র তিনটি পথ খোলা থাকেঃ (১) যদি জীবনকালে নিজে কোন ছদকায়ে জারিয়ার কাজ করিয়া গিয়া থাকে কিংবা মৃত্যুকালে কোন ছদকায়ে জারিয়ার কাজের জন্য ওয়ারিসদিগকে ওছিয়ত করিয়া থাকে এবং ওয়ারিসগণ তাহা পালন করিয়া থাকে, তবে ইহার ছওয়াব লাভ করিয়া থাকিবে। ছদকায়ে জারিয়ার কাজ যথা—মাদ্রাসা, মসজিদ, পুল, রাস্তা, মুসাফিরখানা, ইন্দারা, পুকুর, টিউবওয়েল প্রভৃতি স্থায়ী জনহিতকর কাজে সাহায্য দান করা। (২) অথবা যদি দ্বীনী-এল্‌মের প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়া গিয়া থাকে। (৩) অথবা যদি কোন নেককার সন্তান রাখিয়া মরিয়া থাকে, যে সন্তান সদাসর্বদা বাপ-মায়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আয়ে মাগ্‌ফেরাত করিতে থাকে।

প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করুন। ইসলাম ধর্মের আদর্শ কত সুন্দর! কারণ, ইহা মানুষের রচিত বা প্রবর্তিত ধর্ম নহে; বরং ইহা স্বয়ং বিশ্ব-স্রষ্টা মালেকুল-মূলক আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত এবং তাঁহার হাবীব ও রাসূলের প্রবর্তিত ধর্ম। এই ধর্মের মধ্যে লোকাচারের বা মানুষের মতামতের কোন স্থান নাই। মানুষ বলিয়া থাকেঃ "ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নহে।" এই উক্তি সেই ধর্মের বেলায়ই খাটে, যে ধর্ম মানুষের রচিত। কেননা, মানুষের রচনার মধ্যে ভুল-প্রমাদের সম্ভাবনা আছে। কাজেই উহার মধ্যে মানুষের মতের খাতিরে পরিবর্তনও করা যাইতে পারে। কিন্তু সেটা ধর্ম নহে। উহা মানুষের মনগড়া কতিপয় স্বার্থমূলক নীতি মাত্র। ধর্ম উহাকেই বলে, যাহা স্বয়ং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসিয়াছে। কেননা, খোদা সর্বজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও মঙ্গলময়। তিনি মানুষের হিতাহিত বিবেচনা পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রেরিত ধর্মবিধান নিছক মানুষের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। অতঃপর কুত্রাপি ইহাতে কোন প্রকারের পরিবর্তন-পরিবর্ধন আসিতে পারে না। কাজেই মানুষের উপরোক্ত সত্য ধর্মের বেলায় সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আমাদের দেশে কোন ধর্মে রীতি আছে যে, বাপ মরিয়া গেলে বাপের মুখে ছেলে আগুন ধরাইয়া দিবে। তারপর আগুনের তাপে মৃত ব্যক্তির শব মোড় খাইতে আরম্ভ করিলে লাঠি দ্বারা পিটাইয়া তাহার হাড়-গোড় ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের ইসলাম ধর্মে মৃত ব্যক্তিকে পিটাইয়া হাড় ভাঙ্গা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র 'বে-তাযীমি' বা অসম্মান হয় এমন কোন কাজও মৃত ব্যক্তির প্রতি করা জায়েয নহে।

ফারায়েয

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে জীবিত ওয়ারিসদের জন্য কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ্ অনুযায়ী নির্ধারিত অংশ নির্ণয় করাকে 'ফারায়েয' বলে। ফারায়েযের আইন একটি অকাট্য আইন। কোরআন পাকের একটি সূরা শুধু এই আইন বর্ণনা করার জন্য খাছ করা হইয়াছে। এই সূরাটির নাম সূরাতুন-নিসা, অর্থাৎ দুর্বল, এতীম, বিধবা ও নারীদের প্রাপ্য প্রদানের আইন বর্ণনার অধ্যায়। আল্লাহ্ তা-আলা প্রথমে বলিয়াছেনঃ যাহারা এতীমের মাল আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহারা আগুন উদরস্থ করিতেছে। অতি শীঘ্র তাহারা দোযখের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফারায়েয আইনের সাধারণ সূত্রগুলি বর্ণনা করিয়াছেন—(১) বেটা বেটিদের দ্বিগুণ অংশ পাইবে। (২) শুধু বেটি থাকিলে তাহারা একাধিক হইলে ২/৩ অংশ পাইবে। (৩) শুধু এক বেটি

হইলে সে ১/২ অংশ পাইবে। (৪) বেটা-বেটি থাকিলে মা-বাপের প্রত্যেকে ১/৬ অংশ পাইবে। বেটা বা বেটি কেহই না থাকিলে মা ১/৩ অংশ পাইবে। অবশিষ্ট বাপ পাইবে। কিন্তু যদি একাধিক ভাই-ভগ্নীও থাকে তদবস্থায়ও মা ১/৬ অংশ পাইবে। (৫) এই সমস্ত অংশ ওছিয়তপূর্ণ করার এবং ঋণ পরিশোধের পর দেওয়া হইবে। ওছিয়তপূর্ণ না করিয়া বা দেনা পরিশোধ না করিয়া ওয়ারিসদের অংশ দেওয়া যাইবে না। (৬) মৃত স্ত্রীর বেটা বা বেটি কেহ না থাকিলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে স্বামী ১/২ অংশ পাইবে। আর বেটা-বেটি থাকিলে স্বামী ১/৪ অংশ পাইবে। (৭) নিজের ঔরসজাত কোন সন্তান রাখিয়া মরিলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে স্ত্রী ১/৮ অংশ এবং স্বামী নিঃসন্তান মরিলে স্ত্রী ১/৪ অংশ পাইবে। এইসব অংশও ওছিয়ত পূরণ এবং ঋণ পরিশোধ করার পর দেওয়া হইবে। তাহা না করিয়া কোন অংশই দেওয়া যাইবে না। (৮) মৃত ব্যক্তির বাপ বা নিজস্ব সন্তান কেহ যদি না থাকে আর মায়ের পক্ষের বৈপিত্রেয় ভাই-বোন থাকে, তবে তাহারা একজন হইলে ১/৬ অংশ পাইবে। একাধিক হইলে ১/৩ অংশ সকলে সমভাবে ভাগ করিয়া নিবে। (৯) শুধু আপন হাকীকী বোন ১ জন থাকিলে সে ১/২ অংশ পাইবে। একাধিক থাকিলে ২/৩ অংশ পাইবে। কিন্তু যদি ভগ্নীদের সহিত ভাই থাকে, তবে ভাই ভগ্নীর দ্বিগুণ পাইবে। অন্য কেহ না থাকিয়া শুধু একজন বা একাধিক ভাই থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি ভাই পাইবে। ফারায়েযের আইন সম্পর্কে এই সাধারণ সূত্রগুলি বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, এগুলি মানুষের রচিত বিধান নহে। ইহা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা, যাহারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করিবে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা দোযখে নিক্ষেপ করিবেন এবং সেখানে তাহাদের অপমান ও লাঞ্ছনাময় ভীষণ শাস্তি হইবে। এই ধারাগুলি বর্ণনা করার পূর্বেই আবার দুইটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করিয়াছেন। (১) পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক, নিকটবর্তী জন বর্তমান থাকিলে দূরবর্তী জন অংশ পাইবে না। যেমন বাপ থাকিলে দাদা পাইবে না, ভাই পাইবে না। দাদা থাকিলে চাচা পাইবে না, চাচা থাকিলে চাচাত ভাই পাইবে না। ভাই থাকিলে ভাতিজা পাইবে না। ছেলে থাকিলে নাতি পাইবে না। মা থাকিলে দাদী বা নানী পাইবে না। হাকীকী ভাই থাকিলে বৈমাত্রেয় ভাই পাইবে না ইত্যাদি। এই মূল ধারাটির প্রভাব সমস্ত ধারাগুলির উপরেই বিস্তারিত হইবে। এই জন্য দ্বিতীয় ধারায় বলিতেছেন—(২) সম্পত্তি বণ্টন কালে লা-ওয়ারিস আত্মীয় বা এতীমগণ বা মিস্‌কীনগণ উপস্থিত হইলে সমস্ত সাবালেগা ওয়ারিস একত্রি হইয়া বা কোন একজন নিজ নিজ অংশ হইতে তাহাদিগকে কিছু খানা-পিনার ব্যবস্থা করিয়া দিবে এবং তাহাদের সঙ্গে মিষ্টি আলাপ করিয়া সদ্ব্যবহারের সহিত তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিবে। অবশ্য এতীম বা না-বালেগ ওয়ারিসের অংশ হইতে কিছু দেওয়া যাইবে না, সেইজন্য ওযর পেশ করিয়া দিবে। এই ধারাগুলি বর্ণনা করার পূর্বাহ্নেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকীদের সহিত বলিয়া দিয়াছেন যে, সাবধান! এতীমের মালের মধ্যে যেন কোনরূপে তছরুপ করা না হয়। যাহারা অক্ষম ও নিঃসহায় তাহাদের মাল তছরুফ করার পরিণাম অতীব ভয়াবহ হইবে।

এতীমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে এবং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে বার বার তাকীদ করিয়াছেন। দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় বাপ মরিয়া গেলে দাদাকে তাকীদ করা হইয়াছে, যেন তিনি মাহ্‌রূমোল মীরাস এতীম নাতিদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকালে যেন তাহাদের জন্য ওছিয়ত করিয়া যান, যাহাতে উক্ত পিতৃহীন এতীম নাতিগণ দাদার মৃত্যুর পূর্বে ও পরে নিজেদের পিতৃবিয়োগজনিত

অভাব ও নিঃস্বতা অনুভব করিতে না পারে। তাহাদের তা'লীম-তরবিয়ত, খাওয়া পরা ইত্যাদি কাজে যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় এবং দাদার মৃত্যুর পরেও যেন তাহারা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হয়। যদি দাদা সম্পত্তিহীন ও অক্ষম হয়, তবে হাদীস শরীফে আসিয়াছে—"এতীমদের পর-ওয়ারিশ করার মত কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকিলে তাহাদের লালন-পালনের দায়িত্ব হুকুমতের।"

হুকুমতকে সৎপরামর্শ

হুকুমতের কাজ—আল্লাহ্‌র কাজে দখল দেওয়া বা লোকের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা নহে। হুকুমতের কাজ—জনগণের স্রষ্টা বিধাতার আইনের অনুসরণে জনসাধারণের সেবা করা। মানুষের সংখ্যা কমান হুকুমতের কাজ নহে। কিম্বা ব্যক্তিগত বা দলগত পক্ষপাতিত্ব করা হুকুমতের কাজ নহে। নিজের ব্যক্তিগত খামখেয়ালীমূলক মতের বশবর্তী হইয়া কোন কাজ করাও হুকুমতের কর্তব্য নহে। হুকুমতের কর্তব্য হইল—(১) বিশ্বমানবের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত এবং তাঁহার খাছ রাসূলের মারফতে প্রচারিত যে সমস্ত বিধান কোরআন ও হাদীস শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে—তাহা লুকাইয়া না রাখিয়া এবং উহার শিক্ষা ও প্রচার বন্ধ না রাখিয়া; বরং সেই শিক্ষাকে যথাসাধ্য প্রচার করা ও চালু রাখা। (২) আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে যাবতীয় কায়িক বন্দেগী যথা নামায, রোযা প্রভৃতিকে চালু করা এবং যাহাতে গায়রুল্লাহ্‌র পূজা না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা। (৩) তাঁহার আর্থিক বন্দেগী যাকাতকে চালু করিয়া ধনী লোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার শিক্ষা ও বিধান প্রচারের প্রষ্ঠিানগুলিকে সাহায্য করা। (৪) জনগণের মধ্যে সৎ কাজ, সুনীতি, ইসলামী আদর্শের চালচলন ও পারস্পরিক সদ্ব্যবহার ও সদ্ভাব গড়িয়া তোলা। (৫) শরীঅত বিরুদ্ধ যাবতীয় কুকাজ, কুপ্রথা দুর্নীতি প্রভৃতি অসৎ কার্যগুলির মূল উৎপাটন করিয়া ফেলা। এই কাজগুলি ইসলামী হুকুমতের বুনিয়াদী কর্তব্য, এই কাজগুলির ভিতর দিয়াই মুসলিম জাতির পরানুকরণ প্রবণতা দূরীভূত হইয়া তাহাদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের ও ইসলামী প্রাবল্য কায়েম হইতে পারে। এই প্রেরণা শুধু হুকুমতের কাণ্ডারীগণের মনেই নহে; বরং সমস্ত মুসলিম সমাজের অন্তরে জাগরুক হওয়া একান্ত আবশ্যক।

'মুহাররাম' ও 'আশুরা'

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের তিন রকম সনের এবং তিন রকম মাসের হিসাবের বোঝা বহন করিতে হইতেছে। অথচ আমাদের দরকার আছে—মাত্র দুই রকম সনের এবং দুই রকমের মাসকে হিসাবে রাখার। (১) ইসলামী আহ্‌কামের অধিকাংশই নির্ধারিত হইয়াছে চাঁদের হিসাবে। রমযান শরীফের রোযা ফরয করা হইয়াছে চাঁদের হিসাবে, যাকাত ফরয করা হইয়াছে চাঁদের হিসাবে। হজ্জ ফরয করা হইয়াছে চাঁদের হিসাবে, ছেলেমেয়ের বালেগ হওয়ার বয়স গণনা করা হয় চাঁদের হিসাবে, মেয়েলোকের ইদ্দত গণনা করা হয় চাঁদের হিসাবে। এইজন্য চাঁদের হিসাবে বৎসর ও মাসের হিসাব রাখার প্রয়োজন আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নিরূপণ করা হয় সূর্যের হিসাবে, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতির তারিখ ও সময় নির্ণীত হয় সূর্যের হিসাবে। কাজেই চাঁদের মাস এবং সূর্যের মাসের হিসাব রাখাই আমাদের দরকার। সূর্যের সন বা মাসের হিসাবের জন্য দুইটি সনের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপান আছে।

একটিকে বলা হয় ঈসায়ী সন। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম একজন অতি মর্যাদাশীল পয়গম্বর বলিয়া আমরা মানি, কাজেই ঈসায়ী সন গ্রহণ করাতে আমাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় আর একটি সন আমাদের ঘাড়ে চাপান আছে, সেটাকে বাংলা সন বলা হয়। ইহার পিছনে কোনই ঐতিহাসিক পটভূমিকা নাই। অধিকন্তু বাংলা মাসগুলির তারিখ ঠিক করাও জ্যোতিষী পণ্ডিতগণের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে জনসাধারণের পক্ষে উপায়ান্তর নাই। এমন কি, কোন কোন মাস ৩২ দিনেও হইয়া থাকে। তাহা কেমন করিয়া হয়, জ্যোতিষী পণ্ডিতগণের শরণাপন্ন না হইয়া তাহার কোন কারণই আমরা বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে ঈসায়ী সনের মাসগুলির তারিখ নির্ধারিত আছে, সহজেই হিসাব রাখা যায়। আর চাঁদের মাসগুলির হিসাব সকলেই চোখে দেখিয়া এবং পূর্বমাসের হিসাব রাখিয়া ঠিক করিতে পারে। হিজরী সনের পিছনেই দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় ত্যাগের ঐতিহাসিক পটভূমিকা রহিয়াছে।

বিশেষতঃ অন্যান্য ধর্মগুলির যেমন ব্যক্তিগত বা আঞ্চলিক বা বংশগত নামে নামকরণ করা হইয়াছে, ইসলাম ধর্মের নামকরণের বেলায় তেমন কোন ব্যক্তিগত বংশগত বা অঞ্চলগত নামে নামকৃত করা হয় নাই; বরং উহার সাধারণ গুণগত নামেই নামকরণ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে হিজরী সনকেও সত্যের জন্য ঘরবাড়ী, জায়গা-জমিন, বিষয়-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যথাসর্বস্ব ত্যাগরূপ মহৎ গুণের স্মৃতিমূলক নাম রাখা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা মৃত্যুর সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া নাম রাখা হয় নাই।

হিজরী সনের প্রথম মাস 'মুহাররাম'। এই মাসের ১০ই রাত্রিকে আশুরার রাত্রি বলা হয়। এই দিনটির অনেক ফযীলত আছে। এই দিনে হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের তওবা কবূল হয়। এই দিনে হযরত ইউনুস আলাইহিস্‌সালামের কওমের তওবা কবূল হয়। এই দিনে হযরত নূহ্ আলাইহিস্‌সালামের জাহাজ মহাপ্লাবন হইতে মুক্তি লাভপূর্বক জুদী পাহাড়ে আসিয়া লাগে। এই দিনে হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালাম জন্মলাভ করেন। এই দিনেই হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতে বাপের ঔরস ব্যতীত মাতৃগর্ভ হইতে জন্মলাভ করেন। এই সমস্ত কারণে আশুরার রাত্রির ফযীলত অনেক বেশী। এই দিনে রোযা রাখিলে ও দান-খয়রাত করিলে অশেষ নেকী ও ছওয়াব পাওয়া যায়। ইহা পূর্ব হইতেই প্রমাণিত আছে।

পরে নানার উত্তরাধিকার বা রাজত্ব অধিকারেরর জন্য নহে; ইসলাম ধর্মের নেতৃত্ব কর্তৃত্বকে ইয়াযিদ ফাসেকের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য এবং মোসলেম জাতিকে ও ইসলামী আদর্শ ও খেলাফত-তন্ত্রকে সর্বপ্রধান বেদ'আত বংশগত রাজতন্ত্র হইতে রক্ষার জন্য আমাদের হযরতের নাতি ইমাম হোসায়েন (রাঃ) আমরণ জেহাদ করিয়া এই দিনেই শাহাদত বরণ করেন। অতএব, এই দিনে আমাদের কর্তব্য—রোযা রাখা, দান খয়রাত করা এবং আমাদের পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও আওলিয়াগণের ত্যাগের এবং আদর্শ চরিত্রের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া নিজেদের ভিতরে সেই প্রেরণা ও দ্বীনের খেদমতের জযবাকে জাগান। এই পবিত্র দিনকে তাজিয়া ইত্যাদি উৎসবের দ্বারা বা আরও অন্যান্য গর্হিত কর্মের দ্বারা অপবিত্র করা অতীব অন্যায়।

ছফর মাস

ছফর মাসের শেষ বুধবারকে 'আখেরী চাহার শম্বা' বলা হয় এবং বলা হয় যে, ছফর মাসের শেষ বুধবার হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সুস্থ বোধ করিয়া গোসলে ছেহ্‌হাত লাভ

করিয়াছিলেন। এই স্বাস্থ্যগত উক্তির কোন প্রমাণ আমি এখনও পাই নাই। অবশ্য এতটুকু প্রমাণ পাইয়াছি যে, ২৮শে ছফর বুধবার হযরত প্রথম বিমার পড়িয়াছিলেন—বিমারীতে তিনি শেষ পর্যন্ত ইহ্‌ধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

রবিউল আউয়াল শরীফ

এই পবিত্র মাসেই আমাদের হযরত আল্লাহ্‌র ওহীপ্রাপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র ওহীকৃত সমস্ত মানুষ পূজা, পুরোহিত পূজা, পীর পূজা, পয়গম্বর পূজা, রাজা-বাদশাহ্ পূজা, মূর্তিপূজা, মন পূজা, মনসা পূজা, কবর পূজা, জন্তু পূজা ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় গায়রুল্লাহ্‌র পূজা মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া পবিত্র আদর্শ অনুযায়ী একটি ভূখণ্ডকে পূর্ণ স্বাধীন নেযামে খেলাফত দান করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের কর্তব্য অন্ততঃ এই মাসটাকে আমরা হযরতের পূর্ণ জীবন-চরিত আলোচনায় এবং হযরতের জীবনের পবিত্র আদর্শ গবেষণায় কাটাই এবং আমরা যাতে তাঁহার কূলের কুলাঙ্গার না হই, সেই চেষ্টায় আমরা আজীবন লিপ্ত থাকার শপথকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া করি। মশহুর কথা এই যে, ১২ই রবিউল আউয়ালই হযরতের পয়দায়েশের তারিখও এবং এই তারিখ ওফাতের তারিখও। কিন্তু আলোচনার জন্য এই তারিখকেই সীমাবদ্ধভাবে নির্ধারিত করার কোন মানে নাই।

রবিউস্‌সানি

এই মাসের ১১ই তারিখে বিশ্ব-বিখ্যাত বড় পীর ছাহেব হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহ্‌মতুল্লাহ্ আলাইহি ইহধাম ত্যাগ করেন। অবতারবাদ হিন্দুদের মিথ্যা মতবাদ, ইসলামে উহার কোন স্থান নাই। অজ্ঞতাবশতঃ বা হিন্দু পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে কেহ কেহ আল্লাহ্‌র ওলী সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী রহ্‌মতুল্লাহ্ আলাইহির মাযার আযমীর শরীফকে তীর্থস্থান মনে করে বা তাঁহাকে হাজত-রওয়া মনে করিয়া তাঁহার নিকট হাজত চায়; মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী, বিপদ হরণকারী, সম্পদ দানকারী মনে করিয়া তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে—ইহা মারাত্মক ভুল শেরেকী আকীদা। হাজত-রওয়া, মানোবাঞ্ছা পূর্ণকারী, বিপদ হরণকারী, সম্পদ দানকারী এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ নাই।

হযরত বড় পীর ছাহেব সম্পর্কে অবতারবাদের ভুল ধারণা মনে পোষণ করিয়া يا خواجه عبد القادر جيلانى شيئا لله এর যপনা করিয়া ওযীফা পড়িয়া শেরেকী পাপে নিমগ্ন হয়। এহেন ভুল আকীদা বা সুন্নতের বরখেলাফ কোন কার্যক্রম হইতে পরহেয থাকিয়া এসব বুযুর্গানে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কেরাম কিরূপ সাধনা করিয়া এত বড় বুযুর্গ হইলেন এবং তাহারা ইসলামের খেদমতের জন্য কতভাবে জীবন কোরবান করিয়াছেন, সেইসব আদর্শ আমাদের স্মরণ করা দরকার। জীবনকে সেই আদর্শ অনুসারে গঠন করার চেষ্টা করা দরকার।

রজব শরীফ

রজব মাসে আমাদের হযরতের মে'রাজ হইয়াছিল। মে'রাজ শরীফের অর্থ এই যে, ইসলাম ধর্মের ভিত্তি আল্লাহ্ একজন আছেন। আল্লাহ্‌র বিচার সত্য। কর্মফল নেকী-বদীর ফলাফলের জন্য একটা দিন ধার্য আছে, উহাকে আখেরাত বলে। ইহা সত্য। আল্লাহ্‌র রাসূল সত্য, এই তিনটি বিশ্বাসের উপরই ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি স্থাপিত। এখন প্রশ্ন এই আসে যে, এই তিনটি বিশ্বাস

কি অন্ধ বিশ্বাস, না কাল্পনিক যুক্তিভিত্তিক বিশ্বাস, না বাস্তব চাক্ষুষ দেখা বিশ্বাস? উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হযরতকে সপ্ত আকাশের ঊর্ধ্বে আরশের উপর পর্যন্ত সশরীরে তুলিয়া নিয়া সবকিছু দেখাইয়া দিয়াছেন। বেহেশ্ত, দোযখ, আরশ, কুরসী, লওহ, কলম, কোন্ পাপের কি শাস্তি, কোন্ নেকীর কি পুরস্কার, এমনকি স্বয়ং আল্লাহ্কে পর্যন্ত আমাদের হযরত (দঃ) চাক্ষুষ দেখিয়া আসিয়াছেন। এমনভাবে দেখিয়াছেন যে, কোরআন শরীফ সাক্ষ্য দিতেছে— مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى যে দেখার মধ্যে এক বিন্দুও ব্যতিক্রম বা অতিক্রম হয় নাই। এই চাক্ষুষ দর্শনের নামই মে'রাজ শরীফ। এইরূপ মজবুত ভিত্তির উপর স্থাপিত ইসলাম ধর্মের ভিত্তি।

মে'রাজ শরীফকে যাহারা বিশ্বাস না করে, তাহাদের ঈমানের ভিত্তিই নড়বড়ে, টলমল। অতএব, প্রত্যেক বৎসর মে'রাজ শরীফের আলোচনা নূতনভাবে করিয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই ঈমানকে তাজা করা দরকার।

মশ্হুর কথা হইল— রজবের ২৭শে মে'রাজ শরীফ হইয়াছিল। মে'রাজ শরীফ ছাড়াও রজব মাসের মর্তবা আছে। বার মাসের মধ্যে চারিটি মাস অধিক মর্যাদার মাস, অর্থাৎ—'আশহোরে হোরম' যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহার্‌রাম এবং রজব। অন্যান্য মাসের চেয়ে এই চারি মাসের মর্যাদা বেশী। অতএব, এই চারি মাস নফল রোযা, নফল নামায, নফল দান-খয়রাত করিলে ছওয়াব বেশী হয় এবং গোনাহ্র কাজ করিলেও গোনাহ্ বেশী হয়।

শা'বান—'শবে বরাত'

শা'বান মাসের ১৫ই রাত্রে শবে বরাত। প্রকাশ থাকে যে, আমাদের ইসলামী শরীঅত অনুযায়ী রাত্রিকে আগে ও দিনকে পরে ধরা হয়। অতএব, ১৫ই রাত্রি বলিতে ১৪ই দিবাগত রাত্রি বুঝায়। এই রাত্রি একটি অতি মহান রাত্রি। এই রাত্রে রাত্রি জাগরণ করিয়া এবাদত বন্দেগী—নফল নামায, কোরআন তেলাওয়াত, দুরূদ শরীফ পাঠ, সমস্ত গোনাহ্র কাজ হইতে তওবা এস্তেগ্ফার করা, আল্লাহ্র যিক্র করা দরকার এবং আপোষে হিংসা-বিদ্বেষ, মনোমালিন্য কাহারও সঙ্গে থাকিলে তাহা দূর করা দরকার। মৃত মা-বাপ, ওস্তাদ, গরীব আত্মীয়-স্বজন সকল মোমেনীন, মোমেনাত, মোসলেমীন, ও মোসলেমাতের জন্য ছওয়াব-রেসানী, কবর যিয়ারত যার যেমন তওফীক হয়, করা দরকার। তারপর দিনের বেলায় রোযা রাখা দরকার।

আগামী এক বৎসরের হায়াত, মউত, রিয্‌ক, দৌলত ইত্যাদি সম্পর্কীয় তকদীর ও কিসমত এই রাত্রিতে আল্লাহ্র তরফ হইতে লিখিত হইয়া ফেরেশ্তাদের হাওলা করা হয়।

এই রাত্রিতে কোন কোন অঞ্চলে আতশবাজীর প্রথা আছে, ইহা খারাব প্রথা। এই খারাব প্রথা বর্জন করা দরকার। গরীবদের দান করিবার জন্য এবং নিজেদের খাওয়ার জন্য যার তওফীক হয় (চুরি না করিয়া, ঋণ না করিয়া, ভিক্ষা না করিয়া) হালুয়ারুটি পাকান কোন পাপের কাজ নহে। অবশ্য ইহাকে শরীঅতের অঙ্গ মনে করা ভুল।

রমযান

রমযান শরীফের পূর্ণ একমাসের রোযা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। যে রাত্রিতে প্রথম চাঁদ দেখা যায়, সেই রাত্রি হইতে পুনরায় যে রাত্রিতে ঈদের চাঁদ দেখা যাইবে সেই রাত্রি না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক রাত্রে এশার ফরয ও সুন্নত নামাযের পর দুই দুই রাকা'আত করিয়া

২০ রাকা'আত তারাবীহ্‌র নামায সুন্নতে মুআক্কাদা এবং পূর্ণ মাসের তারাবীহ্‌র নামাযের মধ্যে পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করাও সুন্নতে মুআক্কাদা। সুতরাং এই মাস প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য বড় রহ্‌মত ও বরকতের মাস। ছবর ও ধৈর্য শিক্ষার মাস। খরচের মাস। যাকাত দান করিয়া ৭০ গুণ ছওয়াব হাছিল করার মাস। এইজন্য যাকাত দানকারীরাও অধিকাংশ এই মাসেই যাকাত খয়রাত দান করিয়া থাকেন। কারণ ইহাতে ৭০ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। এই মাস বিশেষভাবে কোরআন পাঠের মাস। কোরআনের হাফেযগণ কোরআন পাঠ নিশ্চয় বেশী করিবেন। যাঁহারা নাযেরা পড়েন তাঁহাদের বেশী পড়া দরকার। যাহারা কোরআনের হাকীকতের অন্বেষণকারী, তাঁহাদেরও এই মাসেই রোযার পবিত্রতার সঙ্গে এবং আত্মার পবিত্রতার সঙ্গে কোরআনের হাকীকত (নিগূঢ় তত্ত্ব) বেশী অন্বেষণ করা দরকার। কারণ, এই মাসেই যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) উপর কোরআন প্রথম নাযিল হইয়াছে এবং তিনি সংবৎসরের অবতীর্ণ কোরআন হযরত জিব্রীলে আমীনের সঙ্গে দওর করিয়াছেন। (পরস্পর একজন আরেক জনকে কোরআনের হেফয ও মুখস্থ শুনানের নাম দওর।) আর এই মাসেই আল্লাহ্‌র রহমত বেশী নাযিল হয়। এইজন্য এই মাসে সবদিক দিয়া আত্মার পবিত্রতার সঙ্গে কোরআন চর্চা বেশী করা দরকার। কিন্তু খবরদার! কোরআন চর্চার মধ্যে নিয়ত খারাব করা এবং হীনতা মনে আনা চাই না। কিছু পয়সার লোভে টাকা চুক্তি করিয়া নিয়ত খারাব করিয়া কোরআন পড়া চাই না। কোরআন পড়া একমাত্র আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র পেয়ারা হওয়ার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু যাঁহারা তারাবীহ্‌র মধ্যে কোরআন শুনিবেন বা কোন আলেমের মজলিসে কোরআনের তফসীর শুনিবেন বা হযরতের জীবনী আলোচনা শুনিবেন, তাঁহাদের কর্তব্য—জান প্রাণ দিয়া, যথাসাধ্য মাল খরচ করিয়া ঐ হাফেয বা আলেমের মর্যাদা রক্ষা করা।

রমজান মাসের শেষ দশকে এ'তেকাফ করা খাছ লোকদের পক্ষে আল্লাহ্‌র খাছ রহ্‌মত আরও বেশী করিয়া হাছিল করার আরও একটি উপায়। অর্থাৎ, মসজিদে নির্জনে নীরবে বসিয়া আল্লাহ্‌র ধ্যান করা, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা। মসজিদের মধ্যে বাজে কথা না বলিয়া, বাজে কাজ না করিয়া আল্লাহ্‌র দুয়ারে পড়িয়া থাকিয়া খাছভাবে আল্লাহ্‌র ধ্যানে পড়িয়া থাকা, ইহারই নাম এ'তেকাফ। খাঁটি এ'তেকাফ দ্বারা সমস্ত গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়, দিল ছাফ হইয়া যায় এবং আল্লাহ্‌র নিকট খাছ দরজা হাছিল হয়।

রোযার ঈদের চাঁদ—শাওয়াল

চাঁদ সম্বন্ধে লোকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে। কেহ মনে করে, পঞ্জিকার হিসাব মতে বা অমাবস্যা-প্রতিপদের হিসাব মতে রোযা রাখিতে বা রোযা ছাড়িতে হইবে। কেহ কেহ মনে করে, বিজ্ঞানের হিসাব মতে, আবহাওয়ার হিসাব মতে, আবহাওয়া বিভাগের ঘোষণা মতে রোযা রাখিতে, রোযা ছাড়িতে ও ঈদ করিতে হইবে। এগুলি ভুল ধারণা। কেহ কেহ ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া বিমানে চড়িয়া চাঁদ দেখার চেষ্টা করেন, কেহবা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চাঁদ দেখিবার চেষ্টা করে, কেহবা দূর-দূরান্ত হইতে বেতার বা টেলিফোনযোগে খবর আনার চেষ্টা করে। এইগুলি সব বৃথা আড়ম্বর। আমাদের ইসলাম ধর্ম সর্বকালের সর্বদেশের সর্বজনের জন্য আল্লাহ্ প্রেরিত সহজ সরল সঠিক ধর্ম। এর মধ্যে এত আড়ম্বর বা এত কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করার কোনই স্থান নাই। বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞান। ধর্মের মধ্যে মানুষের জ্ঞানের দখল নাই। সুতরাং

বিজ্ঞানের সঙ্গে এবং ধর্মের সঙ্গে বিরোধ নাই। বিজ্ঞান চাঁদের জন্মতারিখ বলিতে পারে, কিন্তু চাঁদের জন্মতারিখে ঈদ করিবার আদেশ বিজ্ঞান দেয় না। পক্ষান্তরে ধর্ম চাঁদের জন্ম তারিখে নয়, বরং চাঁদ দেখার তারিখে ঈদ করিতে বলে। অতএব, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ কোথায়? অবশ্য মানুষের কল্পনার সঙ্গে এবং মানুষের মনের চাহিদার সঙ্গে ধর্মের বিরোধ আছে । এক্ষেত্রে মানুষকে , মানুষের মনকে ধর্মের অনুগত হইতে হইবে। ধর্মের সঙ্গে বিরোধ করিতে হইবে না। প্রাকৃতিকভাবে যে অঞ্চল ও সার্কেলগুলি আছে, তাহাদের কেন্দ্রে যখন বিশ্বস্তসূত্রে স্পষ্ট চোখে চাঁদ দেখা প্রমাণ হইয়া যাইবে, তখনই চাঁদ ধরা হইবে, তখনই রোযা ছাড়া যাইবে। নতুবা হাদীস শরীফে পরিষ্কার হুকুম আছে—যদি মেঘের কারণে চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে ৩০ দিন পুরা করিয়া তারপর নূতন চাঁদ ধরিতে হইবে। এখানে বিজ্ঞানের কের্দানী দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যে সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যাইবে বা ২৯শে রমযান মেঘের কারণে চাঁদ দেখা প্রমাণিত না হইলে যে সন্ধ্যায় ৩০ রোযা পুরা হইয়া যাইবে, তারপর দিন ১লা শাওয়াল ঈদের দিন ধরা হইবে। ঈদের দিন খুশীর দিন। গরীবদেরও খুশীর বন্দোবস্ত ধনীদের করিতে হইবে। ঈদের নামাযের পূর্বেই সকাল সকাল প্রত্যেক মালদার ব্যক্তি নিজের বরং নিজ পরিবারবর্গের প্রত্যেকের পক্ষ হইতে ৮০ তোলা সেরের দুই সের গমের পরিমাণ নগদ পয়সা বা অন্য খাদ্যশস্য গরীবদের দান করা উচিত। ইহাকে "ছদকায়ে ফেৎরা" বলে। ইহা মালদারের উপর ওয়াজিব। ইহা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

সকল মুসলমানের একত্র হইয়া ময়দানে গিয়া ঈদের নামায পড়া উচিত। হিংসা বিদ্বেষ, অহংকার ভুলিয়া সকল মুসলমান সমবেদনাসম্পন্ন ভাই ভাই হইয়া পরস্পর মিলামিলি কোলাকুলি করা উচিত।

এই মাসে ৬টি নফল রোযা আছে। ইহাকে ঈদের 'শশ রোযা' বলে। ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। ঈদের দিন বাদ দিয়া বাকী মাসের ভিরত এই ছয়টি রোযা রাখার ফযীলত ছহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

কোরবানীর ঈদ—যিলহজ্জ

মোট ১২টি চাঁদ— ১। মুহার্‌রম, ২। ছফর, ৩। রবিউল আউয়াল, ৪। রবিউস্‌সানী, ৫। জোমাদাল উলা, ৬। জোমাদাল উখরা, ৭। রজব, ৮। শা'বান, ৯। রমযান, ১০। শাওয়াল, ১১। যিলকদ, ১২। যিলহজ্জ। এইসব চাঁদ এবং এইসব মাস আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। কোন মাসেই নহুসত নাই, নহুসত নিজের কাছে। সৎকাজ করিলে, সৎ চেষ্টা করিলে নহুসত নাই। বদকাজ করিলে, নিশ্চেষ্ট থাকিলে নহুসত আছে। সৎচেষ্টা করিয়া হাছিল করিলে সব মাসেই আল্লাহ্‌র রহমতের বরকতের দরওয়াজা খোলা আছে। অবশ্য ছফর, জোমাদাল উলা এবং জোমাদাল উখরা এই তিন মাসের কোন খাছ ফযীলত শরীঅতে পাওয়া যায় নাই। যিলকদ মাসেরও কোন খাছ ফযীলত নাই; স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিলকদ মাস চারিটি পবিত্র ও মর্যাদাশীল মাসের একটি মাস। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে, যিলকদ মাসের কোনই খাছ ফযীলত নাই বা যিলকদ মাস নহুসতের মাস। ছফর মাসে আমাদের হযরত বিমার পড়িয়াছেন, তা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, এই মাস নহুসতের মাস।

চান্দ্র বৎসরের শেষ মাস যিলহজ্জ মাস। যিলহজ্জ মাস অতি পবিত্র মাস। এই মাসের ৯ই তারিখে সারা পৃথিবীর বহু মুসলমান আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হইয়া হজ্জের ফরয পালন করে। যাহারা হজ্জে শরীক হইতে পারে না তাহারা ঐদিন নফল রোযা রাখিয়া বহু নেকীর অধিকারী হয়। এমন কি, দুই বৎসরের ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ হয়। ১০ই তারিখে ঈদের নামায পড়িতে হয় এবং আল্লাহ্র নামে গৃহপালিত পশু, গরু, ছাগল, মেষ, উট ইত্যাদি কোরবানী করিতে হয়। ৯ই তারিখের ফজর হইতে ১৩ই তারিখের আছর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর প্রত্যেক নামাযীকে একবার (৩ বারও পড়া যায়) 'তকবীরে তশরীক' বলিতে হয়। তকবীরে তশরীক আল্লাহ্র বড়ত্ব এবং আল্লাহ্র একত্ব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দেওয়া যে, আমরা আল্লাহ্র মোকাবেলায় অন্য কাহাকেও মানি না। এক আল্লাহ্কে মানি। তকবীরে তশরীক এই—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ○

তকবীরে তশ্রীকের পিছনে এবং কোরবানীর পিছনে ঐতিহাসিক পটভূমিকা এই যে, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্সালামকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পুত্র কোরবানী করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। পিতা হযরত ইবরাহীম ছুরি হাতে লইয়া প্রস্তুত এবং পুত্র ইসমাঈলও ছুরির তলে গলা রাখিয়া প্রস্তুত। এমন সময় আল্লাহ্র তরফ হইতে দ্বিতীয় আদেশ লইয়া হযরত জিবরীল 'আল্লাহু আকবর' 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন। হযরত ইসমাঈল ছুরির তল হইতে জওয়াব দিলেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর"—তুমি আমাদের খোদা নও, আমাদের খোদা আল্লাহ্। তৎপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র দ্বিতীয় আদেশ পাইয়া প্রথম আদেশকে মনছুখ মনে করিয়া আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করিলেন এবং আল্লাহ্র শোক্র করিলেন। বলিলেন—"আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ"। এই স্মৃতি রক্ষা করিয়া আল্লাহ্র যখন যে আদেশ হইবে, তখন সেই আদেশকে শিরোধার্য করিয়া নিতে হইবে। এই শপথ সজীব রাখার জন্যই বছরে বছরে নিজের জানের চেয়ে পেয়ারা পুত্রের পরিবর্তে একটি গরু, বকরী বা উট কোরবানী করিয়া নিজের নফ্সানিয়াতকে আল্লাহ্র সামনে কোরবানী করিতে হয়। ১০ই তারিখ ঈদের নামাযের পর হইতে ১২ই তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোরবানীর সময়। এর পরে বা আগে করিলে কোরবানী হইবে না। ১০ই, ১১ই, ১২ই এবং ১৩ই এই চারি দিনকে "আইয়্যামে তশরীক" বলে। এই চারিদিন রোযা রাখা হারাম।

কতিপয় ভুল ধারণা

বিবেকের বিকৃতির এই জমানায় কেহ কেহ বিবেকের বিকৃতিবশতঃ আল্লাহ্র নামে পশু কোরবানীকে কালিপূজার পাঠা বলির সমান বলিয়াছে। ইহা বক্তার মস্তিষ্কের বিকৃতি বৈ আর কিছুই নহে। কারণ, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবানী (উৎসর্গ বন্দেগী) এবং অন্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে কোরবানী এক হইতে পারে কি? আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা। তাঁহার উদ্দেশ্যে বন্দেগী, তাঁহারই উদ্দেশ্যে কোরবানী হইতে পারে। অন্য দেবদেবী—সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা না কি যে, তাহাদের নামে, তাহাদের উদ্দেশ্যে বন্দেগী (পূজা) বা কোরবানী (বলি বা উৎসর্গ) হইবে? ইহা নিছক মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা।

কেহ কেহ জিন্দা বা মুরদা কবরস্থ পীরকে গায়েব জাননেওয়ালা, মকছুদ পুরা করিয়া দেনেওয়ালা, অদৃশ্য জ্ঞাত এবং বিপদ হরণকারী, সম্পদ দানকারী মনে করে। ইহা নিছক ভুল ধারণা—ঘৃণ্য শির্‌কী আক্বীদা।

কেহ কেহ পাশ্চাত্য বর্বরতার প্রভাবে পড়িয়া অন্ধ অনুকরণের প্রতিক্রিয়াশীলতার বশবর্তী হইয়া বলে যে, পর্দা ফরয পালন করিলে নারী জাতিকে পঙ্গু হইয়া থাকিতে হইবে। নারী জাতিকে পুরুষজাতি কর্তৃক পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। নর ও নারীর সমান অধিকার থাকিবে না, ইত্যাদি। ইহা নিছক ভুল ধারণা এবং কাম-কুক্কুটদের কামভাব চরিতার্থ করিয়া নারী জাতিকে ভোগের বস্তু বানাইবার একটি ফন্দি মাত্র। পর্দা স্বয়ং আল্লাহ্ কোরআনের আয়াতের দ্বারা ফরয করিয়াছেন। কোন মৌলভী-মাওলানা ফরয করেন নাই। নারী জাতির যে কাজ সে কাজে পর্দা পালনের কারণে কোন বাধা থাকে না। নারীজাতিকে পুরুষেরা পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে না বা হিন্দু ও খৃষ্টানদের ন্যায় মুসলিম পুরুষেরা নারী জাতিকে দাসীরূপে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের সমান অধিকার হইতেও বঞ্চিত করে না। যদি কেহ ব্যক্তিগতভাবে নফ্‌সানিয়াতের বশে করে, তবে তাহাকে ইসলামী শরীঅয়তের দ্বারা শাসন করিতে হইবে। কোরআন পাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বিদ্যমান যে, নারী জাতি তাহারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে নিজেদের সৌন্দর্য্য অন্য পুরুষকে দেখাইবে না। এই নির্দেশের দার্শনিক নিগূঢ়তত্ত্বও আছে যে, লোভনীয় মূল্যবান জিনিসকে অন্যের লোলুপ দৃষ্টি থেকে আড়াল রাখা প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানশীল মানুষেরই কর্তব্য। এর জন্যই প্রত্যেক হীরা কাঞ্চন, মণি-মাণিক্যের অধিকারীকেই লোলুপ দৃষ্টি থেকে তার মূল্যবান সম্পদকে আড়ালে রাখিতে হয়। প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানশীলা নারীর কাজেই তার সতীত্বের মূল্য হীরা, কাঞ্চন, মণি-মানিক্যে থেকে অনেক বেশী। এই দায়িত্বজ্ঞানশীলতাই প্রত্যেক নারীকে বাধ্য করে তাহার সৌন্দর্য্যকে পরপুরুষ থেকে আড়লে লুকাইয়া রাখিতে। বিশেষতঃ যখন লোভনীয়তা এবং আকর্ষণ দুই তরফ থেকে হয়, তখন এই দায়িত্ব আরও শতগুণে বাড়িয়া যায়। অতএব, দেখা গেল যে, নারী নারীত্ব রক্ষার্থেই পর্দা করিতে বাধ্য। কোন পুরুষের আদেশে বা পুরুষের অত্যাচারে নয়। অবশ্য সৃষ্টিকর্তা বিধাতা আল্লাহ্ কোরআনে পাকে নারীর দায়িত্বটা নারীদেরকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এই ফরয পর্দা পালন করাতে নারীর সমান অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ, চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, সমান অধিকারের অর্থ কি? যদি সমান অধিকারের অর্থ এই হয় যে, অধিকারের পরিমাণও সমান হইবে। তবে নারী একা কেন সন্তান পেটে ধারণ করার কষ্ট বহন করিবে? পুরুষ কেন এ কষ্ট বহন করিবে না? নারীর শরীর গঠন কেন কোমল এবং পুরুষের শরীরের গঠন কেন কঠোর হইবে? কোরআনের পাতায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র বিচারে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ পুরুষ নারীর দ্বিগুণ অংশ পাইবে'—সূত্রে নারী কেন পুরুষের অর্ধেক অংশ পায়, আর اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ সূত্রে পরিবার পরিচালনার নেতৃত্ব কেন নারীকে না দিয়া নরকে দেওয়া হইয়াছে? বুঝা গেল, সমান অধিকারের অর্থ অধিকারের পরিমাণে সমান সমান নয়। যার যে পরিমাণ অধিকার বিধাতার তরফ হইতে নির্ধারিত আছে, সে সেই পরিমাণই পাইবে; কিন্তু মূল্য অধিকারে বিচারের বেলায় সবই সমান। কেহ দুই পয়সা পাইবে, কেহ দুই হাজার পাইবে। সকলেরই সমান অধিকার-এর অর্থ এই নয় যে, দুই পয়সাওয়ালাকে দুই হাজার দিতে হইবে বা দুই হাজারওয়ালাকে দুই পায়সা দিতে হইবে। না, না, সে অর্থ নয়। অর্থ এই যে, দুই পয়সাওয়ালারও বিচার পাওয়ার ঠিক ততটা অধিকার, যতটা অধিকার দুই

হাজারওয়ালার। বিচার এ নয় যে, দুই হাজারওয়ালার বিচার ত করিবেন, কিন্তু দুই পয়সাওয়ালা থাকিলে তখন বিচার হইতে গাফলতি করিবেন। তা নয় তাহাকেও সুবিচার দান করিতে হইবে ঠিক ততখানি যত্ন সহকারে যতটা যত্ন সহকারে তিনি সুবিচার করিয়া থাকেন দুই হাজারওয়ালার বেলায়।

যবাহ করিবার ফতওয়া

ইসলাম ধর্মের পবিত্র আদর্শে কোন হালাল জীব খাইতে হইলে তাহাকে গলা মোচড়াইয়া ছিঁড়িয়া খাইলে তাহা হালাল হইবে না বা মেশিনে গলা কাটিয়া খাইলে তাহা হালাল হইবে না; বরং স্বয়ং যিনি ঐ জীবের সৃষ্টিকর্তা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া بسم الله الله اكبر (বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর) বলিয়া কোন ধারাল অস্ত্রের দ্বারা জীবের গলা কাটিতে হইবে, তবেই ঐ জীব খাওয়া হালাল হইবে, নতুবা হালাল হইবে না। যেমন হালাল জীব নিজস্ব সম্পত্তি হইলে হালাল হইবে, ঘুষের বা চুরির বা জোরদখলের জিনিস হইলে হালাল হইবে না।

সালাম, মোছাফাহা, মোয়ানাকা

দুইজন মুসলমান চাই যে কোন দেশের, যে কোন সমাজের, যে কোন বর্ণের, যে কোন ভাষার হউক না কেন দুইজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে একে অন্যকে সালাম করা এবং সালামের যখন তখন জওয়াব দেওয়া ইসলামের আদর্শ। সালামের জন্য যে বাক্য নির্ধারিত হইয়াছে তাহা এই—'আস্‌সালামু আলাইকুম' আর জওয়াবের জন্য এই বাক্য নির্ধারিত—'ওয়াআলাইকুমুস্-সালাম'। এত সুন্দর বাক্য এত সুন্দর পদ্ধতি অন্য কোন ধর্ম বা জাতির মধ্যে নাই। সালামের অর্থ "আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক এবং আমি আপনাকে আমার তরফ হইতে পূর্ণ নিরাপত্তার এগ্রিমেণ্ট দান করিতেছি।" দৈনিক মোলাকাতের সময় বা একদিনে কয়েকবার মোলাকাত হইলে প্রত্যেকবার মোলাকাতের সময় প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানকে হাসিমুখে সালাম করিবে। বড় যদি ছোটকে সালাম করে, তবে তাহা বড়র পক্ষে অন্যায় নহে, বরং বড়র পক্ষে তাহা সৌজন্য; কিন্তু ছোটর কর্তব্য যে, ছোটই বড়কে আগে নম্রভাবে সালাম করিবে। কিছু দীর্ঘকাল পরে মোলাকাত হইলে সালামের পর মোছাফাহাও করা উচিত। মোছাফাহা দুই হাত দিয়া করা বেশী নম্রতাব্যঞ্জক, এক হাত দিয়া মোছাফাহা করা যায়। মোছাফাহার সময় উভয়ে বলিবে— يَغْفِرُ اللّٰهُ لِىْ وَلَكُمْ 'আল্লাহ্ আমার গোনাহ্ মাফ করিয়া দিন, আপনার গোনাহ্ও মাফ করিয়া দিন।' দীর্ঘ দিন পরে মোলাকাত হইলে সালাম ও মোছাফাহার সঙ্গে মোয়ানাকাও করা যাইতে পারে। কিন্তু সালাম, মোছাফাহা, হাসি-আলাপ বিনিময় যেমন স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে হইতে পারিবে না—নিষিদ্ধ; তেমন যদি স্বামী-স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য কোন যুবক দুইজনের মধ্যে মোয়ানাকা অর্থাৎ কোলাকুলি করিলে উত্তেজনার আশঙ্কা থাকে, তবে এমন দুইজনের মধ্যে মোয়ানাকা হওয়া চাই না। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জোড় হাত করিয়া বা মাথা নত করিয়া বা মাথা মাটিতে রাখিয়া সেবা, নমস্কার বা প্রণামপ্রণিপাত করার প্রথা আছে—ইহা মানুষের সামনে মানুষের দাসত্বব্যঞ্জক এবং শির্‌কব্যঞ্জক জঘন্য প্রথা। সালাম বলার সময় জোড় হাত করার বা মাথা নত করার আদৌ আবশ্যক নাই। অবশ্য শব্দ না শুনা গেলে বা শুনা না যাইবার আশঙ্কা থাকিলে অথবা স্বাভাবিক আদব ও নম্রতা

প্রকাশের জন্য মূল বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে হাতের দ্বারা বা মাথার দ্বারা ইশারাও করা যাইতে পারে এবং মা-বাপ ও ওস্তাদ, পীরের বা স্বামীর, শ্বশুরের প্রতি গাঢ় ভক্তি ও মহব্বত প্রদর্শের জন্য পদ-চুম্বন বা হস্তচুম্বন করিতে চাহিলে তাহাও করা যাইতে পারে। পদ চুম্বনের বেলায় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন মাথা রুকূর মত বা সজ্‌দার মত নত না হয়; এর জন্য হাতের দ্বারা পদ স্পর্শ করিয়া হাতে চুমা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রথা চালুকরণের যোগ্য প্রথা নহে। আসল সুন্নত, ইসলামী আদর্শ সালাম-মোছাফাহা পর্যন্ত, বা বুযুর্গ লোকেরা বাচ্চাদের মাথায় হাত ফিরাইয়া দেওয়া পর্যন্ত। কোন কোন সমাজে “গুডমর্ণিং” বলিয়া সালাম করার প্রথা আছে; ইহা শিরকমূলক নয় বটে, কিন্তু নাস্তিকতাব্যঞ্জক। ইহার অনুকরণে আরব দেশে اصباح الخير বলার প্রথা চালু হইতেছে। ইহা অজ্ঞাতসারে নাস্তিকতার অনুপ্রবেশ। ইসলামের আদর্শের ন্যায় সর্বদিক রক্ষাকারী সর্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শ আর নাই।

জামাআতি নেযাম

স্বদেশে, বিদেশে, গ্রামে, শহরে যে কোন স্থানে কমপক্ষে তিনজন মুসলমান থাকিলে তাহাদের মধ্যে পরস্পর জামাআতি নেযাম—অর্থাৎ একতা শৃঙ্খলা থাকার বিধান ও নির্দেশ শরীঅতে আছে। তিনজন হউক বা ততোধিক হউক, তাহাদের একজনকে ইমাম অর্থাৎ নেতা ও মুরুব্বি নির্বাচন করিয়া লওয়া কর্তব্য। নির্বাচন এল্‌ম ও তাকওয়ার গুণের মাপকাঠিতে হওয়া উচিত। অর্থ, বংশ বা বর্ণের দিক দিয়া হওয়া উচিত নয়। যাহাকে ইমাম, নেতা বা মুরুব্বি নির্বাচিত করা হইবে, তাঁহার দায়িত্ব হইবে—জামাআতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করা। জামাআতের দায়িত্ব হইবে নেতার অনুমতি লইয়া অন্যত্র যাওয়া এবং কাজ করা। আর কাজ করিয়া নেতাকে এত্তেলা বা খবর দেওয়া। এই নেযাম, এই আদর্শ (নিয়ম) আজ মুসলমান সমাজে প্রতিপালিত হয় না বলিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা আসিয়া গিয়াছে। বিশৃঙ্খলার পরিণতি দুর্বলতা। এই বিশৃঙ্খলা এবং এই দুর্বলতা দূর করিতে হইবে।

অন্যান্য খণ্ডের অনুবাদের কালে আমি খুব কম পরিবর্তন পরিবর্ধন করিয়াই শুধু মাসআলাগুলি সাজানের মধ্যে কিছু তরতীব বদলাইয়া দিয়াছি। কিন্তু ষষ্ঠ খণ্ড যেহেতু লিখিত হইয়াছিল যে দেশের এবং যে কালের সামাজিক কু-প্রথা সংশোধনের জন্য; সে দেশ এবং সে কাল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, কু-প্রথাও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই আমি নগণ্য খাদেম স্বয়ং মোছান্নেফ আল্লামার সংসর্গে ২২ বৎসর কাল এল্‌ম দুরুস্ত ও পোখতা করার উদ্দেশ্যে থাকার ফলে যাহাকিছু কোরআন-হাদীসের আলো এবং এল্‌ম ও মা'রেফাৎ তাঁহার পদধূলির বরকতে আল্লাহ্‌ পাক এই নগণ্য দাসকে দান করিয়াছেন, তাহার আলোতে এই খণ্ডকে বলিতে গেলে অতি অল্প মাত্রায় তাঁহার লেখা বাকী রাখিয়া অবশিষ্ট সবটুকু তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরিবর্তন করিয়া লেখা হইয়াছে। কোন বিজ্ঞ আলেম ভাই দলিলের দিক দিয়া কোন ভুল পাইলে সে ভুল আমার হইবে, মোছান্নেফ আল্লামার নহে। আমাকে আমার জীবিত অবস্থায় জানাইলে ভুল সংশোধন করিয়া দিব। আমার মৃত্যুর পর কোরআন-হাদীসে মাহের (পারদর্শী) আলেমগণের কোরআন-হাদীসের আলোতে, কোরআন হাদীসের মাপকাঠিতে মাপিয়া সংশোধন এবং সমালোচনা করার অধিকার হামেশা থাকিবে।

নাচীয—**শামছুল হক**

বেহ্তরীন জেহীয

ভূমিকা

হযরত থানভী (রঃ) কর্তৃক লিখিত

অনুবাদঃ মাওলানা আবদুল মজীদ

এছলাহুন্নেছা নামক রেছালা প্রণয়নকালে স্ত্রীলোকদের জন্য অতি উপকারী একটি প্রবন্ধ পুরাকাজী নিবাসী, তেলাম রাজ্যের উকীল, মাদ্রাছায়ে আলীয়া দেওবন্দের সদ্যস্য হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব কর্তৃক লিখিত আমার দৃষ্টিগোচর হয়। তদীয় পুত্র মাওলানা নজরুল হক ছাহেবের বর্ণনা মতে প্রবন্ধ লেখার মূল উদ্দেশ্যঃ মাওলানা আবদুল হক ছাহেবের প্রিয়তম কন্যা আসআদী বেগমের শরীঅত অনুযায়ী বিবাহের পর বিদায়কালে এই প্রবন্ধখানা সঙ্গে দিয়াছিলেন যেন এই হেদায়ত অনুযায়ী আমল করিয়া দুনিয়ার শান্তি এবং আখেরাতে নাজাত পাইতে পারে। তাহার একটি কপি প্রকাশ করার অনুমতিপত্রসহ আমাকে দেওয়া হয়। এদিকে এছলাহুন্নেছা রেসালাখানা ছাপা হইয়া প্রেস হইতে বাহির হইতেছিল, তখন ঐ রেসালার পরিশিষ্ট হিসাবে এই প্রবন্ধখানা সংযোজিত করিয়া দেওয়াই সমীচীন মনে হইল। প্রবন্ধের মধ্যে গুটিকয়েক বাক্য ব্যক্তিবিশেষকে সম্বোধন করিয়া লেখা। বাকী অংশ সবটুকুই সর্বসাধারণের প্রতি একান্তভাবে প্রযোজ্য। মাওলানা ছাহেব প্রবন্ধখানার নাম রাখিয়াছেন "বেহ্তরীন জেহীয"। দো'আ করি, আল্লাহ্ তা'আলা যেন ইহাকে সকলের জন্য উপকারী এবং সমাজ হইতে মূর্খতা দূরীভূতকারী বানাইয়া দেন।

আহ্কার আশরাফ আলী

৩রা রবিউস্‌সানী

১৩৩০ হিজরী

الحمد لله

বেহ্তরীন জেহীয

সর্বপ্রথম করুণাময় আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পাক নবীর উপর শত সহস্র দরূদ।

আমার স্নেহাস্পদ কন্যা, হৃদয়ের টুকরা! তোমার (আসআদী বেগম) নামানুসারে আল্লাহ্ তোমাকে উভয় জগতে সৌভাগ্যবতী ও নেকবখ্ত বানান; এই আন্তরিক মোনাজাত।

এযাবৎ তুমি মায়ের স্নেহ-মমতায় এবং দয়ালু পিতার সুকোমল ছায়াতলে প্রতিপালিত হইয়াছ। তোমার সুখ-শান্তিই ছিল তোমার পিতামাতার কাছে সর্বাধিক অগ্রগণ্য। তোমার শিক্ষা-দীক্ষা, তোমার চারিত্রিক সংশোধন ও উন্নতির একমাত্র জিম্মাদার ও দায়ী ছিলেন তোমার পিতামাতা।

আজ হইতে তুমি একটি নতুন সংসারে পা দিয়াছ, যেখানে তোমার যাবতীয় স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন, আচার-ব্যবহারের জন্য একমাত্র তুমিই দায়ী। অতএব, আমি তোমাকে কয়েকটি উপদেশ দিতেছি। যদি তুমি উহা পুরাপুরি আমল কর, তবে ইনশাআল্লাহ্ দ্বীন ও দুনিয়ায় তুমি সফলকাম হইবে।

হেদায়ত ও নছীহতসমূহ

তওহীদ ও রেসালত ঃ

যাবতীয় কাজের মধ্যে আল্লাহ্‌র বন্দেগী এবং রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়রবীর স্থান সর্বাগ্রে; কাজেই এ কথাটি সদাসর্বদা অন্তরে জাগরুক রাখিবে। আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপরীত (খেলাফ) কেহ যদি কোন কাজ করিতে বলে, আদেশকারী যে কেহই হউক না কেন, কিছুতেই তাহা মানিও না। দেখ, আল্লাহ্ পাক কোরআন মজীদে মা-বাপের তাবেদারী করিতে খুব বেশী তাকীদ করিয়াছেন। এমন কি, হাদীসে বলা হইয়াছে, "সন্তানের বেহেশ্‌ত মা-বাপের পদতলে"—(হাদীস)। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যদি মা-বাপও কোন আদেশ করেন, তাহাও মানিও না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কালামে পাকে ফরমাইয়াছেনঃ

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ○

তর্জমা ঃ তোমার মা-বাপ যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কোন কিছুর শরীক করিতে বল প্রয়োগ করে—যাহা তোমার জানা নাই, তবে তুমি তাহাদের ঐ হুকুম পালন করিও না। অবশ্য পার্থিব ব্যাপারে তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে থাক। আমি যে তোমার জন্য "চল্লিশ হাদীস" পুস্তিকা সংকলন করিয়াছি এবং তুমি উহা তর্জমা সহকারে মুখস্থও করিয়াছ, উহাতে এই হাদীসটি আছেঃ

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ○

"যে কাজে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নাফরমানী প্রকাশ পায়, সেই কাজে কোন মানুষেরই হুকুম মান্য করা চলিবে না। অতএব, তোমার অন্তরের অন্তঃস্থলে যখন একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ধারণা বদ্ধমূল থাকিবে, তখন তুমি আপনা হইতেই আল্লাহ্‌র আদেশসমূহের পাবন্দ থাকিবে। শরীঅতের আদেশ এবং আল্লাহ্‌র হুকুম অনেক আছে, যাহা তুমি অল্প-বিস্তর দ্বীনি পুস্তকে বিশেষতঃ বেহেশ্‌তী জেওরে পড়িয়াছ। এখানে সেগুলির পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নাই। অবশ্য তন্মধ্যে যেগুলি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, অতি সংক্ষেপে সেগুলি বর্ণিত হইতেছে।

নামায ঃ

আল্লাহ্‌র একত্ব এবং রাসূলের রেসালতের প্রতি মনের অটল বিশ্বাস স্থাপনের পর যে বিষয় সম্বন্ধে কোরআন শরীফে অতি গুরুত্ব সহকারে স্থানে স্থানে তাকীদ আসিয়াছে; তাহা হইল নামায। ইহা ইসলামের এমন সুদৃঢ় স্তম্ভ এবং অপরিহার্য ফরয যে, কোন আকেল-বালেগের জন্য উহা হইতে অব্যাহতি নাই। বাড়ীতেই থাক আর সফরেই যাও, রীতিমত নামায আদায় করিবে। অধিকাংশ মেয়েলোক নামাযের পাবন্দ হওয়া সত্ত্বেও সফরে নামাযের বেশী খেয়াল ও লক্ষ্য রাখে না। এদিকে তুমি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিও।

জাহাজ বা গাড়ীর সফরে নামায :

সফরেও যেন তোমার নামায ক্বাযা হইতে না পারে। রেলগাড়ীতেই সফর কর কিংবা গরুর গাড়ীতে। গরুর গাড়ী তো তোমারই আয়ত্তে। মাঠে থামাও এবং এক পাশে গিয়া বোরখা পরিয়া অথবা বড় একটি চাদরে আবৃত হইয়া নামায পড়িয়া লও। যদি ওযূ না থাকে, তবে গরুর গাড়ীর আড়ালে বসিয়া ওযূ করিয়া লও, আর যদি রেলগাড়ীতে সফর কর, তবে মেয়েদের নির্ধারিত গাড়ীতে সফর করিও; সেই গাড়ীতে যত ভিড়ই হউক না কেন, নামায পড়িবার পাক্কা এরাদা (দৃঢ়) থাকিলে নামাযের জায়গা নিশ্চয়ই পাইবে। অনেক ষ্টেশনে রেলগাড়ী এতটুকু দাঁড়ায় যে, দুই তিন রাকা'আত নামায পড়া যায়। কেননা, শরয়ী সফরে নামায হয়ত দুই রাকা'আত, নচেৎ তিন রাকা'আত, এতটুকু অবসর অবশ্যই পাওয়া যায়। শরয়ী সফরে সুন্নত ও নফল পড়িতে না পারিলে তত বেশী দোষ নাই। কিন্তু ফরয ওয়াজিব সফরেও ছাড়িও না। আর যদি মেয়েদের জন্য নির্ধারিত গাড়ীতে আরোহণ না করিয়া থাক, তবে তোমার স্বামী কিংবা তোমার মাহরাম আত্মীয় হয়ত নিকটেই বসা থাকিবে। সে নিশ্চয়ই তোমার কাজের জিম্মাদার। মোটকথা, অটল ও দৃঢ় ইচ্ছার সম্মুখে কোন বাধা নাই। পুরুষই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক, যে নেহায়ত দৃঢ়তার সহিত নামাযের পাবন্দ, সে সফরেও নামায যেরূপেই পারে পড়িয়া লইবে। রেলগাড়ী যদিও নিজের আয়ত্তে নহে, কিন্তু নামায ক্বাযা করিবার জন্য ইহা ওযর নহে। আমি খুব সন্তুষ্ট যে, তুমি খুব ধীরে সুস্থে নামাযের আরকান পূর্ণরূপে আদায় কর। আমি দো'আ করি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নেক কাজের আরও অধিক তৌফিক দান করুন। ফরযের সাথে সাথে সুন্নতে মোআক্কাদারও পাবন্দ থাকিও। সম্ভব হইলে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নত নফল পড়িও।

তাহাজ্জুদের নামায :

তাহাজ্জুদের নামাযে বহুত বড় সওয়াব। আমাদের রাসূলুল্ললাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় তাহাজ্জুদের নামায পড়িয়াছেন। কোন সময় রাত্রে পড়িবার সুযোগ না পাইয়া থাকিলে দিনের বেলায় পড়িয়াছেন। তাঁহার পবিত্র বিবিগণও তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। তাহাজ্জুদের সময় দো'আ কবূল এবং রহ্মত নাযিল হয়।

কোরআন তেলাওয়াত :

কোন এক নামাযের পর কোরআন মজীদ তেলাওয়াতও করিও। ফজরের নামাযের পর তেলাওয়াতের সময় নির্ধারিত করা খুবই উত্তম। তুমি কোরআন শরীফ তর্জমাসহ পড়িয়াছ। কাজেই তেলাওয়াতের সময় তর্জমার প্রতি খেয়াল রাখিও, যেখানে বুঝে না আসে জিজ্ঞাসা করিয়া লইও। ইহা অত্যন্ত খুশীর বিষয় যে, তুমি কোরআন শরীফ পড়ার সময় প্রত্যেকটি হরফ তাহার নির্দিষ্ট স্থান হইতে উচ্চারণ কর। আ'ইন, 'হা-হোত্তী' ইহাদের নির্দিষ্ট স্থান হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অধিকাংশ মেয়েলোকের কোরআন শরীফ পড়ার মধ্যে দেখা যায় যে, মাখরাজ হইতে তাহাদের হরফ উচ্চারিত হয় না, "হা-হোত্তী"র স্থলে "হা-হাওয়ায" এবং 'আইনে'র স্থলে আলেফ অর্থাৎ হামযা বাহির হয়।

রোযা :

রোযার বিষয়ে তোমাকে তাকীদ করার প্রয়োজন নাই। কেননা, নিজেই রমযান শরীফ ব্যতীত অন্যান্য নফল রোযাও রাখিয়া থাক। যেমন অন্যান্য মেয়েদেরও এইরূপ অভ্যাস। বিশেষ করিয়া রোযার ব্যাপারে মেয়েদের সাহস পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী; তবুও এতটুকু বলার প্রয়োজন

মনে করি যে, রোযাকে পাক ছাফ রাখিবে। কিন্তু সর্বাবস্থায় গীবত বা পরনিন্দা হইতে বাঁচিয়া থাকা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, গীবত অতি বড় কবীরা গোনাহ্। এবিষয়ে কোরআন শরীফ এবং হাদীসে কঠোরভাবে ভীতি ও ধমকীর উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ রোযার মধ্যে অনেক বেশী খেয়াল রাখিবে যেন কাহারও গীবত না কর। গীবত করিলে রোযার ছওয়াব নষ্ট হইয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এমন রোযার কোন পরওয়া করেন না, যে রোযায় মানুষ মিথ্যা এবং গীবতে লিপ্ত থাকে।

যাকাত ঃ

যাকাত ফরয। তাহার শর্তাবলীর বিস্তারিত বিবরণ এবং সোনা-চান্দির নেছাবের পরিমাণ এবং যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ বিবরণ যাহা কোরআনে উল্লেখ আছে, সবই তোমার জানা আছে। উহার পুনরাবৃত্তির এখানে প্রয়োজন নাই। এখানে শুধু এতটুকু বলার বিষয় যে, অধিকাংশ মেয়েলোক যাকাত সম্পর্কে বেপরোয়া থাকে। প্রথমতঃ, ধনসম্পদ একটি প্রিয় বস্তু। স্বভাবতঃই অন্তর উহাকে পৃথক করিতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ অলসতা এবং উদাসীনতার দরুন যাকাত পরিশোধ করা হয় না, যাকাত আদায় করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যেসব অলংকার আমি তোমাকে দিয়াছি, তাহা নেছাব পরিমাণ হইবে। সদাসর্বদা উহার যাকাত আদায় করিও, যদি স্বামী স্ত্রীর পক্ষ হইতে যাকাত দেয়, তাহাও জায়েয। যদি কোন স্ত্রীলোক নিজের মালের যাকাত নিজস্ব সম্পত্তি হইতে আদায় করে কিন্তু স্বামী নিষেধ করে, তবে স্বামীর কথা মান্য করা চলিবে না, যেরূপ উপরে হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে— لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

এই মাসআলা শুধু তোমাকে জ্ঞাত করাইবার উদ্দেশ্যে লিখিলাম। নতুবা খোদা চাহে ত কখনও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে না; বরং শরীঅতের অন্যান্য মাসআলা ও ফরযসমূহের পাবন্দির তাকীদ আরো বেশী পরিমাণে করা হইবে। এখানে সুবিধার জন্য দশ টাকা হইতে এক হাজার টাকা পর্যন্ত কত টাকায় কত পরিমাণ যাকাত দিতে হয় তাহার একটা তালিকা লিখিয়া দিতেছি ঃ

টাকার পরিমাণ	যাকাতের পরিমাণ
টাকা ১০০০·০০	টাকা ২৫·০০
টাকা ৯০০·০০	টাকা ২২·৫০
টাকা ৮০০·০০	টাকা ২০·০০
টাকা ৭০০·০০	টাকা ১৭·৫০
টাকা ৬০০·০০	টাকা ১৫·০০
টাকা ৫০০·০০	টাকা ১২·৫০
টাকা ৪০০·০০	টাকা ১০·০০
টাকা ৩০০·০০	টাকা ৭·৫০
টাকা ২০০·০০	টাকা ৫·০০
টাকা ১০০·০০	টাকা ২·৫০
টাকা ৫০·০০	টাকা ১·২৫
টাকা ২৫·০০	টাকা ·৬২
টাকা ২০·০০	টাকা ·৫০
টাকা ১০·০০	টাকা ·২৫

উপরোক্ত তালিকা দ্বারা মধ্যবর্তী অংকের যাকাত বাহির করাও সহজ হইবে। যেমন ১৫০ (দেড়শত) টাকার যাকাত জানিতে চাহিলে তালিকা হইতে ১০০ টাকার যাকাত দেখ, অতঃপর ৫০ টাকার যাকাত দেখ, একত্রে যাকাতের উভয় সংখ্যা যোগ দাও, দেড়শত টাকার যাকাত বুঝে আসিবে। তদ্রূপ ৭৫ টাকার যাকাত জানিতে চাহিলে পঞ্চাশ এবং পঁচিশ টাকার যাকাত যোগ দাও, ৭৫ টাকার যাকাত বুঝে আসিবে।

হজ্জ ঃ

হজ্জ করিবার মত সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ ফরয হয়। যাহার উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে অথচ হজ্জ করে না, এমন লোকের প্রতি হাদীসে কঠোর ধমকি ও তাম্বীহ উল্লেখ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির প্রতি অমুসলমান হইয়া মরিবার ধমকি দিয়াছেন। আমার জানা আছে, যে পরিমাণ অলংকারাদিতে হজ্জ ফরয হয়, সেই পরিমাণ অলংকার তোমার কাছে নাই। মেয়েলোকের কাছে শুধু রাহা খরচ থাকিলে হজ্জ ফরয হয় না। বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত আসা যাওয়া, খাওয়া খরচ ব্যতীত সঙ্গে মাহ্‌রাম ব্যক্তি বা স্বামী থাকাও শর্ত। এই মাসআলা তুমি দ্বীনি রেসালায় পড়িয়াছ। আল্লাহ্ যদি তোমাকে হজ্জ করার মত তৌফিক দেন, তবে তুমি ইতস্ততঃ না করিয়া হজ্জ আদায় করিবে।

পতিভক্তি ঃ

এখন তোমার কর্মজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনা করিব। স্ত্রীর উপর স্বামীর আদেশ পালন ফরয। হাদীস শরীফে ইহার বহুত তাকীদ আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যদি আমি কোন মানুষকে সজ্‌দা করার আদেশ করিতাম, তবে রমণীদিগকে আদেশ করিতাম যে, তাহারা যেন নিজ নিজ স্বামীকে সজ্‌দা করে। কিন্তু আমাদের শরীঅতে যেহেতু তাযীমী সজ্‌দা হারাম, এই জন্য রাসূল্লাল্লাহ্ (দঃ) কাহাকেও সজ্‌দা করার অনুমতি দেন নাই। অত্র হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া খেয়াল করা দরকার যে, শরীঅতে স্বামীর ফরমাঁবরদারীর আদেশ কত তাকীদ সহকারে করা হইয়াছে। যে নারী স্বামীর নাফরমান এবং স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট, এমন নারী আল্লাহ্‌র রহ্‌মত হইতে বহু দূর থাকিবে, যতক্ষণ সে তাহার স্বামীকে সন্তুষ্ট না করিবে। স্মরণ রাখিবে, যদি কোন স্বামী ফরয কাজ সমাধা করিলে নারায হয় তবে তৎপ্রতি পরওয়া করিবে না। কেননা لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কাহারও ফরমাঁবরদারী চলে না। এই হাদীসখানা কয়েকবার বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানেও শুধু স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য লিখিত হইল। নচেৎ খোদা চাহে ত, এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন তুমি হইবে না। যেই রমণীর মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকিবে, সেই নারীর প্রতি তাহার স্বামী কখনও অসন্তুষ্ট হইবে না। শেখ সাদী (রঃ) বোস্তাঁর একটি বয়াতে গুণ তিনটি একস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

زن خوب وفرماں بروپارسا کند مرد درویش راپادشاه

অর্থাৎ, *'সুশ্রী' তাবেদার ও দ্বীনদার নারী,*
দরিদ্র স্বামীকে করে রাজ্যের অধিকারী।'

শেষোক্ত গুণ দুইটি মানুষের আয়ত্তে। যদি কোন রমণীর মধ্যে প্রথমোক্ত গুণটি নাও থাকে, তবে শেষোক্ত গুণ দুইটি বিদ্যমান থাকিলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুমধুর ও সুখময় হইবে। আর যদি প্রথমোক্ত গুণটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শেষোক্ত গুণ দুইটি বিদ্যমান না থাকে, তবে এমন নারী

দুনিয়াতেও বদনামের ভাগী এবং পরকালে তাহার জন্য কঠোর আযাব রহিয়াছে। যে স্ত্রীলোক স্বামীর তাবেদার না হয়, কিংবা বদমেযাজ হয়, কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে, সেই নারী সম্পর্কেও শেখ সাদী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

زن بد درسرائے مرد نیکو همدرین عالم است دوزخ او

অর্থাৎ, *'নেক্‌কার স্বামী গৃহে নারী বদকার*
দোযখ দেখিবে এই বিশ্বের মাঝার।'

বাস্তব সত্য কথা এই যে, যেই সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুখের না হয়, সেই সংসার জাহান্নাম সদৃশ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাহাদের প্রতি লোকেরা হাসাহাসি করে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবন-যাত্রা দুর্বিষহ হইয়া উঠে। কোন কোন স্থানে আমি এই অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আর যেই সংসারে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সুমধুর, সেই সংসার যদিও দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের হয়, তবুও উহা ধন-ভাণ্ডার ও শাহী মহল হইতে শতগুণে উত্তম; বরং উহা বেহেশ্‌তের নমুনায় রূপায়িত হইয়া যায়।

কোন কোন সময় ইহাও সম্ভব যে, তোমার ধারণা মতে স্বামীর অসন্তুষ্টি একেবারেই অকারণ এবং এমনও হইতে পারে যে, বাস্তবে তোমার ধারণাই সত্য; এমতাবস্থায়ও অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে খুব বুদ্ধিমত্তার সহিত সহ্য করিবে। এমনকি, তোমার কথায় তো দূরের কথা, ইশারা-ইঙ্গিতেও যেন প্রকাশ না পায় যে, তাহার ক্রোধ করা অন্যায় এবং রাগ করা অমূলক ছিল। তোমার এই ধৈর্য অবশেষে এক দিন তাহাকে অবহিত করিবে যে, তাহার এই রাগ অকারণে ছিল। ইহার পরিণতি অতীব শুভ এবং তোমার প্রতি অত্যধিক দয়া ও মেহেরবানীর কারণ হইবে। এরূপ ব্যবহারে তো শত্রুও মিত্র হয়; আর স্বামী তো স্বামীই। অবশ্য এই ধৈর্য ধারণকালে এদিকে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখিও যেন, তোমার চোখ ভ্রূ-কুঞ্চিত না হয়; বরং প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকিবে। কথাবার্তায় চালচলনে কিছুতেই যেন অসন্তুষ্টির ভাব ফুটিয়া না উঠে। স্বামীর সহিত কথাবার্তা বলার সময় তাঁহার মর্যাদার ও মর্তবার প্রতি খুব খেয়াল রাখিও। মনখোলা কথাবার্তা বলার সময়ও এদিকে লক্ষ্য রাখিও। সম্বোধনে এমন শব্দ কিছুতেই ব্যবহার করিও না, যদ্দ্বারা বেআদবি বুঝে আসে। স্বামী কোন কথা বলিলে প্রথমে খুব মন দিয়া শুন, তারপর আদব সহকারে যথাযথ উত্তর দাও। উত্তর অতি উচ্চস্বরেও দিও না, আবার এত নিম্নস্বরেও দিও না যে, আওয়ায শুনা না যায়। স্বামী যদি কোন ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হন কিংবা ভুল বুঝিয়া থাকেন, তবে ঐ ঘটনা সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি অতি আদব ও ভক্তি সহকারে খণ্ডন করিতে চেষ্টা কর। এমন শব্দ প্রয়োগ করিও না যাহাতে স্বামীর প্রতি ঐ ব্যাপারে অজ্ঞতার কটাক্ষ হয়। আর যদি মানবতা সুলভ দুর্বলতার কারণে তোমার দ্বারা কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হইয়া যায়, অথবা কোন কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া পড়ে, তবে উহা স্বীকার করিয়া মাফ চাহিয়া লও, ইহার ফল হইবে অতীব শুভ। স্বামীর কাছে যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় দ্বীনি মাসআলা বিষয়কই হউক কিংবা সাংসারিক কোন কথা হউক, তবে উহা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা কর এবং ভালরূপে বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হও।

درطلب کردن حقیقت کار ازخدا شرم دار وشرم اومدار

অর্থাৎ, কোন বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা জানিবার বাসনা হইলে লজ্জা করিবে না, আল্লাহ্‌র সহিত লজ্জা করিবে, যেন গোনাহ্ না হয়।

স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ঃ

স্ত্রীলোকের সচরাচর অভ্যাস, তাহারা স্বামীর না-শুক্‌রি করে; এই অভ্যাস অতি জঘন্য। স্বামী কিংবা শ্বশুরের পক্ষ হইতে যাহাকিছু খাদ্য-দ্রব্য পাও, উহা কৃতজ্ঞতা সহকারে কবূল করা কর্তব্য। যত সামান্য ও নগণ্যই হউক না কেন, উহার প্রতিও শোক্‌র করা ওয়াজিব। লক্ষ লক্ষ লোক এরূপ আছে যাহারা তোমার মত খাইতে বা পরিতে পায় না এবং তোমার মত আরামেও তাহারা নাই। খাওয়া, পরা, ধন-দৌলতের কোনটিরই লোভ করিও না। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা, উহাতে শক্ত গোনাহ্‌ ব্যতীত মানুষ নিজে নিজেই আযাবে লিপ্ত থাকে। পার্থিব ও বৈষয়িক ব্যাপারে হামেশা নিজের চেয়ে হীন অবস্থাসম্পন্নদের প্রতি দৃষ্টি রাখ এবং দ্বীনের কাজে সব সময় যাহারা তোমার ঊর্ধ্বে সে দিকে নজর রাখ। এরূপ করিলে তুমি দুনিয়াতে সুখী হইবে এবং নেক কাজের তৌফিক পাইবে।

শ্বশুর বাড়ীর লোকদের সহিত আচার-ব্যবহার ঃ

বড়দের সহিত ব্যবহার ঃ

নিজের স্নেহময়ী মাতার ন্যায় প্রত্যেক কাজে শাশুড়ীর আদব করিও এবং সর্বাবস্থায় তাঁহার সন্তুষ্টি অগ্রগণ্য মনে করিও। তোমার যতই কষ্ট বা আরাম হউক না কেন, কিন্তু তাঁহার মর্জির বিপরীত এক পা-ও আগে বাড়াইও না। মুখে এমন কোন কথা উচ্চারণ করিও না, যাহাতে তাঁহার কষ্ট হয়। তাঁহার সাথে যখন কথা বল কিম্বা তাঁহাকে যখন সম্বোধন কর, তখন নিজের সমকক্ষদের সাথে যেইরূপ সম্বোধন কর সেইরূপ করিও না; বরং মুরব্বীদের জন্য যে শব্দ প্রয়োগ করা উচিত তাহাই ব্যবহার কর। তোমার শাশুড়ী যদি কোন কাজে তোমাকে তাম্বীহ্‌ করেন, তবে উহা নীরবে শুন; যদিও মনের বিপরীত এবং কটু কথাও বলেন (যাহা আশা করা যায় না), তবুও সুস্বাদু শরবতের ন্যায় অনায়াসে পান কর (সহ্য কর)। খবরদার! কস্মিনকালেও কঠোরভাবে প্রতি-উত্তর করিও না। নিজের মায়ের সমতুল্য তাঁহার খেদমত কর। তিনি যদি অন্য কাহাকেও কোন কাজের আদেশ করেন, তৎক্ষণাৎ সে কাজ তুমি নিজেই করিয়া ফেল। মেহেরবান পিতার ন্যায় শ্বশুরের তা'যীম ও শ্রদ্ধা কর। শাশুড়ীর সহিত কথা-বার্তা বলার যে আদব কায়দা লিখিয়াছি, শ্বশুরের বেলায়ও সে দিকে লক্ষ্য রাখ। তোমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, "তোমার শ্বশুর কোথায় গেছেন?" তদুত্তরে বল যে, "অমুক স্থানে তশরীফ নিয়া গেছেন।" যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "অমুক বিষয়ে তোমার শ্বশুর কি বলিয়াছেন?" তদুত্তরে তুমি বল যে "তিনি এরূপ ফরমাইয়াছেন।" তাঁহাকে আরাম পৌঁছানের এবং তাঁহার খেদমতের যথাসাধ্য চেষ্টা কর। কোন উৎসবে যোগদান করিতে হইলে কিংবা কোন বান্ধবীর সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে নিজের শ্বশুর ও স্বামীর নিকট হইতে অনুমতি লও। তাঁহারা যদি উপস্থিত না থাকেন, তবে শাশুড়ীর কাছে অনুমতি চাও। যদি অনুমতি দেন, তবে যাও, নতুবা যাইও না। যদি কোন উৎসবে যাইতে বলেন, তোমার মন না চাহিলেও যাও। কেননা, খোদা না করুন ইহা সম্ভব নহে যে, তোমাকে এমন স্থানে যাইতে বলিবেন, যেখানে শরীঅত বিরোধী কোন কাজ হয়। যে বাড়ীতে বা মজলিসে শরীঅত বিরোধী কাজ হয়, তথায় যাওয়া নিষেধ।

শ্বশুর বাড়ীর কোন মহিলা যদি বয়সে তোমার চেয়ে বড় হয়, যেমন স্বামীর বড় ভাইর বিবি; তাঁহার সহিত কথাবার্তা উঠা-বসায় তাঁহার মর্তবার প্রতি লক্ষ্য রাখিও এবং তাঁহার সহিত দুধ-মিশ্রির মত এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিও যেন উভয়ে সহোদরা ভগ্নীদ্বয়, একজন বড়

ও একজন ছোট। যদি তুমি এমন ব্যবহার কর, তবে অপর পক্ষও তোমার সাথে এইরূপই ব্যবহার করিবে। আর যদি সে বয়সে ও মর্তবায় তোমার চেয়ে ছোট হয়, তবে তাহার সাথে স্নেহ ও মহব্বত সুলভ ব্যবহার কর এবং তাহাকে অতি নম্র ও শান্তভাবে ভাল ভাল কথা শিক্ষা দিতে থাক। সে কোন কাজ করিতে আরম্ভ করিলে তুমি নিজে উদ্যোগী হইয়া তাহার সহায়ক হইয়া ঐ কাজ সমাধা কর। অনুরূপ স্বামীর ভগ্নী, ভাগিনী ইত্যাদির সহিত যার যার মর্তবা অনুযায়ী সম্ভ্রম ও নম্র ব্যবহার কর, কিন্তু ইহাতেও মধ্যপন্থার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখিও। কেননা, মধ্যপন্থায় অতীব নম্রতা ও সম্ভ্রম ব্যবহার সদাসর্বদা রক্ষা করিয়া চলা সু-কঠিন। নিজের বাড়ীতে বিশেষ কোন উৎসব উপলক্ষে যখন মেয়েদের সহিত একত্রিত হও, তখন কাহারও সম্পর্কে তাহার অগোচরে এমন কোন কথা বলিও না যে, এই কথা তাহার কর্ণগোচর হইলে সে ইহা খারাব মনে করিবে; ইহাকেই গীবত বলে। গীবত করার গোনাহ্ অতি কঠোর। ইহা সম্পর্কে আগেও আমি রোযার বয়ানে কিছু বর্ণনা করিয়াছি। এখানে এই কথাটা শুধু উল্লেখযোগ্য যে, কেহ্ কেহ্ বলিয়া থাকে যে, আমি তো কোন মিছা কথা বলিতেছি না; যাহা বলিতেছি, তাহা তো অমুকের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

স্মরণ রাখিও, ইহা নফ্‌সের একটি ধোঁকা। কাহারও কোন দোষ বর্ণনা করিলে যদি সে দোষ তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবেই তো উহাকে গীবত বলে, বাস্তব দোষ বর্ণনার নামই গীবত। আর যদি ঐ দোষ তাহার মধ্যে না থাকে, তবে তো দ্বিগুণ গোনাহ্ হয়। এই প্রকার গীবতের নাম তোহ্‌মত।

ছোটদের প্রতি ব্যবহারঃ

বাড়ীতে যেসব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে, তোমার শ্বশুরেরই হউক বা বাড়ীতে অবস্থানকারী অন্য কোন আত্মীয়েরই হউক, তাহাদের সাথে অতিশয় স্নেহমমতা সুলভ ব্যবহার কর।

হাদীস শরীফে আছেঃ

عن ابن عباس رض قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْكَبِيْرَنَا – رواه ترمذى مشكوة

'যে ব্যক্তি বড়দের আদব করে না ও ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।' আমাদের রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদিগকে বড় ভালবাসিতেন। এমনকি একবার একটি ছোট শিশু তাঁহার কোলে পেশাবও করিয়াছিল। —মেশকাত

কোন কোন স্ত্রীলোক যাহারা শিশুদিগকে স্নেহ করে, তাহারা ছেলেপিলেকে কাছে আসিবার জন্য এই বাহানা করিয়া ডাকে যে, আস, আমি তোমাকে একটি বস্তু দিব, অথচ কিছু দেওয়ার ইচ্ছা নাই। শুধু ডাকিয়া আনাই উদ্দেশ্য; কিন্তু এরূপ বলা এক প্রকার মিথ্যা। কখনও এরূপ করিও না।

একদা রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে একজন স্ত্রীলোক শিশুকে কিছু দিবে বলিয়া ডাকিল, কিন্তু সে মিছামিছি প্ররোচনা দেয় নাই; বরং শিশুকে কোন কিছু দিয়াছিল। রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তুমি ইহাকে কিছু না দিতে, তবে মিথ্যা হইত। —আবু দাউদ, বায়হাকী

চাকর চাকরাণীর সহিত ব্যবহার ঃ

বাড়ীতে যদি কান চাকরাণী থাকে, তবে তাহার দ্বারা তাহার সাধ্যাতীত কাজ লইও না। কোন কাজ তাহার কষ্টসাধ্য হইলে ঐ কাজে নিজের সহায়তা করা কর্তব্য। তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিও না। সে রোগাক্রান্ত হইলে কিংবা কোন কষ্টে পতিত হইলে তাহাকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিও । চাকরাণীদের সাথে তোমার মাতার ব্যবহার তুমি দেখিয়াছ। কোন চাকরাণীর মাথায় একটু ব্যথা অনুভব হইলে কাজের ফরমাইশ তাহাকে না দিয়া তোমার মা নিজেই সেই কাজ করিয়াছে। অবশ্য এরূপও করা চাই না, যাহতে চাকর-চাকরাণীরা একেবারে আরামপ্রিয় ও কামচোরা হইয়া যায়। চাকরাণীদেরকে নিষ্কর্মা করিয়া রাখা বাস্তবে ইহা তাহাদের সহিত শত্রুতা করা। কেননা, সে অন্যত্র যেখানেই যাইবে, সর্বদা গৃহকর্ত্রীর গালমন্দ শুনিবে। খাওয়া-দাওয়ার কোন উৎকৃষ্ট বস্তু তোহ্ফা স্বরূপ কোথাও হইতে আসিলে, উহা হইতে চাকরাণীদের কিছু কিছু দেওয়া উচিত। তোমার মাতার ব্যবহার তুমি নিজ চক্ষেই দেখিয়াছ যে, জিনিস যত অল্পই হউক না কেন, তবুও চাকরাণীর একটা অংশ রাখা হইত। তোমার মাতার এই আচরণ দেখিয়া মনে মনে ভারী আনন্দিত হইতাম যে, সৃষ্টিগতভাবে তোমাদের মধ্যে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার গুণ বিদ্যমান আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এই সৎগুণে আরো উন্নতি দিন। নিজ স্বামী এবং বাড়ীর অন্যান্য মেয়েলোকদের সহিত এই ব্যবহার করিতে থাকিও।

মেহ্মানদারী ঃ

যেসব মহিলা অন্দর মহলে এবং পুরুষ বহির্বাটীতে মেহ্মান হইয়া আসে, স্বামীর মর্জি অনুযায়ী উদার মনে তাহাদের মেহ্মানদারী করা কর্তব্য। মেহমানদের খাতিরে নিজেদের স্বাভাবিক খাদ্যের চেয়ে একটু জাঁকজমকপূর্ণ খানার ব্যবস্থা করা জায়েয আছে; কিন্তু অপব্যয়ের সীমায় যেন না পৌঁছে। আর যদি কোন মেহ্মান মোত্তাকী, আল্লাহ্‌র নেকবান্দা হয়; তবে তাহার মেহ্মানদারীকে বরকতের কারণ এবং সৌভাগ্য মনে করা চাই। যে কোন মেহ্মানই হউক না কেন, কখনও সংকীর্ণমনা হওয়া উচিত নহে। আমাদের রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরকেও মেহ্মানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যদি মেহ্মানের খাতিরদারি এবং তাহাকে আরো মেহ্মান রাখিবার জন্য আরজু বা অনুরোধ করায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মেহ্মানের ক্ষতি হয় এরূপ পীড়াপীড়ি ভাল নয়। মেহ্মান কোন দরকারী কাজের জন্য বিদায় হইতে চায়, তবে মেজবান তাঁহাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দোহাই দেওয়া অতি অন্যায়। বস্তুতঃ ইহা কিছুতেই ভাল কাজ নহে যে, বাড়ীওয়ালার আবদার ও পীড়া-পীড়িতে মেহ্মান অসন্তুষ্ট হয় ও তাঁহার ক্ষতি হয়। হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ ছাহেব গাঙ্গুহী (কুদ্দিসা ছিররুহু) এমন পীড়াপীড়ি কখনও পছন্দ করিতেন না।

মেহ্মানের খাতিরদারী, খেদমত-গোযারী যাহাকিছু করা হয়, তজ্জন্য অর্থাৎ মেহ্মানদারী করিয়া মেহ্মানের প্রতি এহ্ছান করিতেছ, কখনো একথা মনে করিও না; বরং মেহ্মানই তোমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছে যে, তাহার নিজের নির্ধারিত খাদ্য তোমার এখানে আসিয়া খাইয়াছে এবং তোমাকে সওয়াবের ভাগী করিয়াছে।

شکر بجا ارکہ مہمان تو روزئےخود میخورد برخوان تو

অর্থ—শুক্‌রগুযারী কর যে, তোমার মেহ্মান তোমার দস্তরখানায় বসিয়া তাহার নিজের জীবিকাই খায়।

এইরূপে যদি কাহারও প্রতি কোন এহ্‌ছান করিয়া থাক, তবে কোন সময় সে এহ্‌ছান উল্লেখ করিয়া তাহার মনে আঘাত দিও না। পবিত্র কোরআন শরীফ হইতে প্রমাণিত আছে যে, এহ্‌ছান জিতাইলে (খোঁটা দিলে) সদ্ব্যবহার করার ছওয়াব বাতিল হইয়া যায়। দান-এহ্‌ছান শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হওয়া চাই।

সাধারণ আচার ব্যবহার ঃ

সংসারের কাঠামো দৃঢ় ও মজবুত করার জন্য এবং উহাকে উন্নত ও ঊর্ধ্বগামী বানাইবার জন্য এবং উহার রওনক বৃদ্ধির জন্য বাটীস্থ লোকদের উপরোল্লিখিত গুণাবলী অর্থাৎ সুন্দর আচার-ব্যবহার, উৎকৃষ্ট লেনদেন, সৎস্বভাব ইত্যাদির সাথে সাথে সংসার ও গৃহস্থালীর উত্তম ব্যবস্থাপনা ও সুনিয়মতান্ত্রিক সংস্থা একটি নেহায়েত জরুরী জিনিস। সংসারের ব্যবস্থাপনা যদি যথাযথ ও সঠিক না হয়, তবে বিত্ত ও সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও বাড়ীতে কষ্ট ও অমঙ্গল নামিয়া আসিতে আমি স্বচক্ষে অনেক ধনী লোকের বাড়ীতে দেখিয়াছি।

গৃহকর্মের সুব্যবস্থা ঃ

বাড়ীর মেয়েলোকদের মধ্যে সংসারে সুব্যবস্থার যথাবিহিত নিয়ম-পদ্ধতির জ্ঞানের অভাবে তাহাদের বাড়ীর অবস্থা কপর্দকহীন কাঙ্গালদের চেয়েও নিকৃষ্ট। ঘর-সংসারের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ব্যয়ের পরিমাণ ও তাহার স্থানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে ; ব্যয়ে স্থানবিশেষে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে। আয়ের চেয়ে ব্যয় যেন বেশী না হয়। আবার ব্যয়ের মাত্রা কমাইয়া কৃপণও সাজিও না। কোরআন পাকে কৃপণতা এবং অপব্যয় এতদুভয়ের দোষ ও অপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। টাকা পয়সার এতদূর মায়া মহব্বত যে, পয়সা পয়সা করিয়া জমা করার ফিকিরে পড়িয়া নিরানব্বই পাল্লায় গিয়া পড়ে। ইহা অতীব দূষণীয়। তাহা ছাড়া ইহাতে জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হইয়া পড়ে। অবশ্য মধ্যবর্তিতা এমন পন্থা যে, উহাতে মানুষকে কেহ কৃপণও বলে না, অপব্যয়ীও না। প্রয়োজনের সময় তাহার কোন কাজ আটকাইয়া থাকে না। টাকা পয়সা যাহার হাতে ব্যয় হয় ব্যয়ের স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাহারই কাজ। তাহার খেয়াল করা উচিত কোন্ জায়গায় কি পরিমাণ খরচ করা কর্তব্য। এ সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয় বিস্তারিত লেখা দুষ্কর। স্বামীর অনুমতিক্রমে যদি দৈনন্দিন খরচের হিসাব লিখিয়া রাখ এবং প্রত্যহ কিংবা সপ্তাহে একবার ঐ হিসাব স্বামীকে দেখাও, তবে ইহা খুবই স্বস্তি বিষয়ক ও আস্থার কারণ। হিসাব এমন উত্তম জিনিস যে, দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের উপকারী। ডাল, চাউল, আনাজ ইত্যাদি যাহাকিছু বাড়ীতে আসে, মাপিয়া ওজন করিয়া রাখিবে। এইরূপে টাকা-পয়সাও গণিয়া রাখিবে। কোন লোককে কর্জ দিলে কিংবা ধার লইলে তাহাও লিখিয়া রাখিবে এবং উসুল হইলে বা কর্জ শোধ করিলে তাহাও লিখিয়া রাখিবে।

এমন কি, লিখা ব্যতীত ধোপার কাছেও কাপড় দিও না। সর্বাপেক্ষা উত্তম কথা এই যে, তোমার কাছে যাহাকিছু কাপড়-চোপড় টাকা-পয়সা অলংকারাদি আছে, সবই লিখিয়া রাখিবে। ইহা অত্যন্ত কাজের কথা।

ঘরের আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখা ঃ

ঘরের জিনিসপত্রগুলি স্ব স্ব স্থানে গোছাইয়া রাখাও সাংসারিক সুব্যবস্থার অন্যতম কাজ। যে জিনিস যেখানে রাখার যোগ্য তাহা সেখানে রাখাও সঙ্গত। বিছানাপত্র, চৌকি, পালঙ্ক যথাস্থানে রাখিয়া দাও। প্রয়োজনবোধে কোন জিনিস রক্ষিত স্থান হইতে বাহির করিলে পরে কাজ শেষে

আবার সেই বস্তু সেখানেই রাখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এরূপে দৈনন্দিন ব্যবহারিক থালা-বাসন এবং নিত্যপ্রয়োজীয় অন্যান্য জিনিসপত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। এমন যেন না হয় যে, লোটা একস্থানে গড়াগড়ি খাইতেছে, রেকাবি অন্যস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, ডেকচি আধোয়া অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। মাছির ঝাঁক বিন্‌বিন্‌ করিতেছে। এদিকে পানির কলসীর মুখ খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। কিনারে দাঁড়াইয়া কাক পানি পান করিতেছে এবং পায়খানা করিয়া নষ্ট করিতেছে।

কাপড়গুলি সব সময় ভাঁজ করিয়া রাখিও। এমন যেন না হয় যে, কাপড়-চোপড় এদিকে-ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে; যদি পশমী বা রেশমী কাপড় হয়, তবে সদাসর্বদা তাহার তত্ত্বাবধান করা কর্তব্য। বিশেষতঃ বৃষ্টি-বাদলের দিনে একটু বেশী খেয়াল রাখিও। কেননা, ঐ মওছুমে কাপড়ে পোকা লাগিয়া যায়। যদিও সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে সুব্যবস্থা সুশৃংখলার শক্তি বিদ্যমান, তবুও কোশেশ ও চেষ্টার যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে একথা অস্বীকার করার যো নাই। বাড়ীতে প্রতিভাবান বুদ্ধিমতী যে বেগম ছাহেবা রহিয়াছেন, সদাসর্বদা তাঁহার কাছ থেকে ঘর-সংসারের সুব্যবস্থাপনা ও শৃংখলার রীতি-নীতি শিক্ষা করিতে থাক এবং খুব লক্ষ্য করিয়া তাহার এন্তেজাম লক্ষ্য কর, অতঃপর উহার অনুসরণ কর।

এখন এই কথাগুলি শেষ করিতেছি এবং পুনরায় তোমাকে এই নছীহত করিতেছি, যদি তুমি এই হেদায়ত অনুযায়ী আমল কর, তবে ইন্‌শাআল্লাহ্ তুমি দোনোজাহানে সফলকাম হইবে এবং দুনিয়াতে এত সুখ-শান্তিতে বাস করিবে যে, তোমার বাড়ী বেহেশ্‌তে রূপায়িত হইবে। তোমার জন্য আমার এই নছীহতনামা বিবাহ খুশীর অতি উত্তম পিতৃদান। তুমি ইহাকে প্রতি সপ্তাহে ২/৩ বার করিয়া পড়িও ২/৩ বার সম্ভব না হইলে অন্ততঃ একবার অবশ্যই পড়িবে। আমি আল্লাহ্‌র দরগাহে কায়মনোবাক্যে দো'আ করিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বরকত দান করেন। আমি তোমাকে শামিল করিয়া এই দো'আ করিঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

অর্থ—হে আমাদের রব্ব! দুনিয়াতে আমাদিগকে উত্তম বস্তু (এবাদত বন্দেগী হালাল রুজী ইত্যাদি) দান করুন এবং আখেরাতেও, আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।

আমরা তোমার কাছে শুধু এতটুকু চাই যে, যতদিন আমরা তোমার পিতা মাতা জীবিত থাকি আমাদের জন্য ঈমানের ছালামতি এবং ঈমানের সাথে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার জন্য দো'আ করিতে থাকিবে এবং এই জাহান হইতে বিদায় হওয়ার পর আমাদিগকে দো'আয়ে মাগ্‌ফেরাতের সাথে স্মরণ করিও।

واخـر دعـوانـا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله خير الخلائق محمد

واصحابه اجمعين ـ

॥ ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

সপ্তম খণ্ড

ওযূ ইত্যাদি

১। সময় বিশেষে কিছু কষ্ট হইলেও ওযূ ভালমত করিবে।

২। নূতন ওযূ করিলে বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়।

৩। পায়খানা বা পেশাব করিবার সময় কেবলার দিকে পিঠ বা মুখ দিয়া বসিও না।

৪। সাবধান থাকিও যেন পেশাবের ছিঁটা কাপড়ে বা গায়ে না লাগে; কেননা, এ বিষয়ে সতর্ক না থাকিলে কবর আযাব হয়।

৫। কোন গর্তের মধ্যে পেশাব করিও না, হয়ত সাপ-বিচ্ছু থাকিতে পারে।

৬। গোসল করিবার জায়গায় পেশাব করিও না।

৭। পেশাব পায়খানার সময় কথা বলিও না।

৮। ঘুম হইতে উঠিয়া হাত ভালরূপে না ধুইয়া (লোটা বদনা প্রভৃতির) পানির মধ্যে হাত দিও না।

৯। রৌদ্রে থাকিয়া যে পানি গরম হইয়া গিয়াছে, সে পানি ব্যবহার করিও না, (শ্বেত কুষ্ঠ) রোগ জন্মিতে পারে।

নামায

১। নামায সময় মত পড়িবে। রুকূ, সজ্‌দা খুব ভাল করিয়া করিবে, খুব মেনোযোগ ও ভক্তির সহিত নামায পড়িবে।

২। ছেলে-মেয়ে সাত বৎসরের হইলে তাহাদের নামায পড়িতে বলিবে, দশ বৎসরের হওয়া সত্ত্বেও যদি নামায না পড়িতে চায়, তবে মারিয়া পিটিয়া নামায পড়াইবে।

৩। যে কাপড়ে বা যে জায়গায় এ রকম ফুল পাতা আঁকা আছে যে, তাহার দিকে হয়ত মন যাইতে পারে, তাহাতে নামায পড়া চাই না।

৪। খোলা ময়দানে নামায পড়িবার সময় সামনে কিছু আড় থাকা চাই; যদি আড় কিছু না থাকে, তবে লাঠি বা অন্য কোন উঁচু জিনিস সামনে খাড়া করিয়া উহাকে ডান বা বাম ভ্রূর বরাবর রাখিয়া নামায পড়িবে।

৫। ফরয পড়িয়া সে জায়গা হইতে কিঞ্চিত সরিয়াই সুন্নত বা নফল পড়া ভাল।

৬। নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দেখিও না, উর্ধ্ব দিকেও নযর উঠাইও না, আর হাই আসিলে যাথাসাধ্য চাপিয়া রাখিবে।

৭। পেশাব-পায়খানার জোর থাকিলে প্রথমে পেশাব-পায়খানা শেষ করিয়া পরে নামায পড়িবে।

৮। কোন ওযীফা বা কোন নফল এবাদত শুরু করিতে হইলে যে পরিমাণ সর্বদা চালাইতে পারিবে, সেই পরিমাণ শুরু করিবে।

মৃত্যু ও বিপদের সময়

১। পুরাতন কোন কষ্টের কথা মনে উঠিলে اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্‌রই এবং তাঁহারই কাছে আমাদিগকেও যাইতে হইবে) পড়িয়া লও, তবে যেমন ছওয়াব প্রথমে পাইয়াছ আবার সেই রকম ছওয়াব পাইবে।

২। অতি সামান্য কষ্টের কথাই হউক না কেন তাহাতেও যদি— اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়, তবে ছওয়াব পাইবে।

যাকাত খয়রাত

১। যে অভাবগ্রস্ত লোক নিজের মান-সম্মান বাঁচাইয়া ঘরে বসিয়া থাকে, অন্যের দুয়ারে হাত পাতিতে লজ্জাবোধ করে, সে-সব লোকদেরই যাকাত দেওয়া উচিত।

২। অল্প বলিয়া দিতে লজ্জাবোধ করিও না, যখন যে রকম জুটে সে রকমই দান করিতে থাকিবে।

৩। অনেকে ভাবে যে, যাকাত পরিশোধ করিয়া দিলে অন্যান্য দান-খয়রাতের আর কি দরকার? এরূপ মনে করা ভুল। সুযোগ অনুসারে সাধ্যমত খয়রাত করিতে থাকা উচিত।

৪। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনকে দান করাতে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ হয়—(১) দান করা এক ছওয়াব, (২) আর নিজের আত্মীয়দের উপকার করা আর এক ছওয়াব।

৫। দরিদ্র প্রতিবেশীদের যথাসাধ্য তত্ত্বাবধান করিতে থাকিবে।

৬। স্ত্রীর জন্য স্বামীর সম্পত্তি হইতে এত পরিমাণ দান করা ঠিক নয়, যাহাতে স্বামী অসন্তুষ্ট হইতে পারেন।

রোযা

১। রোযা রাখিয়া অযথা কথা বলিও না, কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না, আর কাহারও গীবত করা ত অতীব অন্যায় এবং গোনাহ্‌র কাজ।

২। স্বামী বাড়ী থাকিলে স্ত্রীকে নফল রোযা রাখিতে স্বামীর অনুমতি লইতে হইবে।

৩। রমযান শরীফের যখন মাত্র দশ দিন অবশিষ্ট থাকে, তখন হইতে বেশী করিয়া এবাদত করা চাই।

কাহারও সম্বন্ধে তাহার অসাক্ষাতে এমন কোন কথা বলা, যাহাতে তাহার মনে কষ্ট হয়, তাহাকে 'গীবত' বলে।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত

১। কোরআন শরীফ যদি ভালরূপে চলিয়া না পড়িতে পার, তবে বিরক্ত হইয়া ছাড়িয়া দিও না, পড়িতে থাক; এরূপ ব্যক্তিকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হয়।

২। কোরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাইও না, রোজ পড়িতে থাক; অন্যথায় শক্ত গোনাহ্ হইবে।

৩। কোরআন শরীফ খুব মনোযোগ ও ভক্তির সহিত পড়িবে; আর আল্লাহ্ তা'আলার ভয় ও মনে জাগরিত রাখিয়া পাঠ করিবে।

দো'আ ও যিক্র

১। দো'আ করিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেঃ

(ক) খুব মনোযোগ ও নেহায়েত কাতর স্বরে দো'আ করিবে।

(খ) কোন গোনাহ্র কাজের জন্য দো'আ করিবে না।

(গ) যে কাজের জন্য দো'আ করিতেছ, তাহা পুরা হইতে দেরী হইলে বিরক্ত হইয়া দো'আ করা ছাড়িয়া দিও না।

(ঘ) দো'আ করার সময় মনে গাঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, আমার দো'আ আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবানী করিয়া নিশ্চয় কবূল করিবেন।

২। রাগের বশে নিজের সন্তান-সন্ততির বা ধন-সম্পত্তির জন্য বদ দো'আ করিও না। কেননা, হয়ত কবূল হইয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে পরে অনুতাপ করিবে।

৩। যেখানে বসিয়া দুনিয়ার কারবার কর বা দুনিয়ার কথাবার্তা বল, সেখানে কিছু আল্লাহ্-রাসূলের যিক্রও করিয়া লইবে, নতুবা ঐ সব দুনিয়াদারী বিপদের কারণ হইতে পারে।

৪। খুব বেশী করিয়া অধিকাংশ সময় এস্তেগ্ফার করিবে, ইহাতে অনেক মুশকিল আসান হয় এবং রুযীতে বরকত হয়।

৫। নফ্স বা শয়তানের ধোঁকায় দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কোন গোনাহ্ হইয়া যায়, তবে তওবা করিতে দেরী করিও না। যদি আবার ঘটনাক্রমে হইয়া পড়ে, তবে আবার তওবা করিবে। ইহা মনে করিও না যে, যখন তওবা ঠিক থাকে না, ভঙ্গ হইয়া যায় তখন আর তওবা করিয়া লাভ কি? বরং বারবার তওবা করিতে থাকিবে।

৬। অনেক দো'আ আছে যাহা বিশেষ সময়ে পড়িতে পারিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ঘুমাইবার সময় এই দো'আ পড়িবেঃ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

'হে খোদা! তোমার নামেই আমি মৃত্যুরূপ নিদ্রায় অভিভূত হই। আবার তোমারই নামের বরকতে জীবনরূপ জাগরণ প্রাপ্ত হই।'

ঘুম হইত উঠিয়া এই দো'আ পড়িবেঃ – اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমাদের মৃত্যুর (নিদ্রাও এক প্রকার মৃত্যু) পর জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহারই কাছে সকলের যাইতে হইবে।'

সকাল বেলায় এই দো'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ـ

আয় আল্লাহ্! আপনারই কৃপায় আমরা সকাল বেলায় জীবন ধারণ করি, আপনারই অনুগ্রহে আমরা বিকাল বেলায় জীবন ধারণ করি, আপনারই কৃপায় জীবন প্রাপ্ত হই, আপনাকে স্মরণ করিয়াই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি এবং আপনারই কাছে আবার সকলের উপস্থিত হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় এই দো'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ـ

অর্থ একই, কিন্তু একটা শব্দ আগে-পিছে আছে।

খানা খাইয়া এই দো'আ পড়িবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَفَانَا وَاٰوَانَا ـ

অর্থাৎ, 'শোক্‌র সেই আল্লাহ্ তা'আলার যিনি আমাদের খাওয়াইয়াছেন এবং (পানি প্রভৃতি) পান করাইয়াছেন এবং যিনি আমাদিগকে মুসলমান করিয়াছেন এবং বিপদ-আপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং (বাস করিতে ঘর-বাড়ী দান করিয়া) আশ্রয় দান করিয়াছেন।'

ফজর এবং মাগরেবের নামাযের পর এই দো'আ সাতবার পড়িবেঃ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ, আয় আল্লাহ্! আমাকে দোযখ হইতে বাঁচাও।" এবং পরবর্তী দো'আ তিনবার পড়িবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

অর্থাৎ, (সেই মহান) আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিয়াছি, যাঁহার নামের সঙ্গে আসমানে হউক বা জমীনে হউক, কোথাও কাহারও কোন ক্ষতি হইতে পারে না, এবং তিনি সব কথাই (আমার কাতর প্রর্থনাও) শুনেন এবং সব কিছুই (আমার হীন অবস্থাও) জানেন।

ঘোড়া বা অন্য কিছুতে চড়িতে হইলে, এই দো'আ পড়িবেঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

অর্থাৎ, 'পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি আমি সেই খোদার, যিনি আমাদের জন্য ইহাকে বশীভূত করিয়া দিয়াছেন; অথচ আমাদের ইহার উপর কোনই শক্তি ছিল না। আর আমাকে স্বীয় প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

কাহারও বাড়ীতে কিছু খাইলে, এ দো'আও পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ـ

অর্থাৎ, 'আয় আল্লাহ্! ইহাদের যাহাকিছু (ধন-দৌলত) দান করিয়াছ, তাহাতে আরও বরকত (উন্নতি) দাও এবং তাহাদের গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও এবং তাহাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ-দৃষ্টি কর।'

নূতন চাঁদ দেখিয়া এই দো'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ ـ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, 'আয় আল্লাহ্! এই চাঁদ (মাস) ভরিয়া আমাদের শান্তি এবং ঈমানের সঙ্গে রাখিও এবং নিরাপদ ও ইসলামে মজবুত রাখিও। হে চাঁদ! (তুই ভাল-মন্দ কিছুই করিতে পারিস না,) তোর আর আমার উভয়েরই সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা একই আল্লাহ্।

কোন বিপদগ্রস্তকে দেখিলে এই দো'আ পড়িবে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا۔

অর্থাৎ, 'শোক্‌র সেই (দয়াময়) আল্লাহ্ তা'আলার, যে মুছীবত তুমি ভোগ করিতেছ, তাহা হইতে যিনি আমাকে নিরাপদে রাখিয়াছেন এবং আমাকে স্বীয় বহুসংখ্যক সৃষ্ট জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (আশরাফুল মখলুকাতরূপে সৃষ্টি) করিয়াছেন।'

তোমার নিকট যদি কেহ বিদায় হইতে আসে, তবে এইরূপ বলঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ ○

অর্থাৎ, 'তোমার দ্বীন (ধর্ম-কর্ম), আমানত (বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্ততা) এবং খাতেমা অর্থাৎ, প্রত্যেক কাজের পরিণাম (যেন ভাল হয়) সবই আল্লাহ্ তা'আলার উপর সোপর্দ করিতেছি।'

নূতন বিবাহিত বর-কনেকে মোবারকবাদ দিতে হইলে এই বলিয়া দাওঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ ۔

'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উভয়ের কাজে বরকত দেউক এবং তোমাদের উভয়ের উপর বরকত নাযিল করুক এবং তোমাদের উভয়কে ভালভাবে মিল-মহব্বতে রাখুক।"

কোন বিপদাপদ আসিলে এই দো'আ পড়ঃ يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ○

"হে আল্লাহ্! তুমিই প্রকৃত জীবনধারী এবং সকলের রক্ষাকারী। আমি তোমারই দয়ার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর এবং ঘুমাইবার সময় এই দো'আটি তিনবার পড়িবেঃ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۔

"আমি সেই দয়াময়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—যিনি ব্যতীত অন্য কেহই এবাদতের যোগ্য নহে; তিনিই প্রকৃত জীবনধারী এবং (সকলের) রক্ষাকারী এবং তাঁহারই সমীপে আমি তওবা (প্রত্যাবর্তন) করিতেছি।" এবং একবার এই দো'আ পড়িবেঃ

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔

"আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত করা যাইবে না, তিনি একক, অন্য কেহই তাঁহার শরীক নাই। তাঁহারই যাবতীয় সাম্রাজ্য, তাঁহারই যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনিই সর্বশক্তিমান।"

سُبْحَانَ اللّٰهِ (আল্লাহ্ পবিত্র) ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য) ৩৩ বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বড়) ৩৪ বার এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ সূরাদ্বয় এক একবার এবং আয়াতুল কুরসী একবার এবং সকাল বেলায় সূরা-ইয়াসীন একবার, মাগরেবের পর সূরা-ওয়াক্বেয়া একবার, এশার পর সূরা-মুল্‌ক একবার আর শুক্রবারে সূরা-কাহ্‌ফ একবার পড়িবে।* ঘুমাইবার সময় সূরা-আলে ইমরানের শেষে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়িবে। রোজ যতটুকু পার কোরআন তেলাওয়াত করিবে।** মনে

টিকা

* এইরূপ পড়িতে পারিলে দরিদ্রতা দূর হয়। রোজ কোরআন মজীদ হইতে কমপক্ষে ১০ আয়াত তেলাওয়াত করিয়া লওয়া চাই। কেননা, হাদীস শরীফে আছে, যে দশ আয়াত তেলাওয়াত করে, তাহাকেও তেলাওয়াত কারীদের মধ্যে শামিল করা হয়।

** চিন্তা করিয়া দেখ, শরীঅত তোমাকে কেমন ভাবে সব কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার দিকে পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছে, মনে রাখিও ইহাই ধর্মের মূল।

রাখিও যে, যাহা কিছু পড়িতে বলা হইল, পড়িতে পারিলে ছওয়াব আছে, না পড়িলে কোন গোনাহ্ নাই।

কসম এবং মান্নত

১। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুরই কসম খাইতে নাই; অনেকে নিজের মাথার বা চক্ষের বা ছেলে-মেয়ের কসম খাইয়া থাকে, ইহাতে কবীরা গোনাহ্ হয়। যদি ভুলবশতঃ কখনও মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ (তওবা করিয়া) কলেমা পড়িয়া লও।

২। এরকম কসম খাইও না যে, 'যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে যেন আমি বে-ঈমান হইয়া যাই'; যদিও সত্য কথা হয় (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

৩। রাগ বা অন্য কোন কারণবশতঃ যদি এরকম কসম খাইয়া থাক যে, তাহা পূর্ণ করা গোনাহ্র কাজ, তবে সে কসম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার কাফ্ফারা দিয়া দিবে। যেমন, এই রকম কসম খাওয়া যে, 'আমি আমার মা-বাপের সঙ্গে কথা বলিব না' বা এই রকম অন্য কোন কসম খাইল।

কারবার (আদান-প্রদান) ভালরূপে করা

১। টাকা-পয়সার এত লোভ করিও না যে, হালাল হারামেরও খেয়াল না থাকে। আর আল্লাহ্ তা'আলা যদি হালাল পয়সা দান করেন, তবে তাহা অযথা উড়াইয়া দিও না; একটু চিন্তা করিয়া খরচ করিও। বাস্তবিকই যেখানে একান্ত আবশ্যক সেখানেই খরচ করিও।

২। কেহ বিপদে পড়িয়া যদি কোন জিনিস বিক্রয় করিতে আসে, তবে ঠেকা বলিয়া সুযোগ পাইয়া তাহাকে ঠকাইও না, তাহার জিনিসের দাম কম করিও না; বরং পারিলে তাহার কিছু সাহায্য কর, না হয় ত অন্ততঃ উচিত মূল্যে তাহার জিনিসটি খরিদ করিয়া লও।

৩। তোমার যদি কাহারও নিকট কিছু পাওনা থাকে, আর সে গরীব হয়, তবে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিও না, তাহাকে সময় দাও; বরং যদি সম্ভব হয় কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দাও।

৪। যদি তোমার নিকট কাহারও কিছু পাওনা থাকে আর তোমার দিবার ক্ষমতা আছে, তবে (তৎক্ষণাৎ দিয়া দাও, টালবহানা করিও না। কেননা, হাতে থাকিতে (টালবাহানা) করা বড়ই অন্যায়।

৫। যাহাতে ধার না লইতে হয়, সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। একান্ত ঠেকাবশতঃ যদি লইতেই হয়, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইও না। সর্বদা পরিশোধ করিবার চিন্তায় ও চেষ্টায় থাকিও। আর যাহার নিকট হইতে ধার লইয়াছ, সে যদি তোমাকে কিছু বলে, তবে তাহার প্রতিউত্তর করিও না, অসন্তুষ্ট হইও না, ছবর করিও।

৬। হাসি-ঠাট্টা করিয়া কাহারও জিনিস এরূপভাবে সরাইয়া লুকাইয়া রাখা (যাহাতে সে পেরেশান হইতে পারে) বড়ই অন্যায় কথা।

৭। মযদুরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইয়া তাহার মযদুরী দিতে দেরী করিও না, বা তাহার মযদুরী কম দিতে চেষ্টা করিও না।

৮। দুর্ভিক্ষের সময় অনেক বিপদগ্রস্ত লোক নিজের বা পরের যে সন্তান বেচিয়া ফেলে, তাহাদের গোলাম বা বান্দী বানান হারাম।

৯। পাক করিবার জন্য একটু আগুন বা নিমক দিলে এত ছওয়াব পাওয়া যায় যেন সম্পূর্ণ ভাত সালন দান করিয়াছে।

১০। পানি পান করাইলে বড়ই ছওয়াব পাওয়া যায়। যেখানে প্রচুর পরিমাণে পানি পাওয়া যায়, সেখানে ত যেমন একটা গোলাম আযাদ করিয়া দিল; আর যেখানে কম পাওয়া যায়, সেখানে ত যেমন একজন মৃতকে জীবন দান করিল।

১১। তোমার নিকট যদি কাহারও কিছু পাওনা থাকে বা কাহারও কিছু আমানতি জিনিস রাখা থাকে, তবে অন্য দুই চারিজন বিশ্বস্ত লোককে জানাইয়া রাখ অথবা কোন কাগজে লিখিয়া বা লিখাইয়া রাখ। কেননা, মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট নাই; হয়ত হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া যাইতে পারে, আর তুমি পরের দায়িক থাকিয়া মরিতে পার।

বিবাহ

১। ছেলে-মেয়ের বিবাহের সময় এই বিষয়ে বেশী খেয়াল রাখিবে, যেন কোন দ্বীনদার ধার্মিকের সঙ্গে হয়। দুনিয়ার শান-শওকত বা মালদারীর বেশী খেয়াল করিও না। বিশেষতঃ আজকালকার যমানায় ধনীর ছেলেরা ইংরাজী পড়িয়া অনেকে ঈমান হারাইয়া বসিয়াছে। এ রকম স্থলে বিবাহই দুরুস্ত হয় না, চিরজীবন যিনা করার গোনাহ্ হইতে থাকে।

২। মেয়েদের অভ্যাস আছে যে, তাহারা অনেকে স্বামীর নিকট অন্য মেয়েলোকের রূপ-গুণ বর্ণনা করিয়া থাকে। এরূপ করা অসঙ্গত। খোদা না করুন, যদি স্বামীর মন সেই দিকে চলিয়া যায় তবে (বড়ই বিপদের আশঙ্কা,) নিজেই কাঁদিয়া কাটাইবে।

৩। কোন জায়গায় যদি অন্য জায়গা হইতে বিবাহের পয়গাম আসিয়া থাকে, আর কিছু কিছু মতও দেখা যায়, তবে তুমি সেখানে নিজের কাহারও জন্য বিবাহের কথা উত্থাপন করিও না। হাঁ, যদি সে ছাড়িয়া যায় বা ঘরওয়ালা অস্বীকার করে, তবে অবশ্য বলিতে পার।

৪। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেসব বিশেষ বিশেষ কাজ বা কথা হয়, তাহা অন্য কাহারও কাছে বলাকে আল্লাহ্-তা'আলা বড়ই না-পছন্দ করেন, প্রায়ই দেখা যায় যাহাদের নূতন বিবাহ হয়, তাহারা এ বিষয়ে খেয়াল রাখে না, তাহা বড়ই অন্যায়।

৫। বিবাহের নিমিত্ত যদি তোমার কাছে কেহ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, আর সে স্থানে কিছু দোষ থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিত। এমন গীবত না-জায়েয নহে; অবশ্য বিনা দরকারে কাহারও আয়েব বাহির করা চাই না।

৬। স্বামীর নিকট থাকা সত্ত্বেও যদি স্ত্রীর আবশ্যক পরিমাণ (খাওয়া পরার) খরচ না দেয়, তবে স্বামীর অগোচরে নেওয়া জায়েয আছে, কিন্তু কোন বাহুল্য খরচের জন্য নহে (নিজের বা নিজের শিশু-সন্তানের জরুরী খরচের জন্য নিতে পারে)।

কাহাকেও কষ্ট দেওয়া

১। চিকিৎসা শাস্ত্র যে ভালরূপ পড়ে নাই তাহার পক্ষে এরকম কোন ঔষধ কোন রোগীকে দেওয়া, যাহাতে ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে, জায়েয নহে। যদি এরূপ করে গোনাহ্ হইবে।

২। কোন অস্ত্রের দ্বারা ঠাট্টা করিয়া কাহাকেও ভয় দেখান চাই না। কেননা, হয়ত হাত হইতে ছুটিয়া গিয়া আঘাত লাগিতে পারে।

৩। ছুরি, চাকু খোলা অবস্থায় কাহারও হাতে দিবে না, হয় বন্ধ করিয়া দাও না হয় কোন জায়গায় রাখিয়া দাও, সে নিজেই উঠাইয়া নিবে।

৪। কুকুর বিড়ালকে বন্ধ রাখিয়া পানাহারে কষ্ট দেওয়া বড়ই গোনাহ্।

৫। গোনাহ্গারদের অনর্থক লা'ন্‌তা'ন করা চাই না, ইহা অন্যায় কথা। অবশ্য তাহার জন্য নরমভাবে কিছু নছীহতের কথা বলিতে পার।

৬। বিনা অপরাধে কাহারও প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করা—যাহাতে সে ভীত হইতে পারে—জায়েয নহে। দেখ, যখন একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পর্যন্ত জায়েয নহে, তখন ঠাট্টা করিয়া কোথাও পলাইয়া থাকিয়া কাহাকেও হঠাৎ ভয় দেখান কত বড় অন্যায় হইবে।

৭ । যবাহ করার সময় অস্ত্রে খুব ধার দিয়া লইবে, জানোয়ারকে অযথা কষ্ট দিবে না।

৮। ঘোড়ায় চড়িয়া কোথাও যাইতে হইলে (বা অন্য কোন জীব দ্বারা কোন কাজ লইতে হইলে) ঘোড়াকে (বা সে জীবকে) কষ্ট দিও না। এত বোঝা তাহার উপর চাপাইও না বা এত দ্রুত তাহাকে দৌড়াইও না, যাহাতে তাহার কষ্ট হইতে পারে। আর গন্তব্য স্থলে পৌঁছা মাত্রই তাহার খাওয়া-পিয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।

খাওয়ার কু-অভ্যাস দূর করা

১। বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া খাওয়া শুরু করিবে। ডান হাত দিয়া খাইবে। (কয়েক জনে এক সঙ্গে খাইতে হইলে) নিজের সামনে থেকে খাইবে; অবশ্য কয়েক রকমের জিনিস যদি এক বর্তনে থাকে, তবে যে জিনিস খাইতে রুচি হয়—উঠাইয়া লইতে পার।

২। খাওয়ার সময় আঙ্গুল চাটিয়া খাইবে। আর বর্তন খালি হইয়া গেলে তাহা ছাফ করিয়া খাইবে।

৩। খাইবার সময় খাওয়ার জিনিস যদি নীচে পড়িয়া যায়, তাহা উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া খাইতে ঘৃণা বোধ করিবে না।

৪। খেজুর, আঙ্গুর বা ফুট, তরমুজের টুকরা ইত্যাদি জিনিস কয়েক জনে এক সঙ্গে খাইতে হইলে একটি বা এক এক টুকরা করিয়া উঠাইবে, দুই তিনটি এক সঙ্গে উঠাইবে না।

৫। পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি কোন দুর্গন্ধ বিশিষ্ট জিনিস খাইয়া কোন মজলিসে যাইতে হইলে প্রথমে মুখ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইবে, যেন কোনরূপ দুর্গন্ধ না থাকে।

৬। প্রত্যহ পাকাইবার সময় চাউল, ডাল ইত্যাদি জিনিস মাপিয়া লইবে, আন্দাজি খাইতে থাকিবে না।

৭। যে কোন হালাল জিনিস খাইয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র করিবে।

৮। খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধুইবে ও কুল্লি করিবে।

৯। খুব গরম ভাত, ছালন ইত্যাদি খাইবে না। (হাঁ, যদি এরকম কোন জিনিস হয় যে, গরম গরম না খাইলে তাহার স্বাদ থাকে না, তবে তাহাতে ক্ষতি নাই।)

১০। মেহ্‌মানের খুব খাতির করা চাই। আর যদি তুমি কোথাও মেহ্‌মান হও, তবে তথায় এত বেশী দেরী করিও না, যাহাতে তাহাদের বিরক্তি বোধ হইতে পারে!

১১। এক সঙ্গে খাওয়াতে বরকত হয়।

১২। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে প্রথমে দস্তরখান উঠাইয়া দিবে, পরে নিজে উঠিবে। দস্তরখান না উঠাইয়া নিজে উঠিয়া গেলে বে-আদবী হয়। যদি কয়েকজন এক সঙ্গে খাইতে বস, আর অন্যান্যের খাওয়া শেষ হইবার পূর্বেই তোমার খাওয়া শেষ হইয়া যায়, তবে একা একা উঠিয়া যাইও না; অল্প অল্প খাইতে থাক, নতুবা তোমার সাথীরা লজ্জায় পড়িয়া ক্ষুধার্ত থাকিয়া যাইতে পারে। যদি একান্ত দরকার হয়, তবে ওযর পেশ করিয়া উঠিতে পার।

১৩। মেহ্‌মানকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া সুন্নত।

১৪। পানি এক শ্বাসে পান করিবে না, তিন শ্বাসে পান করিবে, আর শ্বাস ফেলিবার সময় পাত্রকে মুখ হইতে সরাইয়া দিবে, যেন পানিতে শ্বাস না লাগে। পানি পান করিবার সময় "বিস্‌মিল্লাহ্‌" বলিয়া পান করিবে। পান শেষ করিয়া "আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌" পড়িবে।

১৫। যে-সব বর্তন (পাত্র) এরকম যে, হয়ত হঠাৎ অনেকটা পানি আসিয়া যাইতে পারে বা এরকম যে, তাহার ভিতরকার অবস্থা জানা যাইতে পারে না, হয়ত ভিতরে কোন পোকা বা কাঁটা থাকিতে পারে, সেরকম বর্তনে মুখ লাগাইয়া পানি পান করিও না।

১৬। বিনা প্রয়োজনে দাঁড়াইয়া পানি পান করিও না। (যদি একান্ত ঠেকা হয়, সে ভিন্ন কথা)।

১৭। পানি পান করিয়া যদি অন্যকে দিতে হয়, তবে যে তোমার ডান দিকে আছে তাহাকে প্রথমে দাও, সে তাহার ডান দিকে যে আছে তাহাকে দিবে। এরূপে যদি অন্য কোন বস্তু ভাগ করিয়া দিতে হয়, যেমন পান, আতর, মিঠাই সকলেরই এই হুকুম।

১৮। বর্তনের মুখ যদি কিছু ভাঙ্গা হয়, তবে ভাঙ্গা দিকে পানি পান করিও না।

১৯। সন্ধ্যার সময় ছেলে-মেয়েদের বাহিরে থাকিতে দিও না। রাত্রে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া দরজা বন্ধ করিবে। বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া থাল, বাসন, হাড়ি-পাতিল ঢাকিয়া রাখিবে; ঘুমাইবার সময় বাতি নিবাইয়া রাখিবে এবং চুলার আগুনও নিবাইয়া ফেলিবে বা ভালরূপে ঢাকিয়া রাখিবে।

২০। কোন খাওয়ার জিনিস কোথাও পাঠাইলে ঢাকিয়া পাঠাইবে।

কাপড় ইত্যাদি পরা

১। একখানা জুতা পরিয়া হাঁটিও না। চাদর এরকমভাবে গায়ে দিও না, যাহাতে জল্‌দি হাত বাহির করিতে বা হাঁটিতে কষ্ট হইতে পারে।

২। কাপড় পরার সময় ডান দিক দিয়া এবং খোলার সময় বাম দিক দিয়া শুরু করিবে। যেমন, কোরতার ডান আস্তিন প্রথমে পরিবে, পায়জামার ডান পা প্রথমে পরিবে এবং খোলার সময় বাম আস্তিন এবং বাম পা প্রথমে খুলিবে।

৩। নূতন কাপড় পরিয়া এই দো'আ পড়িবে, ইহাতে গুনাহ্‌ মাফ হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَاقُوَّةٍ ○

অর্থাৎ, শোক্‌র সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমার কোন ক্ষমতা, কোন শক্তি না থাকা সত্ত্বেও আমাকে ইহা পরিধানের নিয়ামত দান করিয়াছেন।

৪। এরকম কাপড় পরিও না, যাহাতে রীতিমত পর্দা হয় না।

৫। যে সব লোক নানারকম মূল্যবান যেওর, কাপড় ব্যবহার করে, তাহাদের কাছে বেশী বসিও না; হয়ত বৃথা তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতে পারে।

৬। কাপড় তালি লাগানকে অপমানজনক মনে করিও না।

৭। অতি শান-শওকতের কাপড়ও পরিও না বা একেবারে ময়লা কাপড়ও পরিও না। মধ্যম রকমের কাপড় পরিবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে।

৮। চুলের যত্ন করা দরকার (তৈল দিয়া কাঙ্গি করিবে), কিন্তু তাই বলিয়া সব সময় এই খেয়ালেই লাগিয়া থাকা চাই না। (মেয়েলোকের জন্য) হাতে মেহেদী লাগাইয়া রাখা ভাল।

৯। সুরমা উভয় চোখেই তিন তিনবার করিয়া লাগাইবে।

১০। ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

রোগের চিকিৎসা

১। রোগীকে খাওয়ার জন্য বেশী জোর-যবরদস্তি করা চাই না।

২। কোন অসুখ হইলে যে সব জিনিসে অপকার করে, তাহা খাইবে না ; সতর্ক হইয়া চলিবে।

৩। যে সব তাবীয বা মন্ত্র-তন্ত্র শরীঅতের খেলাফ, সে সব কখনও ব্যবহার করিবে না।

৪। যদি কাহারও উপর কাহারও নযর লাগে, তবে যাহার নযর লাগার সন্দেহ হয়, তাহার মুখ, কনুই সমেত উভয় হাত, উভয় পা, উভয় হাঁটু এবং আবদস্ত করার জায়গাকে ধোয়াইয়া সেই পানি যদি যে ব্যক্তির উপর নযর লাগিয়াছে তাহার মাথার উপর ঢালিয়া দিতে পার, তবে খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

৫। যে সব রোগ দেখিলে সাধারণতঃ লোকের স্বাভাবিকভাবে ঘৃণা জন্মে যেমন, পাঁচড়া, কুষ্ঠ, বসন্ত ইত্যাদি—সে সব রোগীদের নিজেরই দূরে দূরে থাকা ভাল। তাহা হইলে কাহারও কষ্ট হইবে না, নিজেও অন্যান্যের ঘৃণায় পতিত হইবে না।

স্বপ্ন

১। যদি খারাপ কোন স্বপ্ন দেখ, তবে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেল এবং তিনবার—

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

অর্থাৎ, "শয়তান মরদুদ হইতে (রক্ষা পাইবার জন্য) আমি আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। (অতএব, হে আল্লাহ্! আমাকে শয়তানের হাত হইতে বাঁচাও।)" পড় এবং পাশ বদলিয়া শোও, আর অন্য কাহারও কাছে এই স্বপ্ন বলিও না।

২। যদি স্বপ্নের কথা কাহারও কাছে বলিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রকৃত জ্ঞানী লোকের কাছে বলিবে বা এ রকম কোন লোকের কাছে বলিবে, যে তোমাকে দিলের সহিত ভালবাসে এবং তোমার জন্য বুরা তা'বীর না করে, তবে খোদা চাহে ত কোন ক্ষতি হইবে না।

সালাম

১। পরস্পর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আস্সালামু আলাইকুম) বলিয়া সালাম করিবে এবং وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ (ওয়ালাইকুমুস্সালাম) বলিয়া জওয়াব দিবে। ইহা ছাড়া অন্য যত রকমের সালামের প্রচলন আছে, সবই অযথা ও সুন্নতের খেলাফ।

২। যে-ব্যক্তি প্রথমে সালাম করে, সে-ই বেশী সওয়াব পায়।

৩। যদি কেহ অন্য কাহারও সালাম তোমার নিকট পৌঁছায়, তবে عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ (আলাইহিম ওয়াআলাইকুমুস্‌সালাম) বলিয়া জাওয়াব দিবে।

৪। কয়েক জনের মধ্যে হইতে একজনে সালাম করিলেও সবের তরফ হইতেই আদায় হইয়া যাইবে। এইরূপে সমস্ত মজলিসের মধ্যে মাত্র একজনে জওয়াব দিলেও সবের তরফ হইতেই আদায় হইয়া যাইবে।

হাঁটা, বসা, শোয়া ইত্যাদি

১। সাজিয়া-গুজিয়া গর্বিতভাবে চলিবে না।

২। উল্‌টাভাবে অর্থাৎ উপুড় হইয়া শুইবে না।

৩। এমন জায়গায় ঘুমাইবে না, যেখান হইতে গড়াইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। হয়ত ঘুমের মধ্যে গড়াইয়া পড়িয়া যাইতে পার।

৪। কিছু অংশ ছায়ায় কিছু অংশ রৌদ্রে—এরকমভাবে বসিও না ও শুইও না।

৫। কোন ঠেকাবশতঃ যদি মেয়ে লোককে রাস্তায় বাহির হইতে হয়, তবে রাস্তার এক পার্শ্ব দিয়া চলিবে। কেননা, রাস্তার মাঝখান দিয়া হাঁটা মেয়েলোকের জন্য বড়ই বে-হায়ায়ীর কথা।

অন্যের সঙ্গে বসা

১। কাহাকেও তাহার জায়গা হইতে উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে বসিও না।

২। মজলিসের মধ্য হইতে যদি কেহ উঠিয়া কোন কাজে যায় এবং ভাবে বুঝা যায় যে, সে আবার আসিয়া বসিবে, তবে তাহার জায়গায় অন্য কাহারও বসা চাই না, সে জায়গা তাহারই হক্‌।

৩। দুইজন লোক এক জায়গায় কাছে কাছে বসিয়া আছে, তুমি গিয়া তাহাদের উভয়ের মাঝখানে বসিও না, অবশ্য যদি তাহারা উভয়ে খুশী হইয়া বসাইয়া লয়, তবে ক্ষতি নাই।

৪। তোমার সঙ্গে যদি কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসে, তবে তাহাকে দেখিয়া একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিবে। তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিবে যে, তাহাকে সমাদর করা হইয়াছে।

৫। নিজে সাজিয়া বড় হইয়া বসিও না। যেখানে জায়গা পাওয়া যায়, গরীবদের মত তথায় বসিয়া পড়।

৬। হাঁচি আসিলে মুখের উপর হাত বা কাপড় রাখিয়া দিবে এবং বেশী শব্দ হইতে দিবে না।

৭। হাইকে যথাসাধ্য থামাইয়া রাখিবে, একান্ত না থামিলে মুখ চাপিয়া লইবে।

৮। উচ্চস্বরে খিলখিল করিয়া হাসিও না।

৯। মজলিসের মধ্যে বড় মানুষীভাবে গাল ফুলাইয়া বসিও না, মিস্‌কীনের ন্যায় বস। যদি কোন কাজের কথা থাকে তাহাও বলিতে পার; অবশ্য যে কথায় গোনাহ্‌ হয়, সে সব কথা বলিও না।

১০। মজলিসের মধ্যে পা ছড়াইয়া বসিও না।

কথা

১। চিন্তা না করিয়া কোন কথাই বলিবে না। খুব চিন্তা করিয়া যখন দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া যায় যে, এ কথায় কোন প্রকারেই দোষ নাই, তখনই সে কথা বলিবে।

২। কাহাকেও বে-ঈমান বলা বা এই রকম বলা যে, অমুকের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত হউক বা আল্লাহ্ তা'আলার গযব নাযিল হউক বা দোযখ নছীব হউক, তাহা কোন গরু বাছুরকে বা কোন মানুষকেই বলুক, ইহা বড়ই গোনাহ্র কাজ। এইরূপ যাহাকে বলা হয়, সে যদি সে রকম না হয়, যে বলে তাহারই উপর বর্তিয়া থাকে।

৩। কেহ যদি তোমাকে অন্যায়ভাবে কোন কথা বলে, তবে তুমিও ঠিক ততটুকু পরিমাণ তাহাকে বলিতে পার, কিন্তু বিন্দুমাত্র বেশী হইলেই তুমি গোনাহ্গার হইবে। (অতএব, মাফ করিয়া দেওয়া প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা ভাল। কারণ, সম্পূর্ণ ঠিক ঠিক প্রতিশোধ লওয়া প্রায় অসম্ভব।)

৪। দুমুখো কথা বলিও না। অর্থাৎ, প্রত্যেকেরই সম্মুখে তাহার মন রক্ষা করিয়া তাহার পছন্দ মত কথা বলিবে না।

৫। চোগলখোরী করিবে না। আর অন্য কেহ যদি তোমার কাছে অন্য কাহারও সম্বন্ধে চোগলখোরী করিতে চায়, তাহাও শুনিবে না।

৬। মিথ্যা কিছুতেই বলিবে না।

৭। খোশামোদের জন্য কাহারও সাক্ষাতে তাহার প্রশংসা করিও না। আর অসাক্ষাতেও যোগ্যতার চেয়ে বেশী তা'রীফ করিও না।

৮। কাহারও গীবত কখনও করিবে না। কাহারও অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে এরকম কোন কথা বলা, যাহাতে তাহার মনে ব্যথা লাগে, তাহা সত্যই হউক না কেন, 'ইহাকেই বলে গীবত'। আর যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহাকে বলে, 'বোহ্তান,' সে আরও বড় গোনাহ্।

৯। কাহারও সহিত তর্কবিতর্ক করিবে না। নিজের কথাকেই উপরে রাখিতে চেষ্টা করিবে না।

১০। বেশী হাসিও না। বেশী হাসিলে দিল মরিয়া যায়।

১১। যদি কাহারও গীবত করিয়া থাক, তবে তাহার নিকট হইতে মাফ করাইয়া লওয়া দরকার। যদি না পার, তবে তাহার জন্য এস্তেগ্ফার অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই দো'আ করিতে থাক, যেন তাহাকে মাফ করিয়া দেন। তাহা হইলে আশা করা যায় যে, কিয়ামতের দিন সেও তোমাকে মাফ করিয়া দিবে।

১২। মিথ্যা ওয়াদা করিও না, ওয়াদা করিয়া খেলাফ করিও না।

১৩। কাহারও সহিত এরূপভাবে হাসিঠাট্টা করিও না, যাহাতে সে মনে কষ্ট পাইতে পারে বা লজ্জিত হয়।

১৪। নিজের কোন জিনিস বা নিজের কোন গুণের উপর বড়াই করিও না।

১৫। কবিতা পাঠে তত মত্ত হইও না। হাঁ, যদি শরীঅতের খেলাফ কোন কথা না থাকে, তবে মাঝে মাঝে কোন নছীহত বা দো'আর কবিতা আস্তে আস্তে পড়াতে কোন ক্ষতি নাই।

১৬। না জানিয়া শুনিয়া কথা কহিও না; কেননা, প্রায়ই এরকম কথা মিথ্যা হইয়া থাকে।

বিবিধ

১। চিঠি লিখিয়া তাহার উপর কিছু ধুলা ছড়াইয়া দাও; ইহাতে যে কাজের জন্য চিঠি লিখিয়াছ সে কাজ খোদা চাহে ত সহজে হইয়া যাইবে।

২। জামানাকে মন্দ বলিও না, এবিষয়ে লোকেরা খেয়াল করে না, সাধারণতঃ বলিয়া থাকে, সময়টা বড়ই খারাপ। এইরূপ বলা অনুচিত।

৩। চাবাইয়া চাবাইয়া কথা বলিও না বা অনেক লম্বা চওড়া এবং বাড়াইয়া কথা বলিও না, যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই বলিবে।

৪। কেহ যদি গান করিতে থাকে, সে দিকে কান লাগাইও না।

৫। কাহারও কোন খারাপ অবস্থা বা কথার অনুকরণ ও ব্যঙ্গ করিও না।

৬। কাহারও মধ্যে কোন দোষ দেখিলে তাহা ঢাকিয়া রাখা উচিত, গাহিয়া বেড়ান উচিত নয়। হাঁ, যদি কোন জরুরতবশতঃ যাহের করিতে হয়, তবে ক্ষতি নাই। যেমন, এক ব্যক্তির মধ্যে কোন আয়েব আছে, যদি তুমি সে আয়েব যাহের না কর, তবে হয়ত অন্য লোক ধোঁকা খাইবে। এইরূপ অবস্থায় তাহার আয়েব যাহের করিয়া দেওয়া ভাল; বরং তাহাতে ছওয়াব পাওয়া যাইবে। আবার কোন কোন সময় আয়েব যাহের করা ওয়াজিবও হইয়া পড়ে।

৭। যে কোন কাজ কর, প্রথমে খুব ভালরূপে চিন্তা করিয়া, পরিণাম ভাবিয়া শান্তির সহিত করিবে। কেননা, তাড়াতাড়ি করাতে প্রায়ই কাজ খারাব হয়।

৮। তোমার কাছে যদি কেহ কোন পরামর্শ চায়, তবে তোমার কাছে যাহা ভাল মনে হয়, সেই পরামর্শই তাহাকে দাও।

৯। যাহাদের সঙ্গে উঠা-বসা কর তাহাদের নিকট হইতে নিজের খাতা-কছুর মাফ করাইয়া লও; নতুবা কিয়ামতের দিন বড় বিপদ হইতে পারে।

১০। পার্শ্ববর্তী লোকদেরও ভাল কাজ করিতে এবং মন্দ কাজ ছাড়িতে উপদেশ দিতে থাক। হাঁ, যদি একেবারে আশাই না থাকে যে, তাহারা শুনিবে বা এই ভয় হয় যে, হয়ত তোমাকে কষ্টও দিতে পারে, তবে অবশ্য চুপ থাকা জায়েয আছে; কিন্তু মনে মনে সেই কাজকে মন্দ জানিতে থাকিবে, আর নেহায়েত ঠেকা না হইলে এই রকম লোকদের সঙ্গে উঠা-বসা করিবে না।

মনের সংশোধন ও লোভের প্রতিকার

বেশী খাওয়ার কারণে অনেক গোনাহ্ হয়। অতএব, খাওয়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি পালন করিয়া চলিবে।

(১) সব সময় মজাদার খানা খাওয়ার পাবন্দী করিও না। (হাঁ মাঝে মাঝে কখনও যদি হয় ক্ষতি নাই।) (২) হারাম রুযী হইতে দূরে থাকিবে। (৩) পেটকে খুব বেশী ভরিবে না; বরং দুই-চার লোকমার ক্ষুধা থাকিতে খাওয়া শেষ করিবে।

পরিমাণের চেয়ে কিছু কম খাওয়ার অভ্যাস করিলে নিম্নলিখিত উপকার পাইবেঃ (১) দিল ভাল থাকিবে, আর দিল ভাল থাকিলে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যখন আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত দেখিতে পাইবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মহব্বত পয়দা হইবে। (২) দিল নরম থাকিবে। দিল নরম হইলে দো'আ এবং যিক্‌রে খুব মজা পাইবে। (৩) নফ্‌সের ছরকাশী ও বড়াই ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। (৪) এইরূপ করাতে নফ্‌সের কিছু কষ্ট হইবে, তখন কষ্ট দেখিয়া আল্লাহ্‌র আযাবের কথা মনে উঠিবে। অতএব, ক্রমশঃ গোনাহ্‌র কাজ ত্যাগ করিতে শিখিবে। (৫) গোনাহ্ করার ইচ্ছা তত থাকিবে না, ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। (৬) শরীর ভাল থাকিবে, অলসতা বোধ হইবে না, ঘুমও কম হইবে, তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য এবাদতে আলস্য বোধ হইবে না। যাহারা খাইতে পায় না সেইসব দরিদ্রের প্রতি দয়া আসিবে, বরং প্রত্যেকের প্রতিই দয়ার সৃষ্টি হইবে।

বেশী কথা বলার দোষ

বেশী কথা বলাও এটি বড় রোগ, নফ্‌সও বেশী কথা বলিতে ভালবাসে, অথচ এই বেশী কথা বলার দরুনই মানুষ শত শত গোনাহ্‌তে লিপ্ত হয়; যেমন—(১) মিথ্যা বলা, (২) কাহারো গীবত করা, (৩) কাহাকেও অভিশাপ দেওয়া, (৪) নিজের বড়াই করা, (৫) অযথা কাহারও সহিত তর্ক বাধাইয়া দেওয়া, (৬) বড় লোকের খোশামোদ করা, (৭) কাহারও সহিত হাসিঠাট্টা করিতে গিয়া এরকম কথা বলা, যাহাতে সে মনে কষ্ট পায়। এইসব গোনাহ্‌ হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় মুখ বন্ধ করিয়া থাকা অর্থাৎ মুখ সামলাইয়া কথা বলা। আর মুখ বন্ধ রাখার উপায় এই যে, যখন কোন কথা মুখ দিয়া বাহির করার ইচ্ছা হয় তৎক্ষণাৎ তাহা না বলা; বরং চিন্তা করিয়া দেখা, কথাটি বলিলে কোন গোনাহ্‌ হইবে কি ছওয়াব হইবে, বা ছওয়াবও হইবে না, গোনাহ্‌ও হইবে না। যদি তাহাতে অল্প কিংবা বেশী গোনাহ্‌ হয়, তবে সে কথা কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিবে না, মুখকে সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া লইবে। আর যদি ভিতর হইতে নফ্‌স তাহা বলিবার জন্য তাগাদা করে, তবে তাহাকে এই রকমভাবে বুঝাও যে, এখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া অল্প একটু কষ্ট সহ্য করা সহজ; কিন্তু পরকালে দোযখের আযাব বড় ভয়ঙ্কর (এবং বহু কালব্যাপী) হইবে।

যদি দেখ যে, এইরূপ কথা বলিলে ছওয়াব হইবে, তবে বলিয়া দিবে। আর যদি দেখ যে, এরূপ কথাতে ছওয়াবও নাই গোনাহ্‌ও নাই, তবেও তাহা বলিবে না। যদি একান্ত না বলিয়া থাকিতে না পার, তবে অল্প বলিয়া চুপ হইয়া থাকিবে। প্রত্যেক কথাই এই রকম চিন্তা করিয়া বলিতে থাক। খোদা চাহে ত অল্প দিনের মধ্যেই মন্দ কথা বলিতে নিজেরই ঘৃণাবোধ হইতে থাকিবে। মুখ সামলাইয়া রাখিবার ইহাও এক উপায় যে, একান্ত জরুরত না হইলে কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবে না। একা একা থাকিলে বেহুদা কথা বলিতে পারিবে না।

রাগ দমনের পন্থা

রাগ হইলে বুদ্ধি ঠিক থাকে না, আর পরিণাম চিন্তা করিবারও খেয়াল থাকে না। কাজেই মুখ দিয়াও নানারূপ অন্যায় কথা বাহির হইয়া যায়, বা অনেক সময় অনেক অন্যায় কাজও করিয়া ফেলে। অতএব, এহেন দুশমনকে দমন করা চাই। দমন করিবার উপায় এই—সর্বপ্রথমে যাহার উপর রাগ হইাছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সম্মুখ হইতে সরাইয়া দাও। আর যদি সে না যায় তবে নিজেই তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া যাও। তারপর চিন্তা করিয়া দেখ যে, তোমার নিকট সে যতটুকু অপরাধী, তার চেয়ে ত তুমিই আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে বেশী অপরাধী। আবার তুমি যেমন চাও যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন, সেই রকমেই তোমারও তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়া উচিত। মুখে আউযুবিল্লাহ্‌ কয়েকবার পড়িবে এবং পানি পান করিবে বা ওযূ করিবে। এইরূপ করিলে ক্রমশঃ রাগ চলিয়া যাইবে। তারপর যখন বুদ্ধি ঠিক হয়, তখন তাহার অপরাধ দেখিয়া যদি শাস্তি দেওয়াই সঙ্গত বোধ হয় অর্থাৎ শাস্তিতে অপরাধীর উপকার হইবে মনে হয়। যেমন নিজের সন্তান, কেননা তাহাদের চরিত্র সংশোধন করা একান্ত আবশ্যক, বা

অপরাধী অন্য কাহারও উপর অত্যাচার করিয়াছে, এখন তাহার প্রতিশোধ লওয়া উচিত; তবে প্রথমে চিন্তা করিয়া দেখ যে, কতটুকু অপরাধ এবং সে অনুপাতে কত পরিমাণ শাস্তি হওয়া দরকার? এবিষয়ে শরীঅত অনুযায়ী যখন নিঃসন্দেহভাবে ব্যবস্থা মাথায় আসিয়া যায়, তখন অবশ্য সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পার। এইরূপে কিছু দিন পর্যন্ত রাগকে দমন করিতে থাকিলে পরে আর তত জোর থাকিবে না; ক্রমশঃ তোমারই কাবু হইয়া যাইবে। রাগের কারণেই মনের মলিনতা অর্থাৎ কীনা হইয়া থাকে; রাগের সংশোধন হইয়া গেলে পরে কীনারও সংশোধন হইয়া যাইবে, মনের মলিনতাও দূর হইয়া যাইবে।

হাসাদ, হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা

কাহারও ভালভাবে খাইতে পরিতে, সুখে জীবন-যাপন করিতে দেখিয়া বা কাহারও মান-সম্মান, এলম-লেয়াকত দেখিয়া যে এক প্রকার মনঃকষ্ট উপস্থিত হয় এবং আকাঙ্ক্ষা হয় যে, এই সব তাহার না থাকুক বা চলিয়া যাউক, তবে মন সন্তুষ্ট হয়, ইহাকেই বলে হাসাদ বা হিংসা অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা। হাসাদ বড়ই খারাপ জিনিস। ইহাতে যেমন একদিকে গোনাহ্ হয়, তেমনই এরকম জীবনে কখনো শান্তি পায় না। চিরকাল কষ্টেই কাল যাপন করে। দ্বীন এবং দুনিয়া উভয়ই পণ্ড হয়। হাসাদ যখন এতদূর অনিষ্টকর, কাজেই তাহা হইতে মুক্তি পাইবার পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। মুক্তি পাইবার উপায় এই যে, প্রথমে চিন্তা করিয়া দেখ যে, হাসাদ করিলে তাহার কোনই ক্ষতি নাই, তোমারই ক্ষতি হইতেছে এবং তুমিই কষ্ট ভোগ করিতেছ। তোমার ক্ষতি এই যে, হাসাদ করার কারণে তোমার সমস্ত নেকী বরবাদ হইতেছে। কেননা, হাদীস শরীফে আছে যে, যেরূপ আগুন কাষ্ঠকে খাইয়া (জ্বালাইয়া) ফেলে, ঠিক সেইরূপ হাসাদ মানুষের নেকীকে খাইয়া ফেলে। (মতলব এই যে, তুমি যদি কাহারও প্রতি হাসাদ কর, তবে কিয়ামতের দিন তোমার নেকী তাহাকে দেওয়া হইবে; আর তুমি খালি হাত থাকিয়া যাইবে। অতএব, তোমার সেই পরিমাণ সৎকাজ বরবাদ যাইবে) ইহার কারণ এই যে, হাসাদকারী স্পষ্টভাবে না বলিলেও পরোক্ষভাবে বলিতে চায় যে, (নাউযুবিলাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা অন্যায় করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এ ধন-সম্পত্তির যোগ্য ছিল না অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করা হইয়াছে, তা যেন আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মোকাবেলা করা হয় (তওবা)। ভাবিয়া দেখ, কত বড় গোনাহ্! আর কষ্ট ত স্পষ্টই দেখা যায় যে, হাসাদকারী সর্বদাই অশান্তিতে বাস করে, জীবন ভরিয়া কখনও সুখ পায় না। আর যাহার উপর হাসাদ করা হয় তাহার কোন ক্ষতি নাই। কেননা, হাসাদের কারণে তাহার ধন-সম্পত্তি কিছুতেই কম হইতে পারে না, বরং তাহার লাভ। কেননা, সে হাসাদকারীর নেকী পাইতে থাকিবে। এই রকমভাবে খুব চিন্তা করিয়া তারপর যাহার উপর হাসাদ হইয়াছে, নিজ মুখে লোক সমাজে তাহার তারীফ এবং প্রশংসা করিবার জন্য নিজের মনকে জোর জবরদস্তি বাধ্য করিবে এবং বলিবে যে, আল্লাহ্র শোক্র যে, তাহার কাছে এমন এমন নেয়ামত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আরও দ্বিগুণ চতুর্গুণ দান করুন। আর যদি তাহার সঙ্গে কখনও দেখা হয়, তবে তাহার প্রতি নেহায়েত ভক্তি প্রদর্শন করিবে (মন যদিও করিতে চায় না, তবুও জোর জবরদস্তি করিবে) এবং তাহার সহিত নেহায়েত নম্র ব্যবহার করিবে। প্রথমে প্রথমে এইরূপ ব্যবহার করিতে নফ্সের বড়ই কষ্ট হইবে, কিন্তু ক্রমশঃ খোদার ফযলে কষ্ট কম হইতে থাকিবে, নফ্সের দুষ্টামি হ্রাস পাইতে থাকিবে, হাসাদও চলিয়া যাইবে। এই হইল হাসাদ রোগের চিকিৎসা।

দুনিয়া এবং অর্থ লোভ ও তাহার প্রতিকার

টাকা-পয়সার লোভ এত বড় খারাপ জিনিস যে, একবার ঢুকিলে আর আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইয়াদ থাকিতে পারে না। কেননা সে ত সব সময়ই চিন্তা করিবে যে, টাকা কেমন করিয়া আসিবে, টাকা কেমন করিয়া জমা হইবে? এমতাবস্থায় কখন এবং কেমন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করিবে? আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মহব্বত করিতে গেলে যে কাজের ক্ষতি হয় তাহাই বা করিবে কেন? সে ত শুধু এই চিন্তায় জীবন নষ্ট করিবে যে, কাপড় এই রকম হওয়া চাই, অন্যান্য আসবাব-পত্র এই রকম হওয়া চাই, বাড়ী-ঘর ও বাগ-বাগিচার এই রকম সুবন্দোবস্ত করা চাই ইত্যাদি। বল ত দেখি, এত জঞ্জাল যার মধ্যে সব সময় ভরা থাকে, তার মনে কি আর একবারও আল্লাহ্র কথা জাগিতে পারে? অর্থের লোভের আর এক দোষ এই যে, যাহার মনের মধ্যে অর্থের লোভ একবার বসিয়া যায়, সে কিছুতেই আল্লাহ্র কাছে যাইতে অর্থাৎ মরিতে চায় না; বরং তাহা বড়ই কষ্টকর বলিয়া মনে করে। কেননা, সে জানে যে, মরা মাত্রই তাহার এই ভোগ বিলাস, এইসব আরাম-আয়েশের লেশমাত্রও থাকিবে না। আবার কখনও এরকম হয় যে, মরার অব্যবহিত পূর্বে দুনিয়াকে বর্জন করা তাহার নিকট বড়ই কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। আর যখন জানিতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তাহাকে দুনিয়া হইতে ছাড়াইতেছেন, তখন (তওবা, তওবা) আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাগান্বিত হইয়া ঈমান হারায় এবং কুফরী হালাতে মরে। "নাউযুবিল্লাহি মিন যালেক।" আর এক দোষ এই যে, অর্থের লোভে পড়িয়া যখন অর্থ সংগ্রহ করাতে লাগিয়া যায়, তখন আর হালাল, হারাম, হক, না-হক্ ও সত্য-মিথ্যার খেয়াল থাকে না। টাকা পাইলেই হইল—ধোঁকাবাজি করিয়াই হউক বা সুদ, ঘুষ খাইয়া হউক, যে রকমেই পারে ধনাগারের উন্নতি করিতে পারিলেই হইল; এইসব কারণেই হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, দুনিয়ার মায়াই সর্বপ্রকার পাপের মূল।

যখন লোভ এত মারাত্মক জিনিস, তখন ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য। মনকে এহেন অপবিত্র জিনিস হইতে পবিত্র করা যারপর নাই আবশ্যক। তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় এই যে, প্রথমে ত মৃত্যুকে খুব বেশী করিয়া স্মরণ করা চাই, এবং সব সময় এই চিন্তা করা চাই যে, এইসব একদিন ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তবে ইহাতে মনোনিবেশ করিয়া কি লাভ? বরং যতই মনের আকর্ষণ এইসব জিনিস-পত্রের দিকে বেশী হইবে তাহা ছাড়িবার সময় ততই অধিক কষ্ট হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই করা চাই যে, অধিক লোকের সহিত দুস্তি-মহব্বত, আলাপ-পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎ লেনদেন করা চাই না, আসবাব-পত্র জায়গা-জমিও জরুরতের চেয়ে বেশী সংগ্রহ করা চাই না। কারবার, ব্যবসায়-বাণিজ্যও অনেক বেশী বিস্তৃত করা চাই না, যে পরিমাণ হইলে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়—তাহা অপেক্ষা বেশী বাড়ান চাই না। ফলকথা এই যে, সব সামানই সংক্ষেপ রাখা উচিত। তৃতীয়তঃ, এই করা চাই যে, অযথা অপব্যয় করা চাই না। কেননা, বেহুদা খরচ করিলে আয় বৃদ্ধি করারও লোভ জন্মে, আর এই লোভেই সমস্ত দোষের উৎপত্তি হয়। চতুর্থতঃ, মোটা খাওয়া-পরার অভ্যাস করা চাই;

পঞ্চমতঃ, দরিদ্রদের সহিত সব সময় উঠা-বসা করিবে, ধনীদের সংসর্গে যাইবে না। কারণ তাহাতে নানা প্রকার বড় মানুষির খেয়াল দেমাগের মধ্যে ঢুকে। ষষ্ঠতঃ, যে সব বুযুর্গেরা দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের জিবনী মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে। সপ্তমতঃ, যে জিনিসের সঙ্গে মনের খুব বেশী তা'আল্লুক হয়, তাহা হয় কাহাকেও দিয়া দিবে, না হয় বেচিয়া ফেলিবে। এই সব তদবীর করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ দিল হইতে দুনিয়ার মহব্বত দূর হইয়া যাইবে এবং যে সমস্ত বড় বড় দুরাশা মনকে আলোড়িত করিতে থাকে, যথা—এই রকমভাবে টাকা সংগ্রহ করিব, ছেলেপিলের জন্য এত টাকা এবং এত জায়গা-জমিন রাখিয়া যাইব। (ছেলেমেয়েকে এই রকম বড় ঘরে বিবাহ দিব, সে সবও ক্রমশঃ ইন্‌শাআল্লাহ্ মন হইতে দূরীভূত হইতে থাকিবে। এই হইল সর্বাপেক্ষা বড় রোগ—দুনিয়ার মহব্বতের মহৌষধ।) দুনিয়ার মহব্বত যখন চলিয়া যাইবে এইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিজে নিজেই দূর হইয়া যাইবে।

কৃপণতার অপকারিতা ও তাহার প্রতিকার

কৃপণতা এত বড় খারাপ জিনিস যে, অনেকগুলি ফরয ও ওয়াজিব ইহার কারণে আদায় হয় না। যেমন—যাকাত দেওয়া, কোরবানী করা, অভাবগ্রস্তের সাহায্য করা, নিজের দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের উপকার করা। এই সব নেক কাজ হইতে বঞ্চিত থাকা এবং এই সমস্ত পাপের বোঝা কাঁধে লওয়া সবই একমাত্র বখিলীর কারণে। এইত হইল দ্বীনের নোকছান। আর দুনিয়ার নোকছানও অনেক আছে। তাহা এই যে, বখীলকে সকলেই ঘৃণা করে, এর চেয়ে নোকছান আর কি হইতে পারে? এ দুরন্ত রোগের চিকিৎসা এই যে, প্রথমতঃ ধন-সম্পত্তির ও দুনিয়ার লালসাকে মন হইতে বাহির করিয়া দিবে, যখন মালের মহব্বত না থাকিবে, তখন কৃপণতা থাকিতেই পারে না; (কেননা, মালের মহব্বতের কারণেই লোক বখিলী করে।) দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থা যে, যে সব জিনিস একান্ত আবশ্যকীয় নয় তাহা কাহাকেও দিয়া ফেলিবে, যদিও মনে না চায় এবং কষ্ট হয় তবুও দিয়া ফেলিবে। তাহাতে কষ্ট হইলে একটু হিম্মত করিয়া কষ্ট সহ্য করিয়া লও। যাবৎ বখিলী মনের মধ্যে থাকে তাবৎ এই রকমই করিতে থাকিবে।

প্রশংসা ও যশের আকাঙ্ক্ষার অপকারিতা ও তাহার প্রতিকার

সুখ্যাতির লোভ মনের মধ্যে পড়িলে পরে অন্যের সুখ্যাতি প্রশংসা দেখিয়া মনে আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং হাসাদ পয়দা হয়। আর হাসাদের অপকারিতা উপরেই জানিয়াছ। তা ছাড়া অন্যের অপমান বা পরাজয়ের কথা শুনিয়া মনে আনন্দ জন্মে। অন্যের মন্দ চাওয়া বা মন্দ দেখিয়া আনন্দিত হওয়াও বড়ই গোনাহ্‌র কাজ। ইহাও এক খারাবী যে, অনেক সময় নাজায়েয উপায়ে সুখ্যাতি অর্জন করার চেষ্টা করা হয়। যেমন, বিবাহ শাদীতে সুনামের জন্য অযথা নানারূপ অপব্যয় করা হয়, আর এই অপব্যয়ের মাল অনেক সময় ঘুষ লইয়া খরচ করা হয়, বা সুদী করিয়া লওয়া হয়। এ সমস্ত গোনাহ্ কেবল নামের লোভের কারণে হয়; আর এতে দুনিয়ার নোকছান এই যে, যাহার নাম বেশী হয়, তাহার অনেক লোক শত্রু হইয়া পড়ে এবং নানারূপ কষ্ট দিবার জন্য চেষ্টা করে। এ রোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় এই যে, প্রথমে চিন্তা কর যে, তুমি যাহাদের নিকট ভাল হইতে চাও তাহারাও থাকিবে না, তুমিও থাকিবে না, দু'দিন পর সকলেরই

চলিয়া যাইতে হইবে, তখন এমন অসাড় জিনিসে মন লাগান নির্বুদ্ধিতা নয় কি? দ্বিতীয় এলাজ এই যে, এমন কোন কাজ করা, যাহা শরীঅতের খেলাফ নয়, কিন্তু লোকসমক্ষে তাহার কারণে লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হয়। যেমন, বাড়ীর কোন নগণ্য জিনিস বিক্রি করা, তাতে দুর্নাম খুব হয়, কিন্তু শরীঅত অনুযায়ী সম্পূর্ণ জায়েয।

অহঙ্কার ও তাহার প্রতিকার

এল্‌ম, এবাদত, দিয়ানতদারী, দ্বীনদারী, হাছব, ধনদৌলত, চিজ-আসবাব, মান-সম্মান, বিদ্যা-বুদ্ধি ইত্যাদি কোন গুণে নিজকে বড় মনে করিয়া অন্যকে ক্ষুদ্র এবং হেয় মনে করাকে গরুরী, অহঙ্কার এবং তাকাব্বুর বলে। ইহা বড়ই সাংঘাতিক রোগ, বরং তামাম রোগের মূল এবং অতি বড় গোনাহ্। হাদীস শরীফে আছে, যাহার মনের মধ্যে বিন্দুমাত্রও অহঙ্কার থাকিবে, সে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না। এ ত গেল আখেরাত এবং দ্বীনের খারাবী। এ ছাড়া দুনিয়াতে যদিও সাক্ষাতে ভয়ে কেহ কিছু না বলে বরং সম্মান করে কিন্তু মনে মনে সকলেই অহঙ্কারীকে বড়ই ঘৃণা করিয়া থাকে এবং সুযোগে শত্রুতা করিয়া প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। আর এক খারাবী এই যে, এ রকম অহঙ্কারী লোক কাহারও নছীহত কবূল করে না। কেহ সৎপরামর্শ দিলে তাহাও গ্রহণ করে না; বরং খারাপ মনে করে এবং নছীহতকারীকে কষ্ট দিতে চায়। এহেন মারাত্মক রোগের অমোঘ ঔষধ এই যে, তুমি কি? এবং কে? একবার ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। চিন্তা করিয়া দেখ যে, তুমি ত সেই মাটিই যাকে দিবারাত্রি লোকে পদদলিত করিতে থাকে, তোমার মূল ত সেই এক বিন্দু দুর্গন্ধময় অপবিত্র পানিই, যাহা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া বাহির হইয়া থাকে। এক্ষণে যদি তোমার মধ্যে কোন গুণ, কোন কামাল আসিয়া থাকে তাহা তোমার বাহুবলে অর্জিত নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তোমাকে দান করিয়াছেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন এই ক্ষণেই সবই কাড়িয়া নিতে পারেন এবং তোমাকে সম্পূর্ণভাবে সর্বগুণহীন করিয়া দিতে পারেন এবং এতদ-সত্ত্বেও কোন সামান্য কামালিয়াতের উপর ফখর করা আহ্‌মকী নয় কি? ইহা তো গেল নিজের স্বরূপ এবং "নিজে কিছু না হওয়ার"র চিন্তা করার কথা। এ ছাড়া আরও চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কত বড়! সমস্ত কামাল ত তাঁহার মধ্যে কত অসীম ও অনন্ত পরিমাণে বিদ্যমান! আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে নিজের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যাইবে; কামালিয়াত ত অনেক দূরের কথা। এতদ্ব্যতীত যাহাকে তুমি ক্ষুদ্র এবং হেয় বলিয়া মনে কর, তাহার সহিত জোর-জবরদস্তি নম্র ব্যবহার করিবে এবং তাহাকে সম্মান করিবে; তাহা হইলে অহঙ্কার নিজেই চলিয়া যাইবে। আর যদি কিছু না হয়, যদি এতটুকু করিতে পার যে, কোন সামান্য লোককে দেখিয়া প্রথমেই তাহাকে সালাম কর, তবেও নফ্‌সের মধ্যে অনেক আজিযী আসিয়া যাইবে এবং ক্রমশঃ দাম্ভিকতার স্থলে নম্রতা স্থান পাইতে থাকিবে।

আত্মগর্ব ও তাহার প্রতিকার

যদিও অন্য কাউকে হেয় মনে না হয়, কিন্তু নিজেকেই নিজে ভাল মনে করা বা নিজের কোন জিনিসের উপর গর্বিত হওয়া, যেমন ভাল কোন কাপড় পরিয়া গর্ব-ভরে চলা ইহাও বড়ই খারাপ। হাদীস শরীফে আছে— এই দোষ লোকের দ্বীনকে বরবাদ করিয়া ফেলে। তাছাড়া যে নিজেকে ভাল বলিয়া মনে করে সে নিজের দোষ-ত্রুটি কখনও এছলাহ করিতে পারে না। কেননা, যে

প্রথম হইতেই নিজেকে দোষ ত্রুটিশূন্য মনে করিয়া বসিয়াছে সে ত কখনো চিন্তাও করিবে না যে, তাহার মধ্যে কোন দোষ আছে। (আর চিন্তাই সমস্ত এছলাহের মূল।)

নিজের দোষ এবং আয়েবগুলি এক এক করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ (এবং সংশোধনে তৎপর হও) এবং মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাও যে, যদি তোমার মধ্যে কোন গুণ থাকিয়া থাকে, তবে তাহা আল্লাহ্ তা'আলারই দান, তোমার কিছুই নয়। এই চিন্তা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার শোক্‌র কর এবং দো'আ কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে এই নেয়ামত হইতে মাহ্‌রূম না করেন। (এইরূপে চিন্তা করিতে থাক এবং এরূপে হিম্মতের সঙ্গে কাজ করিতে থাকাই এই রোগ হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায়।)

রিয়াকারীর দোষ ও তাহার প্রতিকার

(কোন কাজ লোক দেখানের জন্য করাকে রিয়া বলে। রিয়া অতি বড় গোনাহ্। এমন কি, কিয়ামতের দিন রিয়ার কারণে অনেক নেক আমলের সওয়াবের পরিবর্তে উল্টা আযাব মিলিবে।) রিয়া নানা প্রকার হয়, কোন সময় ত নিজের মুখেই বলিয়া ফেলে। যেমন কেহ বলে যে, আমি এত পরিমাণ কোরআন শরীফ পড়িয়াছি বা আমি রাত্রে উঠিয়া থাকি। কখনো অন্য কথার প্রসংগে বলা হয়, যেমন কোন মজলিসে বন্ধুদের মধ্যে কথা হইতেছিল, একজনে বলিয়া উঠিল, না এ সবই মিথ্যা কথা, "আমাদের কাফেলার সঙ্গে এই এই রকম ভাল ব্যবহার করিয়াছিল;" এখানে কথা প্রসঙ্গে সে জানাইয়া দিল যে, সেও হজ্জ করিয়াছে। কখনো কোন কাজ করায় রিয়া হয়, কেহ মানুষকে দেখাইবার জন্য হাতে তসবীহ্ লইয়া আসিয়া লোকসমক্ষে বসিয়া যায়। কখনো কাজটাকে একটু আরও ভাল করিয়া করায় রিয়া হয়; যেমন কোরআন শরীফ ত সব সময়ই পড়িয়া থাকে, কিন্তু দশজন লোকের মধ্যে মুখ বানাইয়া পড়ে। কখনো বা আকারে প্রকারে রিয়া হয়, যেমন চক্ষু বন্ধ করিয়া ঘাড় নোয়াইয়া বসিয়া থাকে, লোকে ভাবিবে যে, বড়ই দরবেশ, সব সময় আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকেন, রাত্রে ঘুমান নাই তাই চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে। এইরূপে এই রিয়া রোগ আরও কয়েক প্রকারের হয়। যেই ভাবেই হউক রিয়া বড়ই সাঙ্ঘাতিক রোগ। পূর্বে সুখ্যাতি আকাঙ্ক্ষার যে সব এলাজ লেখা হইয়াছে, তাহাই এই রোগেরও এলাজ। কেননা, লোক দেখাইবার জন্য যে সব কাজ লোকে করে তাহাও এই জন্যই করিয়া থাকে যে, লোকে ভাল বলিবে, প্রশংসা করিবে, সুনাম রটিবে। (তাই উভয় প্রকার রোগের এই এলাজ।)

কয়েকটি জরুরী কথা

উল্লিখিত ত্রুটিসমূহের যে সব এলাজ এ পর্যন্ত লেখা হইয়াছে তাহা দুই চারি বার আমল করিলেই যে সেসব দোষ হইতে মুক্তি পাওয়া গেল তাহাও নহে; বরং বহুকালব্যাপী, (এমন কি সারা জীবনব্যাপী) এই ভাবেই আমল করিতে থাকিবে। (এক মুহূর্তও গাফেল হইলে চলিবে না, নফ্‌সের কোন বিশ্বাস নাই, নফ্‌স বড়ই দুষ্ট, নফ্‌সের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিত হইয়া যাওয়া নির্বুদ্ধিতা মাত্র! কখনো যদি ভুল হইয়া যায়, তবে মনে মনে নেহায়েত আফসোস এবং আক্ষেপ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইবে। এইরূপ করিতে করিতে আল্লাহ্ চাহে ত একদিন নফ্‌সের দুষ্টামি শেষ হইতে পারে। উদহরণস্বরূপ যেমন রাগকে দুই চারিবার দমন করিয়া বুঝিবে না যে, এই রিপু হইতে মুক্তি পাইয়াছ, বা দুই চারিবার যদি রাগ না আসে, তবে ধোঁকা খাইবে

না যে, তোমার নফ্‌সের বোধ হয় এছলাহ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; বরং নফ্‌সের শত্রুতা হইতে আমরণ সতর্ক থাকিতে হইবে। হাঁ, ইহা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ যে, প্রথম প্রতিবন্ধকতা করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হয় বটে; কিন্তু ক্রমশঃ এই কষ্টের লাঘব হয়।

আরও জরুরী একটা কথা

নফ্‌সের মধ্যে যে দুষ্টামি ও দোষ আছে এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা যেসব গোনাহ্ হয়, এ সবের জন্য এক সহজ ঔষধও আছে। তাহা হইল এই যে, যখনই নফ্‌স কোন দুষ্টামি করে বা গোনাহ্ হয়, তখনই নফ্‌সকে কিছু শাস্তি দান কর। আর সাধারণতঃ দুই প্রকার শাস্তিই সহজসাধ্য। (১) যখনই কোন অন্যায় কাজ কর, তখনই নিজের অবস্থানুসারে আনা দু'আনা বা টাকা দু'টাকা জরিমানা করিয়া তাহা গরীবকে দাও। আবার যদি সেই কাজ কর, আবার জরিমানা দাও। (২) কোন অন্যায় কাজ করিয়া বসিলে দুই-এক ওয়াক্ত নফ্‌সকে না খাওয়াইয়া রাখ। আশা করা যায় যে, যদি কেহ এইরূপ শস্তির বিধান করিতে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মুক্তি দান করিতে পারেন।

এপর্যন্ত মানুষের মধ্যে যেসব দোষ সাধারণতঃ দেখা যায়, তাহার সংশোধনের বয়ান ছিল, এক্ষণে যে সব কাজে মানুষের মন নূরে আলোকিত এবং সুসজ্জিত হয় তাহার বয়ান করা হইবে!

তওবা এবং তাহার প্রণালী

তওবা এমন ভাল কাজ যে, ইহা দ্বারা সমস্ত গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়। যে নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং দেখে যে, অনবরত আমার দ্বারা কোন না কোন গোনাহ্ হইতেই থাকে, সে নিশ্চয়ই সব সময়ের জন্য তওবাকে জরুরী মনে করিবে। তওবার ভাব মনের মধ্যে জাগাইবার উপায় এই যে, কোরআন হাদীসে গোনাহ্‌র কারণে যে সমস্ত আযাবের কথা বলা হইয়াছে, সে সব স্মরণ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। যখন ভালরূপ চিন্তা করিবে তখন নিশ্চয়ই মন গলিয়া যাইবে এবং মনে এক প্রকার অনুতাপ ও লজ্জার ভাব উদয় হইবে। যখন মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইবে, তখন মুখেও স্বীকার করিয়া লইবে এবং যেসব নামায, রোযা ইত্যাদি ছুটিয়া গিয়াছে সে সব কাযা করিয়া লইবে; আর যদি কোন মানুষের কোন হক নষ্ট করিয়া থাক তবে তাহার নিকট হইতে মাফ করাইয়া লইবে বা পরিশোধ করিয়া দিবে। আর যদি এছাড়া অন্য কোন গোনাহ্ হইয়া থাকে, তবে মনে মনে খুব দুঃখিত হইবে এবং যথাসাধ্য কাতরস্বরে করজোড়ে ও নম্রভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাফ চাহিবে (এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে যে, এমন আর কখনো করিব না!) এই হইল আসল তওবা।

আল্লাহ্ তা'আলার ভয়

আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলিয়াছেনঃ আমার ভয় মনে জাগাইয়া রাখ, আল্লাহ্ তা'আলার ভয় এমন উত্তম জিনিস যে, ইহা যদি মানুষের মধ্যে থাকে, তবে গোনাহ্ হইতে পারে না। তওবার প্রণালীই ইহার প্রতিকারের তরীকা, আল্লাহ্ তা'আলার সেই ভীষণ আযাবের কথা চিন্তা করিয়া দেখ এবং স্মরণ কর।

আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আশা রাখা

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, তোমরা আমার রহমত ও অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না। এই আশা এমন ভাল জিনিস যে, ইহাতে সৎকাজে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং তওবা করিবার হিম্মত জন্মে। আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আশা মনের ভিতর জন্মাইবার উপায় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ও অপার রহমতের কথা মনে করিয়া চিন্তা করিবে।

ছবর

নফ্সকে দ্বীনের কাজের পাবন্দ রাখা এবং শরীঅতের খেলাফ কোন কাজ করিতে না দেওয়াকে ছবর বলে। বছর কয়েক প্রকার।

প্রথম প্রকার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মান-সম্মান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, চাকর-নকর, গাড়ী-ঘোড়া, আওলাদ-ফরযন্দ, দালান-কোঠা ইত্যাদি সব রকমেরই নেয়ামত দান করিয়াছেন। এ অবস্থায় ছবর এই যে, এইসব পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলিয়া যাইও না, অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিও না, গরীব-গোরাবাকে হীন মনে করিও না, তাহাদের সঙ্গে যথাসম্ভব সদয় ব্যবহার করিও এবং সাধ্যমত তাহাদের খেদমত করিতে থাকিও।

দ্বিতীয়—এবাদতের সময় ছবর। এবাদত করিতে অনেক সময় নফ্স আলস্য করে; যেমন, নামাযের জন্য জাগিতে বা জমা'আতে নামায পড়িতে যাইতে নফ্স অলসতা করিয়া থাকে বা কোন সময় কৃপণতাও করে; যেমন, দান-খয়রাত করিবার বা যাকাত দিবার সময় নফ্স বখিলী করিয়া থাকে, এইরূপ স্থলে তিন প্রকার ছবরের দরকার। প্রথম, এবাদত শুরু করিবার পূর্বে নিয়ত খুব খালেছ করিয়া লইবে, শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তেই করিবে, অন্য কোন নফ্সানী গরযে করিবে না। দ্বিতীয়, এবাদতের সময় উৎসাহ ভঙ্গ হইলে চলিবে না, পূর্ণ উৎসাহ এবং হিম্মতের সহিত এবাদত যেমনভাবে করা চাই তেমনভাবে করিবে। এবাদতের হক আদায় করিবে। তৃতীয়, এবাদত করিয়া অন্য কাহাকেও বলিবে না।

তৃতীয়—গোনাহ্র সময়ের ছবর। গোনাহ্র সময়ের ছবর এই যে, নফ্সকে গোনাহ্ হইতে যে রকমেই হয় নিরাপদ রাখিবে।

চতুর্থ—যে সময় কেহ কোন রকম কষ্ট দেয় সেই সময়ের ছবর। এরকম সময়ের ছবর হইল এই যে, যে রকম কষ্টই হউক না কেন, যে রকম মন্দই বলুক না কেন, তুমি কোনরূপ প্রতিশোধ লইও না।

পঞ্চম—যে সময় কোন বিপদ-আপদ আসিয়া পড়ে, কোন রোগ পীড়া হয় বা টাকা-পয়সার কোন রকম সাংঘাতিক ক্ষতি হইয়া যায় বা খাওয়া-পরার কষ্ট হয় বা কোন আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু ঘটে, সেই সময়ের ছবর। এরকম সময়ের ছবর এই যে, এরকম সময় শরীঅতের খেলাফ কোন কথা মুখ দিয়া বাহির করিও না বা বয়ান করিয়া ক্রন্দন করিও না। এই সব প্রকার ছবরই হাছেল

করিবার উপায় এই যে, এই রকম স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা যে সব ছওয়াবের ওয়াদা করিয়াছেন সেই সব স্মরণ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবে এবং মনে মনে এই বিশ্বাস করিবে যে, এ সব আমারই কোন না কোন মঙ্গলের জন্য হইতেছে, যদিও আমি বুঝিতে পারিতেছি না এবং একথা মনকে বুঝাইবে যে, যদিও আমি ছবর না করি, তবে তক্দীরে যা আছে তাহা ত হইবেই, মিছামিছি কেন বে-ছবরী করিয়া ছওয়াব হারাইব ?

শোক্র

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনন্ত অনুগ্রহ দেখিয়া মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া তাঁহার প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি জমান এবং মনে মনে এরূপ ভাবের উদয় হওয়া যে, যে-জন (অযাচিতভাবে) আমাকে এইসব সামগ্রী দান করিয়াছেন (সে জনের এবাদত না করিয়া কেমন করিয়া পারা যায় ? অতএব,) প্রাণপণে তাঁহার এবাদত করা চাই এবং নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাকা চাই। কেননা, এহেন উপকারী জনের আদেশ অমান্য করা বড়ই লজ্জার কথা। ইহাকেই শোক্র বলে। মানুষের উপর অনবরত আল্লাহ্র অসীম অনন্ত নেয়ামতরাশি বর্ষিত হইতেছে, এমনকি যদি কোন মুছীবতও আসে, তবে তাহাতেও মানুষের অসংখ্য মঙ্গল নিহিত থাকে। (কেননা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করিলে তাহাতে অনেক ছওয়াবও পাওয়া যায় এবং নফ্সের এছলাহও হয়,) কাজেই তাহাও নেয়ামতই। অতএব, যখন দেখা গেল যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ আমাদের উপর অনবরত বর্ষিত হইতেছে, তখন আল্লাহ্র সঙ্গে অগাধ মহব্বত এবং প্রগাঢ় ভক্তি অনবরত থাকা চাই এবং আল্লাহ্র হুকুমগুলি পালন এবং বিন্দুমাত্র আদেশও যেন লঙ্ঘন না হয় সে জন্য সতত তৎপর থাকা চাই।

শোক্র হাছেল করিবার উপায় এই যে, কিছুক্ষণ নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্র নেয়ামত ও অনুগ্রহরাশি চিন্তা করিবে (এবং এই উপায়ে আল্লাহ্র মহব্বত বর্ধিত করিতে চেষ্টা করিবে)।

কতকগুলি উপদেশ—(পরিবর্ধিত)

খোদার ভয় দেলে রাখ। পাপ কাজ করিও না। ওযূ করিয়া নামায পড়। নামাযী মানুষ আল্লাহ্র পেয়ারা হয়। বেনামাযী আল্লাহ্র রহ্মত হইতে দূরে থাকে। গরীবের বদদোআ লইও না। গরীবকে তুচ্ছ বা অত্যাচার করিও না। অযথা কোন জীবজন্তুকে কষ্ট দিও না। বিড়াল কুকুর বা গরু বাছুরকে অযথা মারিও না বা গৃহপালিত পশু-পক্ষীকে অনাহারে কষ্ট দিও না। মা-বাপের কথা শুন। মা-বাপের প্রহারকে গৌরব মনে কর। প্রাণের সহিত মা-বাপের খেদমত কর। বেহেশ্ত মা-বাপের পায়ের তলে। মা-বাপের কথার পাল্টা জওয়াব দিও না। মা-বাপ রাগ করিয়া কোন কথা বলিলে বা তিরস্কার করিলে চুপ করিয়া তাহা সহ্য কর। কোন বিষয়ে মা বাপের মনে কষ্ট দিও না। মা, বাপ, ওস্তাদ, পীর এই চারিজনকে প্রাণের সহিত ভক্তি কর। মুরব্বিদের সামনে আদব-তমীযের সাথে থাক। ছোটদের স্নেহ কর। বড়দের ভক্তি কর; আলেমদের সম্মান কর; কাহাকেও তুচ্ছ করিও না। ছোট ভাই-বোনদের সহিত বা পাড়া-প্রতিবেশীদের সহিত ঝগড়া-কলহ বা মারামারি করিও না। যাহার মধ্যে নম্রতা গুণ আছে, তাহাকে সকলে ভালবাসে। অহঙ্কারীকে সকলেই ঘৃণা করে। পরের দোষ দেখিও না। পানির গ্লাস এবং চা'এর পেয়ালা ডান হাতে ধরিয়া পানি এবং চা পান কর। বাম হাতে খাওয়া-পিয়া শয়তানের কাজ। তিন শ্বাসে পান কর। ভাত সালুন কিছু ঠাণ্ডা করিয়া খাও। বেশী গরম খাওয়াতে বরকত থাকে না। মিথ্যা কথা বলিও না।

সদা সত্য কথা বলিবে। মিথ্যা বলা মহাপাপ। সকাল বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া আউযুবিল্লাহ্ বিসমিল্লাহ্ এবং লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ কলেমা পড়িবে এবং মুরব্বিদের সালাম করিবে। ফজরের নামায পড়িয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিবে। ছবক ভালমত ইয়াদ করিবে। বার বার কছম খাইবে না। নিজের বই, কিতাব, দোয়াত, কলম, নিজের কাপড়, বিছানা-পত্র নিজেই যত্ন করিয়া রাখিবে, যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিবে না। কাহাকেও ঠাট্টা করিবে না বা কাহাকেও ভেঙ্গাইবে না। নাক বাম হাত দিয়া ছাফ করিবে। জুতা পরিবার সময় আগে ডাইন পায়ে পরিবে পরে বাম পায়ে পরিবে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পেশাব করিও না। পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হইয়া পেশাব পায়খানা করিতে বসিও না। কাহাকে খাইতে দেখিলে তথায় যাইয়া বসিও না। পরিশ্রমী হও। অলস হইও না। অপব্যয় করিও না। বিলাসিতা করিও না। কৃষি কাজকে ঘৃণা করিও না। —অনুবাদক

তাওয়াক্কুল

[আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা]

প্রত্যেক মুসলমানেরই ঈমান (অকাট্য বিশ্বাস) আছে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে দুনিয়াতে লাভ-লোকসান বা উপকার অপকারের কোন কিছুই হইতে পারে না। (ইহাই তক্‌দীরের উপর ঈমান আনার সারমর্ম। শরীঅতে যেমন তক্‌দীরের উপর ঈমান রাখার হুকুম আছে তেমনই তদ্‌বীর করারও হুকুম আছে। তক্‌দীরের উপর মজবুত ঈমান এবং পূর্ণ বিশ্বাস ত রাখিতেই হইবে, তারপর সংসার জীবন যাত্রার পথে দৈনন্দিন যত ঘটনা সামনে আসিবে, প্রত্যেক ঘটনার যথারীতি তদ্‌বীরও করিতে হইবে।) কিন্তু, যেমন বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না, তদ্রূপ প্রত্যেক কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেক চেষ্টার ফলের জন্য, প্রত্যেক তদ্‌বীরের কামিয়াবীর জন্য ভরসা রাখিতে হইবে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের উপর। ইহাকেই বলে তাওয়াক্কুল। নতুবা তদ্‌বীর না করিয়া হাত-পা গুটাইয়া অকর্মা হইয়া বসিয়া থাকা বা চেষ্টা না করিয়া ফলের আশা করা শরীঅতের বিধান নহে। নিয়ম মত চেষ্টা ও তদ্‌বীর করিতে হইবে। এক খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কোন আশা করিবে না বা অন্য কাহারও ভয়ে ভীত হইবে না; ভয় শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ্ না-রায না হইয়া যান, আল্লাহ্ না-রায হইলে সর্বনাশ। ইহাকেই বলে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। (তাওয়াক্কুল ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হয় না।)

তাওয়াক্কুল শিক্ষা এবং হাছেল করিবার উপায় এই যে, কিছুক্ষণ সময় নির্ধারিত করিয়া চিন্তা (মোরাকাবা) করিবে যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ্ দয়াময়, আল্লাহ্ মঙ্গলময়, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অন্য কাহারও কিছু করিবার ক্ষমতা নাই।

আল্লাহ্‌র সঙ্গে মহব্বত পয়দা করার নিয়ম

[আল্লাহ্‌কে ভালবাসা এবং ভক্তি করা]

আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রাণের টান থাকা, আল্লাহ্‌র কথা শুনিয়া প্রাণ গলিয়া যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র কার্য-কলাপ দেখিয়া মুগ্ধ হওয়াকে বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত। ইহা প্রত্যেক মুসলমানের বরং প্রত্যেক মানুষেরই স্বাভাবিক ধর্ম। আল্লাহ্‌র ন্যায় এমন দয়ালু, মহান এবং মহোপকারী জন আর কে আছে?

আল্লাহ্‌র সঙ্গে মহব্বত করিবার সহজ উপায় এই যে, আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম খুব বেশী করিয়া যিক্‌র করিবে। আল্লাহ্ যে তোমাকে কত ভালবাসেন (আর সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তিনি যে তোমার উপকার করেন, কত অসংখ্য অগণ্য নেয়ামতরাশি যে তুমি তাঁহার বিনা পয়সায় বিনা যাচ্ঞায় অনবরত ভোগ করিতেছ) এবং তিনি যে কত মহান, কত উদার, কত দয়ালু এই সব কথা দৈনিক কতক্ষণ নির্জনে বসিয়া গভীরভাবে চিন্তা (মোরাকাবা) করিবে। এই উপায়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত বাড়িবে।

রেযা-বিলক্কাযা

[আল্লাহ্‌র হুকুমে রাযী থাকা]

আল্লাহ্ ভাল এবং আল্লাহ্‌র সব কাজই ভাল, একথা বিশ্বাস করা, স্বীকার করা এবং প্রকাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরই ফরয। তুমি নিজে বিপদ টানিয়া আনিও না; নতুবা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যদি কোন বিপদ আসে বা কোন কঠিন আদেশ তোমার প্রতি হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহাতে তোমার মঙ্গল নিহিত আছে। কাজেই এরূপ সময়ে অস্থির হইও না, ঘাবড়াইয়া পেরেশান হইও না, মনের মধ্যে বা মুখের কথায় কোন শেকায়েত এ'তেরায বা প্রতিবাদ করিও না, বেজার হইও না; রাযী থাকিও। কারণ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যে বিপদ আসিবে তাহাতে তোমার গোনাহ্ মাফ হইবে, তোমার দর্জা বুলন্দ হইবে, ছওয়াব হাছেল হইবে, জ্ঞান ও মা'রেফাৎ বাড়িবে ইত্যাদি; তোমার অনেক প্রকার ফায়েদা তাহাতে নিহিত থাকে। এই সব ফায়েদার কথা চিন্তা করিবে এবং আল্লাহ্ যে একটুও মন্দ বা বিন্দুমাত্রও নিষ্ঠুর নন তিনি যে পরম দয়ালু পূর্ণ মঙ্গলময় এইসব কথা চিন্তা করিবে। তাহা হইলে সহজেই রেযা-বিলক্কাযা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমে রাযী থাকার মর্তবা হাছেল হইবে।

ছেদক ও এখলাছ হাছেল করিবার নিয়ম

[দেল খাঁটি করা এবং নিয়ত খালেছ করা]

দ্বীনের কাজে দুনিয়ার কোন গরযের নিয়ত রাখা চাই না। লোকের কাছে 'আদরণীয় বা সম্মানী হইব' এধারণাও করা চাই না এমন কি রোযা রাখিলে পেটের অসুখ সারে বা নামায পড়িলে ব্যায়াম হয় বা হজ্জ করিলে বহু দেশ দেখা যায়, যাকাত দিলে লোক হাত হয়, এইসব নিয়তও করা চাই না। এ সব বিষয় এবাদতের মধ্যে নিশ্চয় আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য ও নিয়ত হওয়া চাই—শুধু আল্লাহ্‌কে রাযী করা, আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়পাত্র হওয়া। তাছাড়া দুনিয়ার এইসব উপকারিতার নিয়ত কখনও করা চাই না; নতুবা নিয়ত খাঁটি ও খালেছ না হইলে কোন এবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায় না।

নিয়ত খালেছ করার উপায় এই যে, এবাদত করিবার পূর্বে কিছু চিন্তা করিয়া লইবে; দেলের মধ্য হইতে অন্যান্য বাজে উদ্দেশ্য সব দূরে নিক্ষেপ করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যের কথা দেলে স্থান দিবে। কতক দিন এইরূপে চেষ্টা করিলে সব আয়ত্তে আসিবে, তখন একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিলে কষ্টবোধ হইবে।

মোরাকাবা (আল্লাহ্র ধ্যান) হাছেল করিবার নিয়ম

[আল্লাহ্র খেয়াল সদাসর্বদা মনে রাখা]

সব সময় দেলের মধ্যে এই খেয়াল রাখিবে যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখিতেছেন, আমি যাহাকিছু করিতেছি, যাহাকিছু কথা বলিতেছি, যা কিছু মনে মনে চিন্তা করিতেছি, সবই আল্লাহ্ দেখিতেছেন। যদি কোন কু-কাজ করি বা কু-কথা মনে কল্পনা করি, তাহা দেখিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন এবং দুনিয়াতেই শাস্তি দিবেন, না হয় আখেরাতে কিয়ামতের দিন ত শাস্তি দিবেনই। দ্বিতীয়তঃ, এবাদতের সময় (নামায পড়ার সময়, যেকের করার সময়, যাকাত খয়রাত দেওয়ার সময়, রোযা রাখার সময়) এই খেয়াল সব সময় মনে রাখিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা দেখিতেছেন; অতএব, এইসব কাজ ভক্তি ও মনোযোগের সহিত করিতে হইবে। (ইহাতে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হইয়া অনেক পুরস্কার দিবেন, আর যদি অভক্তির সঙ্গে করি বা অলসতা করি, তবে তাঁহার নিকট গোপন কোন কিছুই থাকিবে না, তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। এই চিন্তাটি গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিতে হইবে।) অনবরত চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্র খেয়াল এত বাড়িয়া যাইবে যে, তখন আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। আল্লাহ্র মতের বিরুদ্ধে কোন কল্পনা মনে আসিলেও মনে ব্যথা লাগিবে। (এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্র কথা ভুলিয়া গেলে মনে যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। আল্লাহ্র ধ্যান (মোরাকাবা) অমূল্য রত্ন। সকলেরই ইহা হাছেল করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা দরকার। ইহা হাছেল করিবার সময় প্রথম প্রথম একটু কষ্ট করিতে হয়, পরে সহজ ও মধুর হইয়া যায়। প্রথম প্রথম মনে থাকিতে চায় না, বার বার মনকে জোর করিয়া টানিয়া আনিতে হয়। মনে না থাকিলেও মুখে অনবরত আল্লাহ্র যেকের করিতে হয়, আল্লাহ্ওয়ালাদের সংসর্গের বরকতে ক্রমান্বয়ে মন এমন মজিয়া যায় যে, মুহূর্তের তরেও গাফলত সহ্য হয় না।)

কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে হুযূরে ক্বাল্ব হাছেল করার নিয়ত

তোমাকে যদি তোমার ওস্তাদ পীর বা অন্য কোন বড় লোক আদেশ করেন যে, আমাকে কিছু কোরআন শরীফ পড়িয়া শুনাও, তখন তুমি সুন্দর করিয়া পড়িবে এবং যাহাতে একটি যের-যবরও ভুল না যায় এবং একটুও মন এদিক-ওদিক না যায় সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। তদ্রূপ কোরআন শরীফ যখন পড়িতে বস, তখন কিছুক্ষণ এই চিন্তা করিয়া লও যে, আল্লাহ্ সকলের বড়, সকল বাদশাহ্র বাদশাহ্; তিনি তাঁহার কালাম আমার দ্বারা পড়াইয়া শুনিতে চাহিতেছেন। যদি আমি সুন্দর করিয়া নির্ভুলভাবে মন লাগাইয়া পড়ি, তবে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, নতুবা ভুল পড়িলে বা অভক্তি ও অমনোযোগিতার সহিত পড়িলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন এইরূপ চিন্তা করিয়া তারপর পড়া শুরু করিবে এবং খুব ভক্তির সহিত একটুও ভুল না হয় সেইভাবে পড়িবে। যদি কতক্ষণ পড়িলে এই চিন্তা না থাকে, অমনোযোগিতা আসিয়া যায়, তখন পড়া বন্ধ করিয়া কতক্ষণ

আবার ঐরূপ চিন্তা তাজা করিয়া লইবে। কতক দিন এইরূপ মশ্ক করিলে, পরে ঐ চিন্তা খুব গাঢ় হইয়া যাইবে এবং ভুলও হইবে না। মনও লাগিবে, ভক্তি ও মহব্বত বাড়িবে।

নামাযে হুযূরে ক্বাল্ব হাছেলের নিয়ম

নামাযের মধ্যে হুযূরে ক্বালব জরুরী। হুযূরে ক্বালবের অর্থ দেল হাযির করা। হুযূরে ক্বালব হাছেল করার সহজ তরীকা এইঃ (এতটুকু কথা স্মরণ রাখিবে যে, নামাযের মধ্যে যাহাকিছু পড় এবং যাহাকিছু কর, তাহা যেন বে-খেয়ালীর সঙ্গে না হয়; বরং) প্রত্যেক লফ্য খেয়ালের সঙ্গে পড়িবে এবং প্রত্যেক কাজ খেয়ালের সঙ্গে করিবে। নামাযের মধ্যে যখন اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলিয়া দাঁড়াও তখন চিন্তা করিয়া খেয়াল করিয়া দাঁড়াইবে যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখিতেছেন, আমি আল্লাহ্র সামনে ভক্তিভরে নতশিরে তাঁহার দাসত্বের জন্য দণ্ডায়মান হইতেছি। তারপর যখন سُبْحَانَكَ পড় তখন যদি অর্থ বুঝ, তবে ত প্রত্যেক লফ্যে অর্থের দিকেও খেয়াল রাখিবে, নতুবা শুধু লফ্যের দিকেই খেয়াল রাখিবে যে, আমি سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ পড়িতেছি, আমি وَبِحَمْدِكَ পড়িতেছি, এই আমি وَتَبَارَكَ اسْمُكَ পড়িতেছি, (যেমন প্রত্যেকটি লফ্য আমি অন্তরের আন্তরিক ভক্তির সহিত মুখে উচ্চারণ করিয়া মহান আল্লাহ্র সামনে নযরানা স্বরূপ পেশ করিতেছি। যদি আন্তরিক ভক্তির সহিত পেশ না করি, অমনোযোগিতার সহিত পড়ি তবে তিনি ভীষণ রাগ হইবেন, আর ভক্তি ও মনোযোগ দেখিলে তিনি মহা সন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ প্রত্যেক লফ্যের জন্য পৃথক ও নূতনভাবে খেয়াল করিয়া লইবে। তারপর যখন আলহামদু সূরা পড়, তাহাতেও এইরূপ প্রত্যেক লফ্যের দিকে পৃথক ও নূতনভাবে খেয়াল করিয়া পড়িবে। তারপর যখন অন্য কোন সূরা পড়িবে সে সূরাও এইরূপভাবে পড়িবে। তারপর যখন রুকূতে যাইবে তখন খেয়াল করিবে যে, আমি আল্লাহ্র সামনে মাথা নত করিয়া আল্লাহ্র সামনে দাসত্ব প্রকাশ করিতেছি, ভক্তির পরিচয় দিতেছি। তারপর যখন سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ পড়িবে, তখনও উপরোক্তরূপে খেয়াল রাখিয়া পড়িবে। মোট কথা, নামাযের যে শব্দ মুখ হইতে বাহির করিবে, খেয়ালও ঐ দিকে রাখিবে। যখন সজ্দায় যাইবে তখন খেয়াল করিবে যে, আমি আল্লাহ্র সামনে মাথা মাটিতে রাখিয়া আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটা করিতেছি। এইরূপে শেষ পর্যন্ত এইরূপ খেয়ালের সঙ্গে নামায শেষ করিবে। শুধু গড়গড় করিয়া মুখস্থ পড়িয়া যাইবে না। যদি কোন সময় খেয়াল একটু এদিক-ওদিক চলিয়া যায়, তবে পুনরায় জোর করিয়া দেলকে টানিয়া আনিবে এবং নূতন ভাবে খেয়াল জমাইতে থাকিবে। এইরূপে কিছু দিন অভ্যাস করিলে পরে আর দেল তত এদিক-ওদিক যাইবে না।

এইরূপে সহজেই হুযূরে ক্বাল্বের মর্তবা হাছিল হইবে। অনবরত এইরূপ করিতে পারিলে দেখিবে যে, নামাযের মত মজার জিনিস আর নাই।

মুরীদ হওয়ার ফায়েদার কথা

(প্রত্যেক মুসলমানেরই খাঁটি নায়েবে রাসূল পীর তালাশ করিয়া তাঁহার কাছে মুরীদ হওয়ার দরকার।) মুরীদ হওয়ার মধ্যে অনেক ফায়েদা আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি ফায়েদা এখানে লিখিতেছি।

প্রথম ফায়েদা—উপরে যে ক্বালব ছাফ করার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পীরে কামেলের সংসর্গ ও সদুপদেশ ব্যতিরেকে নিজে নিজে শুধু কিতাব দেখিয়া হাছেল করা অতি দুষ্কর। নিজে

নিজে কিতাবের অর্থ বুঝিতে অনেক ভুল হয়। (তারপর আমল করিবার সময় অনেক ভুল হয়। অনেক সময় দুষ্ট নফ্‌সের সহিত সংগ্রাম করিয়া একা একা জয়লাভ করা যায় না। নফ্‌স দুষ্টামি করিয়া অনেক সময় ভুল অর্থ বুঝাইয়া বা অলসতা করিয়া এখন না তখন করিয়া টালবাহানা করে বা একটু কঠিন কাজ দেখিলেই কামচোরাপনা করিতে থাকে, বা যেখানে প্রশংসা সুখ্যাতি দেখে সেখানে ত কাজ করে, আর যেখানে এইসব দেখে না সেখানে কাজ করিতে চায় না।) পীরে কামেলের উপদেশে এবং সাহায্যে নফ্‌সের (এইসব) দুষ্টামি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ফায়েদা—পীরে কামেলের সংসর্গে থাকিলে ও তাঁহার মুখে শুনিলে যেমন তা'ছীর হয়, কিতাব পড়াতে তেমন তাছীর হয় না। কারণ কামেল লোকের নূরানী ক্বাল্‌বেরও তা'ছীর পড়ে, তাঁহার দো'আরও বরকত লাভ হয়। এই ভয়ও আছে যে, যদি কোন নেক কাজে অবহেলা করে বা কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলে, তবে পীর ছাহেব অসন্তুষ্ট হইবেন, তাঁহার নিকট শরমেন্দা হইতে হইবে।

তৃতীয় ফায়েদা—কামেল পীরের সংসর্গে থাকিলে তাঁহার সঙ্গে খুব মহব্বত ও ভক্তি পয়দা হয়। কাজেই তাঁহার প্রত্যেক কাজেই অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে আপনা হইতে মন চায়।

চতুর্থ ফায়েদা—পীর ছাহেব কোন নছীহতের কথা বাতাইবার সময় কটুকথা বলিলে বা তিরস্কার করিলেও তাহা খারাপ লাগে না; কাজেই নছীহতের উপর আমল করিবার জন্য আরও বেশী চেষ্টা করে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অনেক ফায়েদা আছে। আল্লাহ্ পাক যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহারই ফায়েদা হাছেল হয়, এবং হাছেল হওয়ার পরই তাহা অনুভব করিতে পারে। (এবং এত ফায়েদা দেখে যে, নিজের জীবন পর্যন্ত পীরের পায়ে কোরবান করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। মোট কথা, যার উছিলায় আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়, সে যে কতখানি প্রাণাধিক-প্রিয় হয়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।)

পীরে-কামেলের শর্ত

যখন কোন পীরের কাছে মুরীদ হইতে ইচ্ছা কর, তখন সেই পীরের মধ্যে এই শর্তগুলি পাওয়া যায় কি না খুব ভাল ভাবে তাহকীক করিয়া লইবে। যদি শর্তগুলি না পাওয়া যায়, তবে মুরীদ হইও না। (উপযুক্ত পীর না হইলে আলেমের কাছে শুনিয়া শুনিয়া শরীঅতের হুকুমগুলি পালন করিতে থাকিবে। এইভাবে সারা-জীবন তালাশ করা সত্ত্বেও উপযুক্ত পীর না পাওয়ার কারণে মুরীদ না হইতে পারিলে কোন গোনাহ্ হইবে না! কিন্তু তালাশ করিতে থাকিবে।)

পীরে কামেলের **প্রথম শর্ত**ঃ শরীঅতের মাসআলাসমূহ পীরের অবগত হওয়া দরকার। শরীঅত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ না হওয়া চাই।

দ্বিতীয় শর্তঃ তাঁহার মধ্যে শরার বরখেলাফ আকীদা বা আমল না থাকা চাই। এই কিতাবে যে সমস্ত আকায়েদ এবং আমলের কথা লেখা হইয়াছে এবং সুন্নত তরীকা অনুসারে ক্বল্‌ব ছাফ করার যে তরীকা বাতান হইয়াছে, পীর সেগুলির অনুযায়ী হওয়া চাই।

তৃতীয় শর্তঃ যিনি (খাঁটি পীর হইবেন তিনি) অর্থ উপার্জনের জন্য মুরীদ করেন না। (অর্থাৎ পীরী-মুরীদীকে তিনি দুনিয়ার ব্যবসা স্বরূপ করিবেন না, খালেছ নিয়তে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে লোকদিগকে আল্লাহ্‌র রাস্তা বাতাইবেন, আল্লাহ্‌র দিকে ডাকিবেন, আল্লাহ্‌র দ্বীন জারি করিবেন।)

চতুর্থ শর্তঃ পীর ছাহেবের এমন কোন কামেল পীরের নিকট মুরীদ হওয়া চাই (তাঁহার ছোহ্‌বতে থাকিয়া নফ্‌সের এছলাহ্ করান চাই এবং তরীকত শিক্ষা করা চাই) যাঁহাকে সমসাময়িক আলেমগণ এবং দ্বীনদার জ্ঞানী লোকগণ কামেল পীর বলিয়া মনে করেন।

পঞ্চম শর্তঃ এই পীর ছাহেবকেও (আকায়েদ, আমল, আখলাখ এবং জীবন যাত্রার ধারা সুন্নতের মোয়াফেক হওয়া চাই; তা-ছাড়া) সমসাময়িক দ্বীনদার আলেমগণও যেন ভাল বলেন।

ষষ্ঠ শর্তঃ পীর ছাহেবের তালীম-তলক্বীনের মধ্যে এমন আছর দেখা যাওয়া চাই যে, যাহাতে লোকের মধ্যে দ্বীনের মহব্বত এবং আখেরাতের শওক পয়দা হয়। (দুনিয়ার রং-তামাশা, নাম-নকশা, জাঁকজমক, অর্থলিপ্সা এবং শান-শওকতের আকাঙ্ক্ষা কম হইতে থাকে।) পীরের মুরীদানদের অবস্থা দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। দশজন মুরীদের মধ্যে যদি ৫/৬ জনের অবস্থা এইরূপ দুরুস্ত হয়, তবেই বুঝিবে যে, তিনি খাঁটি পীর। দুই একজনের অবস্থা যদি দুরুস্ত না হয়, তাহাতে পীরের উপর সন্দেহ করিবে না। (তাহা মুরীদেরই চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি বুঝিতে হইবে।) বুযুর্গদের ছোহ্‌বতে বসিলে যে ফয়েয ও বরকত হাছেলের কথা বলা হয়, ইহাই সেই ফয়েয ও বরকত। নতুবা, সে মুখ দিয়া যাহা বলিয়া দেয় তাই হইয়া যায়। একটু ফুঁক দিয়া দিলেই রোগ সারিয়া যায়, যে কাজের জন্য যে তাবীয দেয় সে কাজ সফল হইয়া যায়, তাহার তাওয়াজ্জুহ দেওয়াতে লোক একেবারে বেহুশ হইয়া যায়, তাহার ফয়েযের চোটে লোকে লাফালাফি বা ছটফট করিতে থাকে; এইরূপ তাছীর যাদুকরেরাও করিতে পারে। কাজেই কোন লোকের মধ্যে যদি এই সব তাছীর দেখ, তবে তাহাতে ধোঁকা খাইও না। (আসল জিনিস শরীঅত এবং সুন্নতের পায়রবী, ভিতরে বাহিরে তাহাই দেখিবে।)

সপ্তম শর্তঃ ঐ পীর ছাহেব এমন হওয়া দরকার যে, সকলকেই যেন তিনি নছীহত করেন এবং দ্বীনের কথা বাতান; খারাপ কাজ করিতে দেখিলে বা শুনিলে যেন নিষেধ করেন এবং শরীঅতের হুকুমগুলি পালন করিতে আদেশ করেন। কাহারও সম্পত্তি বা সম্মানের চাপে বা লোভে পড়িয়া যেন তিনি শরীঅতের হুকুম বাতাইতে ক্রটি না করেন।

এই শর্তসমূহ যে পীরের মধ্যে পাওয়া যাইবে, দ্বীনকে দুরুস্ত করার জন্য খাঁটি নিয়তে তাঁহার কাছে মুরীদ হইবে (এবং রীতিমত তাঁহার কাছে যাতায়াত করিয়া, তাঁহার ছোহ্‌বতে বসিয়া, তাঁহার আদেশ উপদেশ পালন করিয়া, নিজের নফ্‌সের এছলাহ্ এবং দ্বীনের উন্নতি করিবে, তাহাতে ক্রটি করিবে না)। মেয়ে-লোকের মুরীদ হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, যদি অবিবাহিতা হয়, তবে মা-বাপের এজাযত লইবে; বিবাহিতা হইলে স্বামীর এজাযত লইবে। যদি কোন কারণবশতঃ তাঁহারা এজাযত না দেন, তবে তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে মুরীদ হইবে না। কারণ, মুরীদ হওয়া ফরয নয়, শরীঅতের পায়রবী করা ফরয। মুরীদ না হইয়াও যদি শরীঅতের পায়রবী রীতিমত করিতে থাকে এবং সুন্নতের পায়রবী করিতে থাকে, তবে তাহাতে গোনাহগার হইবে না। কাজেই মা-বাপের বা স্বামীর হুকুম অমান্য করিয়া মুরীদ হইবে না, শরীঅতের পায়রবী এবং সুন্নতের পায়রবী করিতে থাকিবে (যখন তাঁহারা অনুমতি দেন তখন মুরীদ হইবে)।

পীরী-মুরীদী সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ

১। উপদেশঃ পীরকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিবে। নফ্‌সের এছলাহ সম্বন্ধে তিনি যে আদেশ-উপদেশ দিবেন তাহা কিছুতেই অমান্য করিবে না, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহা পালন

করিবে। আল্লাহ্‌র যেকের নিজের পীরের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া লইবে। নিজের নফ্‌সের এছলাহের জন্য নিজের পীরকে সবচেয়ে বড় মনে করিবে। (কিন্তু অন্যান্য বুযুর্গদের বা তাঁহাদের মুরীদদের মন্দ জানিবে না বা মন্দ বলিবে না।)

২। **উপদেশ ঃ** নফ্‌সের এছলাহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি পীর ছাহেবের এন্তেকাল হইয়া যায়, তবে উপরোক্ত শর্ত অনুসারে অন্য কোন কামেল পীরের আশ্রয় লইয়া তাঁহার নিকট তা'লীম হাছিল করিবে। (যদি উপরোক্ত শর্তসমূহ না থাকে, তবে শুধু পীরের ছেলে বা জামাই বা পীরের ভাই বলিয়া তাহাকে পীর বানাইবে না। আসল জিনিস হইল পীরের মধ্যে উপরোক্ত শর্তসমূহ ও গুণগুলি থাকা। ঐ গুণগুলি ব্যতীত পীরের ছেলে হইলেও তাহাকে পীর বলা যাইবে না।

৩। **উপদেশ ঃ** তাছাওওফের কোন কিতাবে কোন ওযীফা দেখিলে বা কোন আলেমের মুখে কোন ওযীফার কথা শুনিলে, তাহা নিজের পীরের কাছে বলিবে। তিনি যদি এজাযত দেন, তবে আমল করিবে, নতুবা করিবে না। এইরূপে দেলের কোন কথা বা কোন এরাদা নিজের পীরের নিকট গোপন করিবে না, যাহাকিছু দেলের অবস্থা হয়—ভাল বা মন্দ পীরকে জানাইবে এবং যাহাকিছু ইচ্ছা বা এরাদা হয় তাহাও পীরের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। (জিজ্ঞাসা করার পর তিনি যেরূপ বলেন সেইরূপ করিবে। কোন কথাই গোপন করিবে না এবং কোন কথাই অমান্য করিবে না।)

৪। **উপদেশ ঃ** মেয়েলোক নিজের পীরকেও দেখা দিবে না এবং মুরীদ হইবার সময় পীরের হাতে হাত দিবে না, পর্দার আড়ালে থাকিয়া রুমাল, পাগড়ী বা চাদর ধরিয়া অথবা শুধু মৌখিক অঙ্গীকার করিয়া মুরীদ হইবে। শুধু মৌখিক অঙ্গীকার করিয়া মুরীদ হইলে তাহাও দুরুস্ত আছে।

৫। **উপদেশ ঃ** যদি কেহ কোন শরার খেলাফ পীরের কাছে মুরীদ হইয়া বসে, অথবা পীর আগে ভাল ছিল পরে বিগড়াইয়া যায়, তবে ঐ পীরকে ছাড়িয়া দিয়া অন্য কোন ভাল পীরের কাছে মুরীদ হইতে হইবে। যদি কচিৎ কোন কাজ শরীঅতের খেলাফ হইয়া পড়ে এবং সতর্ক করার পর অথবা নিজেই সতর্ক হইয়া যখন তখন তওবা করিয়া লয়, তবে সে কারণে আকীদা খারাব করিবে না। কারণ, পীরও ত মানুষ, তাঁহারও ভুল-চুক হইতে পারে। কাজেই সামান্য সামান্য কারণে দেল খারাব করিবে না। অবশ্য যদি শরার বরখেলাফ বা সুন্নতের খেলাফ কাজের উপর জিদ করিয়া জমিয়া থাকে, তবে সে পীরের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করিবে।

৬। **উপদেশ ঃ** আমাদের সব সময়কার সব অবস্থা (মনের কথা দেলের ভেদ) পীর জানিতে পারে এইরূপ ধারণা রাখা (শেরেকী) গোনাহ্‌।

৭। **উপদেশ ঃ** কোন কোন ফকিরী বা মা'রফতির দাবীদার লোক অনেক সময় অনেক কথা শরার বরখেলাফ বলিয়া থাকে বা কিতাবে লিখিয়া থাকে। খবরদার! ঐ সব লোকের কাছেও যাইবে না বা ঐ সব কিতাবও দেখিবে না। অনেক কবি বা শায়েরও কবিতায় বা শায়েরীর মধ্যে কোন কোন কথা শরার বরখেলাফ বলিয়া ফেলে। তাহাদের কবিতা বা পুঁথি কখনও পড়িবে না।

৮। **উপদেশ ঃ** কোন কোন বেদআতী ফকীর মা'রফতির দাবী করে এবং বলিয়া থাকে যে, (মৌলবীরা মা'রফতির ভেদের কথা কি জানে?) শরীঅতের রাস্তা ভিন্ন তরীকতের (মা'রফতের) রাস্তা ভিন্ন। এইরকম কথা যে বলে তাহাকে মিথ্যুক এবং ধোঁকাবাজ মনে করা ফরয এবং তাহার সংসর্গে কখনও যাইবে না (ক্ষমতা থাকিলে তাহাদিগকে শাসন করাও দরকার)।

৯। উপদেশঃ পীর যদি শরীঅতের খেলাফ বা সুন্নতের খেলাফ কোন কিছু বাতায়, তবে তাহার উপদেশ মত আমল করা জায়েয নহে, আর পীর যদি ঐ খেলাফে শরা কাজ করার উপর (আলেমদের সতর্ক করা সত্ত্বেও) হঠ করিতে থাকে, তবে সে পীরের উপযুক্ত নয়; তাহাকে মানিবে না।

১০। উপদেশঃ আল্লাহ্র যেকেরের বরকতে যদি দেলের মধ্যে কোন ভাল হালাত পয়দা হয় বা ভাল খোয়াব নজরে আসে বা জাগ্রত অবস্থায় কোন গায়েবী আওয়াজ শুনা যায় বা কোন আলো বা নূর দেখা যায়, তবে সেইসব কথা নিজের পীর ব্যতীত অন্য কাহারও কাছে বলিবে না।

এইরূপে নিজের ওযীফার কথা বা নিজের বন্দেগী (—এশরাক, তাহাজ্জুদ, বার-তসবীহ্ যেকের) ইত্যাদির কথাও নিজের পীর ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট বলা উচিত নয়। কারণ তাহাতে বরকত নষ্ট হইয়া যায়।

১১। উপদেশঃ পীর কোন ওযীফা বা যেকের বাতাইলে তাহাতে যদি কিছুকাল পর্যন্ত কোন ফায়েদা বা তাছীর অনুভব না হয়, তবে সে কারণে পীরের উপর আকীদা নষ্ট করিবে না। কেননা, সবচেয়ে বড় ফায়েদা এই যে, আল্লাহ্র নাম লওয়ার এরাদা দেলের মধ্যে পয়দা হইতে থাকে এবং এই নেক কাম করার তৌফীক আল্লাহ্ তা'আলা দান করিয়াছেন, (এইরূপ খেয়াল কখনও দেলে পোষণ করিবে না যে, ভাল ভাল খোয়াব কেন দেখি না, রাসূলুল্লাহ্র বা বুযুর্গানে দ্বীনের যেয়ারত খোয়াবের মধ্যে কেন হয় না, গায়েবের খবর কেন জানিতে পারি না, কাশফ কেন হয় না, কারামত কেন যাহের হয় না, খুব কান্না কেন আসে না, এবাদতের মধ্যে একেবারে বেহুস কেন হইয়া যাই না, অছঅছা আমার একেবারে বন্ধ কেন হইয়া যায় না।) কেননা, এইসব জিনিস (কাহারও হয় না, আবার একই লোকেরও) কখনও হয়, কখনও হয় না। কাজেই যদি কাহারও হয়, তবে তাহার (ফখর করা চাই না) আল্লাহ্র শোক্র করা চাই, আর যাহার মোটেই না হয় বা হইয়া বন্ধ হইয়া যায় বা বেশী হইয়া পরে কম হইয়া যায়, তাহার এই কারণে পেরেশান হওয়া ও আফসোস করা চাই না। অবশ্য যদি খোদা না করুন সুন্নতের পায়রবী বা শরার পাবন্দির মধ্যে ত্রুটি হয় বা আলস্য করে বা গোনাহ্র কাজ হয়, তবে তাহা আক্ষেপ এবং পেরেশানির বিষয় বটে। যদি কখনও খোদা নাখাস্তা এইরূপ অবস্থা হয়, তবে অতি সত্বর হিম্মত করিয়া নফ্সের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তওবা এস্তেগ্ফার করিয়া হালাত দুরুস্ত করিয়া লওয়া দরকার এবং পীরকে জানাইবে, পীর ছাহেব যেরূপ বাতান তদনুযায়ী আমল করা দরকার।

১২। উপদেশঃ (নিজের পীরকে ভাল এবং বড় জানিবে একথা সত্য, কিন্তু খবরদার!) অন্যান্য পীর ছাহেবের বা অন্যান্য তরীকাকে কখনও মন্দ জানিবে না, বা অন্য কোন পীরের বা অন্য কোন তরীকার মুরীদানের সঙ্গে এরূপ আলাপ-আলোচনা করিবে না যে, তোমাদের পীরের চেয়ে আমাদের পীর ভাল বা তোমাদের তরীকার চেয়ে আমাদের তরীকা ভাল; এইসব বেহুদা কথায় দেল অন্ধকার হইয়া যায়। (খবরদার! এমন কথা কখনও জবানে আনিবে না; নিজের পীরের বা নিজের তরীকার প্রশংসা ত করা উচিত, কিন্তু প্রশংসা এমন হওয়া চাই না যাহাতে অন্যের প্রতি কটাক্ষ বা দোষারোপ হয়।)

১৩। উপদেশঃ (পীর-ভাইদের সঙ্গে গাঢ় মহব্বত রাখা দরকার।) যদি কোন পীর ভাইয়ের তরক্কী বেশী দেখা যায় বা পীরের তাওয়াজ্জুহ (নেক দৃষ্টি) কাহারও দিকে বেশী দেখা যায় তবে খবরদার! সেজন্য মনে কোন গ্লানি আনিবে না বা হিংসা করিবে না। (বরং এই মনে করিবে যে,

সে কাজে ভাল করিতেছে বলিয়াই ফল বেশী পাইতেছে; আমার এইরূপ ঐকান্তিক চেষ্টার সহিত কাজ ভাল করা দরকার)।

নিম্নের উপদেশগুলি হামেশা পালন করিবে

১। আবশ্যক পরিমাণ এলমে-দ্বীন প্রত্যেকেরই হাছেল করা দরকার, তাহা কিতাব পড়িয়া হাছেল করুক বা (আলেমদের ছোহ্‌বতে থাকিয়া) জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া হাছেল করুক—(অনবরত ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধি করা দরকার।)

২। সমস্ত গোনাহ্‌ হইতে বাঁচিয়া থাকা দরকার।

৩। যদি কোন সময় কোন গোনাহ্‌র কাজ হইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ তওবা করিবে।

৪। কাহারও কোন হক নষ্ট করিবে না। শরীকী অংশ বা দেনা রাখিবে না।) কাহাকেও কোন কথা বা কোন ব্যবহারে মনে কষ্ট দিবে না। কাহারও নিন্দাবাদ বা গীবত-শেকায়েত করিবে না।

৫। অর্থ-লোভ ও নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা রাখিবে না। (বিলাসিতা ও অলসতা বর্জন করিবে, কাজ করিতে আলস্য বা লজ্জাবোধ করিবে না।) ভাল খাওয়া-পরা, ভাল আসবাবপত্র যোগাড় করার চিন্তায় পড়িবে না।

৬। যদি কোন কথায় বা কাজে ভুল হইয়া যায় এবং পরে (নিজের ভুল বুঝে আসে বা) অন্য কেহ ভুল ধরিয়া দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ ভুল স্বীকার করিয়া লইবে এবং ক্ষমা চাহিবে ও তওবা করিবে।

৭। বিনা জরুরতে সফর (বিদেশ ভ্রমণ) করিবে না, (জরুরত—যেমন তেজারতের জরুরত, তলবে এলমির জরুরত, হজ্জের জরুরত, জেহাদ বা তবলীগের জরুরত ইত্যাদি।) কারণ, সফরের মধ্যে সব কাজ ঠিকমত করা যায় না; অনেক নেক কাজ ছুটিয়া যায় এবং ওযীফা ছুটিয়া যায়। (আজকাল সফরের মধ্যে চক্ষু বাঁচাইয়া রাখার এবং পর্দার হেফাযতের খাছ করিয়া ব্যবস্থা করা দরকার। অনেক সময় অনেক ফাহেশা কথা বেহুদা লোকেরা লিখিয়া রাখে বা ফাহেশা ছবি লটকাইয়া রাখে, সে সব হইতে চক্ষুকে এবং মনকে বাঁচাইয়া রাখা একান্ত দরকার।)

৮। বেশী হাসিবে না, বেশী কথা বলিবে না; বিশেষতঃ মেয়েলোকেরা গায়ের মাহ্‌রাম লোকের সঙ্গে হাসি-চাতুরি ত করিবেই না, জরুরী কথা ছাড়া অতিরিক্ত বাজে কথাও বলিবে না।

৯। কাহারও সহিত ঝগড়া-কলহ বা তর্কবিতর্ক করিবে না।

১০। প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক কথায় শরীঅতের পাবন্দি এবং সুন্নতের পায়রবির খেয়াল রাখিবে।

১১। (নামায, রোযা এবং অন্যান্য) এবাদতের মধ্যে কখনও অলস্য (বা অবহেলা) করিবে না।

১২। (বিনা জরুরতে লোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিবে না। জরুরত মত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আবার নিজের কাজে লিপ্ত হইবে।) অধিকাংশ সময় নির্জনে থাকিবে। (একাকী খোদার ধ্যানে থাকাকেই বেশী ভালবাসিবে। অন্ততঃ দৈনিক কিছু সময় একাকী নির্জনে বসিয়া খোদার ধ্যান এবং খোদার যেকেরের জন্য অবশ্যই নির্ধারিত করিয়া রাখিবে)।

১৩। যখন অন্য লোকের সঙ্গে মিলিয়া থাকার বা চলার দরকার পড়ে, তখন সকলের সামনেই নিজকে ছোট মনে করিয়া নম্রভাবে সকলের খেদমত করিবে। নিজেকে অন্যের চেয়ে

বড় বানাইয়া রাখিবে না (বা অন্যের দ্বারা খেদমত পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিবে না; বরং অন্য সকলেরই খেদমত করিবার চেষ্টা করিবে)।

১৪। বড় লোকদের সঙ্গে মেলামেশা কম করিবে (গরীবদের সঙ্গে মিল-মহব্বত বেশী রাখিবে)।

১৫। যে লোক দ্বীনের খেলাফ চলে, (বিশেষতঃ ধর্মের বিরুদ্ধে যে লোক কোন কথা বলে,) তাহা হইতে দূরে থাকিবে।

১৬। পরের দোষ দেখিবে না, নিজের দোষ দেখিবে এবং নিজের দোষ ধরিয়া তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে। কাহারও উপর বদগোমানী করিবে না; অর্থাৎ কাহারও প্রতি খারাব ধারণা করিবে না।

১৭। নামায মোস্তাহাব ওয়াক্তে নিয়মিত পাবন্দির সহিত আন্তরিক ভক্তি ও মনোযোগের সঙ্গে পড়িবে। (মেয়েলোকেরা প্রত্যেক নামায আউয়াল ওয়াক্তে ঘরের আন্দর কুঠরিতে পড়িবে এবং পুরুষেরা জমা'আতে হাযির হইয়া পাঞ্জেগানা নামায রীতিমত আদায় করিবে।)

১৮। আল্লাহ্র যেকের হইতে এক মুহূর্তও গাফেল থাকিবে না; যদি সব সময় দেলকে হাযির রাখিতে না পার, তবুও জবানী যেকের সব সময় জারি রাখিবে।

১৯। আল্লাহ্র যেকেরে যদি স্বাদ পাওয়া যায়, দেল সন্তুষ্ট হয়, তবে আল্লাহ্র শুক্র আদায় করিবে। (নামাযে মজা না লাগিলে ঘাবড়াইয়া ছাড়িয়া দিবে না।)

২০। মিষ্ট ভাষায় নম্রভাবে নরম কথা বলিবে (কর্কশ ভাষা বা কটু কথা বলিবে না।)

২১। প্রত্যেক কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিবে। সেই নিয়ম মত সময়ের সদ্ব্যবহার করিবে। (অনিয়ম বা সময় নষ্ট করিবে না।)

২২। যদি কোন বিপদ-আপদ আসে, (রোগ-পীড়া আসে, বা শত্রুরা শত্রুতা করে বা কাজ কারবারে নোকছান হইয়া যায়, বা অভাব-অভিযোগ আসিয়া পড়ে বা বাজে কথা উঠে) অস্থির হইবে না, ঘাবড়াইবে না। সবই আল্লাহ্র তরফ হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে এবং মনে করিবে যে, ইহাতে আমি সওয়াব পাইব। (আল্লাহ্কে আরও বেশী ভালবাসিবে। খবরদার! যেন আল্লাহ্র উপর কোন প্রতিবাদ দেলে না আসে। মনে করিবে যে, এই সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলে অনেক সওয়াব মিলিবে এবং দর্জা বুলন্দ হইবে। খবরদার! এ কখনও মনে করিবে না যে, আমি ত আল্লাহ্র রাস্তায় চলিতে চাই, অথচ এসব বাধা কেন আসে; এইরূপ চিন্তা করা বড়ই খারাপ। মনে রাখিবে, বাধা-বিঘ্নের দ্বারাই ত আল্লাহ্র রাস্তা মধুর এবং মূল্যবান হয়।)

২৩। (যাহা দুনিয়ার জরুরী কাজ তাহা ত নিশ্চয়ই করিবে, তাহাতে আলস্য বা অবহেলা করিবে না, কিন্তু) সব সময় দুনিয়ার চর্চা, দুনিয়ার আলোচনা করিবে না, অধিকাংশ সময় দেল আল্লাহ্র দিকে রুজু রাখিবে। এমন কি, কাজ করিবার সময় যাতে দেল গাফেল না হয় সেজন্য চেষ্টা করিবে।

২৪। লোকের উপকার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে—তাহা দ্বীনের উপকার হউক বা দুনিয়ার উপকার হউক (বা তাহারা আপন হউক বা পর হউক, মিত্র হউক বা শত্রু হউক,) প্রত্যেকেরই উপকার করিতে চেষ্টা করিবে।)

২৫। খাওয়া-পিয়া এত কম করিবে না যে, শরীর দুর্বল বা স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়। আবার এত বেশী খাইবে না, যাহাতে (লোভ রিপু বর্ধিত হয় বা) শরীরে অলসতা আসিয়া যায়। (ক্ষুধা লাগিলে খাইবে, বিনা ক্ষুধায় খাইতে বসিবে না এবং কিছু ক্ষুধা বাকী রাখিয়া খাওয়া শেষ করিবে।)

২৬। এক খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কিছু আশা রাখিবে না। এ খেয়াল করিবে না যে, অমুকে আমার সাহায্য করিয়া দিবে, অমুকে আমার সেবা-শুশ্রূষা করিবে। (নজর কখনও মানুষের উপর রাখিবে না। নজর একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর রাখিবে।

২৭। হামেশা খোদার তালাশে বে-কারার থাকিবে। (খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় কখনও ক্ষান্ত হইয়া বা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না।)

২৮। অতি সামান্য নেয়ামত হইলেও তাহার শুক্‌র আদায় করিবে। (এইরূপে কোন লোক সামান্য কোন উপকার করিলেও আজীবন তাহা স্মরণ রাখিবে এবং সেজন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।) অভাব-অভিযোগ আসিলে তাহাতে মনে কষ্ট আনিবে না। (তাহা হ্রাস করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু ফলবতী না হইলে সেজন্য চেষ্টা ছাড়িবে না বা ঘাবড়াইবে না। যদি কেহ তোমার কোন ক্ষতি করে বা তোমাকে কোন কষ্ট দেয়, তবে তুমি মনে কোন দুঃখ রাখিও না।)

২৯। তোমার অধীনে যাহারা কাজ করে, তাহাদের ভুল-ত্রুটি (অধিকাংশ) মাফ করিয়া দিবে। (তাহাদের প্রতি দয়া ও স্নেহ দেখাইবে।)

৩০। কাহারও কোন আয়েব দেখিলে তাহা ঢাকিয়া রাখিবে। (অন্যের কাছে প্রকাশ করিবে না। যদি পার—গোপনে খায়ের-খাহির সাথে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবে; নতুবা চুপ করিয়া মনের কথা মনেই হজম করিবে।) কিন্তু যদি জানিতে পার যে, কেহ হয়ত গোপনে অন্য কাহারও কোন ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেছে, তবে যাহার ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেছে, গোপনে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।

৩১। মেহমান, মোছাফির ও গরীব-দুঃখী এবং আলেম, (তালেব-এল্‌ম,) পীর-বুযুর্গগণের খেদমত করিবে। (পুরুষেরা ত সব রকমের খেদমতই করিতে পারে; মেয়েলোকেরা আর্থিক খেদমত করিতে বা ভাত-পথ্য পাকাইয়া দিতে পারে বা পর্দায় থাকিয়া কাপড় ধুইয়া দিতে পারে বা কোন বৃদ্ধা মেয়েলোক বা না-বালেগ হইলে রোগীর সেবা-শুশ্রূষাও করিতে পারে। এইসব খেদমতে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায় এবং অনেক মর্তবা পাওয়া যায়।)

৩২। (কুসংসর্গ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে,) সৎসংসর্গ অবলম্বন করিবে।

৩৩। খোদার ভয় সদাসর্বদা অন্তঃকরণে জাগরিত রাখিবে।

৩৪। মৃত্যুকে স্মরণ করিবে।

৩৫। প্রত্যহ কিছু সময় নির্দিষ্ট করিয়া নির্জনে বসিয়া সমস্ত দিনের হিসাব নিজের নফ্‌সের নিকট হইতে লইবে। যে সব নেক কাজ দেখিবে তাহার জন্য আল্লাহ্‌র শুক্‌র করিবে, এবং যে সব অন্যায়-ত্রুটি বা গোনাহ্‌র কাজ দেখিবে, সে জন্য নফ্‌সকে তাম্বীহ্ করিবে এবং খোদার কাছে লজ্জিত হইয়া তওবা এস্তেগ্‌ফার করিবে।

৩৬। কখনও মিথ্যা বলিবে না। (সদা সত্য কথা বলিবে।)

৩৭। খেলাফে-শরা মাহ্‌ফিলে কখনও যাইবে না।

৩৮। হায়া-শরম রাখিয়া চলিবে, (দয়া-মায়া রাখিবে, পাতলামী করিবে না,) গম্ভীর ও চিন্তাশীল হইয়া থাকিবে (প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধেই চিন্তা করিয়া তাহা হইতে কিছু নছীহত হাছেল করিতে চেষ্টা করিবে।)

৩৯। (নিজের তাক্ওয়া-পরহেযগারী বা এল্‌ম লিয়াকত বা রূপ-গুণের কারণে) কখনও ফখর বা গরুরী করিবে না যে, আমি এই সব গুণের অধিকারী। (এই মনে করিবে যে, এই সব আল্লাহ্‌র দান; আমি নালায়েককে তিনি দয়া করিয়া দান করিয়াছেন। আমি যদি ফখর করি বা নিজস্ব বলিয়া দাবী করি, তবে তিঁনি ইচ্ছা করিলে যে কোন মুহূর্তে এসব ছিনাইয়া লইয়া যাইতে পারে; অতএব, আমার আরও অধিক নম্র এবং দয়ালু হওয়া দরকার।)

৪০। হামেশা আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি-মিনতি করিয়া দো'আ চাহিতে থাকিবে যে, আয় আল্লাহ্! যতদিন দুনিয়াতে রাখ ততদিন হক রাস্তার উপর, দ্বীনের রাস্তার উপর, রাসূলের তরীকার উপর কায়েম রাখিও (এবং যখন মৃত্যু দাও ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দিও)।

কতকগুলি হাদীস

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ-নিঃসৃত পবিত্র বাণী শুনিলে প্রত্যেক মুসলমানেরই মন গলিয়া যায় এবং মন গলিয়া যাওয়া উচিত। এই কারণে নেক কাজের ছওয়াবের কথা এবং বদ কাজের আযাবের কথা হাদীস শরীফ হইতে উল্লেখ করা হইতেছে।

নিয়ত খালেছ করা

১। **হাদীসঃ** এক ব্যক্তি উচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঈমান কি বস্তু? হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ নিয়ত খালেছ রাখ। খালেছ নিয়তে নেক কাজ করাই ঈমানের রূহ্ (প্রাণ)। (অতএব, প্রত্যেক নেক কাজের শুরুতে চিন্তা করিয়া, দেলটাকে খুব খাঁটি এবং নিয়তকে খুব খালছ করিয়া লইবে।) খালেছ নিয়তের অর্থ, প্রত্যেক কাজই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করিবে। (যে সব কাজে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, সেই সব কাজ অন্য কোন উদ্দেশ্যে না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা।)

২। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"নেক কাজের ছওয়াব শুধু নিয়তের বরকতেই হইয়া থাকে।" অর্থাৎ, নিয়ত খালেছ হইলে, তবেই নেক কাজের পূর্ণ ছওয়াব পাওয়া যায়, নচেৎ নহে।

রিয়াকারী বর্জন

(যে কোন কাজ করিবে, খালেছ নিয়তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করিবে, নামের জন্য বা লোকের নিকট সম্মান বা প্রশংসা লাভের জন্য কোন কাজ করিবে না।)

৩। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে কেহ নামের জন্য কোন কাজ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে তাহার দোষ শুনাইবে এবং যে লোককে দেখাইবার জন্য কোন কাজ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে তাহার আয়েব দেখাইবেন।

৪। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, লোক দেখানের নিয়তে সামান্য কাজ করাও এক প্রকার শিরক।

কোরআন হাদীসের নির্দেশানুযায়ী চলা

৫। **হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِاَةِ شَهِيْدٍ ○

অর্থাৎ, "আমার উম্মতের মধ্যে যখন ধর্মের অবনতি শুরু হইবে, তখন যে ব্যক্তি আমার সুন্নত তরীকাকে শক্ত করিয়া ধরিবে, সে একশত শহীদের ছওয়াব পাইবে।"

৬। হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا اِذَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّتِىْ ○

অর্থাৎ, "আমি তোমাদের মধ্যে এমন দুটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, যদি সেই দুইটি জিনিসকে তোমরা শক্ত করিয়া আঁকড়িয়া থাক, তবে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব অর্থাৎ কোরআন-মজীদ, দ্বিতীয়টি আমার সুন্নত অর্থাৎ হাদীস শরীফ।"

নেককাজের পথ আবিষ্কার ও বদকাজের ভিত্তি স্থাপন

৭। হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজের ভিত্তি স্থাপন করিবে, তারপর তার দেখাদেখি যত লোক ঐ সৎ কাজটি করিবে, সমস্তের ছওয়াবের সমষ্টির পরিমাণ ছওয়াব যে ব্যক্তি প্রথম পথ দেখাইয়াছে সেই ব্যক্তি পাইবে, কিন্তু তাহাদের ছওয়াব কম হইবে না এবং যে ব্যক্তি একটি বদ কাজের ভিত্তি স্থাপন করিবে, তাহার নিজের গোনাহ্ তো হইবেই, পরন্তু তারপর যত লোক ঐ বদ-কাজটি করিবে, সমস্তের সমষ্টির পরিমাণ গোনাহ্ (প্রথম যে পথ দেখাইয়াছে) তাহার হইবে, কিন্তু তাহাদের গোনাহ্ কম হইবে না।

উদাহরণ স্বরূপ যেমন—যদি কেহ নিজ সন্তানের বিবাহ-শাদীতে শরীঅত বিরোধী রছম রেওয়াজ ত্যাগ করে, (একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে বা মাদ্রাসার সাহায্য করে বা ধর্মপ্রচারের অর্থাৎ তাবলীগের তরীকা জারি করে) বা বিধবা বিবাহ প্রথা যেখানে নাই, সেখানে ঐ প্রথা জারি করে (বা মেয়েলোকেরা যে হিন্দুয়ানী পোশাক ধুতি-শাড়ী পরে, এই হিন্দুয়ানী পোশাক ছাড়িয়া সুন্নতী লেবাস কোর্তা, পায়জামা প্রথা জারি করে,) তবে পরে যত লোকে ঐ সব নেক কাজ করিবে, সকলের সমষ্টিতে যত ছওয়াব পাইবে, প্রথম ব্যক্তি সর্বদা তাহার সমান ছওয়াব পাইবে। (কিন্তু ঐ প্রথম ব্যক্তিকে পরের ঐ সব লোকের ছওয়াব কাটিয়া আনিয়া দেওয়া হইবে না, তাহাদের ছওয়াব ঠিকই থাকিবে ; আল্লাহ্ পাক প্রথম ব্যক্তিকে নিজের তরফ হইতে পৃথকভাবে তত ছওয়াব দান করিবেন। এইরূপে যে ইসলামের পর্দা ভঙ্গ করিয়া এই পাপ-রীতি জারি করিয়াছে, পরে যত লোকে পর্দা ভঙ্গ করিবে সকলের সমান গোনাহ্ ঐ প্রমথ ব্যক্তির হইবে, বা গরীবদের উৎপীড়নের বা কর বাড়ানের বা কুশিক্ষা প্রচারের কাজ প্রথম যে করিয়াছে, পরে যতকাল ঐ প্রথা জারি থাকিবে সকলের সমান পাপ ঐ প্রথম ব্যক্তির হইবে। —অনুবাদক)

এল্‌মে দ্বীন বা ধর্ম-জ্ঞান শিক্ষা করা

৮। হাদীস ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ

مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ○

অর্থাৎ, আল্লাহ্র ভালবাসার আলামত এই যে, আল্লাহ্ যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে দ্বীনের সমঝ অর্থাৎ, ধর্মজ্ঞান দান করেন। অর্থাৎ সে শরয়ী মাসআলা অন্বেষণ করে এবং তৎপ্রতি তাহার আগ্রহ পয়দা হয়।

ধর্মের কথা গোপন করা

৯। হাদীসঃ যে ব্যক্তি ধর্মের কোন কথা জানে অথচ তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও (দরকার পড়া সত্ত্বেও) সে তাহা প্রকাশ করে না (বা শিক্ষা দেয় না), লুকাইয়া রাখে, তাহার মুখে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরান হইবে। ধর্মের বাণী যাহা জানা আছে তাহা শিক্ষা দিতে কখনও কার্পণ্য বা আলস্য করিবে না। (অবশ্য না জানিয়া আন্দাজিও বলা চাই না। জানিয়া না বলাতে যেমন পাপ, না জানিয়া আন্দাজি বলাতে তার চেয়ে শক্ত পাপ)।

মাসআলা জানিয়া আমল না করা

১০। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, এল্‌ম শিখিয়া যদি তদনুযায়ী আমল না করে, তবে সে এল্‌ম তাহার জন্য আযাবের কারণ হইবে। অতএব, খবদার! দেশাচার লোকাচারের খাতিরে বিবির খাতিরে , মা-বাপ, ভাই বেরাদারের খাতিরে, অথবা শয়তান বা নফ্‌সের ধোঁকায় পড়িয়া কখনও শরীঅতের হুকুম জানা সত্ত্বেও তাহার উল্টা কাজ করিবে না।

পেশাব হইতে সতর্ক থাকা

১১। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, (হে আমার উম্মতগণ! পেশাবের ছিঁটা এবং ফোঁটা হইতে খুব বেশী সতর্ক থাকিবে। কেননা, অধিকাংশ কবর আযাব পেশাবেরই কারণে হইয়া থাকে। (বসিয়া পেশাব করিবে, দাঁড়াইয়া পেশাব করিবে না। যাহাতে কাপড়ে বা শরীরে ছিঁটা না আসিতে পারে, সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিব। পেশাব করিয়া আসার পর যাহাতে পরে ফোঁটা না ঝরিতে পারে, তজ্জন্য কিছুক্ষণ বসিয়া দেরী করিবে। তারপর মেয়েলোকেরা শুধু পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে এবং পুরুষেরা ঢিলা কুলুখ লইয়া কিছুকাল পর্যন্ত টহলিবে, যাহাতে ফোঁটা আসা ভালরূপে বন্ধ হইয়া যায়, তারপর পানির দ্বারা ধুইবে। পুরুষেরা পেশাবের পর কুলুখ না লইলে ফোঁটা আসিয়া কাপড় ও শরীর নাপাক হইয়া নামায নষ্ট হইবার এবং কবর আযাব হইবার প্রবল আশঙ্কা আছে; কাজেই প্রত্যেক পুরুষই কুলুখ অবশ্যই লইবে, ইহাতে আলস্য বা অবহেলা করিবে না।)

ওযূ-গোসল ভাল করিয়া করা

১২। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, কষ্টের সময় ভালমত ওযূ করিলে গোনাহ্ ধুইয়া যায়। বিশেষতঃ যখন শীতের কারণে অথবা আলস্যের কারণে ওযূ (গোসল) করিতে কষ্ট বোধ হয়, তখন (একটি পশমও যাতে শুষ্ক না থাকে তদ্রূপ যত্নের সহিত পূর্ণরূপে ওযূ (গোসল) করাতে আরও অনেক ছগীরা গোনাহ্ মাফ হয়। (যাহার ছগীরা গোনাহ্ না থাকে, তাহার দর্জা বুলন্দ হয়।)

মেসওয়াক করা

১৩। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, মেসওয়াক করিয়া দাঁত মুখ পরিষ্কার করিয়া ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িলে, তাহা বিনা মেসওয়াকের সত্তর রাকা'আতের চেয়েও আফযাল হয়।

ওযূতে ভালরূপে পানি না পৌঁছান

১৪। হাদীসঃ হযরত (দঃ) একদিন দেখিলেন যে, কতক লোক ওযূ করিয়াছে, কিন্তু পায়ের গোড়ালির দিক কিছু শুক্‌না রহিয়া গিয়াছে, তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, পায়ের গোড়ালি শুষ্ক

থাকার দরুন দোযখের আযাব অতি ভীষণ হইবে। অতএব, হুঁশিয়ার! মেয়েলোকের হাতে আংটি থাকিলে নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার নীচে পানি পৌঁছাইবে। (গোছলের সময় কানে নাকে বালি, থাকিলে তাহার নীচে লক্ষ্য করিয়া পানি পৌঁছাইবে। শীতের সময় পা শুকাইয়া যায়, প্রায়ই পায়ের তলার দিকে গোড়ালির দিকে একটু বে-খেয়াল হইলেই শুক্‌না থাকিয়া যায়; সকলেই এইসব জায়গায় বিশেষ খেয়াল করিয়া পানি পৌঁছাইবে। (একটা পশমের গোড়াও যেন শুকনা না থাকিতে পারে, নতুবা ওযূ-গোসল হইবে না।) কোন কোন স্ত্রী লোক শুধু চেহারার সম্মুখ ভাগ ধোয়, কানের লতী পর্যন্ত ধোয় না, এইসব বিষয়ের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখিবে।

নামাযের জন্য মেয়েলোকদের বাহিরে যাওয়া

১৫। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন, মেয়েলোকদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মসজিদ তাহাদের ঘরের আন্দর কোঠা। এই হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল যে, মেয়েলোকদের জন্য মসজিদে গিয়া নামায পড়া ভাল নহে। ইহাও বুঝা গেল যে, যখন নামাযের ন্যায় শ্রেষ্ঠ এবাদতের জন্য (এবং ২৭ গুণ ছওয়াবের জন্য) ঘর হইতে বাহির হওয়া মেয়েলোকদের জন্য পছন্দনীয় নহে, তখন শুধু দেশ রেওয়াজের খাতিরে, অথবা শুধু মিলা-মিশার জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়া মেয়েদের জন্য কত বড় অন্যায় হইবে।

নামাযের পাবন্দি

১৬। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামযের মেছাল এইরূপ, যেন কাহারো বাড়ীর সম্মুখে একটি নহর বা নদী প্রবাহিত আছে, সে দৈনিক পাঁচবার ঐ নদীতে গোসল করিলে, অর্থাৎ এমতাস্থায় তাহার শরীরে যেমন বিন্দুমাত্রও ময়লা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাবন্দির সহিত পড়িবে, তাহারও সমস্ত গোনাহ্‌ ধুইয়া যাইবে। (অতএব, খুব যত্ন করিয়া খুব পাবন্দির সহিত পাঞ্জেগানা নামায আদায় করিবে; সামান্য সামান্য কারণে কখনও নামায ক্বাযা করিবে না।)

১৭। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট হইতে সর্বপ্রথম হিসাব লওয়া হইবে নামাযের। (যদি নামাযের হিসাবে পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়, তবে আশা করা যায় যে, অন্যান্য বিষয়েও উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি নামাযের হিসাবেই উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তবে সর্বনাশ।)

আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া

১৮। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন, আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়িলে আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত খুশী হন। মেয়েলোকদের ত জমা'আত নাই, তাহারা দেরী করিবে কেন? (পুরুষদের জমা'আতের কারণে হয়ত কোন ওয়াক্ত কিছু দেরী হইতে পারে; কিন্তু মেয়েদের কোন ওয়াক্তেই দেরী করা উচিত নয়। সুতরাং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়িবে।)

ভালরূপে নামায না পড়া

১৯। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অভক্তি ও অযত্নের সহিত নামায পড়িবে, অর্থাৎ উত্তম ওয়াক্তে নামায পড়ে না, ওযূ ভালরূপে করে না, (রুকূ সজ্‌দা, ক্বওমা-জলসা খুশু খুযু) ভালরূপে আদায় করে না, তাহার নামায ছিয়াহ (অন্ধকার) কাল বর্ণ ধারণ করে এবং ঐ নামায খোদার দরবারে ঐ নামাযীকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলে যে, তুই যেমন আমাকে বরবাদ করিলে, তোকেও যেন খোদা সেইরূপে বরবাদ করেন।" অতঃপর যখন নামায স্বীয়

স্বীয় নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়, যেখানে আল্লাহ্র মঞ্জুরী হয়, তখন ঐ নামাযকে পুরাতন নেকড়ার ন্যায় পেঁচাইয়া ঐ নামাযীর মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারা হয় অর্থাৎ, দরবারে কবূল হয় না।

হে মুসলিম ভ্রাতা-ভগিনীগণ! নামায যখন পড়েন, এবং (সবচেয়ে বড় কর্তব্য ইহাই যে) ছওয়াবের জন্য নামায পড়েন, এমনভাবে কেন পড়েন যে উল্টা (ছওয়াবের পরিবর্তে) গোনাহ্ হয়। (যে ছওয়াব অন্য কাউকে দিবেন না, যে ছওয়াবের দ্বারা নিজের ঘর আবাদ হইবে, তখন অভক্তির সঙ্গে কেন পড়েন? ভক্তির সঙ্গে, মনোযোগের সঙ্গে, মহব্বতের সঙ্গে নামায পড়ুন। নিশ্চয় জানিবেন, নামাযের ন্যায় মূল্যবান রত্ন আর নাই; দুনিয়ার সব কিছুতেও দুই রাকা'আত নামাযের সমান কাজ দিতে পারে না।)

নামাযে এদিক-ওদিক তাকান

২০। **হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নামাযের মধ্যে তোমরা উপরের দিকে তাকাইবে না; (উহা নামাযের শানে এবং আল্লাহ্র শানে বে-আদবী। আল্লাহ্র শানে বে-আদবী করিতে) অন্তঃকরণে ভয় হওয়া চাই যে, (আল্লাহ্ কত বড় ক্ষমতাশালী,) ইহা করিলে আল্লাহ্ ঐ চক্ষুকে ছিনাইয়াও নিতে পারেন।

২১। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক তাকায়, তাহার নামায কবূল হয় না, তাহার নামায তাহারই চেহারার উপর ছুঁড়িয়া মারা হয়।

নামাযের সামনে দিয়া যাওয়া (পাপ)

২২। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, নামাযের সামনে দিয়া যাওয়া যে কত বড় পাপ, তাহা যদি কেহ বুঝিত, তবে চল্লিশ বৎসরও ঐ জায়গায় তার জন্য দাঁড়াইয়া থাকা সহজ হইত, তবুও নামাযের সামনে দিয়া যাইত না।

মাসআলাঃ নামাযীর সামনে যদি এক হাত উঁচা কোন জিনিস রাখা থাকে, তবে তাহার সামনে দিয়া যাওয়া দুরুস্ত আছে।

জানিয়া বুঝিয়া নামায ক্বাযা করা (মহাপাপ)

২৩। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি (জানিয়া বুঝিয়া) নামায ছাড়িয়া দিবে, সে যখন আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে, তখন আল্লাহ্ তাহার উপর ভীষণ রাগান্বিত হইবেন।

করযে হাসানা দেওয়া

২৪। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আমি যখন মে'রাজে গিয়াছিলাম, তখন বেহেশ্তের দরজার উপর লেখা দেখিয়াছি যে, খয়রাতের ছওয়াব দশগুণ, আর করযে-হাসানা বা ধার দেওয়ার ছওয়াব আঠার গুণ।

গরীব দেনাদারকে সময় দেওয়া

২৫। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কোন গরীব অভাবী লোককে করযে হাসানা দিলে (বা বাকী দিলে) যাবৎ ওয়াদা পার না হয়, তাবৎ দৈনিক ঐ পরিমাণ টাকা দান করার ছওয়াব পাওয়া যায়। আর যখন ওয়াদার তারিখ আসে আর সে গরীব তারিখ মত দেনা না দিতে পারিয়া সময় (মোহলত) চায় এবং পাওনাদার সময় দেয়, তখন হইতে দৈনিক ঐ টাকার দ্বিগুণ টাকা আল্লাহ্র ওয়াস্তে দান করিলে যে ছওয়াব পাওয়া যাইত, সেই পরিমাণ ছওয়াব পাইবে।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার ছওয়াব

২৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের একটি মাত্র হরফ পাঠ করিবে, সে একটি নেকী পাইবে; আর রহমান ও রহীম আল্লাহ্‌র দরবারে মু'মিন বান্দার নেকীর জন্য নিয়ম এই যে, এক নেকীতে দশ নেকী দিবেন। (কাজেই একটি হরফ কেহ ভক্তির সঙ্গে পাঠ করিলে সে দশটি নেকী পাইবে।) হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি এই বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম', এক হরফ, বরং 'আলিফ' এক হরফ, 'লাম' এক হরফ, 'মীম' এক হরফ। অতএব, কেহ শুধু 'আলিফ-লাম-মীম' (এইটুকু ভক্তির সহিত) তেলাওয়াত করিলে এই হিসাবে সে ৩০ নেকী পাইবে।

অভিশাপ বা বদদো'আ দেওয়া

২৭। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, (খবরদার,!) তোমরা কখনো (রাগের বশে) নিজকে নিজে বদদো'আ (অভিশাপ) দিও না, নিজের সন্তানদিগকেও (কখনো বদদো'আ দিও) না, নিজের চাকর-নওকরকেও (কখনো বদদো'আ দিও) না, নিজের গরু, ঘোড়া, মাল-আসবাবকেও (কখনো বদদো'আ দিও) না। কেননা, অনেক সময় দো'আ কবূলিয়াতের সময় হয়, সে সময় বদদো'আ দিলে বদদো'আও কবূল হইয়া যাইতে পারে। (তাহা হইলে পরে নিজেরই আফসোস করিতে হইবে।)

হারাম মাল কামাই করা ও খাওয়া পরা

২৮। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ جِسْمٌ غُذِىَ بِالْحَرَامِ "হারামের দ্বারা (সুদ, ঘুষ, চুরি, লুট, যুলুম, ইত্যাদির পয়সার দ্বারা) শরীরের যে অংশটুকু পয়দা হইয়াছে, তাহা কখনও বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না। (তাহা দোযখের আগুনে দগ্ধ হইবারই উপযুক্ত।)

২৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি দশ দেরহাম দ্বারা একটি কাপড় তৈয়ার করিল, তন্মধ্যে তাহার এক দেরহাম পরিমাণও যদি হারামের হয়, তবে যাবৎ ঐ কাপড় তাহার গায়ে থাকিবে তাবৎ তাহার কোন নামায (বা দো'আ) আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করিবেন না। (এক দেরহাম চারি আনা হইতে কিছু বেশী।)

ধোঁকা দেওয়া (মহাপাপ)

৩০। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ধোঁকা দিবে সে আমাদের দশভুক্ত নয়, সে আমার উম্মত হইতে খারেজ। ক্রয়-বিক্রয়, (মামলা-মকদ্দমা, শাদী-বিবাহ, পীরী-মুরীদী) প্রভৃতির মধ্যে যে কোন প্রকারের ধোঁকা হউক না কেন, ধোকা দেওয়া মহাপাপ।

করয লওয়া

৩১। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি দেনাদার থাকিয়া মরিয়া যাইবে, তাহার দেনা কিয়ামতের মাঠে নেকীর দ্বারা পরিশোধ করা হইবে। যেখানে দীনারও থাকিবে না, দেরহামও থাকিবে না। (একটি দীনার দশ দেরহামের মূল্যের সমান।)

৩২। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, ঠেকাবশতঃ যদি কেহ ধার করে এবং সেই ধার পরিশোধ করার জন্য তাহার আপ্রাণ চিন্তা ও চেষ্টা থাকে, অথচ পরিশোধ করিতে না পারিয়া ঐ চিন্তা লইয়া মরিয়া যায়, তবে আল্লাহ্ বলেন যে, আল্লাহ্ তাহার সাহায্য করিবেন। অর্থাৎ স্বয়ং তাহার দেনা পরিশোধের কোন ছুরত করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তির দেনা পরিশোধ করার জন্য ঐরূপ চিন্তা ও চেষ্টা না থাকিবে, সে যদি দেনা পরিশোধ না করিয়া মরিয়া যায়,

তবে তাহার দেনার পরিবর্তে তাহার নেকী লইয়া যাওয়া হবে। ঐ দিন দীনার-দেরহাম কিছুই মওজুদ থাকিবে না।

সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও দেনা পরিশোধ না করা (বড়ই গোনাহ্)

৩৩। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও দেনা পরিশোধ না করিয়া টালবাহানা করা যুলম। অনেকের কু-অভ্যাস থাকে যে, হাতে পয়সা থাকা সত্ত্বেও দুই চার দিন ঘুরাইয়া দেয় বা মযদুরের মযদুরি এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টা দেরী করিতে পারিলে আর যখন তখন দেয় না; সব খরচ চালায়, কিন্তু দেনাদারের দেনা পরিশোধের বেলায় এখন না তখন করিতে থাকে। (এইরূপ কু-অভ্যাস বড়ই খারাপ; কাজেই তাহা পরিত্যাগ করা দরকার।)

সুদ লওয়া ও দেওয়া গোনাহ্

৩৪। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সুদ যে খায় তার উপরও লা'নত এবং যে সুদ দেয় তার উপরও লা'নত।

পরের জমি গছব করিয়া লওয়া (মহাপাপ)

৩৫। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও পরের জমি গছব করিয়া লইবে (তাহাকে কিয়ামতের দিন ভীষণ শাস্তি দেওয়া হইবে।) সাত তবক জমিনের হার (গলবেড়ী) বানাইয়া তাহার গলায় দেওয়া হইবে।

মজুরি সঙ্গে সঙ্গে দিবে একটুও দেরী করিবে না

৩৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, মযদুরের গায়ের ঘাম শুকাইবার পূর্বে তাহার মজুরি দিয়া দিবে।

৩৭। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, স্বয়ং আমি কিয়ামতের মাঠে তিন ব্যক্তির পক্ষে ফরিয়াদী হইব; সেই তিন জনের মধ্যে ঐ ব্যক্তিও আছে যাহার দ্বারা কাজ লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার মজুরি দেয় নাই।

সন্তান মারা গেলে

৩৮। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি ঈমানদার হয় এবং তাহাদের তিনটি সন্তান (নাবালেগ অবস্থায়) মারা যায়, তবে তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ রহ্মতে বেহেশ্ত দান করিবেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি কাহারও দুইটি সন্তান মারা যায়। (তাহার কি হইবে?) হুযূর (দঃ) বলিলেন, যাহার দুইটি সন্তান মারা যাইবে তাহারও এই ছওয়াব। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, যদি কাহারও একটি সন্তান মারা যায়? (তাহার কি ছওয়াব হইবে?) হুযূর (দঃ) বলিলেন, যাহার একটি সন্তান মারা যাইবে (এবং ছবর করিবে) তাহারও এইরূপ ছওয়াব। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ্র কসম খাইয়া বলিতেছি, যে আল্লাহ্র হাতে আমার জান—যে মেয়েলোকের গর্ভপাত হইয়া সন্তান মারা যাইবে, যদি সে আল্লাহ্র দিকে চাহিয়া ছবর করে, তবে সেই সন্তান তাহার মাকে তাহার নাড়ীর নার দ্বারা পেঁচাইয়া বেহেশ্তে লইয়া যাইবে।

মেয়েলোকের পর্দা করা জরুরী

[**হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ - (بيهقى)

অর্থ—"যে দেখিবে এবং যে দেখা দিবে, উভয়ের উপর আল্লাহ্র লা'নত।"]

আতর সুগন্ধি লাগাইয়া পরপুরুষের সামনে যাওয়া

৩৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে মেয়েলোক সুগন্ধি লাগাইয়া (অথবা বেশভূষা দেখাইয়া) বেগানা পুরুষদের কাছ দিয়া যাতায়াত করিবে, সে এমন, অর্থাৎ বদকার। দেওর, ভাসুর, ভগ্নিপতি, চাচাত ভাই, মামাত ভাই, ভাসুর-পুত, দেওর-পুত, ফুফাত ভাই, খালাত ভাই ইত্যাদিও গায়র মাহ্‌রাম এবং বেগানা; কাজেই তাহাদের সামনে বা কাছ দিয়াও সুগন্ধি লাগাইয়া বা সুসজ্জিতা বেশে যাওয়া-আসা করা চাই না। (অবশ্য সুগন্ধি না লাগাইয়া ময়লা বিবর্ণ কাপড় দ্বারা আপাদমস্তক ঢাকিয়া দরকারবশতঃ যাতায়াত করা যাইতে পারে।)

মেয়েলোকের পাতলা কাপড় পরা

৪০। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ কোন কোন মেয়েলোক নামে কাপড় পরে, কিন্তু কাপড় পাতলা হওয়ার দরুন প্রকৃত প্রস্তাবে উলঙ্গ থাকে, তাহারা বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না এবং বেহেশ্‌তের ঘ্রাণও তাহারা পাইবে না।

মেয়েলোকের পুরুষের ছুরত বানান বা কাপড় পরা

৪১। হাদীসঃ যে মেয়েলোক পুরুষের (ন্যায়) কাপড় পরিবে (বা ছুরত বানাইবে), তাহার উপর হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করিয়াছেন।

[**হাদীসঃ** لَعَنَ اللّٰهُ الْمَجَمِّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ يَتَّخِذْنَ شُعُوْرَهُنَّ جُمَّةً ○

"হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে সমস্ত মেয়েলোক পুরুষের বাবরীর মত কান বা কাঁধ পর্যন্ত (লম্বা) চুল রাখিবে, তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।"

وَاَمَّا النِّسَاءُ فَانَّهُنَّ يُرْسِلْنَ اَشْعَارَ هُنَّ لَايَتَّخِذْنَ جُمَّةً ○

অর্থাৎ—মেয়েলোকদের চুল লম্বা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। পুরুষদের বাবরীর মত চুল রাখা তাহাদের উচিত নহে। (এবং মেয়েলোকদের মত পুরুষদের চুল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে; পুরুষ কান কিংবা কাঁধ পর্যন্ত বাবরী রাখিতে পারে বেশী নয়।)]

শান দেখাইবার জন্য কাপড় পরা

৪২। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নামের জন্য এবং নিজের শান দেখাইবার জন্য পোশাক পরিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে অপমানের পোশাক পরাইয়া তাহাতে দোযখের আগুন লাগাইয়া দিবেন।

কাহারও উপর যুল্‌ম (অত্যাচার) করা

৪৩। হাদীসঃ হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দিন মজলিসের মধ্যে বলিলেন, তোমরা বলিতে পার গরীব কে? সকলে বলিল, আমরা গরীব তাহাকে বলি, যাহার টাকা-পয়সা, বিষয় সম্পত্তি নাই। হযরত বলিলেন, (আমার সে উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য এইঃ) আমার উম্মতের মধ্যে বড় গরীব সে-ই, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত, সবকিছু লইয়া উপস্থিত হইবে, কিন্তু হয়ত সে কাহাকেও গালিমন্দ (গীবত) করিয়াছিল, কাহারো উপর মিথ্যা তোহ্‌মত লাগাইয়াছিল, কাহারো হক নষ্ট করিয়াছিল, কাহারো মাল আত্মসাৎ করিয়াছিল, কাহাকেও হত্যা করিয়াছিল, কাহাকেও অন্যায়ভাবে মারিয়াছিল ইত্যাদি, এইসব কারণে তাহার নেকীসমূহ ঐ সব হকদারকে দিয়া দেওয়া হইবে; তাহাতেও যদি হকদারদের হক সকল আদায় না হয়, তবে অর্থাৎ নেকী যখন না থাকিবে তখন ঐ সব হকদারের গোনাহ্‌ উহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে দোযখের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে—এই হইল বড় গরীব।

দয়া ও রহম করা

৪৪। **হাদীস**ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়া সে পাইবে না, যে মানুষের উপর দয়া ও রহম করে না।

সৎকাজে আদেশ করা বদকাজে নিষেধ করা

৪৫। **হাদীস**ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেহ শরীঅতের খেলাফ কোন কাজ দেখিবে, তাহার নিজ হাতে সেই কাজে বাধা প্রদান করিয়া তাহা বন্ধ করা উচিত। যদি এতদূর ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখে নিষেধ করিবে। যদি এতটুকু ক্ষমতাও না থাকে, অন্ততঃ ঐ বদকাজকে দেলের সহিত অস্বীকার এবং ঘৃণা করিবে। ইহা ঈমানের সর্ব-নিম্নস্তর। (হে মুসলিম ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! যাহাদের উপর জোর চলে, যেমন নিজেদের ছেলে-মেয়ে, চাকর-নওকর ইত্যাদি, তাহাদেরে জোরপূর্বক নামায, রোযা, পর্দা, সত্য কথা, সদ্ব্যবহার, ইসলামী আদব-কায়দা ইত্যাদি শিক্ষা দাও এবং ইহার অভ্যাস করাও। যদি তাহাদের কাছে ফটো, ছবি বা মাটির বা চীনা মাটির মূর্তি দেখ, বা বেহুদা পুঁথি-পুস্তক দেখ, তবে তাহা ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জ্বলাইয়া ফেল এবং আতশবাজি, ঘুড়ি, রেস, বায়স্কোপ, হিন্দুর পর্বের মিঠাই সামগ্রী ইত্যাদির জন্য পয়সা দিও না।

মুসলমানের দোষ ঢাকিয়া রাখা

৪৬। **হাদীস**ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের আয়েব ঢাকিয়া রাখিবে, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তাহার আয়েব ঢাকিয়া রাখিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের আয়েব ফাঁস করিয়া দিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহার আয়েব ফাঁস করিয়া দিবেন। এমন কি, সে নিজের বাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকিলেও অপমানিত হইবে।

কাহারও অপমান অনিষ্ট দেখিয়া খুশী হওয়া

৪৭। **হাদীস**ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, খবরদার! তোমরা কেহ অন্য মুসলমান ভাইয়ের বিপদ (অপমান বা অনিষ্ট) দেখিয়া খুশী হইও না। কেননা, হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর রহম করিয়া তাহাকে ঐ বিপদ হইতে মুক্তি দিয়া তোমাকে ঐ বিপদের মধ্যে গ্রেপ্তার করিয়া দিতে পারেন। (কাজেই হুঁশিয়ার থাকা দরকার।)

কোন গোনাহ্‌র কারণে তা'না বা খোঁটা দেওয়া

৪৮। **হাদীস**ঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও কোন গোনাহ্‌র (বা দোষের) কাজের জন্য তা'না বা খোঁটা দিবে, সে নিশ্চয়ই সেই গোনাহ্ বা দোষের কাজের মধ্যে গ্রেপ্তার হইবেই হইবে। যে পর্যন্ত সেই গোনাহ্ বা দোষের কাজের মধ্যে গ্রেপ্তার না হইবে, সে পর্যন্ত তার মৃত্যু আসিবে না। (হাদীসের অর্থ এই যে, যদি কেহ কোন পাপের কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকে এবং পরে তওবা করে, তবে সেই তওবাকৃত পাপের কারণে তাহাকে তা'না বা খোঁটা দেওয়া ঘোর অন্যায়। আর যদি তওবা না করিয়া থাকে, তবে খায়েরখাহির সহিত তাকে নছীহত বা তাম্বীহ্ ত করা যাইবে কিন্তু তবুও তাকে শরম দেওয়ার জন্য বা তাহার অপমান করার জন্য বা নিজের বাহাদুরী বা গৌরব দেখাইবার জন্য বলাবলি করা অন্যায়।)

ছগীরা (ছোট ছোট) গোনাহ্ করা

৪৯। **হদীস**ঃ হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি আয়েশা (রাঃ) কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, হে আয়েশা! ছোট ছোট গোনাহ্ হইতেও তুমি নিজেকে বহুত (চেষ্টা এবং

লক্ষ্য করিয়া) বাঁচাইতে থাকিবে। কেননা, এইসব ছোট ছোট গোনাহ্‌রও সওয়াল-জওয়াব হইবে, তাহা ফেরেশ্‌তারা লিখিতেছেন এবং তাহার হিসাব হইবে। ছোট ছোট গোনাহ্‌র কারণেও শাস্তি হইবার আশঙ্কা আছে।

মা-বাপকে সন্তুষ্ট রাখা

৫০। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্‌র খুশী মা-বাপের খুশীর মধ্যে অর্থাৎ মা-বাপ যে ছেলেমেয়ের উপর সন্তুষ্ট, আল্লাহ্‌ তাহার উপর সন্তুষ্ট এবং যাহার উপর মা-বাপ অসন্তুষ্ট, আল্লাহ্‌ তাহার উপর অসন্তুষ্ট।

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে
অসদ্ব্যবহার করা

৫১। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেক শুক্রবারের রাত্রে অর্থাৎ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে সমস্ত লোকের আমল- আখলাক, এবাদত-বন্দেগী আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি (নিজের ভাই-বেরাদরের সঙ্গে বা) আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে, তাহার কোন এবাদত-বন্দেগী কবূল হয় না।

পিতৃহীন (এতীমের) **লালন-পালন করা**

৫২। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এতীম বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণ-পোষণ এবং লালন-পালনের ভার (তাহাদের সম্পত্তি গ্রাসের জন্য নহে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে খালেছ নিয়তে) গ্রহণ করিবে, শাহাদত অঙ্গুলি ও মধ্যমা আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়া বলিয়াছেন যে, সে এবং আমি এইরূপ একত্রে বেহেশ্‌তে থাকিব।

৫৩। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন এতীম বাচ্চার মাথার উপর শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দয়া পরবশ হইয়া হাত বুলাইয়া দিবে, তাহার হাতের নীচে যত চুল পড়িবে তত পরিমাণ নেকী সে পাইবে। আর যদি কাহারও আশ্রয়ে এতীম ছেলেমেয়ে থাকে এবং তাহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, তবে আমি এবং সে বেহেশ্‌তে এভাবে থাকিব যেমন শাহাদত আঙ্গুলি এবং মধ্যমা অঙ্গুলি নিকট নিকট। (এতীম ছেলে-মেয়ের রক্ষক মা হউক, বা চাচা হউক, বা মামু বা নানা হউক, বা অন্য কেহ হউক, তাহাদের সকলেই এই ছওয়াবের আশায় এতীমের খেদমত করা উচিত। কিন্তু খবরদার! এতীমের এক পাই পয়সাও যেন আত্মসাৎ না হয়; নতুবা সর্বনাশ! কোরআন শরীফে আছে, "যাহারা এতীমের মাল খায়, তাহারা দোযখের আগুনই খায়।" খবরদার! হুঁশিয়ার!!

পাড়া-প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া

৫৪। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের পাড়া-প্রতিবেশীকে (পার্শ্ববর্তী লোককে) কষ্ট দেয়; সে আমাকে কষ্ট দেয়; আর যে আমাকে কষ্ট দেয় সে স্বয়ং খোদা তা'আলাকে কষ্ট দেয়; যে নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করে সে স্বয়ং আমার সঙ্গে ঝগড়া করে; আর যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, সে স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাকের সঙ্গে ঝগড়া করে। (পাড়া-প্রতিবেশীর হক খুব বেশী; সামান্য সামান্য কারণে তাহাদের সহিত ঝগড়া-কলহ করা, কাউকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া বড়ই অন্যায়। (ছবর করা দরকার; নতুবা উপায় নাই।)

কোন মুসলমানের কোন কাজ করিয়া দেওয়া

৫৫। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের কোন কাজে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাহায্য করিয়া দিবে এবং তাহার উপকার করিয়া দিবে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তাহার কাজ করিয়া দিবেন এবং তাহার সাহায্য ও উপকার করিবেন।

লজ্জাশীলতা এবং নির্লজ্জতা

৫৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, লজ্জা প্রবণতা এবং হায়া-শরম ঈমানের একটি প্রধান অঙ্গ। ঈমান মানুষকে বেহেশ্‌তে পৌঁছাইবে। বেহায়ায়ী অর্থাৎ নির্লজ্জতা বদ-খাছলতির আলামত; বদ-খাছলতী মানুষকে দোযখে পৌঁছায়। কিন্তু দ্বীনের কার্যে কখনও লজ্জা করিও না, যেমন বিবাহ-শাদীর সময় কিংবা সফরে মেয়েলোকেরা নামায পড়ে না। এমন লজ্জা নির্লজ্জতার চেয়ে নিকৃষ্ট। (লজ্জা প্রবণতা এবং হায়া-শরমের অর্থ এই যে, শরীঅত-বিরুদ্ধ কাজ করিতে, খোদার হুকুম এবং তরীকার বিরুদ্ধে কাজ করিতে লজ্জা বোধ করা চাই। যেমন মেয়েলোকের জন্য পরপুরুষকে দেখা দেওয়া লজ্জার কথা, মিথ্যা বলা, ঝগড়া করা, গালি দেওয়া, ফাহেশা কথা বলা, নিজের অভাব পরের কাছে জানান, ছতর খোলা, মজলিসের মধ্যে বাতকর্ম করা, মেহমানের যত্ন ও সম্মান না করা, মুরুব্বীকে ভক্তি না করা, ভিক্ষা বা চুরি করা, ইত্যাদি বে-হায়ায়ীর কাজ; নতুবা মাসআলার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জাবোধ করা, নামায পড়িতে লজ্জাবোধ করা, দাড়ী রাখিতে লজ্জাবোধ করা, মেয়েলোকের নৌকার সফরে বা গাড়ীর সফরে বা নূতন বিবাহকালে নামায পড়িতে লজ্জা বোধ করা, নিজের জাতীয় পোশাক পরিতে বা জাতীয় কথা বলিতে লজ্জা বোধ করা, এসব লজ্জার বিষয় নহে, মনের দুর্বলতা বা আত্মার সঙ্কোচ, কাজেই ইহা বড়ই দূষণীয়।)

ভাল স্বভাব এবং মন্দ স্বভাব

৫৭। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, মানুষের ভাল স্বভাব এবং সদ্ব্যবহার মানুষের পাপসমূহকে এমন ভাবে গলাইয়া (দূর করিয়া) দেয়, যেমন পানি নিমককে গলাইয়া (নিমকের রূপকে দূর করিয়া) দেয়। এইরূপ মানুষের মন্দ স্বভাব এবং অসদ্ব্যবহার মানুষের এবাদত-বন্দেগীকে এমন ভাবে নষ্ট করিয়া দেয়, যেরূপ সিরকা মধুকে নষ্ট করিয়া দেয়।

৫৮। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়পাত্র এবং কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী আমার নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হইবে, যাহার স্বভাব-চরিত্র ভাল (এবং লোকের সহিত ব্যবহার মধুর) হইবে; আর আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় এবং কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী দূরবর্তী সেই ব্যক্তি হইবে, যাহার স্বভাব মন্দ (এবং ব্যবহার কর্কশ ও কটু) হইবে।

কোমল এবং কঠোর ব্যবহার

৫৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ স্বয়ং দয়াবান এবং যাহারা দয়াবশতঃ লোকের বরং সমস্ত জীবের সঙ্গে নরম ও কোমল ব্যবহার করে, কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার করে না, তিনি তাহাদিগকে পছন্দ করেন। আল্লাহ্ পাক স্নেহে, নরম ও কোমল ব্যবহারে যে সমস্ত নিয়ামত দান করেন, কঠোর বা নির্মম ব্যবহারে তাহা দান করেন না।

৬০। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যাহার স্বভাবে এবং ব্যবহারে নরমী ও স্নেহ নাই, সে সমস্ত লোক ভালাই এবং কল্যাণ হইতে বঞ্চিত।

কাহারও ঘরে বা বাড়ীতে উঁকি মারা

৬১। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বিনা এজাযতে (কাহারও বাড়ীতে বা ঘরে প্রবেশ করা কোরআনে নিষেধ, তদ্রূপ বিনা এজাযতে) কাহারও ঘরে বা বাড়ীতে উঁকি মারিয়া দেখিও না। যে এইরূপ করিল, সে যেন ঢুকিয়া পড়িল।

ফায়দা ঃ অনেক জায়গায় অনেক কু-প্রথা প্রচলিত আছে যে, মেয়েলোকেরা দুলহা-দুলহানকে বাসর ঘরে দিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখে, ইহা ভারি নির্লজ্জতার কথা এবং ভারী গোনাহ্‌র কাজ। বাস্তবে উঁকি মারিয়া দেখা এবং দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়া ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি ? (হাদীস শরীফে এতদূর পর্যন্ত আছে যে, এইরূপ উঁকি যে মারে তাহার চক্ষু ফুঁড়িয়া দিলেও তার কোন দাদফরিয়াদ নাই।) মুখে কথা বলিয়া আওয়াজ দিয়া এজাযত লইবে।

বিনা এজাযতে কাহারও গোপনীয় কথায় কান দেওয়া

৬২। হাদীস ঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকের কানেকানের কথা শুনিবে, অথচ তাহাকে শুনানের ইচ্ছা তাহাদের নাই, কিয়ামতের দিন তাহার উভয় কানে গলিত সীসা ঢালা হইবে।

রাগ করা

৬৩। হাদীস ঃ একজন লোক হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, হুযূর! আমাকে এমন কোন কাজ বাতাইয়া দেন যদ্দ্বারা আমি সহজে বেহেশ্‌তে যাইতে পারি। হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, রাগ দমন করিতে পারিলে তোমার জন্য বেহেশ্‌ত। (তুমি রাগ-রিপুকে দমন করিবে, তা' হইলেই তুমি সহজে বেহেশ্‌তে যাইতে পাইবে। রোগ বিশেষে রোগীকে ঔষধ বাতান হয়। এই লোকটির যে রোগ ছিল সেই রোগের ঔষধই রূহানী তবীব খোদার হাবীব দান করিয়াছেন।)

কথা বলা ত্যাগ করা

৬৪। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, (ঝগড়া-বিবাদ বা রাগ গোস্বাবশতঃ) কোন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলা ত্যাগ করা (মনে চাহিলে) কোন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশী হালাল নহে। যে তিন দিনের বেশী কথা বলা ত্যাগ করিয়া সেই অবস্থায় মারা যাইবে, সে দোযখী হইবে। (ধর্মীয় কারণে কথাবার্তা ত্যাগ করা জায়েয আছে।)

কোন মুসলমানকে বে-ঈমান বলা ও অভিশাপ দেওয়া

৬৫। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বলিবে, "ওরে কাফের" বা "ওরে বে-ঈমান", তাহার এত পরিমাণ গোনাহ্ হইবে, ঐ মুসলমানকে প্রাণে বধ করিলে যে পরিমাণ গোনাহ্ হইত।

৬৬। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কোন মুসলমানকে লা'নত দেওয়া (বা বদদো'আ ও অভিশাপ দেওয়া) এমন গোনাহ্, যেমন ঐ মুসলমানকে জানে মারিয়া ফেলা গোনাহ্।

৬৭। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন কোন লোক কোন মুসলমানকে (অভিশাপ) লা'নত (বা বদ-দো'আ) দেয়, তখন উহা প্রথমে আকাশের দিকে যায়; আকাশের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, পরে জমিনের দিকে আসে, জমিনের দরজাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর উহা ডানে বামে ঘুরিয়া ফিরে। যাহাকে লা'নত দেওয়া হইয়া থাকে তাহার কাছে যায়। যদি সে লা'নতের উপযুক্ত হয়, তবে ত তাহারই উপর পড়ে, নতুবা যে লা'নত করিয়াছে তাহার

উপর আসিয়া পড়ে। **ফায়দাঃ** কোন কোন স্ত্রীলোকের সামান্য কারণে অভিশাপ বা বদদো'আ দেওয়ার অভ্যাস আছে। সেই অভ্যাস ত্যাগ করা দরকার।

কোন মুসলমানকে (অনর্থক) ভয় দেখান

৬৮। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কোন মুসলমানকে অনর্থক ভয় দেখান কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নহে।

৬৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যদি কোন মুসলমানের দিকে না-হক এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে যে, সে ডরাইয়া যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন (উহার শাস্তি স্বরূপ) তাহাকে ভয় দেখাইবেন। **ফায়দাঃ** ন্যায্য কারণে ভয় দেখান দুরুস্ত আছে বটে, কিন্তু অকারণে ভয় দেখান দুরুস্ত নহে।

মুসলমানের ওযর কবূল করিয়া লওয়া

৭০। হাদীসঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যদি কোন মুসলমান ভাই ভুলবশতঃ কোন অন্যায় করিয়া পরে ওযর-খাহি করে এবং মাফ চায়, তবে তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া উচিত। যে মাফ চাওয়া সত্ত্বেও মাফ করিবে না, সে হাওযে-কওছারের কিনারায় আমার কাছে আসিতে পারিবে না।

চোগলখুরী ও গীবত করা বড় গোনাহ্

৭১। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "চোগলখোর বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না।" (একজনের কথা আর একজনের কাছে এমনভাবে বলা যাহাতে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে "চোগলখুরী" বলে।)

৭২। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমান ভাইয়ের গোশ্‌ত খাইবে (অর্থাৎ গীবত করিবে,) কিয়ামতের দিন তাহাকে মরা মানুষের গোশ্‌ত খাইতে দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে, তুমি জিন্দালোকের গোশ্‌ত খাইয়াছ এখন মুর্দাকেও খাও। সে খাইতে চাহিবে না, শোরগোল করিবে, নাক-মুখ সিটকাইবে, তবুও তাকে ঐ মরার গোশ্‌ত খাইতে বাধ্য করা হইবে।

কাহারও উপর মিথ্যা দোষারোপ করা

৭৩। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিবে, (অর্থাৎ যে কাজ সে করে নাই, যে কথা সে বলে নাই, তাহা মিছামিছি তাহার উপর তোহ্‌মত লাগাইবে,) তাহাকে দোযখের মধ্যে এমন জায়গায় রাখা হইবে যেখানে দোযখীদের শরীর পচিয়া গলিয়া তাহাদের রক্ত-পূঁজ বহিয়া গিয়া জমা হইবে। অবশ্য যদি তওবা করে এবং ঐ লোকের নিকট হইতেও মাফ চাহিয়া লয়, তবে ঐ শাস্তি মাফ হইবে; নতুবা আর কোন উপায় নাই।

কথা কম বলা (ভাল)

৭৪। হাদীসঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, চুপ থাকিলে অনেক আপদ-বিপদ হইতে বাঁচা যায়।

৭৫। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, এক আল্লাহ্‌র যেকের ব্যতিরেকে অন্য বাজে কথা কম বলার অভ্যাস কর। কেননা, আল্লাহ্‌র যেকের ছাড়া অন্য কথা বেশী বলাতে দেল শক্ত হইয়া যায়। যার দেল শক্ত, সে খোদা হইতে সবচেয়ে বেশী দূরে থাকিবে।

নম্র ব্যবহার

[অহঙ্কারে পতন ও মহাপাপ, নম্রতায় উন্নতি]

৭৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাহার মরতবা বাড়াইয়া দেন। আর যে অহঙ্কার করে, আল্লাহ্ তার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেন অর্থাৎ অপদস্থ করেন।

অহঙ্কার করা

৭৭। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যাহার দেলে এক সরিষা পরিমাণ অহঙ্কার থাকিবে, সে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না।

সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলা বড় দোষ

৭৮। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সদা সত্য কথা বলার অভ্যাস করিবে; কেননা, সত্যই সততার মূল এবং সত্য ও সৎ এই দুই-ই বেহেশ্‌তে লইয়া যায়। মিথ্যা কথা কখনও বলিবে না। কেননা, মিথ্যাই পাপের মূল এবং মিথ্যা ও পাপ এই দুই-ই দোযখে লইয়া যায়।

দুমুখো মানুষ (ভাল নহে)

৭৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "দুনিয়াতে যে দুমুখোপনা করিবে, কিয়ামতের দিন তাহার দুইটি আগুনের জিহ্বা হইবে।" দুমুখোপনার অর্থ এই যে, (আ'মল ঈমান ঠিক নাই, হক না-হক বিচার করে না,) যাহার কাছে যায়, (তার থেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য) তাহার মন যোগাইয়া কথা বলে। (এইরূপ স্বভাব বড়ই খারাপ।)

এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কসম খাওয়া

৮০। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও কসম খাইবে, সে কুফরী ও শেরেকী গোনাহ্‌র মধ্যে লিপ্ত হইল। যেমন কাহারও অভ্যাস যে, এরূপ কসম খায় তোমার জানের কসম, আপন চক্ষুর কসম, নিজের ছেলের কসম, এ সকল নিষেধ। এক হাদীসে আছে, এরূপ কসম যদি মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ কলেমা পড়িয়া লইবে। (বিনা জরুরতে কসম খাওয়াই ভাল নহে। যদি জরুরতবশতঃ কসম খাইতে হয়, তবে আল্লাহ্‌র কসম খাওয়া যায়, তা-ছাড়া অন্য কোন কিছুর কিরা কাটা বা কসম খাওয়া জায়েয নহে। যেমন অনেকের অভ্যাস আছে, "ছেলের মাথা খাই।" নবীর কসম ইত্যাদি বলে, এরূপ বলা কঠিন গোনাহ্।)

ঈমানের কসম খাওয়া

অর্থাৎ এরূপ বলিবে না যে, যদি এইরূপ না হয়, তবে যেন ঈমান নছীব না হয়।

৮১। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কসম খায় যে, যদি এই কথা সত্য না হয় বা এইরূপ না হয়, তবে যেন ঈমান নছীব না হয়, (বা কলেমা যেন নছীব না হয় বা শাফা'আত যেন নছীব না হয় বা বেহেশ্‌ত যেন নছীব না হয়, দোযখ যেন নছীব হয়। এরূপ কসম সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কখনও খাওয়া চাই না। যদি কাহারও এরূপ অভ্যাস থাকিয়া থাকে, তবে সে অভ্যাস প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অতি সত্বর পরিবর্তন করা দরকার। কেননা, যদি কেহ এরূপ কসম করে, তবে তাহার ঈমান কোন প্রকারেই সালামত থাকিবে না।) যদি মিথ্যা হয়, তবে ত ঈমান যাইবেই, আর যদি সত্য হয়, তবু ঈমান সালামত থাকিবে না।

রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়া

৮২। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, এক ব্যক্তি পথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। পথে একখানা কাঁটার ডাল দেখিতে পাইল। সে উহা পথ হইতে সরাইয়া ফেলিল। আল্লাহ্ পাক তাহার এই আমলটুকু খুব পছন্দ করিলেন এবং (ইহার পারিতোষিক এই দিলেন যে,) তাহার সব গোনাহ্ খাতা মাফ করিয়া (দিয়া তাহাকে বেহেশ্‌তে দিয়া) দিলেন। ইহাতে বুঝা গেল, এমন জিনিস পথে ফেলিয়া রাখা বড় অন্যায়। কোন কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়েলোকদের অভ্যাস, বারান্দায় পিঁড়ি পাতিয়া বসে, অতঃপর সে ত উঠিয়া গেল, পিঁড়ি সেখানেই রহিয়া গেল। কোন সময় চলিবার সময় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া হাত মুখ ভাঙ্গে। এভাবে পথে কোন বরতন রাখিয়া দেওয়া, চৌকি, কাঠ কিম্বা পাটা ফেলিয়া রাখা অন্যায়।

ওয়াদা ঠিক রাখা, আমানত পুরা না করা

৮৩। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

لَاۤاِيْمَانَ لِمَنْ لَّاۤاَمَانَةَ لَهٗ وَلَادِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهٗ ○

যাহার মধ্যে আমানতের হেফাযত নাই তাহার ঈমান নাই, আর যাহার মুখের কথা (ওয়াদা অঙ্গীকার) ঠিক নাই তাহার ধর্ম নাই।

জ্যোতিষী দ্বারা ভাগ্য গণনা করান

৮৪। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে যাইবে এবং তাহার কাছে গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাহার কথা বিশ্বাস করিবে, (তাহার এত বড় গোনাহ্ যে, তওবা না করিলে) তাহার ৪০ দিনের নামায কবূল হইবে না। (অনেকের এইরূপ অভ্যাস আছে যে, কোন মাল হারাইলে কোন গণক ঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করে।) বা কাহারো উপর জ্বিনের আছর হইলে তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করে এবং আমার স্বামীর চাকুরী কবে হইবে, আমার ছেলে কবে আসিবে, (ছেলে হইবে না মেয়ে হইবে, ভাগ্য ভাল কি মন্দ, রোগ সারিবে কি না সারিবে, মালটা কোথায় কি ভাবে আছে ইত্যাদি) এইসব কথাই শরীঅতের বরখেলাফ এবং কবীরা গোনাহ্ (এরূপ কাজ করা চাই না)।

কুকুর পালা, ফটো বা ছবি রাখা

৮৫। **হাদীসঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে, সে ঘরে রহ্‌মতের ফেরেশ্‌তা আসে না। ছেলেপিলেদের খেলনার মধ্যেও যদি কোন জানদারের মূর্তি থাকে, তাহাও জায়েয নহে।

বিনা ওযরে উপুড় হইয়া শয়ন করা

৮৬। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) এক দিন হাঁটিয়া যাইতেছিলেন, একজন লোককে দেখিলেন যে, উপুড় হইয়া শুইয়া আছে; হযরত (দঃ) তাহাকে পায়ের দ্বারা ঠেলা দিয়া বলিলেন, এরূপ শয়ন করা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

কিছু রৌদ্রে কিছু ছায়ায় শোয়া বা বসা

৮৭। **হাদীসঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু ছায়ায় এবং কিছু রৌদ্রে বসিতে নিষেধ করিয়াছেন।

কুলক্ষণ বা কুযাত্রা মানা

৮৮। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কুলক্ষণ বা কুযাত্রা মানা শেরেক।

৮৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যাদু টোনা করা শেরেক।

দুনিয়ার লোভ করা

৯০। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দুনিয়ার লোভ না করাতে রূহের (আত্মার)-ও শান্তি এবং শরীরের (স্বাস্থ্যের)-ও আরাম।

৯১। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যদি বকরীর পালের মধ্যে দুইটি ক্ষুধার্থ বাঘ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা যেমন বকরীর সর্বনাশ করে, মানুষের অর্থ-লিপ্সা এবং যশঃলিপ্সা তাহার ঈমানকে তদধিক সর্বনাশ ও ধ্বংস করে।

মৃত্যুকে স্মরণ করা

৯২। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা সর্বস্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে খুব বেশী স্মরণ করিবে। (তাহা হইলে সমস্ত বিলাসিতার মূলোচ্ছেদ সহজেই হইয়া যাইবে।)

৯৩। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সকাল বেলায় সন্ধ্যার চিন্তা করিও না এবং সন্ধ্যা বেলায় সকাল বেলার চিন্তা করিও না (কি জানি, হয়ত মৃত্যু আসিয়া পড়িতে পারে, অনর্থক চিন্তা করিয়া লাভ কি?) তোমরা রোগাক্রান্ত হইবার পূর্বে স্বাস্থ্যের কদর কর, (অর্থাৎ, স্বাস্থ্যের দ্বারা কাজ লও। কেননা, প্রতি মুহূর্তেই মানব দেহ রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে।) মৃত্যু আসিবার পূর্বে জীবনের মূল্যবান সময়ের কদর কর। (অর্থাৎ কোন্ মুহূর্তে মৃত্যু আসিয়া পড়িবে কিছুই জানা নাই। অতএব, জীবনের মূল্যবান সময়গুলি নষ্ট করিও না, সময়ের সদ্ব্যবহার কর।) মৃত্যু এবং রোগের সময় কিছুই করা সম্ভব নহে।

বিপদে ও বালা-মুছিবতে ছবর

৯৪। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু অহালাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মুসলমানদের দুনিয়াতে যাহাকিছু দুঃখ-কষ্ট বিপদ-বিমারী বা শোক-তাপ পৌঁছে, এমন কি (কোন জিনিস হারাইলে বা রুযির অভাব হইলে, বাল-বাচ্চার কারণে) যে কছু চিন্তা পেরেশানী আসে, তাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।

রোগীর সেবা-শুশ্রূষা

৯৫। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, একজন মুসলমান যদি অন্য মুসলমান রোগীর সেবা-শুশ্রূষা বা খবরবার্তা লওয়ার জন্য প্রাতে যায়, তবে প্রাতঃ কাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা দিন তাহার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা নেক দো'আ করিতে থাকে। আর যদি সন্ধ্যায় যায়, তবে সারা রাত ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা তাহার জন্য দো'আ করিতে থাকে।

মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন

৯৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুর্দাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গোসল দিবে, তাহার সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ এভাবে মাফ হইয়া যাইবে, যেমন সে সদ্য মা'র পেট হইতে জন্মাইয়াছে। আর যে ব্যক্তি কোন মুর্দাকে কাফন দান করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌তের জোড়া পোশাক দান করিবেন। আর যে ব্যক্তি শোকসন্তপ্ত লোকের প্রবোধ ও সান্ত্বনা দান করিবে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে পরহেযগারীর লেবাস দান করিবেন এবং তাহার রূহের উপর রহ্‌মত নাযিল করিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন শোকসন্তপ্ত বা বিপদগ্রস্তকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দান করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বেহেশ্‌তের মধ্যে এমন পোশাক দান করিবেন, যাহার মূল্য সমস্ত দুনিয়ার (ধন-রত্নের) মূল্যের চেয়েও বেশী।

[**হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি খাঁটি দেলে খালেছ নিয়তে কোন মুসলমানের জানাযার পিছে পিছে যাইবে এবং শুধু জানাযার নামায পড়িয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, সে এক ক্বীরাত সওয়াব পাইবে এবং যে জানাযার নামায পড়িয়া মুর্দাকে দাফন করিয়া অর্থাৎ মাটি দিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, সে দুই ক্বীরাত সওয়াব পাইবে। এক ক্বীরাত ওহোদ পাহাড়ের সমান।

হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে মুসলমানের জানাযার জন্য ৪০ জন এমন মু'মিন লোক যাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করে না, দাঁড়াইয়া আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশের জন্য দো'আ মাগফেরাত করিবে—অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, একশত মুসলমানের একটি দল যাহার জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট সুপারিশ করিবে, আল্লাহ্ পাক তাহাদের সুপারিশ মঞ্জুর করিবেন।]

চিল্লাইয়া ক্রন্দন করা

৯৭। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে মেয়েলোক চীৎকার করিয়া (বিনাইয়া বিনাইয়া) ক্রন্দন করিবে এবং যে মেয়েলোক তাহা শ্রবণ করার মধ্যে শরীক থাকিবে, তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত। (আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এগুলি ছাড়িয়া দিন।)

এতীমের মাল খাওয়া

৯৮। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের দিন কিছুসংখ্যক লোক এমন অবস্থায় কবর হইতে উঠিবে যে, তাহাদের মুখ হইতে আগুনের শিখা বাহির হইতে থাকিবে। মজলিসের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর তাহারা কোন শ্রেণীর লোক? হুযূর বলিলেন, তোমরা কি শুন নাই যে, আল্লাহ্ পাক কোরআন মজীদের মধ্যে ফরমাইয়াছেন, যাহারা এতীমের মাল না-হকভাবে খায়, তাহারা আস্ত আগুন পেটের মধ্যে ভরিতেছে। (আজকাল লোকের এমন কু-অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, মানুষ মরিয়া গেলে শরীঅতের হুকুমের তথা আল্লাহ্‌র আইনের কোন ধার ধারে না; "জোর যার মল্লুক তার" কু-প্রথা অনুযায়ী যালেম সাজিয়া খোদার গযবের তলে পড়িয়া এতীমের ও দুর্বলদের হকের কোন পরওয়া না করিয়া, যার হাতে যা পড়ে সে তাই দখল করে। খবরদার! এরূপ করা চাই না। এতীম কিংবা দুর্বলদের হক নষ্ট করিবে না। তাহাদের ফরিয়াদি স্বয়ং রাব্বুল আ'লামীন আহ্‌কামুল হাকেমীন হইবেন। এতীম, বিধবা ও দুর্বলদের সম্পত্তি দখল করিয়া নেওয়া ত অনেক বড় যুলুমের কথা, এমন কি শরিকী মাল হইতে এতীমের অংশ উঠাইয়া না রাখিয়া এবং দুর্বল শরীকের আন্তরিক এজাযত না লইয়া, খয়রাত-যিয়াফত করাও দুরুস্ত নহে।)

কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ

৯৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক লোকের নিকট চারিটি প্রশ্ন করা হইবে। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কাহাকেও পা নাড়িতে দেওয়া হইবে না। প্রথম প্রশ্ন এই যে, জীবনটা (বয়সটা) কি কাজে কাটাইয়াছ? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শরীঅতের হুকুম সম্বন্ধে যে জ্ঞান (ও এল্‌ম) তোমাকে দান করা হইয়াছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করিয়াছ বা আমল করিয়াছ কি না? তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি কি উপায়ে উপার্জন করিয়াছ—হালাল উপায়ে, না হারাম উপায়ে এবং টাকা-পয়সা কোথায় কি কাজে

কিভাবে ব্যয় করিয়াছ, সৎকাজে না অসৎ কাজে? ৪র্থ প্রশ্ন এই যে, যৌবনে সুষ্ঠু শরীরটা কি কাজে খাটাইয়াছ, কি কাজে শক্তিগুলি ব্যয় করিয়াছ—নফ্সের তাবেদারীর কাজে, না খোদার হুকুমের তাবেদারীর কাজে?

১০০। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের মাঠে সকলের সকল হক (দেনা-পাওনা তিল তিল হিসাব করিয়া) পরিশোধ করা হইবে, এমন কি শিংওয়ালা বকরী (জীব) যদি শিংহীন বকরীকে (জীবকে না-হক) গুঁতাইয়া থাকে ও কষ্ট দিয়া থাকে, তাহারও প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

বেহেশ্ত ও দোযখের কথা

১০১। হাদীসঃ হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ওয়াযের মজলিসে বলিয়াছেনঃ দেখ, অতি বড় দুইটি জিনিস আছে। খবরদার? তোমরা সেই দুইটি জিনিসের কথা কখনও ভুলিও না, তাহা বেহেশ্ত এবং দোযখ। এই দুইটির কথা বলিয়া হুযূর অনেক রোদন করিলেন। এমন কি, হুযূরের মুখমণ্ডলের দাড়ি মোবারক চোখের পানিতে ভিজিয়া গেল। তারপর আবার বলিলেন, আমি আল্লাহ্র কসম খাইয়া বলিতেছি, যে আল্লাহ্র মুঠার মধ্যে আমার জান—আখেরাতের বিষয়সমূহ যাহা আমি যেরূপ জানি (যাহা আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে), তাহা যদি তোমরা (তদ্রূপ) জানিতে, তবে তোমরা ঘরে বাস করিতে না; বরং কাঁদিতে কাঁদিতে মাঠে-ময়দানে বাহির হইয়া মাথায় মাটি ও ধুলা মাখিয়া বেড়াইতে।

[**হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তিনটি খাছলতের কথা আমি তোমাদের নিকট কসম খাইয়া বলিতেছি, (তোমরা অবিশ্বাস করিয়া অবহেলা করিও না। বিশ্বাস করিয়া আমল করিও; ফায়েদা পাইবে।) (১) দানে কখনও ধন কমে না। (২) একজনে অন্যায় করিলে তাহা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ছবর করিবে। এই ছবর করায় সম্মান বাড়িবে, কমিবে না। (৩) যাচ্ঞা বা ভিক্ষার দরজা যে খুলিবে, পরের কাছে মোহতাজী যে করিবে, তাহার দরিদ্রতা ও অভাব কখনও ঘুচিবে না।]

মুসলিম ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! এখানে মাত্র ১০১টি হাদীস আমরা উল্লেখ করিলাম। এই হাদীসগুলি সকলের মুখস্থ করিয়া নিজে আমল করিলে এবং অন্যান্য মুসলমান ভাই-বোনকে শুনাইলে অনেক ছওয়াব ও অনেক মর্তবা পাইবে। হাদীস শরীফে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, 'যে ব্যক্তি মাত্র চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করিয়া আমার উম্মতকে পৌঁছাইবে, তাহাকে হাকিকী আলেম সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া কিয়ামতের দিন উঠান হইবে।' অতএব, প্রত্যেক মুসলমানেরই এই হাদীসগুলি মুখস্থ করিয়া নিজে আমল করা উচিত এবং বাড়ীস্থ ও পার্শ্ববর্তী মুসলমান ভাই-বোনকে শুনান উচিত।

কিয়ামতের আলামত

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত হাদীস শরীফে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেঃ লোকেরা ওয়াক্ফ ইত্যাদি খোদায়ী মালকে নিজের মালের মত মনে করিয়া ভক্ষণ করিবে। যাকাত দেওয়াকে দণ্ড-স্বরূপ মনে করিবে। পরের আমানতের মালকে নিজের মালের মত মনে করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে। পুরুষ স্ত্রীর তাবেদারী করিবে। মাতার নাফরমানী করিবে, বাপকে পর মনে করিবে। অন্যান্য বন্ধুদেরে আপন মনে করিবে। দ্বীনের এলমকে দুনিয়ার অর্থ উপার্জনের জন্য শিক্ষা

করিবে। যাহারা বদ লোক, অর্থাৎ যাহারা লোভী, স্বার্থপর, দুশ্চরিত্র এবং অভদ্র, তাহারা রাজত্ব ও সরদারী করিবে। যে ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত নয়, অর্থাৎ সততা ও ত্যাগের দিক দিয়া যে কাজের যোগ্যতা যার মধ্যে নাই, তাহার উপর সেই কাজের ভার দেওয়া হইবে। লোকেরা যুলুমের ভয়ে যালেমের তাযীম করিবে। লোকেরা নেশা পানে মত্ত হইবে, নেশা পানকে লজ্জাজনক বলিয়াও মনে করিবে না। নাচ-গানের প্রথা অনেক বেশী প্রচলিত হইবে। ঢোল, তবলা ও সারিঙ্গি ইত্যাদি বাদ্যবাজনার প্রচলন খুব বেশী হইবে। পরবর্তী লোকেরা (ধর্মহীনতার কারণে এবং ধর্ম জ্ঞানের অভাবে) পূর্ববর্তী নেক লোকদের (বোকা, ভুলপন্থী ইত্যাদি বলিয়া) মন্দ বলিবে।

(এইসব পাপই দুনিয়া ধ্বংসের কারণ হইবে। এই জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্কবাণী দান করিয়া গিয়াছেন যে, এইসব পাপের স্রোত বহাইয়া তোমরা দুনিয়ার ধ্বংস টানিয়া আনিও না। এইসব পাপ (সংক্রামক ব্যাধি) যাতে ব্যাপক না হইতে পারে, তজ্জন্য সমষ্টিগতভাবে প্রাণপণে চেষ্টা করা দরকার।)

হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন এইসব আলামত পাওয়া যাইবে অর্থাৎ উপরোক্ত পাপ যখন ব্যাপক হইবে, তখন দুনিয়ার ধ্বংস নিকটবর্তী হইবে। তখন আগুনে-বাতাস প্রবাহিত হইবে। কিছু লোক পৃথিবী গর্ভে ধসিত হইবে। আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষিত হইবে। কিছু লোকের আকৃতি (প্রকৃতি) পরিবর্তিত হইয়া যাইবে; মানুষ শূকর, কুকুর হইয়া যাইবে। এইরূপ আরও অনেক বিপদ-আপদ বলা-মুছীবত এমনভাবে পর পর লাগাতর আসিতে থাকিবে, যেমন তস্‌বীহর সূতা ছিঁড়িয়া গেলে তস্‌বীহর দানাগুলি একের পর এক পর পর দ্রুত খসিয়া পড়িতে থাকে।

এইসব আলামতও হইবেঃ দ্বীনের এল্‌ম, ধর্মীয় জ্ঞানের মানুষের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। মিথ্যা বলাকে বুদ্ধিমত্তা বলিয়া মনে করা হইবে। আমানতের হেফাযতের খেয়াল লোকের দেলে থাকিবে না। হায়া-শরম লোকের মধ্যে থাকিবে না। সব দিকে কাফিরদের প্রভাব বেশী হইবে। মিথ্যা ও অন্যায় আইন-কানুন জারি হইবে।

যখন এইসব আলামত পুরা হইয়া সারিবে, তখন সবদেশে নাছারাদের রাজত্ব (ও প্রভাব) হইবে। এই সময় আবু সুফিয়ানের বংশধরের একজন লোক শাম দেশে বাদশাহ্ হইবে। সে সৈয়দ বংশের অনেককে হত্যা করিবে। সিরিয়া এবং মিসরে তাহার আইন কানুন প্রবর্তিত হইবে।

এই সময় রূমের মুসলমান বাদশাহর সঙ্গে, নাছারাদের একদলের সঙ্গে যুদ্ধ এবং একদলের সঙ্গে সন্ধি হইবে। শত্রু পক্ষ কুস্তুন্তনিয়া জয় করিবে এবং তথায় তাহাদের আমল-দখল ও আইন-শাসন জারি হইবে। ঐ বাদশাহ্ নিজ রাজ্য শাম (সিরিয়া) ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। পরে আবার মুসলিম শক্তি খৃষ্টান শক্তির মিত্রপক্ষের সঙ্গে মিলিয়া শত্রুপক্ষের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া মুসলিম শক্তি জয়লাভ করিবে। এই যুদ্ধে জয়লাভের কয়েক দিন পর খৃষ্টান পক্ষের একজন লোক একজন মুসলমানের সামনে বলিবে যে, আমাদের ক্রুশের কল্যাণে এই যুদ্ধে জয় হইয়াছে! এই সামান্য কথার বাড়াবাড়িতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। এমনকি এই যুদ্ধে মুসলমান বাদশাহ্ শহীদ হইয়া যাইবেন এবং শাম দেশেও নাছারাদের রাজত্ব কায়েম হইয়া যাইবে। এই নাছারাদের (মিত্র) দল ঐ (শত্রু) দলের সহিত মিশিয়া যাইবে। অবশিষ্ট মুসলিম যোদ্ধা-দল মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিবে। খয়বরের নিকট পর্যন্ত নাছারাদের আমলদারী হইবে।

এমন সময় মুসলমানগণ পরস্পর আলোচনা করিবেন যে, এখন ইমাম মেহ্‌দীকে তালাশ করা উচিত, যেন এই মুছীবত হইতে নাজাত পাওয়া যায়। (নতুবা এইসব বিপদ থেকে বাঁচার আর

কোন উপায় বুঝে আসে না।) এই সময় ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিসসালাম মদীনা শরীফে অবস্থান করিবেন। লোকেরা তাঁহাকে বাদশাহ্‌ বানাইয়া বায়আত করিয়া তাঁহাকে বাদশাহী করিবার জন্য মজবুর না করে, এই ভয়ে তিনি মদীনা শরীফ পরিত্যাগ করিয়া মক্কা শরীফ চলিয়া যাইবেন। এই সময় সমস্ত আউলিয়া আবদাল ইমাম মেহ্‌দীর অন্বেষণে থাকিবেন। ইত্যবসরে সুযোগ বুঝিয়া অনেক শয়তান-প্রকৃতির লোকেরা মেহ্‌দী হওয়ার মিথ্যা দাবীও করিবে। শেষ সারকথা এই যে, হাকীকী ইমাম মেহ্‌দী একদিন বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের তওয়াফ করিতে থাকিবেন। যখন হাজরে আছওয়াদ এবং মকামে ইব্‌রাহীমের মাঝখানে হইবেন, তখন কিছু সংখ্যক নেক লোক ইমাম মেহ্‌দীকে চিনিয়া ফেলিবেন এবং তাঁহাকে ধরিয়া জোর-জবরদস্তিতে সকলে বায়আত করিয়া তাঁহাকে বাদশাহ্‌ বানাইবেন। ঐ বায়আতের সময় আসমান হইতে একটি গায়েবী আওয়াজ আসিবে, 'ইনিই আল্লাহ্‌র খলীফা মেহ্‌দী।' এই আওয়াজ সেখানে যত লোক উপস্থিত থাকিবে, সকলেই শুনিতে পাইবে।

ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালামের জাহির হওয়ার পর হইতে কিয়ামতের বড় বড় আলামত জাহির হওয়া শুরু হইবে।

অতঃপর যখন ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালামের জহুরের কথা এবং তাঁহার বাদশাহাতের বায়আতের কথা মশহুর হইয়া যাইবে, তখন মদীনা শরীফে যা কিছু মুসলমানের অবশিষ্ট সৈন্য বাকী ছিল, তাহারা মক্কা শরীফ চলিয়া আসিবে। শাম দেশের, এরাকের এবং ইয়ামনের যত আবদাল আউলিয়া থাকিবেন, তাঁহারাও তাঁহার খেদমতে হাজির হইবেন। এতদ্ব্যতীত আরও আরব-সৈন্য যথেষ্ট পরিমাণে একত্রিত হইবে। এই সংবাদ যখন সমস্ত মুসলিম জাহানে মশহুর হইয়া যাইবে, তখন খোরাসানের দিক হইতে একজন নেতা এক বৃহৎ সৈন্য দল লইয়া ইমামের সাহায্যার্থে অভিযান করিবেন। সেই সৈন্য দলের অগ্রণী দলের কমাণ্ডারের নাম হইবে মনছুর। এই সৈন্যদল পথিমধ্যেবহু সংখ্যক ধর্মদ্রোহীদের নিপাত করিতে করিতে যাইবেন।

উপরে যে লোকটির কথা বলা হইয়াছে যে, আবু সুফিয়ানের বংশধরের একজন লোক শাম দেশের বাদশাহ্‌ হইবে এবং সাইয়্যেদদের বাছিয়া বাছিয়া কতল করিবে। যেহেতু ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালামও সাইয়্যেদ, কাজেই তাঁহার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিবার জন্য সে একদল সৈন্য পাঠাইবে। এই সৈন্যদল যখন মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফের মাঝখানে এক ময়দানে এক পাহাড়ের কাছে উপস্থিত হইবে, তখন ঐ সম্পূর্ণ লশকর ভূ-গর্ভে ধসিয়া হালাক হইয়া যাইবে। ঐ সারা লশকরের মধ্যে হইতে মাত্র দুইজন লোক বাঁচিয়া থাকিবে, একজন যাইয়া ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালামকে সংবাদ পৌঁছাইবে। আর একজন ঐ শাম দেশস্থ সুফিয়ানী বাদশাহ্‌কে সংবাদ পৌঁছাইবে। ইত্যবসরে নাছারার দল একতাবদ্ধ হইয়া সৈন্যদল সংগ্রহ করিবে এবং মুসলিম শক্তির সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে। ঐ সৈন্য দল এত বড় হইবে যে, ৮০ টি ঝাণ্ডা হইবে। প্রত্যেক ঝাণ্ডার নীচে বার হাজার সৈন্য হইবে। অতএব, সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা নয় লক্ষ ষাট হাজার হইবে।

ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালাম মক্কা শরীফ হইতে মদীনা শরীফ যাইবেন। তথায় হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফ যেয়ারত করিয়া শাম দেশের দিকে অভিযান করিবেন। তিনি যখন দামেশক পর্যন্ত পৌঁছিবেন, তখন খৃষ্টান শক্তির সৈন্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িবে। ঐ যুদ্ধে ইমাম সাহেবের সৈন্যদল তিন ভাগ হইয়া যাইবে। এক ভাগ ভাগিয়া যাইবে। এক ভাগ শহীদ হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট এক ভাগ জয়লাভ করিবে।

এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, চারিদিন যুদ্ধ হইবে। ইমাম সাহেবের লশকরের মুসলমানগণ প্রথম দিন এই কসম খাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবেন যে, "জয় না করিয়া ফিরিব না। (হয় জয় না হয় ক্ষয় অর্থাৎ হয় যুদ্ধে জয় করিয়া আসিব, নয় জীবন খোদার রাস্তায় দিয়া দিব।) অতঃপর ঐ দিনকার প্রায় সমস্ত মুসলমান শহীদ হইয়া যাইবে। অল্প কিছু লোক বাঁচিয়া থাকিবে। তাহাদের লইয়া ইমাম সাহেব লশকরের সঙ্গে মিলিবেন। দ্বিতীয় দিন পুনরায় লশকরের যে অংশ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে তাহারা ঐভাবে কসম খাইয়া যাইবে এবং প্রায় সবাই শহীদ হইয়া যাইবে। অল্পকিছু সৈন্য বাঁচিয়া থাকিবে। তৃতীয় দিন পুনরায় ঐরূপ হইবে। চতুর্থ দিন যে অল্প সংখ্যক মুসলমান সৈন্য থাকিবে, তাহারাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের হাতে ফতেহ দিবেন। এই যুদ্ধে হারিয়া যাওয়ার পর কাফিরদের আর রাজত্ব করিবার ক্ষমতা বা সাহস থাকিবে না। অতঃপর ইমাম সাহেব দেশের শান্তি, শাসন ও শৃঙ্খলার বন্দোবস্ত করিবেন। চতুর্দিকে সৈন্যদল প্রেরণ করিবেন। স্বয়ং নিজে এন্তেজামের কাজ শেষ করিয়া কুস্তুন্তনিয়া জয় করিবার জন্য অভিযান করিবেন। তিনি যখন রূমের দরিয়ার কিনারায় পৌঁছিবেন, তখন এছহাক বংশীয় সত্তর হাজার সৈন্যের একদল লশকর জাহাজে করিয়া ঐ শহর জয় করিবার জন্য পাঠাইবেন। ঐ সৈন্যদল যখন শহরপানার প্রাচীরের কাছে পৌঁছিবে, তখন "আল্লাহু আকবর—আল্লাহু আকবর" না'রায়ে তক্বীরের বরকতে শহরপানার সামনের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং মুসলিম সেনাবাহিনী শহরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া কাফির যোদ্ধা দলকে কতল করিবে এবং শহর জয় করিবে। ইমাম সাহেব তথায় পূর্ণ শান্তি ও শাসন স্থাপন করিবেন। ইমাম সাহেবের বায়আতে খেলাফত হইতে এই পর্যন্ত ৬ বৎসর কিংবা ৭ বৎসর সময় লাগিবে।

দাজ্জালের ফেৎনা

[দাজ্জালের ফেৎনা অতি বড় ভীষণ ফেৎনা। সে অতি সুশ্রীমান পুরুষ হইবে, এবং ধ্যান-মগ্নরূপ ধারণ করিবে। লোকেরা বৃষ্টি চাহিলে বৃষ্টি বর্ষণ দেখাইবে। শয়তানের দল তাহার তাবেদার থাকিবে। কাজেই মৃতকে পর্যন্ত জীবিত করিয়া দেখাইবে, কৃত্রিম বেহেশ্ত দোযখ তাহার হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার বেহেশ্ত হইবে দোযখ এবং তাহার দোযখ হইবে বেহেশ্ত। ধনাগার তাহার সঙ্গে হইবে। যাহারা তাহাকে মান্য করিবে, তাহাদের স্বাস্থ্য সম্পত্তি অনেক বাড়িয়া যাইবে, আর যাহারা তাহাকে অমান্য করিবে, তাহাদের স্বাস্থ্য সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ আরও অনেক অলৌকিক কাণ্ড সেই পাপিষ্ঠ দুরাচার দেখাইবে। তাহা দেখিয়া কাঁচা ঈমানের স্বল্প-বুদ্ধির লোকেরা দলে দলে তাহার দলভুক্ত হইয়া জাহান্নামী হইবে। ভীষণ ফেৎনা, ভীষণ পরীক্ষা ও ভীষণ ধোঁকা হইবে। ঈমান যাহার পাক্কা,-সে নিশ্চয়ই বাঁচিয়া থাকিবে। হাদীস শরীফে এই দো'আ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে— اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ "হে আল্লাহ্! আমা-দিগকে দাজ্জালের ফেৎনা হইতে বাঁচাও।"

হযরত (দঃ) আমাদিগকে বারবার সতর্ক করিয়া গিয়াছেন—খবরদার! তোমরা দাজ্জালের ধোঁকায় পড়িও না। কৃত্রিম অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া ভুলিও না, নিশ্চয় জানিও—আল্লাহ্ নিরাকার, নির্বিকার, পাক-পবিত্র। দাজ্জালের এক চোখ কানা, এক চোখ টেরা। কিন্তু লোকের ঈমানের পরীক্ষার জন্য তাকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইবে। —অনুবাদক]

ইমাম সাহেব ঐ স্থানের শান্তি স্থাপন ও শৃঙ্খলার এন্তেজামের কাজে লিপ্ত থাকিবেন; এমন সময় হঠাৎ এক মিথ্যা খবর প্রচারিত হইবে যে, তোমরা ত এখানে বসিয়া আছ, অথচ শাম দেশে 'দাজ্জাল' আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়া তোমাদের খেলাফতের বংশের ধ্বংস সাধন করিতেছে। ইমাম সাহেব এই খবর পাইয়া শাম অভিমুখে রওয়ানা হইবেন। খবরের তাহ্‌কীকের জন্য নয়জন কিংবা পাঁচজন লোকের একটি ক্ষুদ্র অফ্‌দ (ডেপুটেশন) পাঠাইবেন। ঐ অফ্‌দের মধ্য হইতে একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিবে যে, ঐ খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখনও দাজ্জাল বাহির হয় নাই। ইমাম সাহেব এই খবর পাইয়া কিছু নিশ্চিন্ত হইবেন এবং অভিযানের জন্য তাড়াহুড়া না করিয়া পথিমধ্যে সমস্ত শহরে শান্তি শৃঙ্খলা কেমন হইয়াছে না হইয়াছে তাহা তদন্ত ও তাহ্‌কীক করিতে করিতে গিয়া নির্বিঘ্নে শাম দেশে পৌঁছিবেন।

তথায় যাওয়ার অল্পদিন পরেই দাজ্জাল বাহির হইবে। দাজ্জালের অভ্যুত্থান ইয়াহুদ সম্প্রদায় হইতে হইবে; শাম এবং এরাকের মাঝখানে তাহার অভ্যুত্থান হইবে। প্রথমে সে নবুওওতের দাবী করিবে। তারপর ইস্পাহানে যাইবে, তথায় ৭০ হাজার ইয়াহুদী তার তাবেদার হইবে। তখন সে খোদায়ী দাবী করিবে। এইরূপে অনেক দেশ জয় করিতে করিতে ইয়ামনের সীমানায় পৌঁছিবে। প্রত্যেক দেশ হইতেই যথেষ্ট সংখ্যক ধর্মভ্রষ্ট লোক তাহার দলভুক্ত হইবে। এমন কি মক্কা শরীফের সীমায়ও সে পৌঁছিবে। কিন্তু মক্কা শরীফের হেফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহাদের কারণে শহরের ভিতর ঢুকিতে পারিবে না। তখন মক্কা শরীফ হইতে মদীনা শরীফের দিকে যাইবে। তথায়ও খোদার রহমতে ও খোদার কুদরতে ফেরেশ্‌তা প্রহরী নিযুক্ত থাকিবে। কাজেই মদীনা শরীফের শহরের ভিতরও ঐ খবীস ঢুকিতে পারিবে না। কিন্তু মদীনা শরীফে তিনবার ভূমিকম্প হইবে। সেই কারণে যতলোক কাঁচা ঈমানের থাকিবে, তাহারা মদীনা শরীফের শহর হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে। তথায় গিয়া দাজ্জালের ধোঁকার জালে পতিত হইবে। ঐ সময় মদীনা শরীফের একজন বুযুর্গ দাজ্জালের সঙ্গে খুব তর্কবিতর্ক, বাহাছ-মোবাহাছা করিবেন। দাজ্জাল যুক্তিসংগত উত্তর না দিতে পারিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কতল করিয়া ফেলিবে, পুনর্বার তাঁহাকে জীবিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে— কেমন, এখন তো আমাকে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে? তখন বুযুর্গ বলিবেন, কখনও না; এখন ত আমার আরও এক্বীন বেশী হইয়াছে যে, তুই দাজ্জাল। দাজ্জাল তখন ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় কতল করার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহার সব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে; তাঁহাকে আর মারিতে পারিবে না। কষ্ট দিবে অবশ্য, প্রাণে বধ আর করিতে পারিবে না।

দাজ্জাল তথা হইতে শাম দেশ অভিমুখে অভিযান করিবে। যখন দামেশকের নিকটবর্তী পৌঁছিবে, ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালাম তখন পূর্বেই তথায় পৌঁছিয়া যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিবেন। একদিন আছরের সময় মোয়ায্‌যিন আযান দিবেন। সমস্ত মুছল্লি নামাযের তৈয়ারি করিবে, এমন সময় হঠাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম দুইজন ফেরেশ্‌তার কাঁধের উপর ভর দিয়া আসমান হইতে অবতীর্ণ হইবেন। দামেশকের মসজিদের পূর্ব দিকের মিনারার উপর আসিয়া দাঁড়াইবেন। তথা হইতে সিঁড়ি লাগাইয়া নীচে নামিবেন। ইমাম সাহেব যুদ্ধের সমস্ত ভার, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করিতে চাহিবেন। কিন্তু তিনি বলিবেন, ভার তো সব আপনার উপরই থাকিবে; আমি শুধু দাজ্জালকে বধ করিবার জন্য আসিয়াছি, সেই ভার আমার উপর থাকিবে। পরদিন সকাল বেলায় ইমাম সাহেব লশকর সাজাইবেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম একটি ঘোড়ায়

সওয়ার হইয়া একটি নেজা (বল্লম) হাতে লইয়া দাজ্জালের দিকে ধাবিত হইবেন। অন্যান্য মুসলমান সৈন্যগণ দাজ্জালের সৈন্যের উপর আক্রমণ করিবে। ভীষণ যুদ্ধ হইবে। ঐ সময় হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামের নিঃশ্বাসের মধ্যে এমন তাছির হইবে যে, যতদূর দৃষ্টি যাইবে ততদূর শ্বাস যাইবে এবং যে কোন কাফিরের গায়ে ঐ শ্বাসের একটু বাতাস লাগিবে, সে তৎক্ষণাৎ হালাক হইয়া যাইবে। দাজ্জাল হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামকে দেখিয়া ভাগিবে। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম পশ্চাদ্ধাবণ করিয়া "বাবে লোদ" নামক স্থানে গিয়া তাহাকে বধ করিবেন। ওদিকে মুসলিম সৈন্যবাহিনী দাজ্জালের সৈন্যগণকে বধ করিবে।

অতপর হজরত ঈসা আলাইহিস্সালাম যত জায়গায় দাজ্জাল অশান্তি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, সেই সব স্থানে গিয়া গিয়া জনসাধারণকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিবেন।

সারা দুনিয়ায় মুসলমান

এই সময় দুনিয়াতে কোন কাফির থাকিবে না, সব মুসলমান হইয়া যাইবে। কিছুদিন পর হযরত ইমাম মেহদী আলাইহিস্সালামের এন্তেকাল হইয়া যাইবে। সমস্ত মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামের উপর আসিবে।

ইয়াজুজ মাজুজের ফেৎনা

দাজ্জালের ফেৎনার পর আসিবে ইয়াজুজ মাজুজের ফেৎনা। ইয়াজুজ মাজুজ অতি ভীষণ অত্যাচারী মানুষ। তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী হইবে, উভয়াঞ্চলের শেষ সীমার পর সপ্ত দেশের বাহিরে সেখানকার সমুদ্রগুলি অত্যধিক ঠাণ্ডার কারণে এত জমাট যে, জাহাজ চলাচল করিতে পারে না, তথায় তাহাদের বাসস্থান অর্থাৎ ছদ্দে সেকান্দরির (সেকান্দর বাদশাহ্র দেওয়ালের) পরপার হইতে তাহারা আসিবে। সমস্ত পৃথিবীতে তাহারা ভীষণ উৎপাত শুরু করিবে। (তাহাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার কাহারও ক্ষমতা থাকিবে না। হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম তখন আল্লাহ্র হুকুমে মুসলমানদেরকে কোহে তূরে লইয়া যাইবেন। অবশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতে তাহাদের ধ্বংস করিয়া দিবেন। অতঃপর ঈসা আলাইহিস্সালাম পাহাড় হইতে বাহিরে আসিবেন। তিনি ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব পরিচালনা করার পর এন্তেকাল ফরমাইবেন। তাঁহাকে আমাদের হযরতের রওজা শরীফের মধ্যে নবী (দঃ)-এর কবরের পার্শ্বেই দাফন করা হইবে।

হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামের ওফাতের পর, জাহ্জাহ্ নামক কাহ্তান বংশীয় ইয়ামনবাসী একজন লোক তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। অতি ন্যায়পরায়ণতার সহিত তিনি রাজত্ব করিবেন। তাঁহার পর তাঁহার বংশীয় আরও কয়েকজন লোক বাদশাহ্ হইবেন।

আকাশের ধুঁয়া

তারপর ক্রমান্বয়ে দ্বীনদারী এবং ধর্মের কথা কম হইয়া যাইবে এবং চতুর্দিকে অর্ধম এবং বদ-দ্বীন ও বে-দ্বীনি শুরু হইয়া যাইবে। এই সময় আকাশে এক প্রকার ধুঁয়ার মত দেখা দিবে। এই ধুঁয়া পৃথিবীতে আসিবে। মুমিন মুসলমানগণের তাহাতে এক প্রকার সর্দির মত ভাব হইবে। কাফিরেরা বেহুঁশ হইয়া যাইবে। ৪০ দিন পর ধুঁয়া পরিষ্কার হইবে।

পশ্চিম দিকে সূর্য উদয়

এই সময়ের নিকটবর্তী একদিন হঠাৎ বকরা ঈদের চাঁদের ১০ তারিখের পর একটি রাত এত লম্বা হইবে যে, লোকের দেল অস্থির হইয়া উঠিবে, ছেলেদের ঘুমাইতে ঘুমাইতে ত্যক্ত ধরিয়া যাইবে। গবাদিপশু বাহিরে যাইয়া ভক্ষণ করিবার জন্য চিল্লাইতে থাকিবে, তবুও রাত্রি প্রভাত হইবে না। সমস্ত লোক পেরেশন হইয়া যাইবে। যখন তিন রাতের পরিমাণ সময় অতিবাহিত হইবে, তখন সূর্য সামান্য কিছু গ্রহণের আলোর মত আলো লইয়া পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে, যখন পশ্চিম দিক দিয়া সূর্য উদয় হইবে, তখন আর কাহারও ঈমান বা তওবা কবূল হইবে না। সূর্য সাধারণতঃ দুপুরের পূর্ববর্তী সময়ে যেখানে থাকে সেই পর্যন্ত উঠিয়া আল্লাহ্‌র হুকুমে আবার পশ্চিম দিকেই গিয়া অস্ত যাইবে। ইহার পর আবার রীতিমত সূর্য পূর্বের নিয়ম মত পূর্বদিকে উদয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যাইবে এবং আলো-উত্তাপও দস্তুর মত হইবে।

দাব্বাতুল আরদ (অদ্ভূত জন্তু)

ইহার কিছুদিন পর ভূমিকম্পে মক্কা শরীফের ছাফা পাহাড় ফাটিয়া যাইবে। তথা হইতে আশ্চর্য ছুরতের এক অদ্ভূত জন্তু বাহির হইবে। সে মানুষের সঙ্গে কথা কহিবে। অতি দ্রুতবেগে চলিয়া সারা পৃথিবী ঘুরিয়া আসিবে। হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামের 'আছা' (লাঠি) দ্বারা মু'মিনগণের কপালে একটি নূরানী রেখা টানিয়া দিবে। তাহাতে মুমিনগণের চেহারা উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। বেঈমানগণের নাকের অথবা গর্দানের উপর হযরত সোলায়মান আলাইহিস্‌সালামের আংটির দ্বারা সীলমোহর করিয়া দিবে। তাহাতে তাহাদের সম্পূর্ণ চেহারা মলিন হইয়া যাইবে। এসমস্ত কাজ করিয়া সে গায়েব হইয়া যাইবে। "দাব্বাতুল আরদ" একটি অদ্ভূত জন্তু হইবে। উহা ৬০ হাত লম্বা হইবে। চার পা হইবে এবং সর্বশরীরে হলুদ বর্ণের পশম হইবে! দুইটি বাহু হইবে। এত দ্রুতবেগে চলিবে যে, পাখিও তার মত চলিতে পারিবে না। মানুষের মত মুখ হইবে। মাথা হইবে গরুর মাথার ন্যায় এবং শিং হইবে গরুর শিং এর মত। শূকরের চোখের মত চোখ হইবে, গর্দান ও উরু উটের ন্যায় হইবে, বন্য হাতীর কানের মত কান, বাঘের রং-এর মত রং এবং বাঘের ছিনার মত ছিনা হইবে। লেজ হইবে দুম্বার লেজের ন্যায়।

সারা দুনিয়ায় কাফের, বায়তুল্লাহ্‌ শহীদ এবং কিয়ামত

দাব্বাতুল আরদের গায়েব হওয়ার পর দক্ষিণ দিক হইতে নেহায়েত আরামদায়ক একটি বাতাস আসিবে। ঐ বাতাসে সমস্ত ঈমানদারগণের বগলে কিছু অসুখ হইবে। তাহাতে সমস্ত মুসলমান মরিয়া যাইবে। সারা দুনিয়ার উপর হাবশী কাফিরদের রাজত্ব এবং তাহাদের একনায়কত্ব চলিবে। তাহারা বায়তুল্লাহ্‌ শরীফকে শহীদ করিয়া ফেলিবে হজ্জ বন্ধ হইয়া যাইবে। কোরআন শরীফ লোকের দেল হইতে এবং কাগজ হইতে উঠিয়া যাইবে। খোদার ভয় এবং লোকের লজ্জা

একেবারে উঠিয়া যাইবে। একজন লোকও 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করার বা আল্লাহ্ নাম লওয়ার থাকিবে না। এই সময় শামদেশে সব জিনিস খুব সস্তা ও সুলভ হইবে। উটে চড়িয়া ও পায়ে হাঁটিয়া লোকেরা সেই দিকে যাইতে থাকিবে। যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদেরও একটি আগুন আসিয়া ঐদিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে। কারণ, ঐ শাম দেশেই ক্বিয়ামতের কেন্দ্র হইবে। এই কাজ করিয়া ঐ আগুন গায়েব হইয়া যাইবে। এই সময় দুনিয়ার খুব উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইবে। তিন চারি বৎসর এই অবস্থায় অতিবাহিত হইবে। একদিন ১০ই মোহররম শুক্রবার সকালে সমস্ত লোক নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকিবে। হঠাৎ এমন সময় সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে। প্রথম প্রথম হাল্কা আওয়াজ হইবে। পরে ঐ আওয়াজ এত কঠোর ও ভীষণ হইবে যে, তাহার হয়বতে সমস্ত লোক মরিয়া যাইবে, জমিন ও আসমান ফাটিয়া যাইবে, দুনিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাইবে। সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হওয়ার সময় হইতে সিঙ্গায় ফুঁকের সময় পর্যন্ত, এক শত বিশ বৎসরের জমানা হইবে। এইখান হইতে কিয়ামতের দিন শুরু।

খাছ কিয়ামতের কথা

আল্লাহ্র আদেশে যখন ইস্রাফীল আলাইহিস্সালাম সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, তখন সমস্ত দুনিয়া ফানা (ধ্বংস) হইয়া যাইবে। চল্লিশ বৎসর এই শূন্য ও খালি অবস্থায় থাকিবে! তারপর আবার আল্লাহ্র আদেশে ইস্রাফীল আলাইহিস্সালাম দ্বিতীয় বার সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। ঐ ফুঁকে জমিন আসমান পুনরায় সৃষ্টি হইবে এবং আদিকাল হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লোক কবর হইতে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে। সকলেই হাশরের ময়দানে সমবেত হইবে। সূর্য অনেক নিকটবর্তী আসিবে। তাহার উত্তাপে লোকের মস্তিষ্ক টগ্বগ করিয়া উতলাইতে থাকিবে। লোকের পাপের পরিমাণ পছিনা (ঘাম) হইবে। কাহারও হাঁটু সমান, কাহারও বুক সামান, কাহারও গলা সমান ইত্যাদি। ঐ ময়দানে লোকে লোকারণ্য থাকিবে। কোটি কোটি লোক সব ক্ষুধায়, পিপাসায় দাঁড়াইয়া অতি অস্থির অবস্থায় ছটফট করিতে থাকিবে।

যাহারা নেক লোক হইবেন, তাঁহাদের জন্য ঐ জমিনের মাটি ময়দা হইয়া যাইবে, তদ্দ্বারা তাঁহারা ক্ষুধা নিবারণ করিবেন। পিপাসা নিবারণের জন্য তাঁহারা 'হাওযে কাওছরের' কাছে যাইবেন। (যাহাদের ভাগ্যে আছে তাঁহারা সেই অতি মধুর শরবৎ পান করিবেন।)

বড় শাফা'আত,
হিসাব শুরুর সুপারিশ

যখন সকলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘাবড়াইয়া অস্থির হইয়া যাইবে, তখন সকলে পরামর্শ করিয়া সুপারিশের জন্য প্রথমে হযতর আদম আলাইহিস্সালামের কাছে যাইবে। তিনি সুপারিশ করিতে অস্বীকার করিলে তারপর সকলে হযরত নূহ আলাইহিস্সালামের কাছে যাইবে। তিনি অস্বীকার করিলে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালামের কাছে যাইবে। তিনি অস্বীকার করিলে হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের কাছে যাইবে। তিনি অস্বীকার করিলে (লোকেরা শুধু এতটুকু কথার সুপারিশ চাইবে যে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অসহ্য হইয়া গিয়াছে, অন্ততঃ আমাদের হিসাবই শুরু হইয়া যাউক। কিন্তু খোদার গযব ও জালাল ঐদিন এত বেশী হইবে যে, সমস্ত উলুলআয্ম পয়গম্বর পর্যন্ত

ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিবেন, আমাদের কথা বলার সাহস হয় না।) অবশেষে আমাদের হযরত খাতামুন্নাবিয়ীন সাইয়্যেদুল মুরসালীনের খেদমতে সকলে হাযির হইয়া ঐ সুপারিশের দরখাস্ত করিবে। আমাদের হুযূর আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে আবেদন মঞ্জুর করিবেন। ঐ সময় হুযূর "মকামে মাহমুদে" (সর্বোচ্চ মকামে) পৌঁছিয়া আল্লাহ্‌র সামনে সজ্‌দায় পড়িয়া আল্লাহ্‌র অসংখ্য প্রশংসা করিবেন এবং শাফা'অত (সুপারিশ) করিবেন। আল্লাহ্ সুপারিশ মঞ্জুর করিবেন। বলিবেন, হে আমার পেয়ারা! আপনি সজ্‌দা হইতে মাথা উঠান, আপনার সুপারিশ আমি কবূল করিলাম, আপনার দরখাস্ত আমি মঞ্জুর করিলাম। এখনই আমি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি করিয়া সারা পৃথিবীর হিসাব কিতাব করিয়া দিতেছি। ইহাকেই বলে "শাফা'আতে কোব্‌রা" অর্থাৎ সর্বজগতের জন্য সবচেয়ে বড় শাফা'আত।

কিয়ামতের হিসাব নিকাশ

প্রথমে আসমান হইতে অসংখ্য ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হইবে এবং চতুর্দিক দিয়া সমস্ত লোকদেরকে ঘেরাও করিয়া রাখিবে। তারপর আল্লাহ্‌র আরশ অবতীর্ণ হইবে। তথায় আল্লাহ্‌র খাছ তজল্লী হইবে। হিসাব-নিকাশ শুরু হইবে। আমলনামা উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ঈমানদারের আমলনামা ডান হাতে আসিবে। বে-ঈমানদের বাম হাতে আমলনামা আপনা-আপনিই আসিবে। আমলের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মাপযন্ত্র (মীযান) খাড়া করা হইবে। ঐ মাপযন্ত্রের দ্বারা তিল তিল করিয়া সকলের নেকী-বদী (পাপ-পুণ্য) মালুম হইয়া যাইবে। অতঃপর পুলছেরাতের উপর দিয়া যাইবার হুকুম হইবে। যাহাদের নেকীর ভাগ বেশী হইবে, তাহারা পুলছেরাত পার হইয়া বেহেশ্‌তে গিয়া পৌঁছিবে। (যার যার নেকী অনুসারে) কেহ বিদ্যুৎ গতিতে যাইবে, কেহ ঘোড়ার মত দ্রুত যাইবে, কেহ হামাগুড়ি দিয়া দীর্ঘকাল পর যাইবে।

(এক রেওয়ায়তে আছে যে, পুলছেরাত তিন বৎসরের পথ হইবে। ওয়াল্লাহু আ'লামু।) যাহাদের গোনাহ্‌র ভাগ বেশী হইবে, তাহাদের গোনাহ্ যদি আল্লাহ্ দয়া করিয়া মাফ না করিয়া দেন, তবে তাহারা দোযখের মধ্যে পড়িয়া যাইবে। যাহাদের নেকী-বদী সমান সমান হইবে, তাহারা বেহেশ্‌ত-দোযখের মাঝখানে আ'রাফ নামক একটি স্থান আছে, তথায় থাকিয়া যাইবে; বেহেশ্‌তে পৌঁছিতে পারিবে না।

অন্যান্য শাফা'আত

তারপর আমাদের হযরত পয়গম্বর ছাহেব এবং অন্যান্য পয়গম্বরগণ এবং আলেম, ওলী, শহীদ, হাফেয এবং অন্যান্য ছালেহীন নেক লোকগণ গোনাহ্‌গারদের বখ্‌শাইবার জন্য শাফা'আত করিবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সেই সব শাফা'আত মঞ্জুর করিবেন। এমন কি, যাহার দেলের মধ্যে বিন্দু পরিমাণও ঈমান থাকিবে, তাহাকেও দোযখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশ্‌তে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। যাহারা আ'রাফে ছিল অবশেষে তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। দোযখে শুধু তাহারাই থাকিবে, যাহারা কাফির এবং মুশরিক। কাফির এবং মুশরিকগণের কখনও দোযখ হইতে মুক্তি নছীব হইবে না। যখন সমস্ত বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে এবং দোযখী দোযখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়া যাইবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা "মওতকে একটি ভেড়ার ছুরতে বেহেশ্‌ত-দোযখের মাঝখানে আনাইয়া সমস্ত বেহেশ্‌তী এবং দোযখীদের দেখাইয়া যবাহ্ করাইয়া

দিবেন। তৎপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করাইয়া দিবেন যে, এখন আর কাহারও মওত নাই। বেহেশ্তবাসীদেরও মৃত্যু নাই, তাহারাও চিরস্থায়ী বেহেশ্তী এবং দোযখবাসীদেরও মৃত্যু নাই, তাহারাও চিরস্থায়ী দোযখী। সেই সময় বেহেশ্তীদের খুশীর সীমা থাকিবে না এবং দোযখীদের দুঃখ ও কষ্টের সীমা থাকিবে না।

বেহেশ্তের নেয়ামতের বর্ণনা

১। **হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহা কেহ চোখেও দেখে নাই; কানেও শুনে নাই এবং কাহারও কল্পনায়ও তাহা আসিতে পারে না।

২। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্তের অট্টালিকায় একখানা ইট হইবে রূপার, একখানা ইট হইবে সোনার, এবং ইটে ইটে মিলাইবার গারা হইবে খালেছ মেশকের (কস্তুরীর) এবং বেহেশ্তের বাড়ীর উঠানের ও বাগবাগিচার কঙ্করগুলি হইবে খাঁটি মোতি ও ইয়াকুতের এবং তথাকার মাটি হইবে জাফরান। যে একবার বেহেশ্তে পৌঁছিবে, সে চির-সুখে ও চির-শান্তিতে কাল যাপন করিবে, আদৌ কোনরূপ দুঃখ কষ্ট তথায় হইবে না। তথায় চিরকাল ঐরূপ সুখে এবং শান্তিতে থাকিবে। তথায় মৃত্যু নাই, তথায় কাপড় ময়লা হইবে না, তথায় চির যৌবন হইবে। (কখনো বার্ধক্য বা দৌর্বল্য বা রোগ-শোক বা বিন্দুমাত্র কষ্ট-ক্লেশ বা ক্লান্তি, দুর্গন্ধ বেহেশ্তবাসীদের স্পর্শও করিতে পারিবে না। পেশাব-পায়খানার কষ্টও হইবে না, হায়েয-নেফাসের কষ্টও হইবে না।)

৩। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্তের মধ্যে দুইটি বাগ এমন হবে যে, তাহার সমস্ত সামান থাল-বাটী, ঘড়া-ঘটী, পালঙ্ক-কুরসী ইত্যাদি সব চান্দি-রূপার হইবে। আর দুইটি বাগ এমন হইবে যে, তথাকার সমস্ত সামান থাল-বাটী, ঘড়া, পালঙ্ক-কুরসী ইত্যাদি সব সোনার হইবে।

৪। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্তের মধ্যে পর পর উপর নীচে এক শতটি স্তর হইবে। প্রত্যেক নীচের স্তর হইতে উপরের স্তরের দূরত্ব এতখানি, যতখানি জমীন হইতে প্রথম আসমানের দূরত্ব, অর্থাৎ পাঁচ শত বৎসরের পথ। বেহেশ্তের সমস্ত স্তরের মধ্যে বড় স্তরের নাম ফিরদাউস। জান্নাতুল ফিরদাউস হইতেই বেহশ্তের চারিটি নহর জারি হইয়াছে। একটি নহর দুধের, একটি নহর মধুর, একটি নহর শরাবান-তহুরার (পবিত্র মদিরার), একটি নহর নির্মল পানির। ফিরদাউসের উপরে আর বেহেশ্ত নাই। ফিরদাউসের উপর খোদার আরশ। হযরত (দঃ) আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমরা (আশা ছোট করিও না, পস্ত-হিম্মত হইও না,) আল্লাহ্র কাছে যখন চাহিবে, জান্নাতুল ফিরদাউস চাহিবে। হযরত (দঃ) ইহাও ফরমাইয়াছেন, জান্নাতুল ফিরদাউসের পরিসর এত প্রশস্ত যে, তাহার এক এক দরজা এত বড় হইবে যে, সারা দুনিয়ার লোকেরও তথায় অতি সহজে সঙ্কুলান হইতে পারিবে; বরং সারা দুনিয়ার লোকেও ভরিবে না।

৫। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্তের বাগিচার মধ্যে যত গাছ হইবে তাহার কাণ্ড ও গুড়ি হইবে সোনার।

৬। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সর্বপ্রথমে যে দল বেহেশ্তে যাইবে, তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তারপর যে দল যাইবে তাহাদের চেহারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত চমকিলা হইবে। বেহেশ্তে না পেশাবের হাজত হইবে, না পায়খানার হাজত হইবে,

না থুথু হইবে, না কাশ থুথু হইবে, না নাকের শ্লেষ্মা হইবে। বেহেশ্‌তের কাঙ্গি হইবে সোনার এবং গায়ের ঘামের সুগন্ধি হইবে মেশ্‌ক কস্তুরীর। মজলিসের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর! (যখন পেশাব পায়খানা হইবে না,) তবে খানা-পানি কোথায় যাইবে? হযরত (দঃ) উত্তর করিলেন, একটি ঢেকুর আসিবে, যাহার খোশবু হইবে মেশ্‌ক কস্তুরীর মত, তাহাতেই সমস্ত খানাপানি হজম হইয়া যাইবে। (বেহেশ্‌তবাসীদের পোশাক হইবে রেশমের এবং তাহাদের খেদমতগার হইবে হূর ও গেলমান। হূর অরূপ রূপবতী সমবয়স্কা প্রাণপ্রিয়া যুবতী। গেলমান মাণিকের মত সুন্দর সুন্দর বালক। তাহারা চিরকাল বালকই থাকিবে এবং খেদমত করিবে। বেহেশ্‌তবাসীদের গ্লাস হইবে রূপার, কিন্তু সে রূপা কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ। সোনার খাটে আরাম করিবে; যখন যে মেওয়া খাইতে মনে চাহিবে, আপনাআপনি মেওয়ার গুচ্ছসহ ডাল বাঁকিয়া যাইবে। তথায় শীত বা গরমের কষ্ট আদৌ হইবে না। সূর্যের আলোর চেয়ে বেশী আলো হইবে, কিন্তু গরম হইবে না।)

৭। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তের মধ্যে সকলের নিম্ন শ্রেণীর যে ব্যক্তি হইবে তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাকে যদি দুনিয়ার কোন রাজা বাদশাহ্‌র রাজত্বের সমান দেই, তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট কি না? সে বলিবে, ইয়া রাব্বুল আলামীন। আমি সন্তুষ্ট আছি। (আমি ত এরও উপযুক্ত নই।) তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বলিবেন, যাও, তোমাকে তাহার পাঁচগুণ দিলাম। সে বলিল, ইয়া রাব্বুল আলামীন! আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, যাও, উহাও দিলাম এবং আরও উহার দশগুণ দিলাম এবং তা-ছাড়া আরও যে কোন সময় যে কোন জিনিস তোমার মনে চাহিবে বা তোমার চোখে যাহাতে শান্তি হইবে, তুমি তাহা নিতে পারিবে।

৮। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌তবাসীদের কাছে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ কি না? তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে কি না? প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের সাধ মিটিয়াছে কি না? সকলে সমস্বরে বলিবে, ইয়া রাব্বাল আলামীন! হে আমাদের প্রভু! আমরা কেমনে সন্তুষ্ট না হইয়া পারি? আপনি ত আমাদের এত দান করিয়াছেন, যাহা আজ পর্যন্ত কাহাকেও দান করেন নাই। তখন আল্লাহ্ পাক বলিবেন, আমি তোমাদিগকে এমন জিনিস দান করিব, যাহা এই সব হইতে উত্তম। সকলে সমস্বরে আরয করিবে, হে আমাদের প্রভু! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কি হইতে পারে? (তাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে।) তখন আল্লাহ্ পাক বলিবেন, এর চেয়ে উত্তম জিনিস এই যে, আমি তোমাদের সুসংবাদ শুনাইয়া দিতেছি যে, আমি চিরতরে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইলাম, আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট বা নারায হইব না।

৯। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন সমস্ত বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে যাইয়া সারিবে, তখন আল্লাহ্ পাক তাহাদের বলিবেন, তোমরা কি আরও কিছু বেশী চাও? সকলে বলিবে, (ইয়া আল্লাহ্, রাব্বাল আলামীন!) আপনি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন, আমাদেরকে (চিরশান্তি নিকেতন) বেহেশ্‌ত দান করিয়াছেন, আমাদের দোযখ লইতে নাজাত দিয়াছেন, আর আমরা কি চাহিব? সেই সময় আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহু পর্দা উঠাইয়া দিবেন এবং স্বীয় দীদারে মোবারক বেহেশ্‌তবাসীদের নছীব করিবেন। বেহেশ্‌তবাসীরা অনুভব করিবে যে, এর চেয়ে (দীদার মোবারকের চেয়ে) বড় নেয়ামত, শান্তির জিনিস ও উপাদেয় সামগ্রী আর নাই।

দোযখের আযাবের বর্ণনা

১। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দোযখের আগুনকে হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হইাছিল, তাহাতে তাহার রং লাল হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার রং সাদা হইয়া গিয়াছিল। তারপর আবার এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার রং ঘোর কাল হইয়া সম্পূর্ণ অন্ধকার অবস্থায় আছে।

২। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দুনিয়ার আগুন দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ, এবং দোযখের আগুন দুনিয়ার আগুনের সত্তর গুণ বেশী তেজ।

৩। **হাদীসঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, দোযখের গর্ত এত গভীর যে, যদি একখানা ভারী পাথর দোযখের মুখ থেকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহার তলায় পৌঁছিতে সত্তর বৎসর লাগিবে।

৪। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দোযখ এত বড় বিশাল ও প্রকাণ্ড হইবে যে, কিয়ামতের দিন যখন দোযখকে সর্বসমক্ষে টানিয়া আনা হইবে, তখন তাহাতে সত্তর হাজার রশি লাগান হইবে, প্রত্যেক রশিকে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা ধরিয়া টানিবে।

৫। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দোযখের মধ্যে সবচেয়ে কম আযাব যাহার হইবে, তাহার পায়ে শুধু দোযখের আগুনের দুইখানা জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাতেই তাহার মগজ ডেগের ফুটন্ত পানির মত টগ্‌বগ করিতে থাকিবে এবং সে মনে করিবে যে, আমার চেয়ে বেশী কষ্ট আর কাহারও নাই।

৬। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দোযখের মধ্যে এত বড় বড় সাপ আছে যে, দেখিতে উটের মত। তাহার বিষ এত তেজ যে, একবার যদি দংশন করে, তবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাহার বিষের লহর উঠিতে থাকিবে। দোযখের মধ্যে বিচ্ছু এত বড় বড় যে, পালান কষা খচ্চরের মত। তাহার বিষ এত তীব্র যে, একবার যদি হুল ফুটায়, তবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাহার বিষের ক্রিয়া থাকিবে।

৭। **হাদীসঃ** একবার হযরত (দঃ) নামায শেষ করিয়া মিম্বরের উপর চড়িয়া বলিতে লাগিলেন, আজ এই নামাযের মধ্যে বেহেশ্‌ত এবং দোযখের হু-বহু নক্‌শা আমি দেখিয়াছি। বেহেশ্‌তের মত সুন্দর আরামের জিনিস আমি দেখি নাই এবং দোযখের মত ভীষণ কষ্টদায়ক জিনিসও আমি দেখি নাই।

(কোরআন শরীফে আছে—দোযখের ভীষণ আযাব আরও ভীষণতর হওয়ার কারণ এই যে, দুনিয়ার কষ্টে মানুষের প্রাণ-পাখী উড়িয়া বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু দোযখের মধ্যে কাহারও মৃত্যু নাই। যতবার খাল-চামড়া আগুনে পুড়িয়া পচিয়া গলিয়া যাইবে, ততবারই পুনরায় নূতন খাল-চামড়া হইবে, যাহাতে আবারও যন্ত্রণা স্থায়ী ও ভীষণ হইতে ভীষণ হইতে পারে। কোরআন শরীফে অন্য এক আয়াতে আছে—দোযখবাসীদের দোযখের আগুনের কাপড় পরান হইবে। মাথার উপরে এমন টগ্‌বগ্ করা ফুটন্ত গরম পানি ঢালা হইবে যে, তাহাতে তাহাদের সর্বশরীরে

খাল-চামড়া এবং পেটের নাড়ী-ভূঁড়ী গলিয়া খসিয়া পড়িবে এবং তাহাদের (তপ্ত) লৌহের মুগুর দ্বারা পিটান হইবে। দোযখবাসীরা যখন পিপাসায় ছটফট করিয়া পানি খাইতে চাহিবে তখন তাহাদের 'হামীম ও গাচ্ছাক্ব' দেওয়া হইবে, তাহাতে তাহাদের মুখের গোশ্‌ত খসিয়া পড়িবে এবং এক কাতরা পেটের মধ্যে পড়িলে পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী পর্যন্ত খসিয়া পড়িবে। টগ্‌বগ্‌ করে এমন উত্তপ্ত পানিকে "হামীম" বলে এবং দোযখবাসীদের পচাগলা শরীর হইতে যেসব উত্তপ্ত পুঁজ বাহির হইয়া জমা হইবে, তাহাকে "গাচ্ছাক্ব" বলে।)

যে কাজ না করিলে ঈমান অপূর্ণ থাকিয়া যায়
ঈমানের শাখা-প্রশাখার বয়ান

(ঈমানের শাখা-প্রশাখা (ফুল পাতা) যদি ঠিক না থাকে, তবে ঈমান নাকেছ থাকিয়া যায়।) হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তরের চেয়ে বেশী। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান শাখা কলেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' এবং সবচেয়ে ছোট শাখা রাস্তা হইতে ইট-পাটকেল কাঁটা ইত্যাদি কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া ফেলা। আর হায়া-শরম অর্থাৎ লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি প্রধান শাখা।

এই হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানের সমস্ত শাখাগুলি যার মধ্যে থাকিবে, সে পুরা মুসলমান হইবে। আর যা'র মধ্যে কোন শাখা থাকিবে, কোন শাখা থাকিবে না, সে (পুরা মুসলমান হইবে না) অপূর্ণ মুসলমান হইবে। সকলেই একথা জানে যে, পুরা মুসলমান হওয়া জরুরী। (অপূর্ণ মুসলমান হইলে মক্‌ছুদ হাছেল হইবে না।) কাজেই সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা দরকার, যাহাতে ঈমানের একটি শাখাও নাকেছ না থাকে, এই জন্য আমরা ঈমানের সেই সমস্ত শাখাগুলি সংক্ষেপে লিখিয়া দিতেছি। ঈমানের মোট শাখা ৭৭টি, তন্মধ্যে ৩০টি কাজ দেলের দ্বারা আদায় করিতে হয়। (৭টি কাজ যবানের দ্বারা সমাধা করিতে হয় এবং ৪০টি কাজ হাত-পা ইত্যাদি সর্বশরীরের দ্বারা করিতে হয়।)

(১) আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর ঈমান আনা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ স্বয়ং সর্বশক্তিমান, সর্বস্রষ্টা, অনাদি অনন্ত, চিরকাল আছেন, চিরকাল থাকিবেন। তাঁহার কোন সৃষ্টিকর্তা নাই। তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, ইহা ইয়াক্বীন দেলে বিশ্বাস করিতে হইবে)।

(২) ইহা বিশ্বাস করা যে, অন্যান্য সব জিনিসের কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, এক আল্লাহ্‌ই সবকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অস্তিত্ব দান করিয়াছেন। (৩) ফেরেশ্‌তাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা। (৪) ইহা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যত কিতাব পয়গম্বরদের উপর নাযিল করিয়াছেন, সব সত্য; অবশ্য বর্তমানে কোরআনে পাক ব্যতীত অন্যান্য কিতাবের হুকুম বিদ্যমান নাই। (৫) ইহা বিশ্বাস করা যে, সকল পয়গম্বর সত্য, অবশ্য এখন শুধু রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপর চলার আদেশ বিদ্যমান। (৬) জগতে যাহাকিছু হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, সবই আল্লাহ্‌ আদিকাল হইতে জানেন এবং তাঁহার জানার উল্টা বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হইতে পারে না। একথা ইয়াক্বীন দেলে বিশ্বাস করা। (ইহাকে বলে তক্‌দীরে বিশ্বাস।) (৭) কিয়ামত নিশ্চয়ই হইবে, (পাপ-পুণ্যের বিচার হইবে, পুনরায় সকলের জীবিত হইয়া সমস্ত জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব দিতে হইবে। পাপের শাস্তি দোযখে, পুণ্যের পুরস্কার বেহেশ্‌তে

দেওয়া হইবে,) একথা ইয়াক্বীন দেলে বিশ্বাস করা। (৮) বেহেশ্‌ত আছে, একথা ইয়াক্বীন দেলে বিশ্বাস করিতে হইবে। (৯) দোযখ আছে, একথা পূর্ণ বিশ্বাস করা। (১০) আল্লাহ্‌র প্রতি (গাঢ় ভক্তি এবং অকৃত্রিম) ভালবাসা রাখা। (১১) আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে (আন্তরিক ভক্তি ও) ভালবাসা রাখা। (১২) কাহারও সহিত দুশমনি বা দোস্তি রাখিলে শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই রাখা। (১৩) প্রত্যেক কাজের নিয়ত শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা। (১৪) কোন গোনাহ্‌র কাজ হইয়া গেলে, তার জন্য অন্তরে কষ্ট অনুভব করিয়া অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র কাছে তওবা এস্তেগ্‌ফার করা। (১৫) আল্লাহ্‌কে ভয় করা। (১৬) আল্লাহ্‌র রহমতের আশা সর্বদা রাখা। (নিরাশও হইয়া যাইবে না, নির্ভীকও হইয়া যাইবে না।) (১৭) মন্দ কাজ করিতে (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রাসূলের নীতিবিরুদ্ধ কাজে) লজ্জা করা। (১৮) আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোকর করা। (১৯) অঙ্গীকার পূর্ণ করা। (২০) (আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কোন বালা-মুছীবত রোগ-শোক বা বিপদ-আপদ আসিলে) ধৈর্য ধারণ ও ছবর করা। (২১) নিজেকে অপর হইতে ছোট মনে করা। (২২) সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া (রহম) করা। (২৩) খোদার তরফ হইতে যাহাকিছু হয়, তাহাতে আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকা। (২৪) প্রত্যেক চেষ্টার ফল যে আল্লাহ্‌র হাতে ইহা বিশ্বাস করিয়া প্রত্যেক ফলের জন্য আল্লাহ্‌র উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) করা। (২৫) (নিজের গুণগুলিকে খোদার দান মনে করিতে হইবে,) নিজের গুণে নিজে গর্বিত না হওয়া। (২৬) কাহারও সহিত কপটতা বা মনোমালিন্য না রাখা। (২৭) কাহারও সহিত হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা। (২৮) রাগ না করা। (২৯) কাহারও অহিত কামনা না করা। (৩০) দুনিয়ার (ধন, দৌলত বা দুনিয়ার প্রভুত্ব-প্রিয়তার) সঙ্গে মহব্বত না রাখা।

ঈমানের যে সাতটি কাজ যবানের দ্বারা সমাধা হয়, তাহা এই—(৩১) কলেমা মুখে পড়া (মুখে স্বীকার করা)। (৩২) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। (৩৩) এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা। (৩৪) ধর্ম-বিদ্যা, ধর্ম-জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। (৩৫) (আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া এবং আখেরাতের মাকছুদগুলির জন্য) দো'আ (প্রার্থনা) করা। (৩৬) আল্লাহ্‌র যেকের করা। (৩৭) বেহুদা কথা হইতে এবং গোনাহ্‌র কথা হইতে যেমন, মিথ্যা, পরনিন্দা, গালি, বদ দো'আ করা, লা'নত দেওয়া, অভিশাপ দেওয়া, গান গাওয়া ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকা।

ঈমানের যে ৪০টি কাজ হাত-পা ইত্যাদি শরীরের দ্বারা আদায় হয়, তাহা এই—(৩৮) ওযূ-গোসল করা, কাপড় পাক-ছাফ রাখা। (৩৯) নামাযের পাবন্দ থাকা। (৪০) মালের যাকাত ও ছদকা-ফেৎরা দেওয়া। (৪১) রমযান মাসের রোযা রাখা। (৪২) হজ্জ করা। (৪৩) রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করা। (৪৪) যে সংসর্গে বা যে দেশে থাকিয়া ঈমান রক্ষা ও ইসলাম ধর্ম পালন করা যায় না, সেই সংসর্গ এবং সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া হিজরত করা। (৪৫) আল্লাহ্‌র নামে মান্নত মানিলে তাহা পুরা করা। (৪৬) আল্লাহ্‌র নাম লইয়া কোন কাজের জন্য কসম করিলে যদি সেই কাজ গোনাহ্‌র কাজ না হয়, তবে তাহা পূর্ণ করা। (৪৭) আল্লাহ্‌র নামে কসম খাইয়া ভঙ্গ করিলে তাহার কাফ্‌ফারা দেওয়া। (৪৮) ছতর ঢাকিয়া রাখা। (পুরুষের ছতর নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত। স্ত্রীলোকের ছতর মাথা হইতে পা পর্যন্ত।) (৪৯) কোরবানী করা। (৫০) মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন করা। (৫১) ঋণ পরিশোধ করা। (৫২) কাজ-কারবারে ধোঁকা, (শরার বরখেলাফ কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকা, কম মাপিয়া দেওয়া, বেশী মাপিয়া আনা, ঘুষ খাওয়া, সুদ খাওয়া ইত্যাদি) হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। (৫৩) সত্য সাক্ষ্য গোপন না করা।

(৫৪) কাম রিপু প্রবল হইলে বিবাহ করা। (৫৫) অধীনস্থ চাকর-নওকর, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতির হক আদায় করা। (৫৬) মা-বাপকে শান্তিতে রাখা। (৫৭) সন্তানের লালন-পালন করা। (তাহাদের আদব-কায়দা, ধর্ম-জ্ঞান এবং হালালভাবে দুনিয়ার জীবন যাপনের সদুপায় শিক্ষা দেওয়া।) (৫৮) ভাই-বেরাদর, বোন-ভাগ্নে, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদির সঙ্গে অসদ্ব্যবহার না করা। (৫৯) (চাকর-নওকর হইলে) মনিবের তাবেদারী করা। (৬০) ন্যায়-বিচার করা। (৬১) মুসলমানদের একতা ভঙ্গ না করা। (মোবাহ্ কাজের মধ্যে জমা'আত ছাড়িয়া একতা ভাঙ্গিয়া ভিন্ন থাকা বা আলাদা দল বানান যাইবে না।) (৬২) মুসলমান বাদশাহ্ এবং মুসলমান আমীরের (দলের নেতার) আদেশ পালন করা। অবশ্য আমীরের আদেশ (খোদা না-খাস্তা) যদি শরীঅতের হুকুমের বিপরীত হয়, সে আদেশ পালন করিবে না। (৬৩) ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেওয়া। (৬৪) সৎ কাজে সাহায্য করা। (৬৫) সৎ কাজে আদেশ, বদ কাজে নিষেধ করা। (৬৬) ইসলামী হুকুমত কায়েম হইলে শরীঅত অনুযায়ী শাস্তি বিধান করা। (প্রজা বিধর্মী হইলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা যাইবে না। কেহ চুরি করিলে তাহার হাত কাটিয়া দিতে হইবে, যেনা করিলে ছঙ্গেছার করিতে অথবা একশত কোড়া লাগাইতে হইবে। মিথ্যা তোহ্মত লাগালে ৮০ কোড়া লাগাইতে হইবে। মদ্যপান করিলে ৮০ কোড়া লাগাইতে হইবে। ডাকাতি করিলে তাহার হাত-পা কাটিয়া দিতে হইবে। খুনের বদলে খুন কেছাছ করিতে হইবে। মিথ্যা সাক্ষী গ্রহণ করা যাইবে না, ঘুষ খাওয়া বা পক্ষপাতিত্ব করা যাইবে না ইত্যাদি।) (৬৭) প্রয়োজন হইলে ইসলামের শত্রুর সহিত সংগ্রাম করা। (৬৮) কাহারও আমানত কাছে থাকিলে (রীতিমত তাহার হেফাযত করিতে হইবে এবং) সময়মত তাহার জিনিস তাহাকে ফেরত দেওয়া। (৬৯) অভাবগ্রস্ত লোক ধার চাহিলে তাহাকে ধার দেওয়া। (৭০) পড়শীর সম্মান ও সহানুভূতি করা। (কোন পড়শী কষ্ট দিলে তাহা সহ্য করিতে হইবে, তাহার বিপদ-মুছীবতের সময় তাহার সাহায্য ও সমবেদনা প্রকাশ করিতে হইবে) (৭১) হালাল উপায়ে হালাল রুজি উপার্জন করা। (৭২) শরীঅতের বিধি অনুযায়ী খরচ করা। (৭৩) মুসলমান ভাইকে দেখিলে চেনা হউক বা অচেনা হউক তাহাকে 'আস্‌সালামুআলাইকুম' বলিয়া সালাম করা; কোন মুসলমান সালাম করিলে "ওয়াআলাইকুমুস্-সালাম" বলিয়া তাহার জওয়াব দেওয়া। (৭৪) কেহ হাঁচি দিয়া 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলিলে 'ইয়ারহামো কাল্লাহ্' বলিয়া তাহার জওয়াব দেওয়া। (৭৫) অনর্থক কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া। (৭৬) খেলাফে শরা খেলা বা রং-তামাশা হইতে বাঁচিয়া থাকা। (৭৭) রাস্তার মধ্যে কোন কাঁটা বা ইট পাথর ইত্যাদি কোন কষ্টদায়ক জিনিস থাকিলে তাহা সরাইয়া ফেলা। (এই সাতাত্তর প্রকার কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারিলে ইন্‌শাহ-আল্লাহ্ তার ঈমান পূর্ণ হইবে। নতুবা ইহার কোন একটি কাজ বাকী থাকিলে ঈমান নাকেছ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ থাকিবে।) [যদি পৃথক পৃথকভাবে সকল বিষয়ের ছওয়াব জানিবার বাসনা হয়, তবে ফুরুউল ঈমান নামক কিতাব দেখুন।]

স্বীয় নফ্‌স ও সাধারণ লোকদের অপকারিতা

উপরে যে সব নেক কাজের এবং উহার ছওয়াবের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে বাস্তবিকই তাহা শুনিয়া প্রত্যেকেরই মনে চায় ভাল হইতে, ভাল কাজ করিতে এবং বেহেশ্‌তে যাওয়ার পথ করিতে এবং যে মন্দ কাজের কথা এবং তাহার গোনাহ্ ও আযাবের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে,

তাহাও শুনিয়া প্রত্যেকেরই মনে চায়, মন্দ কাজ ছাড়িয়া গোনাহ্‌র থেকে বাঁচিয়া দোযখের আযাব হইতে মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে। কিন্তু মানুষের "ভাল হওয়ার এবং মন্দ না থাকার" ইচ্ছায় বাধা দেয় প্রধানতঃ দুই প্রকার শত্রু। এক ত সব সময়কার সাথী দুষ্ট নফ্‌স এবং প্রবঞ্চনাকারী শয়তান। নফ্‌স নেক কাজ করিতে নানারূপ ওযর-বাহানা এবং আলস্য আনিতে থাকে, বদকাজ করিতে নানারূপ প্রলোভন ও ওযর-আপত্তি দেখায়, আবার আযাবের কথার উত্তরে এ কথাও বলে যে, খোদা গাফুরুর রাহীম, গোনাহ্‌ করিয়া শেষে তওবা করিয়া নিব। শয়তান নফ্‌সের এইসব কুমন্ত্রণায় "দাদা দিল দাঁড়াইয়া, সে দিল বাড়াইয়া"-এর কাজ দেয়। দ্বিতীয়, বাধা প্রদানকারী হয় স্ত্রী-পুত্র, মা-বাপ, শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি জনসাধারণ। তাহারা নানা কৌশলে ছলে-বলে বেহেশ্‌ত থেকে দূরে নিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবার অপ্রত্যক্ষ চেষ্টা করে। কোন কোন গোনাহ্‌র কাজ হয় এইসব লোকের সংসর্গ দোষে এবং কোন কোন গোনাহ্‌র কাজ হয় তাহাদের মন যোগানের কারণে, কোন কোন গোনাহ্‌র কাজ হয় তাহাদের সামনে হালকা ও অসম্মানী না হইতে হয় এই ভয়ে, কোন কোন গোনাহ্‌র কাজ হয়, তাহাদের সঙ্গী না থাকিলে তাহারা কষ্ট দিবে এই ভয়ে, (এবং কোন কোন গোনাহ্‌র কাজ হয় এত অপ্রত্যক্ষ, শত্রুতা সত্ত্বেও তাহাদের যে হক আদায় করিতে হইবে, তাহা আদায় না করাতে।) কোন কোন গোনাহ্‌র কাজ হয় তাহারা কষ্ট দেয় সেই দুঃখে এবং চিন্তায় সময় নষ্ট হয় তাহাতে এবং তাহাদের গীবৎ শেকায়েত মনে অথবা মুখে প্রকাশ পায় তাহাতে এবং তাহার প্রতিশোধ কি প্রকারে লওয়া যায় তাহার চিন্তায়।

মোটকথা, নফ্‌সের তাবেদারী করাই হইল সমস্ত গোনাহ্‌র মূল এবং লোকের থেকে অনেক কিছু আশা করা হয়, সেই কারণেই সমস্ত অশান্তি আসে। অতএব, প্রত্যেক মানুষের উপরই দুইটি কঠোর কর্তব্য হয়। একটি এই, যে প্রকারে হউক নিজের নফ্‌সকে দমন করিতে হইবে। চাই তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়াই হউক বা তাহাকে ভয় দেখাইয়া, ধমক দিয়া বা যেভাবেই হউক দ্বীনের পথে তাহাকে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। (নফ্‌সের তাবেদারী করা যাইবে না।) দ্বিতীয় কর্তব্য এই যে, মানুষের সঙ্গে এই প্রকারের বেশী তা'আল্লুক করা চাই না যে, তাহার থেকে আমি কিছু পাইবার আশা করি। আর ভ্রূক্ষেপও করা চাই না যে, অমুক আমাকে ভাল বলিবে কিংবা মন্দ বলিবে। এইজন্য এই দুইটি বিষয়কে পৃথক পৃথকভাবে লেখা হইতেছে। (অবশ্য প্রত্যেক মানুষের হক আদায় করিতে হইবে। প্রত্যেকের কষ্ট দূর করিতে এবং ভালাই করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু নিজের হক তাদের কাছ থেকে আদায় করিতে চাহিবে না বা তাহাদের থেকে কোন ভালাইরও আশা করিবে না এবং তারা যে তোমাকে কষ্ট দিবে না, সাহায্য করিবে সে আশাও করিবে না।)

নিজ নফ্‌সের সঙ্গে ব্যবহার

নিয়ম মত দৈনিক কিছু সময় সকাল বেলায় ফজরের পর এবং কিছু সময় মাগরেবের পর অথবা এশার পর ধার্য করিয়া তাহাতে একা বসিয়া দেলকে অন্যান্য চিন্তা-ভাবনা ও খেয়াল হইতে খালি করিয়া নিজের নফ্‌সের সঙ্গে এইরূপে কথোপকথন করিবে—হে নফ্‌স! তুই দুনিয়াতে আসিয়াছিস বেপার করিতে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তোকে বড় একটি মূলধন দিয়া দুনিয়াতে বেপার

করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। তোর মূলধন তোর জীবনের অমূল্য সময়গুলি। যদি বেপার করিয়া যাইতে পারিস, অর্থাৎ যদি জীবনের সময়গুলি নেক কাজে এবং ভাল কাজে খরচ করিতে পারিস, দোযখের ভীষণ আযাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বেহেশ্‌তের অফুরন্ত সুখ ভোগ করিতে পারিবি। যদি জীবনের সময়গুলি ব্যয় করিয়া কোন নেকী খরিদ না করিস, বরং মন্দ কাজে, গোনাহ্‌র কাজে, অকাজে বা আলসেমী করিয়া, বাবুগিরি বিলাসিতা করিয়া জীবনের অমূল্য সময়-রত্নগুলি খরচ করিস, তবে পুঁজি ত হারাইলিই, লাভও কিছু করিলি না। উল্‌টা আরও দোযখের শাস্তির উপযুক্ত হইলি। তোর জীবনের এই সময়গুলি এত মূল্যবান যে, এক এক মিনিট এবং এক এক শ্বাস লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও তুই কিনিতে পারিবি না। কারণ, টাকা হারাইয়া গেলে তাহা চেষ্টা করিয়া পুনরায় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সময় যাহা চলিয়া যায়, তাহা কোটি কোটি টাকা দিলেও আর ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। (তা-ছাড়া জীবনের সময়গুলির সদ্ব্যবহার করিলে তাহা দ্বারা যত বড় জিনিস ক্রয় করা যায় অর্থাৎ চিরস্থায়ী সুখের স্থান বেহেশ্‌তে এবং খোদার দীদার ও খোদার সন্তুষ্টি, কোটি কোটি টাকার দ্বারাও সেই জিনিস কিছুতেই ক্রয় করার শক্তি কাহারও নাই। অতএব, হে নফ্‌স! এই মূল্যবান সময়রত্নের এখনই তুই কদর কর। ফুরাইয়া গেলে, চলিয়া গেলে আর পাইবি না। আল্লাহ্‌র শোকর কর যে, এখনও তোর মৃত্যু আসে নাই। মৃত্যু আসিলেই আর কিছু করার ক্ষমতা থাকিবে না। মনে কর যে, যখন তোর মৃত্যু আসিবে, তখন যদি মাত্র একদিন সময় পাস, তবে তুই কি করিবি? ঐ একটা দিন কি ভাবে কাটাইবি? নিশ্চয়ই প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছা যে, মৃত্যুর সময় যদি মাত্র একটি দিন পায়, তবে সেই দিন খাঁটিভাবে তওবা করিবে, আল্লাহ্‌র কাছে পাক্কা ওয়াদা করিবে যে, আর কখনও পাপ কাজের কাছেও যাইব না এবং সমস্তটা দিন শুধু আল্লাহ্‌র যেকের এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের তাবেদারিতে কাটাইবে। যখন মৃত্যুর সময় একটা দিন পাইলে তোর এই অবস্থা হইবে তখন আজকার এই দিনটাকে সেইরূপই মনে কর, যেন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এই একটা দিন চাহিয়া নিয়াছিস। অতএব, এই দিনটার মধ্যে খুব লক্ষ্য রাখিবি যেন কোন গোনাহ্‌র কাজ না হয়, কোন অন্যায় কাজ না হয়, আল্লাহ্‌র কোন একটা হুকুম পালন করিতে ছুটিয়া না যায়। আল্লাহ্‌র কথা (যেকের) কোন সময় ভুল না হয়। আজকার দিন এইভাবে অতিবাহিত করিয়া আবার যদি আর একদিন হায়াত পাও, তবে দ্বিতীয় দিনও এইরূপই করিবে। সারা জীবনটি এই ভাবেই হিসাব করিয়া নফ্‌সকে বুঝাইয়া তার দ্বারা কর্তব্য কাজ, নেক কাজ করাইয়া নিবে এবং বদ কাজ ও অলসতা হইতে ফিরাইয়া রাখিবে।

নফ্‌সকে ইহাও বুঝাইবে যে, হে নফ্‌স! কখনো শয়তানের এই ধোঁকায় পড়িবি না যে, খোদা মাফ করিয়া দিবেন। কেননা, তুই কেমন করিয়া জানিলি যে, আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই মাফ করিয়া দিবেন। শাস্তি দিবেন না। তিনি কি শাস্তি দিতে পারেন না? যদি মাফ না করিয়া শাস্তিই দেন, তখন তোর কি উপায় থাকিবে? (দ্বিতীয়তঃ তাঁহার দয়া এবং তাঁহার মাফ পাইবার জন্য প্রধান শর্ত হইল তাঁহার ফরমাঁবরদারী এবং তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য আজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করা, তাহা যে না করিবে সে কেমন করিয়া মাফির এবং দয়ার আশা করিতে পারে? তৃতীয়তঃ) মানিয়া নিলাম যে, তিনি মাফই করিয়া দিলেন তবুও ত যারা বদকাজ ছাড়িয়া নেক কাজ করিবে তারা যে সব পুরস্কার এন্‌আম এক্‌রাম পাইবে তাহা তো তোর ভাগ্যে জুটিবে না। যখন তুই নিজ চোখে সেই সব নেয়ামত দেখিবি তখন তোর কষ্ট হইবে না কি? এইরূপ কথোপকথনের পর নফ্‌স জিজ্ঞাসা করে যে, আচ্ছা! তবে আমি কি করিব এবং কি উপায়ে চেষ্টা করিব? তাহার উত্তরে এইরূপ

বলিবে—যে সব জিনিস তোর থেকে এক দিন (মৃত্যুকালে) নিশ্চয়ই ছুটিবেই ছুটিবে, অর্থাৎ যে-সব বদ-অভ্যাস এবং দুনিয়ার মহব্বত শান-শওকত বাবুগিরি মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করিতেই হইবে, তাহা তুই এখনই ছাড়িয়া দে। আর যে আল্লাহ্‌র কাছে না যাইয়া কিছুতেই উপায় নাই এবং আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা ছাড়াও অন্য কোন আশ্রয় নাই সেই আল্লাহকে এখন থেকেই শক্ত করিয়া ধর। আল্লাহ্‌র পথ অবলম্বন কর, আল্লাহ্‌র কথা সব সময় স্মরণ রাখ, আল্লাহ্‌র হুকুমের তাবেদাবী শুরু কর। আল্লাহ্‌র যেকের থেকে কখনো গাফেল থাকিস না। খোদার হুকুমের তাবেদারী যে কেমন করিয়া করিতে হইবে এবং খোদা কি কি উপায়ে সন্তুষ্ট হইবেন তাহাই বিস্তৃতভাবে খুব খুলিয়া খুলিয়া এই কিতাবে লেখা হইয়াছে, সেই অনুযায়ী জীবনকে গঠিত করিতে চেষ্টা কর। কিছুদিন একটু কষ্ট করিয়া আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের পরামর্শ নিয়া চেষ্টা করিলে দেলের মধ্যে ভাল অভ্যাস জমিয়া দাঁড়াইবে এবং মন্দ অভ্যাসগুলি ক্রমান্বয়ে সব ছুটিয়া যাইবে। (এমন কি শেষে মন্দ কাজের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা এবং নেক কাজের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আগ্রহ জন্মিবে।)

নিজের নফ্‌সকে এইভাবেও বুঝাও—নফ্‌স! তুই দুনিয়াতে আসিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিস। রোগ যদি তুই বদ-পরহেযী করিয়া, কুপথ্য খাইয়া বাড়াইয়া ফেলিস বা তিক্ত ঔষধ না খাওয়ার দরুন রোগ বাড়িয়া যায়, তবে তোর বেহেশ্‌তে যাওয়া দুষ্কর। কাজেই রোগীর যেমন বাছিয়া খাইতে হয়, মজার জিনিস খাওয়া যায় না, তিতা ঔষধ খাইতে হয়, তোরও সেইরূপ বাছিয়া খাইতে হইবে, তিতা ঔষধ খাইতে হইবে। কি কি কুপথ্য, কি কি বাছিয়া চলিতে হইবে, তাহা সব আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল বাতাইয়া দিয়াছেন। কোরআন হাদীসে সব মওজুদ আছে। হক্কানী নায়েবে রাসূলগণ তাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সারা জীবন গোনাহ্‌র কাজগুলির থেকে পরহেয করিয়া চলিতে হইবে। যদিও গোনাহ্‌র কাজে মজা লাগে, তবুও সে মজা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কয়েকটা দিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে এবং যদি এবাদত বন্দেগী করা এবং আল্লাহ্‌র হুকুমগুলি পালন করা তিতা ঔষধ পানের মত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়, তবুও সেগুলি আজীবন পালন করিতে হইবে। হে নফ্‌স! একটু চিন্তা কর, জীবনের যার মায়া আছে, সে যদি কোন রোগে পড়ে, আর হেকিম যদি তাকে বলে যে, অমুক মজাদার জিনিস খাইলে রোগের ভারী ক্ষতি হইবে এবং অমুক তিতা ঔষধ খাইলে তোমার রোগ সারিয়া যাইবে, তবে সে কি করিবে? নিশ্চয়ই সে সেই তিতা ঔষধ খাইবে এবং সে মজাদার জিনিস যাতে তার সামনেও না আসিতে পারে, সেই চেষ্টা সে করিবে। কারণ জীবনের মায়া প্রত্যেকেরই আছে। তোর কি তবে বেহেশ্‌তের সুখের সাধ নাই? দোযখের আযাবের ভয় কি তোর নাই? অতএব, যদি গোনাহ্‌র কাজগুলি শত মজাদারও হয় এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের হুকুমের কাজগুলি এবং এবাদত বন্দেগীগুলি শত কটু-তিতাও হয়, তবুও আল্লাহ্‌র উপর যখন ঈমান আছে—রাসূলের উপর যখন ঈমান আছে এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল সত্য সংবাদ দিয়াছেন যে, গোনাহ্‌র কাজে মজা থাকিলেও ক্ষতি অনিবার্য এবং নেক কাজে কষ্ট হইলেও তাহার লাভ অবশ্যম্ভাবী এবং সেই ক্ষতি এবং লাভও ক্ষণস্থায়ী বা দুই এক দিনের নয়, সে ক্ষতি চিরস্থায়ী, তাহার নাম দোযখ, আর সে লাভও চিরস্থায়ী, তাহার নাম বেহেশ্‌ত। আশ্চর্যের বিষয়, হে নফ্‌স! সামান্য একজন হেকিমের কথায় বিশ্বাস করিয়াই তার কথা পালন করিস, আর খোদার রাসূলের উপর ঈমান রাখা সত্ত্বেও খোদা ও রাসূলের কথা পালন করিলি না। আফসোস! আফসোস! এখনও কাম চোরাপানা

করিস? বেহেশ্‌তের চিরস্থায়ী নির্মল সুখের অতটুকু কদরও তোর কাছে নাই, দুনিয়া সামান্য কয়দিনের সুখের? দোযখের চিরস্থায়ী ভীষণ কষ্টের কি অতদূর ভয়ও তোর নাই এবং তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ততখানি চেষ্টা করাও কি তোর উচিত নয়? যতটুকু দুনিয়ার সামান্য কষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য করিয়া থাকিস? এখনও গাফলতি ছাড়, আর গাফেল থাকিস না, এখনও সতর্ক হও। এখনও সাবধান হও।

নিজের নফ্‌সকে এভাবে বুঝাইবে—হে নফ্‌স! তুই এই দুনিয়াতে একজন বিদেশী পরবাসী মুসাফির। পরবাসে কি পুরা আরাম পাওয়া যায়? কখনো নয়, বিদেশ পরবাসে নানারকম কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিন্তু বিদেশে যারা যায়, তারা এই আশায় সব কষ্ট স্বীকার ও সহ্য করে যে, এখানে দুইদিন একটু কষ্ট করিলে বাড়ীতে গিয়া কিছু বেশী দিন আরামে থাকা যাইবে। যদি কোন বে-অকুফ নাদান ঐ কষ্ট সহ্য না করিয়া বিদেশেই সম্পূর্ণ আরামের বন্দোবস্ত করিয়া সেখানেই ঘর বানাইয়া লয়, তবে তার ভাগ্যে কি বাড়ীর অরাম জুটিবে? কস্মিণকালেও নয়। এইরূপে যতদিন দুনিয়াতে থাকিতে হইবে, ঐরূপ কষ্টই সহ্য করিয়া যাইতে হইবে, তবেই আসল বাড়ীতে পৌঁছিয়া আরাম পাইবার আশা করা যাইবে, নতুবা সব হারাইতে হইবে। "কর না সুখের আশ, পর না দুঃখের ফাঁস।" জীবনের উদ্দেশ্য তা' নয়। এবাদত বন্দেগী করার মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের হুকুমগুলি পালনের মধ্যেও কষ্ট আছে এবং গোনাহ্‌র কাজগুলি ছাড়ার মধ্যেও কষ্ট আছে। তা-ছাড়া আরও অনেক কষ্ট দুনিয়াতে সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু দুনিয়া আমাদের স্থায়ী বাড়ী নয়। আমাদের স্থায়ী বাড়ী বেহেশ্‌তে। একবার যদি বেহেশ্‌তে কোন রকমে কষ্ট-ক্লেশ করিয়া পৌঁছিতে পারি, সব কষ্ট শেষ হইয়া যাইবে। অতএব, এইখানকার দুই দিনকার সব রকমের কষ্টই নীরবে সহ্য করা দরকার এবং বেহেশ্‌ত হাছিল করার জন্য যতই পরিশ্রম কষ্ট করার দরকার হউক না কেন, হাস্যবদনে হৃষ্টচিত্তে সে সব মাথা পাতিয়া লওয়া দরকার।

সারকথা এই যে, এইভাবে নানা উপায়ে বুঝাইয়া নফ্‌সকে সোজা পথে রাখা দরকার। দৈনিক এইভাবে বুঝান দরকার। স্মরণ রাখিও, তুমি নিজে যদি এইরূপে চেষ্টা করিয়া নিজের ভালাইপনা নিজে না কর, তবে অন্য কেউ কি করিয়া দিবে? সে আশা সুদূর পরাহত। আমরা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে, আল্লাহ্‌র রাসূলের তরফ হইতে, তোমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে তোমারই হিতের জন্য এই কথাগুলি বলিলাম। এখন তুমি জান আর তোমার কাম জানে। (আল্লাহ্‌কে সোপর্দ, আল্লাহ্‌র হাওলা।)

জনগণের সঙ্গে ব্যবহার ও গোনাহ্ হইতে আত্মরক্ষা

সমাজে মানুষ তিন প্রকার। এক প্রকার যাহাদের সঙ্গে দোস্তি মহব্বত, বরং আত্মীয়তা আছে। দ্বিতীয় প্রকার যাহাদের সঙ্গে শুধু চিনা-জানা আছে। খাছ কোন তা'আল্লুক দোস্তি-মহব্বত বা আত্মীয়তার কোন তা'আল্লুক নাই। তৃতীয়, যাহাদের সঙ্গে চিন-পরিচয় নাই সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনে রাখিবে, এই তিন প্রকারের লোকের সঙ্গে তিন রকমের ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রথম প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার

যে সব লোকের সঙ্গে চিন-পরিচয় নাই, তাহাদের সঙ্গে চলা-ফেরা, ওঠা-বসার ঘটনা ঘটিলে, তাহারা যে সব বৃথা গল্প-গুজব করিবে অথবা বেহুদা খবরাখবর বর্ণনা করিবে সে সবের দিকে আদৌ কর্ণপাত করিবে না, একেবারে বধিরের মত হইয়া যাইবে, কোন কথার উত্তর দিবে না, কান লাগাইয়া শুনিবেও না, তাহাদের সঙ্গে অনর্থক কোন তা'আল্লুকও পয়দা করিবে না বা তাহাদের থেকে কোনরূপ উপকার বা সাহায্যের আশাও করিবে না। এমনি তাদের মধ্যে যদি কেহ কোন বিপদে পড়ে, তবে যথাসাধ্য তাহার সাহায্য করিয়া দিবে। কোন দরকারী কথা জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীরতার সহিত তাহার সদুত্তর দিয়া দিবে। কিন্তু নিজে কোন তা'আল্লুক পয়দা করিবে না, সওয়াল ত করিবেই না। আর যদি তাহাদের মধ্যে কোন শরার বরখেলাফ কাজ দেখ, তবে নম্রভাবে মিষ্ট ভাষায় তাহাদের বুঝাইয়া দিবে।

দ্বিতীয় প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার

যাহাদের সঙ্গে দুস্তি-মহব্বত এবং আত্মীয়তার তা'আল্লুক, তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায় এদিকে লক্ষ্য রাখিবে যে, প্রথম দুস্তি-মহব্বত এবং আত্মীয়তা করিবার সময় খুব তাহকীক করিয়া লইবে। সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা, দুস্তি-মহব্বত করিবে না। দুস্তি করিবার জন্য পাঁচটি শর্ত। প্রথম শর্ত এই যে, সে জ্ঞানী লোক হওয়া চাই। কেননা, নির্বোধ লোকের বিশ্বাস নাই। নির্বোধ লোক দুস্তি রক্ষা করিতে জানে না। তা-ছাড়া নির্বুদ্ধিতার কারণে অনেক সময় করিতে চাইবে ভাল, হইয়া যাইবে মন্দ।

এক ব্যক্তি ভাল্লুকের সঙ্গে দুস্তি করিয়াছিল। যখন সে ঘুমাইত তখন ভাল্লুক তাহাকে পাখা করিয়া তাহার মাছি তাড়াইত। একদিন একটি মাছি তাহার মুখের উপর আসিয়া বসিয়াছে। একবার তাড়াইয়াছে, দুইবার তাড়াইয়াছে। মাছি যখন তবুও মানে নাই, তখন ভাল্লুকের রাগ আসিয়াছে। ভাল্লুক রাগান্বিত হইয়া বড় একখানা পাথর আনিয়া মাছিকে মারিয়াছে। মাছি ত পালাইয়াছে, কিন্তু লোকটির জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। দেখ, ভাল্লুক করিতে চাহিয়াছিল ত হিত, কিন্তু তার নির্বুদ্ধিতার কারণে হইয়া গেল কত বড় অহিত।

দ্বিতীয় শর্ত—ঐ লোক নিঃস্বার্থ হওয়া চাই এবং তাহার স্বভাব চরিত্রও ভাল হওয়া চাই। কোন স্বার্থ বা গরযের বশীভূত হইয়া যেন দুস্তি না করে বা সামান্য সামান্য কারণে যেন রাগিয়া টং না হয়। রাগের সময় যেন মেজায ঠিক থাকে, হুশ হারা না হইয়া যায়। নিজের স্বার্থে একটু ব্যাঘাত দেখিলে বা সামান্য একটু কষ্ট হইলেই যেন তাহাতে ধৈর্যহীন হইয়া মোড় না বদলাইয়া ফেলে। তৃতীয় শর্ত এই যে, ঐ লোক যেন দ্বীনদার হয়। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র হক আদায় করে না, সে তোমার দুস্তির হক কি আদায় করিবে? দ্বিতীয় কথা এই যে, ধর্মহীন লোকের সঙ্গে যদি তুমি দুস্তি কর, তবে বারবার

তাহাকে ধর্মবিরুদ্ধ কাজ এবং গোনাহ্‌র কাজ করিতে দেখিয়া যদি ছবর না কর তবেও দুস্তি থাকিবে না। আর যদি ছবর কর, তবে বারবার দেখিতে দেখিতে কিছুদিন পরে তোমারও ঐ গোনাহ্‌র প্রতি আগের মত ঘৃণা থাকিবে না, শেষে হয়ত তুমিও ক্রমান্বয়ে ঐ গোনাহে লিপ্ত হইয়া পড়িতে পার। তৃতীয় অপকারিতা এই যে, তাহার মন্দ সংশ্রবের প্রতিক্রিয়া তোমার উপরও পড়িতে পারে এবং এইরূপ পাপ তোমার দ্বারাও সংঘটিত হইতে পারে। আরো একটি শর্ত এই যে, কুসংসর্গ হইতে বহুত পরহেয করা দরকার। ধর্মহীন বে-নামাযী, বে-রোযা, বে-পর্দা, খেলোয়াড় (খেলাফে শরা) লোকের সংসর্গের চেয়ে কু-সংসর্গ আর কি হইবে? চতুর্থ শর্ত এই যে, ঐ লোক দুনিয়ার লোভী না হওয়া চাই। কেননা, লোভী লোকের সংসর্গে যে বসিবে তার মধ্যেও ঐ রোগ ঢুকিবে। দুনিয়ার লোভী হওয়ার আলামত এই যে, প্রায়ই ভাল কাপড়, ভাল পোশাক, ভাল খোরাক, ভাল জিনিস, ভাল সামানের চিন্তা ও চর্চায় থাকে যে, কেমন করিয়া বাড়ীখানা ফিটফাট করিবে, কেমন করিয়া ঘর-দুয়ার সুন্দর করিবে, কেমন করিয়া সুন্দর সুন্দর রেকাবি, সুন্দর সুন্দর পেয়ালা, সুন্দর সুন্দর বিছানা-বালিশ, সুন্দর সুন্দর খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি যোগাড় করিবে, সুন্দর কাচারি বান্ধিবে—এই চিন্তায়ই তার অধিকাংশ সময় যায়। এমন লোকের সঙ্গে যদি তুমি উঠা-বসা কর, তবে তোমার ভালাই নাই, তোমার মধ্যে ঐ রোগ ঢুকিবে। আর যদি তুমি এমন লোকের সঙ্গে দুস্তি কর যে, দুনিয়ার বাড়ী যে, স্থায়ী বাড়ী নহে, দুনিয়ার মান-সম্মান, নাম-যশ যে, কোন মূল্যের জিনিস নহে, ইহা তাহার সব সময় খেয়াল থাকে। দুনিয়া অস্থায়ী ক্ষণস্থায়ী মোসাফিরখানা কাজেই কোন রকমে মোটা খাইয়া মোটা পরিয়া এখানকার কয়টা দিন কোন রকম-সকমে কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল। এই যার ভাব তার সংসর্গে থাকিলে আল্লাহ্ চাহে ত যাহাকিছু দুনিয়ার লোভের রোগ আছে, তাহা দূর হইয়া যাইবার আশা করা যায়। পঞ্চম শর্ত এই যে, ঐ লোক যেন মিথ্যাবাদী না হয়। কেননা, মিথ্যাবাদীর কোন বিশ্বাস নাই। খোদা জানে, মিথ্যাবাদীর কোন মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া কোন সময় তুমি কোন্ বিপদে পড়িয়া বস।

কাজেই দুস্তি-মহব্বত ও আত্মীয়তা করিবার আগে এই পাঁচটি শর্ত অবশ্য অবশ্য দেখিয়া লইবে। কিন্তু যখন পাঁচটি শর্ত পাওয়ার পর কাহারও সহিত আত্মীয়তা বা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুস্তি কর, তখন তাহার হক্‌ও চিরজীবন রীতিমত আদায় করিতে থাকিবে দুস্তির হক এইঃ—(১) তাহার বিপদের সময় অবশ্য অবশ্য প্রাণপণে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। (২) তাহার ঠেকা ও বিপদের সময় কাজে আসিবে। (৩) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যদি তৌফীক দিয়া থাকেন, তবে তাহার আর্থিক সাহায্যও করিবে। (৪) তাহার ভেদের কথা কাহারও নিকট যাহের করিবে না। (৫) যদি কেহ তাহাকে কিছু মন্দ বলে, (তুমি যদি বিনা ফেৎনা-ফাসাদে তাহার প্রতি-উত্তর ও প্রতিকার করিতে পার ত কর, নতুবা) তাহাকে সে কথার খবর দিও না। (৬) সে যখন কোন কথা বলে, কান লাগাইয়া মনোযোগের সহিত তাহা শুন (এবং তাহার সদুত্তর, সৎ পরামর্শ দান কর এবং পালন কর)। (৭) যদি তাহার মধ্যে কোন আয়েব দেখ, তবে নেহায়েত খায়েরখাহির সঙ্গে নরম ভাষায় গোপনভাবে তাহাকে বলিয়া বুঝাইয়া দাও। (৮) যদি তাহার কোন কথা ভুল-চুক হইয়া যায়, তবে তাহা ধরিয়া বসিয়া থাকিও না। মাফ করিয়া বা বলিয়া-কহিয়া দেল ছাফ করিয়া লও। (৯) তাহার দোনো জাহানের ভাল ও উন্নতির জন্য হামেশা দো'আ করিতে থাকিও।

তৃতীয় প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার

যাহাদের সঙ্গে শুধু চিন-পরিচয় আছে তাহাদের দ্বারাই ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বেশী। কেননা, যাহারা খাঁটি দোস্ত, খাঁটি আত্মীয়, তাহারা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আর যাহাদের সঙ্গে চিন-পরিচয় নাই তাহারা হিতকামীও না, অহিতকামীও না। কিন্তু যাহারা মাঝামাঝি তাহাদের দ্বারাই ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশী, কাজেই খুব সতর্ক থাকিতে হইবে। খামাখা কাহারো সঙ্গে মিল-মোলাকাত জন্মাইবে না। কাহারও অর্থ-বিত্ত দেখিয়া লোভ করিবে না, বা তাহার সহিত কিছু মিল-মোলাকাত থাকিলে কোন সময় হয়ত উপকার হইতে পারে, এই আশায় কাহারো সঙ্গে মিল-মোলাকাত পয়দা করিও না। অনেক মানুষ এমন আছে, যাহারা উপরে খুব দুস্তি এবং খায়েরখাহী দেখায় এবং মিঠা কথা বলে, কিন্তু তাহাদের ভিতরটা দুস্তি-মহব্বত থেকে খালি, খল ও কপটতায় ভরা, তাহারা উপরে দুস্তি দেখাইয়া ভিতরে ভিতরে তোমার আয়েব তালাশ করে এবং বদনাম দুর্নাম করার চেষ্টায় থাকে। এই শ্রেণীর লোকের থেকে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। কাহারো সঙ্গে বদ-আখলাকী করিও না বা রুঠা, অভদ্র, নির্দয় ব্যবহার করিও না। সকলের সঙ্গে ভদ্র নম্র এবং সদয় ব্যবহার করিও, কিন্তু কাজের বেলায় হুঁশিয়ার থাকিও। তাহাদের থেকে কিছু পাওয়ার আশা করিও না। পাওয়ার নিয়তে কিছু করিও না, যদি কিছু কর, তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করিও। তাহারা যেন পেঁচে না ফেলাইতে পারে খুব সতর্ক থাকিও, আর তাহাদের প্রলোভনে প্রলুব্ধও হইও না এবং উস্কানিতেও ক্ষেপিও না।

যদি কেহ তোমার সম্মান করে বা তা'রীফ প্রশংসা করে বা খাতের-তাওয়াযু করে এবং ভালবাসা দেখায়, খবরদার তাহার ধোঁকায় পড়িও না। কেননা, এই যমানাতে যাহের-বাতেন তথা ভিতর-বাহির এক রকমের খাঁটি, নিঃস্বার্থ লোক খুব কমই আছে। কাহাকেও ষোল আনা বিশ্বাস করা যায় না। হয়ত স্বার্থ সিদ্ধির কোন উদ্দেশ্য আছে; কাজেই খবরদার ধোকায় পড়িয়া হাতের পেঁচ কখনো ছাড়িবে না।

যদি কেহ তোমার গীবৎ-শেকায়েত বা নিন্দা মন্দ করে, তবে তাহাতে রাগান্বিত হইও না বা আশ্চর্যান্বিত হইও না যে, এমন মানুষ এমন কাজ করিবে! না এ-তো কখনো ভাবি নাই। হাতে ধরিয়া যাহাকে পালিয়াছি-পুষিয়াছি, খাওয়াইয়াছি-পরাইয়াছি, সে যে এমন নেমকহারামি করিবে তা কখনও ভাবি নাই। যার এত উপকার করিয়াছি সে যে সব ভুলিয়া আমার বিরুদ্ধে এমন কথা বলিবে, এ তো কখনো ভাবি নাই। আমি যে তার মুরুব্বি সে এই খেয়ালটুকুও করিল না। আগেও এইসব আশা করিবে না এবং পরেও তাআজ্জুব করিবে না বা রাগ করিবে না। কেননা, একে ত এ যমানার লোকের ভাবও অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। তা-ছাড়া তুমিও চিন্তা করিয়া দেখ, তুমিও ত সব সময় সকলের সঙ্গে সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে এক রকম ব্যবহার করিতে পার না। সামনে এক রকম ব্যবহার হয়, অসাক্ষাতে আর এক রকম ব্যবহার হয়। চিন্তা করিয়া দেখ, তুমিও ত তোমার উপকারী মুরুব্বিদের ষোল আনা হক আদায় কর নাই।

ফলকথা এই যে, কাহারো নিকট হইতে কোন প্রকার ভালাই এবং লাভের আশা পরিত্যাগ কর। কাহারো থেকে আর্থিক বা কায়িক উপকার ও খেদমত পাওয়ার আশা করিও না। কাহারো থেকে সম্মান ও খাতির পাওয়ারও আশা করিও না। কাহারো থেকে মহব্বত ও ভালবাসা পাওয়ারও আশা করিও না। কারণ, আশাই সব কষ্টের মূল। অতএব, যখন আশাই রাখিবে না তখন কাহারও খারাপ ব্যবহারেও কষ্ট হইবে না, সামান্য উপকার করিলেও তাহা অনেক বেশী বলিয়া বোধ হইবে।

কিন্তু অন্যের থেকে ভালাইর আশা রাখিবে না বলিয়া তুমি যে অন্যের ভালাই না করিবে, তাহা কিন্তু করিও না। তুমি লোকের ভালাই করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা আজীবন করিতে থাকিও, কিন্তু খালেছ নিয়তে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করিও এবং এক দুইবার করিয়া কোন ফল দর্শিল না বলিয়া ছাড়িয়া দিও না, বা উপকার করিলে আরও অপকার বেশী করে এ বলিয়াও লোকের উপকার করা ছাড়িও না। যেটুকু করিবে তাহা আল্লাহ্‌র কাছে পাইবে এই আশায় করিও। কেহ উপকার করুক বা অপকার করুক, তোমার উপকারের ফলে, তোমার বশে, তোমার পক্ষে থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু তুমি যেটুকু পারিবে লোকের উপকার করিতে কখনো ত্রুটি করিও না।

কাহারও কোন দ্বীনের বা দুনিয়ার ভালাইর কথা যদি তোমার বুঝে আসে, তবে উহা তাহাকে বাতাইতে তুমি কখনো বখীলি করিও না। যদি কেহ তোমার বিন্দুমাত্র উপকারও করে তাহা কখনো ভুলিও না, জীবন ভর ইয়াদ রাখিও, তাহার শুক্‌রিয়া আদায় করিও, আল্লাহ্‌র কাছে তাহার জন্য দো'আ করিও। যথাসম্ভব তাহার উপকারের প্রত্যুপকার করিও। আসল নেয়ামত আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে মনে করিয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র করিও। মানুষের ভক্ত বেশী হইও না, মানুষের উপর নজর রাখিও না, আল্লাহ্‌র উপর নজর রাখিও এবং আল্লাহ্‌র দান মনে করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি বেশী করিও। যদিও কেহ কোন কষ্ট দেয় বা ক্ষতি করে, তবে তাহাতে তাহার প্রতি মনে কীনা বা খল বা প্রতিশোধের চিন্তা রাখিয়া অনর্থক নিজের দেল খারাপ করিও না এবং প্রতিশোধ নিতে যাইয়া আরও বেশী ক্ষতির তলে পড়িও না। মনে করিও, হয়ত আমি আল্লাহ্‌র দরবারে গোনাহ্‌ করিয়াছি সেই গোনাহ্‌র শাস্তি এবং গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হইতেছে। ছবর করিও এবং আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করিয়া তওবা করিও ও ক্ষমা চাহিও। কোন লোকের সঙ্গে শত্রুতা বা হিংসা মনে পোষণ করিও না।

সারকথা এই যে, এক আল্লাহ্‌র সঙ্গে তা'আল্লুক রাখিবে, আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের আশা রাখিবে, আল্লাহ্‌র গযব ও আযাবের ভয় দেলে রাখিবে, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির পরোয়া করিবে। তা-ছাড়া মানুষের থেকে কোন ভালাইর আশাও করিও না, বা মানুষের ভয়ে ভীত হইয়া হক পথও ছাড়িও না। হামেশা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ রাখিও এবং ভিতরে-বাহিরে আল্লাহ্‌র হুকুমের এবং রাসূলের তরীকার তাবেদারী করিও।

অন্তর পরিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা

১। হাদীস ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى اَجْسَادِكُمْ وَ لَآ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَ لٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ ـ رواه مسلم

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তোমাদের দেহ (-এর সৌন্দর্য) ও আকৃতি দেখেন না। (মনে করিও না যে, যখন প্রকাশ্য কাজগুলি যাহা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়, মনে একাগ্রতা না থাকিলে তাহা কবূল হয় না, এমন কি কবূল হওয়ার কোন পথই নাই; সুতরাং দেলের কাজগুলিও কবূল হইবে না। কেননা, আল্লাহ্ পাক বলেন,) আল্লাহ্ পাক দেখেন তোমাদের অন্তর। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এমন কাজগুলি কবূল করেন না, যাহা শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল দেখায় অথচ এখলাছ এবং একাগ্রতাশূন্য হয়। যেমন, কেহ এবাদত করিতেছে এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবাদতে লিপ্ত আছে কিন্তু অন্তর অন্যমনস্ক। দেলে অনুভব হইতেছে না যে, সে আল্লাহ্র সমক্ষে দাঁড়ান আছে, না অন্য কোন কাজ করিতেছে। এ ধরনের কাজগুলি কবূল হয় না।

অবশ্য কোরআন এবং হাদীস হইতে প্রমাণিত আছে যে, বাহ্যিক কাজের সহিত একাগ্রতা ও এখলাছ বর্তমান থাকিলেই উহার মূল্য আছে। কেননা, আল্লাহ্র দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল হইল অন্তর। বাহ্যিক ডাক্তারীর মতে অন্তর যেমন দেহের রাজা, তেমনিভাবে রূহানী এবং বাতেনী দিক দিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাদশাহ্ হইল অন্তর। অন্তরের অবস্থা সঠিক ও সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত উদ্দেশ্য সফল হওয়ার এবং মুক্তির সন্ধান পাওয়ার কোনই আশা করা যায় না। মনে করুন, বাহ্যতঃ কেহ মুসলমান হইল কিন্তু অন্তরে মুসলমান হয় নাই, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে তাহার মুসলমান হওয়ার কোনই মূল্য নাই। এইরূপে যদি মানুষকে দেখাইবার জন্য কিম্বা অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্যে নামায পড়ে এবং ছদকা-খয়রাত ইত্যাদি এবাদত করে, তবে উহা কোন পর্যায়েই গণ্য হইবে না। কাজেই জানা গেল যে, উভয় জাহানের সফলতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে গ্রহণীয় হওয়ার মাপকাঠি শুধু আত্মার সংশোধন। লোকেরা আজকাল আত্মার ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন। তাহারা শুধু বাহ্যিক আমল কমবেশী কিছু করে এবং জ্ঞানও অর্জন করে কিন্তু আভ্যন্তরীণ সুস্থতা এবং অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও সংশোধনের বিন্দুমাত্রও চিন্তা করে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাহাদের ধারণা—আত্মার সংশোধন, রিয়া (লোক দেখান কাজ,) শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদির প্রতিকার এবং উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার কোনই প্রয়োজন নাই। শুধু বাহ্যিক কাজগুলিকেই ওয়াজিব ও করণীয় মনে করে এবং উহাকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট বলিয়া মনে করে, অথচ আসল উদ্দেশ্য যে আত্মার সংশোধন অত্র হাদীস দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল। আর বাহ্যিক কার্যগুলি হইল আত্মসংশোধিত হওয়ার উপায়। বিশেষতঃ যাহের-বাতেনের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে এমন একটা যোগাযোগ রহিয়াছে যে, বাহ্যিক অবস্থায় সংশোধন ব্যতীত বাতেনী অবস্থা সংশোধিত হয় না। আবার বাহ্যিক আমলসমূহের উপর পাবন্দী না করিলে বাতেনী সংশোধন স্থায়ী হয় না। যখন বাতেনী অবস্থা সংশোধিত হইয়া যায়, তখন বাহ্যিক আমলগুলি খুব ভালভাবে আদায় হইতে থাকে।

কোন নির্বোধ যেন এরূপ মনে না করে যে, বাহ্যিক আমলের প্রয়োজন শুধু আত্মা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত। আত্মা সংশোধিত হইয়া গেলে আর বাহ্যিক আমলের প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হইলে বাহ্যিক আমল করিবে নচেৎ না করিবে, ইহা কুফরী আক্বীদা। কারণ যখন আত্মা সংশোধিত হইয়া যাইবে, তখন যথাসাধ্য সব সময় আল্লাহ্ তা'আলার বন্দেগীতে ব্যস্ত থাকিবে এবং ইহাই আত্মা সংশোধিত হওয়ার নিদর্শন। কেননা, আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যই হইল আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত এবং তাঁহার শোক্র গোযারী করা। পরোয়ারদেগারের নাফরমানী এবং না-শোক্রী না করা। আর নামায

রোযা ইত্যাদি স্পষ্টই আল্লাহ্‌র এবাদত। কাজেই যখন এই এবাদতসমূহ ত্যাগ করা হইল, তখন ত আর আত্মা সংশোধিত হইল না। যদি আত্মা সংশোধিত হইত, তবে হামেশা দিন-রাত আল্লাহ্‌র নবীদের মত আল্লাহ্‌র এবাদতে নিশ্চয়ই মশগুল থাকিত।

নাউযুবিল্লাহ্! কোন নির্বোধ ও আহমকের দেলে এই ওছ্‌ওছা আসিতে পারে যে, কাহারও দেল জনাব হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের চেয়েও বেশী পরিষ্কার ও নেক, তাহার বাহ্যিক এবাদতের প্রয়োজন নাই।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সর্বগুণে গুণান্বিত এবং নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এত অধিক পরিমাণ বাহ্যিক আমলে লিপ্ত থাকিতেন যে, যাহারা উহা দেখিত তাহাদের মনে দয়ার সঞ্চার হইত। আজীবন তাঁহার অবস্থা এরূপই ছিল। হুযূরের (দঃ) এই অবস্থা হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এবং ইহা সর্বজনবিদিত।

মুসলমানগণ! ভালরূপে বুঝিয়া লও, যেরূপ বাহ্যিক আমল যথাঃ—রোযা, নামায ইত্যাদি আদায় করা এবং উহা আদায়ের প্রণালী তরীকা জ্ঞাত হওয়া ওয়াজিব; তেমনিভাবে, বাতেনী আমলসমূহ যেমন রোযা, নামাযকে রিয়া বা লোক দেখানো ইত্যাদি হইতে বাঁচাইয়া রাখা কিম্বা হিংসা-বিদ্বেষ ক্রোধ ইত্যাদি হইতে আত্মাকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আত্মার আ'মলের তরীকা জানিয়া লওয়াও ওয়াজিব। তন্মধ্যে কোন কোন আ'মল তো শুধু দেলের সাথে যোগাযোগ রাখে, যেমন—গোনাহ্‌র ইচ্ছা করা, বিদ্বেষ রাখা, হিংসা করা, এখলাছ পয়দা করা। আর কোন কোন কাজে দেল এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও শরীক আছে; যেমন—নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ছদকা ইত্যাদি। ইমাম গায্‌যালী (রঃ) ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন এই মতকে সমর্থন করিয়াছেন।

২। হাদীসঃ

رَكْعَتَانِ مِنْ رَّجُلٍ وَّرِعٍ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ رَكْعَةٍ مِّنْ مُّخْلِطٍ ○

অর্থাৎ—এমন পরহেযগার ব্যক্তি, যে সন্দেহের বস্তু হইতেও বাঁচিয়া থাকে, তাঁহার দুই রাকা'আত নামায ঐ ব্যক্তির হাজার রাকা'আত নামাযের চেয়েও উত্তম, যে সন্দেহের বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকে না।

ইহা স্পষ্ট কথা যে, এই ফযীলত আত্মার পরিচ্ছন্নতা এবং বাতেনী সংশোধন ব্যতীত হাছিল হওয়া সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি বাতেনী ব্যাধিসমূহ হইতে মুক্ত নহে, সে তো ওয়াজিব কাজগুলিও ঠিকমত আদায় করিতে পারে না এবং হারাম কাজগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকারও ক্ষমতা রাখে না। সে আবার সন্দেহের জিনিসগুলি হইতে কি ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে?

আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে এই ফযীলত দান করেন, সে খোদা ভীরুতা এবং আত্মার পরিচ্ছনতার সহিত যাহাকিছু এবাদত-বন্দেগী করিবে তাহা নিয়মানুযায়ী হইবে এবং গ্রহণীয় হইবে, যদিও তাহা অল্প পরিমাণেই হউক না কেন। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানের যাহের-বাতেনকে পূর্ণরূপে সংশোধন করিয়া লওয়া একান্ত কর্তব্য। কেননা, ইহাই শুধু পরিত্রাণ বা নাজাতের উপায়। আত্মার সংশোধন ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আমলসমূহকে নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করা উচিত নহে।

আচ্ছা ধরুন, যদি কেহ অনেক বেশী বেশী নামায পড়ে; কিন্তু নিয়ত এই যে, লোকে আমাকে বুযুর্গ মনে করুক, আমার প্রশংসা করুক। এমতাবস্থায় সে কি আযাব হইতে বাঁচিতে পারিবে?

অথবা নামায তো এমন জিনিস যে, যদি কেহ উহাকে নিয়মানুযায়ী এবং খাঁটি নিয়তে শুধু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আদায় করে, তবে নামায না পড়িলে যে আযাব হইবে, তাহা হইতেও বাঁচিয়া থাকিবে এবং ছওয়াবও পাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—সেই হতভাগা তো লোক দেখানো ব্যাধির জন্য এবং প্রশংসার মোহে ঐ নামাযকে বরবাদ করিয়া দিল। অতএব, এই সকল ব্যাধির প্রতিকার করা উচিত, নতুবা অচিরেই সর্বনাশে পতিত হইবে। কেননা, রোগ যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে অথচ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা থাকিবে না, তখন ধ্বংস তাহার অনিবার্য।

বল দেখি, যদি তুমি রোগাক্রান্ত হও এবং তোমার শরীর অসুস্থ হয় তখন কি তুমি ইহা পছন্দ করিবে যে, তুমি পীড়িত থাক এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা না করিয়া বসিয়া থাক আর সেই রোগ তোমাকে ধ্বংস করুক? কিছুতেই তুমি ইহা পছন্দ করিবে না, অথচ এই রোগে যে কষ্ট হইবে,তাহা হইবে শুধু এই দুনিয়াতে কয়েক দিনের দৈহিক কষ্ট। কাজেই যখন তুমি সামান্য কষ্ট পছন্দ কর না, তখন আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহে আক্রান্ত থাকা, যাহার কারণে এমন স্থানে দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, যেখানে অনন্তকাল থাকিতে হইবে, ইহা পছন্দ করা সরল বিবেকের একেবারেই পরিপন্থী। অতএব, প্রত্যেক মানুষের একান্ত কর্তব্য যে, দেহ, অন্তর, যাহের বাতেন প্রত্যেকটিকে ভালরূপে সংশোধন করিয়া লওয়া এবং সুস্থ বিবেক দ্বারা চিন্তা করিয়া দোনো জাহানের সফলতাকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করা। জনৈক কবি বলেনঃ

বেকার শুধু সেই দেশ, নাহি যেথা দ্বীনের কোশেশ,
হেথার তরে করেছ সবই হোথার তরে কর কিছু কম বেশ।

৩। হাদীসঃ

عن النعمان بن بشير مرفوعا فِى حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ ـ اَلَا وَ اِنَّ فِى الْجَسَدِمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَ هِىَ الْقَلْبُ ـ

অর্থাৎ, নোমান ইবনে বশীর হইতে এক মরফু' হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ শরীরে এক টুকরা (মাংস পিণ্ড) আছে, যখন উহা সুস্থ থাকে তখন সম্পূর্ণ দেহ ঠিক থাকে, আর যখন উহা খারাব হইয়া যায়, তখন সমস্ত দেহ খারাব (বরবাদ) হইয়া যায়। জানিয়া রাখ, ঐ টুকরাটি হইল হৃৎপিণ্ড। এই হাদীসখানা বোখারী ও মুসলিম (রঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন। এই হাদীসের মর্ম এই যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংশোধন এবং খোদা তা'আলার বন্দেগী দেলের সংশোধনের উপর নির্ভর করে। কেননা, দেল শরীরের রাজা, রাজা সৎ ও দ্বীনদার না হইলে প্রজা সাধারণের নেক ও দ্বীনদার হওয়া সম্ভব নহে। অতএব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেক কাজ ঐ সময়েই করিবে যখন অন্তর নেক হইবে। কাজেই দেল সংশোধনে যত্নবান হওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হইল। কেননা, আল্লাহ্র বন্দেগী ওয়াজিব চাই সেই বন্দিগীর যোগাযোগ শুধু দেলের সাথে হউক কিংবা উহাতে দেলের সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগাযোগ হউক। আর এবাদত সঠিক এবং কবূল হওয়া দেলের সংশোধনের উপর নির্ভর করে; সুতরাং দেলের সংশোধন করা ওয়াজিব। ক্ষুধিত অবস্থায় নামায পড়িলে মন পেরেশান থাকিবে। কাজেই এমতাবস্থায় নামায পড়া শরীঅত মতে মকরূহ। সুতরাং আগে খানা খাইয়া পরে নামায পড়িবে। কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত যেন শেষ হইয়া না যায়। ইহাতে হেকমত এই যে, এবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে হাজিরী দেওয়া এবং নিজের দাসত্ব এইরূপে প্রকাশ করা যে, যাহের ও বাতেন তাঁহার

কাজে মশগুল থাকে এবং যতদূর সম্ভব এক আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন কিছুর দিকে মন যেন না যায়। আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদিও বাহ্যিক দেহ নামাযে লিপ্ত থাকিবে বটে, কিন্তু চাহিবে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করিয়া খানা খাওয়ার জন্য। অতএব, আল্লাহ্‌র দরবারে যেভাবে উপস্থিত হওয়া দরকার উহাতে ক্ষতি সাধিত হইবে অনেক। এ কারণে এমন অবস্থায় নামায পড়া মকরূহ বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার আসল দৃষ্টিস্থল হইল মানুষের অন্তর। পবিত্র শরীঅত উহার সংশোধনের অতি বড় ব্যবস্থা করিয়াছে। বুযুর্গানে দ্বীন আত্মার সংশোধনের জন্য বহু বৎসর পর্যন্ত সাধনা, মোজাহাদা, রিয়াযত ও সংযম অভ্যাস করিয়াছেন। এই বিষয়ের ভুরি ভুরি কিতাব বিদ্যমান আছে। অত্র হাদীস দ্বারা আত্মা সংশোধনের ব্যাপারে খুব বেশী তাকীদ ও তাম্বীহ প্রমাণিত হইতেছে। কেননা, বন্দেগীর সৌন্দর্য, গুণ গরিমা আত্মার উপর নির্ভর করে।

৪। হাদীস ঃ

عن ابن عباس (رض) مَرْفُوْعًا قَالَ رَكْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَّ الْقَلْبُ سَاءٍ ـ

(فى كنز العمال)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, একাগ্রতার সহিত মধ্যম ধরনের দুই রাকা'আত নামায পড়া, অন্যমনস্ক অবস্থায় সারা রাত্র নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। এই হাদীসের মর্ম এই যে, যদি কেহ দুই রাকা'আত নামায মধ্য পন্থায় আদায় করে, নামাযের যাবতীয় ফরয ওয়াজিব ও সুন্নত কাজগুলি হুযূরে কাল্‌ব ও দেলের একাগ্রতার সহিত আদায় করে, যদিও উহাতে লম্বা লম্বা কেরাআত ইত্যাদি না করে, এই প্রকারের দুই রাকা'আত নামায অন্যমনস্কভাবে সারা রাত্রি নামায পড়ার চেয়ে অতি উত্তম এবং মকবুল।

এই হাদীস দ্বারা অন্তরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার অত্যধিক তাকীদ বুঝা যাইতেছে। কারণ মানুষ শুধু দেখে যে, কাজটা কেমন হইল ; কাজ কি পরিমাণ হইতেছে ইহা কেহ দেখে না। কাজ যদিও সামান্য এবং অল্পও হয়, কিন্তু হয় নিয়মানুযায়ী উত্তমরূপে, তবে উহা আল্লাহ্‌র সমীপে সমাদৃত এবং মকবুল হইয়া থাকে। আর যদি কাজ অনেক কিছু হয় কিন্তু কায়দা কানুন ছাড়া অন্যমনস্কভাবে হয়, তবে উহা অপছন্দনীয়। ভালরূপে বুঝিয়া লও।

হিত বাণী সবায় আমি করিলাম দান,
কেটেছে একাজে মোর ক্ষুদ্র জীবনখান,
হতে না পারে কারো হৃদে কর্মের অভিলাষ,
পৌঁছাইলে কিন্তু ওই বাণী নবীগণ খালাস।

সাধারণ মেয়েলোকদের প্রতি নছীহত

শেরেকী বিষয়সমূহের কাছেও যাইবে না, সন্তান হইবার জন্য বা জীবিত থাকার জন্য যাদু-টোনা করিবে না, ভাগ্য গণনা করাইবে না, পীর ওলীদের ফাতেহা-নিয়ায করিবে না, বুযুর্গদের নামে মান্নত করিবে না, শবেবরাত, মোহররম আরফা ইত্যাদিতে এবং তাবাররুকের রুটি (এক জাতীয় রছম) ও তেরাতেজীতে (ছফর মাসের প্রথম তের দিন যখন রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পীড়িত ছিলেন, তাই এই দিনগুলিকে অশুভ মনে করা হয়) ঘুমনী ইত্যাদি

কিছুই করিবে না। শরীঅতে যাদের হইতে পর্দা করিবার হুকুম, চাই সে পীর হউক বা যতই নিকটবর্তীয় হউক না কেন, যেমন ভাসুর পুত্র কিম্বা খালু, ফুফা, মামাত ভাই, ভগ্নিপতি, নন্দাই, ধর্ম-ভাই, ধর্ম-বাপ, এই সকল হইতে বেশী রকম পর্দা করিবে। শরীঅতের রবখেলাফ পোশাক পরিবে না, যেমন কলিদার পায়জামা, এমন জামা যাহাতে পেট, পিঠ, হাতের কব্জি বা বাহু খোলা থাকে কিংবা এমন পাতলা কাপড় যাহাতে শরীর বা মাথার চুল দেখা যায়। মোটা কাপড় দ্বারা লম্বা হাতার লম্বা জামা ও ওড়না তৈয়ার কর। আর সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে মাথা হইতে কাপড় যেন সরিয়া না যায়। অবশ্য যদি বাড়ীতে শুধু মেয়েলোক থাকে কিংবা নিজের বাপ, সহোদর ভাই ইত্যাদি ছাড়া অন্য কেহ না থাকে, তবে মাথার কাপড় খুলিয়া গেলে তাতে ভয়ের কারণ নাই। কাহাকেও উঁকিঝুকি মারিয়া দেখিও না। বিবাহ-শাদী, ছেলের মাথা মুড়ানী, (জন্মের সপ্তম দিবেস সন্তানের মাথার চুল মুণ্ডানকালে ধুমধাম করা।) চিল্লা, (প্রসূতির ৪০ দিনের দিন গোসলের সময় ধুমধাম করা।) প্রসবের ষষ্ঠ দিনের ষষ্ঠি (রসম), খৎনা, আকীকা শাদীর পয়গাম, চৌথি—পাত্র পক্ষ হইতে পাত্রীর বাড়ীর কাপড়, আতর, মেন্দি ইত্যাদি পাঠাইবার দিন যাবতীয় রসুমের মধ্যে কোথাও যাইবে না। উপরোক্ত কাজে নিজের বাড়ীতেও কাহাকেও ডাকিবে না। নামের জন্য কোন কাজ করিও না, খোঁটা, বদদো'আ, পরনিন্দা ও অভিশাপ হইতে জবান বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া রাখ, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আউয়াল ওয়াক্তে পড় মন, লাগাইয়া ধীরে ধীরে নামায পড়, রুকূ-সজ্‌দা ভালরূপে কর। মাসিক নাপাকী হইতে যখন পাক হও তখন খুব খেয়াল রাখিও, খুন বন্ধ হইবার পর যেন কোন ওয়াক্তের নামায ছুটিয়া না যায়। যদি তোমার কাছে অলংকারাদি, সোনা বা রূপার চেইন, কাপড়ের জরী ইত্যাদি থাকে, তবে হিসাব করিয়া যাকাত আদায় করিও। বেহেশ্‌তী জেওর পড়িতে থাকিও কিংবা অন্যের কাছে শুনিতে থাকিও এবং তদনুযায়ী চলিও। স্বামীর তাবেদারি করিও, তাহার মাল গোপনে খরচ করিও না, গান শুনিও না। যদি কোরআন শরীফ পড়িতে পার তবে দৈনিক কোরআন শরীফ তেলাওয়াত কর। যদি কোন বই-পুস্তক পড়িবার জন্য কিংবা দেখিবার জন্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়, তবে প্রথমে কোন পরহেযগার আলেমকে দেখাও। যদি তিনি সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলেন, তবে খরিদ কর, নচেৎ ক্রয় করিও না। যেখানে রসম-রেওয়াজের মিষ্টি বিতরণ হয় সেখানে যাইও না এবং বিতরণ কাজে শরীক হইও না।

খাছ যাহারা মুরীদ হইবে তাহাদের প্রতি নছীহত

উপরের নছীহতগুলি রীতিমত পালন করিবে। প্রত্যেক বিষয়ে সুন্নতের পায়রবী করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। সুন্নতের পায়রবীতে দেলের মধ্যে নূর পয়দা হয়। তোমার মতের বিরুদ্ধে বা মনের বিরুদ্ধে যদি কেহ কোন কথা বলে বা কোন কাজ করে, তবে তাহাতে রাগান্বিত না হইয়া ধৈর্য (ছবর) ধারণ করিবে। চিন্তা না করিয়া হঠাৎ কোন কথা বলা শুরু করিও না, বিশেষতঃ রাগের সময় ত কথা বলিবেই না। কখনো পরহেযগারীর, এবাদত-বন্দেগীর বা এলেম-লিয়াকতের ফখর (গর্ব) করিও না। যে কোন কথা বলিতে হইবে, আগে ভাল মত চিন্তা করিয়া লইবে, যখন খুব এতমিনান হইয়া যাইবে যে, এ কথায় কোন খারাবি নাই; বরং দ্বীনের বা দুনিয়ার জরুরত বা লাভ আছে, তখন বলিবে নতুবা বলিবে না। কোন মন্দ লোককেও মন্দ বলিও না।

(খেলাফে শরা ফকীরের কাছে কখনো যাইও না বা তাহাদের কথা কখনো শুনিও না বা যদি তাহার তা'বিযে কাজ হয়, তবুও তাহার দ্বারা তাবিয-তুমারের কোন তদবীর করাইও না।) কোন মুসলমান যদি গোনাহ্‌গার বা ছোট কওমের হয়, তবুও তাহাকে হেকারতের (ঘৃণার) চোখে দেখিও না। মানের লোভ যশের লোভ করিও না। তাবিয-তুমারের বা সূতা পড়া, পানি পড়ার ব্যবসা কখনো করিও না। যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে যাহারা সর্বদা আল্লাহ্‌র যেক্‌র করে, তাহাদের সঙ্গে থাকিবে। কারণ আল্লাহ্‌র যেকরকারীদের সংসর্গে থাকিলে দেলের মধ্যে নূর, হিম্মত এবং শওক পয়দা হয়। দুনিয়ার ঝামেলা বেশী বাড়াইবে না, বিনা জরুরতের অসবাবপত্র কিনিবে না। বিনা জরুরতে বেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিবে না। অধিকাংশ সময় একা একা থাকিয়া আল্লাহ্‌র যেকরের ধ্যান রাখিতে চেষ্টা করিবে। দরকারবশতঃ লোকের সঙ্গে যখন মেলামেশা কর, তখন খুব ভদ্রতা এবং নম্রতার সহিত মিলিবে মিশিবে। রুঠা বা কর্কশ কথা কাউকে বলিবে না। চিন-পরিচয়ের লোক যারা, তারা কিন্তু অনেক সময় নষ্ট করে। খুব সতর্ক থাকিবে যাতে জীবনের সময় নষ্ট না হয়, সময়গুলি যেন কাজে খাটে। যেকের-শোগল বা মোরাকাবা করার কারণে দেলের মধ্যে যদি কোন হালত পয়দা হয়, তবে তাহা এক পীর ব্যতীত অন্য কাহারো কাছে বলিবে না। অনর্থক জেদ হঠ করিও না, এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিও। যদি কোন কথায় তোমার ভুল হইয়া থাকে, তবে বুঝে আসা মাত্র বা অন্য কেহ সতর্ক করিলে তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল স্বীকার করিয়া লইবে, অনর্থক তর্ক করিয়া জিতিতে চাহিও না। সব কাজে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখিবে, সব সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ রাখিবে আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখিবে, আল্লাহ্‌র গযবের ভয় রাখিবে, যখন যে বিষয় অভাব বা দরকার হয় আল্লাহ্‌র কাছে চাহিবে। যদি তিনি দয়া করিয়া দেন, তবে শোক্‌র করিবে। যদি না দেন ছবর করিবে। সব সময় দ্বীনের উপর হামেশা কায়েম থাকার জন্য এবং খাতেমা বিল-খায়ের অর্থাৎ ঈমানের সঙ্গে মউতের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি, কাকুতিমিনতি করিয়া দো'আ চাহিতে থাকিবে। আল্লাহ্ সকল মুসলমানকে নেক আমল করিবার তওফীক দান করুন। আমিন!

॥ দ্বিতীয় জিল্‌দ সমাপ্ত ॥